॥ श्रीहरिः॥

556

গীতা-দর্পণ

(দর্পণে গীতার সর্বাঙ্গীণ প্রতিচ্ছবি)

गीता–दर्पण (बँगला)

गीताप्रेस गोरखपुर
GITA PRESS, GORAKHPUR

স্বামী রামসুখদাস

॥ শ্রীহরিঃ ॥

সূচিপত্র

পূর্বার্ধ

বিষয় পৃষ্ঠা-সংখ্যা

বিষয় | পৃষ্ঠা-সংখ্যা

উত্তরার্ধ

পরিশিষ্ট

পূর্বার্ধ

ওঁ

॥ শ্রীপরমাত্মনে নমঃ ॥

গীতা-দর্পণ

স্বাত্মীয়প্রিয়ভক্তপার্থগতয়ে গুহ্যং হি গুহ্যাৎ পরং
যেন স্বং প্রকটীকৃতং চ হৃদয়ং গীতাভিধেয়াত্মকম্॥
যস্যাং প্রাপ্তপরিস্থিতৌ তু মনুজঃ প্রাপ্নোতি মুক্তিং স্থিত
এষা যেন কলা নবা নিগদিতা কৃষ্ণায় তস্মৈ নমঃ॥

যিনি তাঁর প্রিয় ভক্ত অর্জুনের কল্যাণের জন্য অতি গোপনীয় 'গীতা' নামক স্বীয় হৃদয় প্রকাশ করেছেন এবং 'মানুষ যে কোনও পরিস্থিতির মধ্যে থেকেই নিজ-কল্যাণ সাধন করতে পারে', এই চিন্তায় নতুন পথ দেখিয়েছেন, সেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করি।

যে বাঞ্ছন্তি নিজং মতং তু ঘটিতুং পশ্যন্তি গীতামিমাং
তেষাং দর্শয়িতুং স্বপক্ষবদনং গীতা স্বয়ং দর্পণঃ।
যে নিষ্পক্ষনিরাগ্রহাস্তু মনুজা ইচ্ছন্তি গীতামতং
গীতাদর্পণ এষ বেত্তুমথ মে তেভ্যঃ কৃতো বাঙ্ময়ঃ॥

যারা নিজের সিদ্ধান্তকেই গীতার প্রতিপাদ্য-রূপে প্রতিষ্ঠিত করতে চান এবং সেই দৃষ্টিকোণ থেকে গীতার বিচার করেন, তাদের নিজ মতবাদরূপ মুখের প্রতিচ্ছবি দর্শন করানোর জন্য গীতা স্বয়ং দর্পণ স্বরূপ। কিন্তু যাঁরা শুধুমাত্র গীতার মতটিকেই দুরাগ্রহরহিত এবং পক্ষপাতশূন্য হয়ে জানতে চান তাঁদের জন্য আমি এই বিশিষ্ট 'গীতা-দর্পণ' রচনা করেছি।

(১) শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতার প্রত্যেক অধ্যায়ের তাৎপর্য

গীতাধ্যায়স্য নিষ্কর্ষং জ্ঞাতুমিচ্ছন্তি যে জনাঃ।
তৈঃ সুখপূর্বকং গ্রাহ্যস্ততঃ সারোঽত্র লিখ্যতে॥

প্রথম অধ্যায়

মোহে বশীভূত হয়ে মানুষ, 'কি করব, কি করব না'—এই দ্বিধাগ্রস্ত অবস্থায় কর্তব্যচ্যুত হয়ে পড়ে। মানুষ যদি মোহের বশীভূত না হয় তবে সে কর্তব্যচ্যুত হতে পারে না।

যে সকল ব্যক্তি ভগবান, ধর্ম, পরলোক ইত্যাদিতে শ্রদ্ধাশীল তাঁরা প্রায়ই দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়েন এই ভেবে যে, যদি আমি কর্তব্য কর্ম সম্পাদন না করি তাহলে আমার পতন হবে, কেবল সাংসারিক কাজেই যদি লিপ্ত থাকি তাহলে আমার আধ্যাত্মিক উন্নতি হবে না,—ব্যবহারিক কাজে মজে থাকলে পরমার্থ ঠিক থাকবে না, আবার যদি পরমার্থ ধরে থাকি তবে ব্যবহারিক কাজকর্ম ঠিকমত হবে না ; যদি আত্মীয়-কুটুম্বদের পরিহার করি তবে আমার পাপ হবে আর যদি আমি শুধু তাদেরই নিয়ে থাকি তাহলে আমার আধ্যাত্মিক উন্নতি হবে না ইত্যাদি। এর তাৎপর্য হিসাবে বলা যায় যে, সকলে নিজের কল্যাণ তো চায় কিন্তু মোহ এবং সুখের প্রতি আসক্তির কারণে তাদের সংসারবন্ধন কাটে না। এই প্রকার অস্থিরতা অর্জুনের মধ্যেও এসেছিল, তাই তিনি ভেবেছিলেন, 'আমি যদি যুদ্ধ করি তবে সমস্ত কুল নষ্ট হবে আর আমার অকল্যাণ হবে, আবার যদি যুদ্ধ না করি তাহলেও কর্তব্যচ্যুতির অপরাধে কল্যাণে অন্তরায়ের সৃষ্টি হবে।'

দ্বিতীয় অধ্যায়

নিজ বিবেককে গুরুত্ব দেওয়া এবং নিজ কর্তব্য পালন, এই দুটি পথের যে কোন একটিকে দৃঢ়তার সঙ্গে অনুসরণ করলে মানুষের শোক ও চিন্তার অবসান ঘটে।

প্রত্যেক দেহই বিনষ্ট হবে, মৃত্যুমুখী হবে। কিন্তু এই দেহের মধ্যে যিনি দেহিরূপে অবস্থান করছেন তাঁর মৃত্যু নেই। একটি শরীর যেমন বাল্যাবস্থা থেকে যুবাবস্থা এবং যুবাবস্থা থেকে বৃদ্ধাবস্থা প্রাপ্ত হয়, তেমনি এই শরীরে অবস্থানকারীও এক শরীর ত্যাগ করে অপর শরীর ধারণ করেন। মানুষ যেমন পুরাতন বস্ত্র পরিত্যাগ করে নতুন বস্ত্র পরিধান করে, দেহধারীও তেমনি এক দেহখোলস পরিত্যাগ করে নতুন দেহ গ্রহণ করেন। অনুকূল বা প্রতিকূল কোনও পরিস্থিতিই আগে থেকে থাকে না, পরেও থাকবে না এবং অন্তবর্তী সময়েও প্রতিক্ষণেই পরিস্থিতির পরিবর্তন হতে থাকে অর্থাৎ কোনও পরিস্থিতিই চিরস্থায়ী নয়, সদা আসে ও যায়—এইরূপ স্পষ্ট বিবেক ভাব বা অন্তদৃষ্টি জাগরিত হলে চঞ্চলতা, শোক ও চিন্তা দূরীভূত হয়। শাস্ত্র নির্দিষ্ট কর্তব্যকর্মের সমাপ্তি-অসমাপ্তি এবং ফলের প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তি বিষয়ে নির্বিকার থেকে যিনি তা সম্পাদন করতে পারেন তাঁর কোনরূপ অস্থিরতা থাকে না।

তৃতীয় অধ্যায়

এই মনুষ্যলোকে প্রত্যেকেরই নিজ নিজ কর্তব্য নিষ্কাম ভাবে তৎপরতার সঙ্গে পালন করা উচিত, তা তিনি জ্ঞানী, অজ্ঞানী বা ভগবৎ অবতার যাই-ই হোন না কেন। কারণ সৃষ্টিচক্র চালিত থাকে প্রত্যেক প্রাণীর নিজ নিজ কর্তব্য পালনের মাধ্যমে।

মানুষ কর্ম আরম্ভ না করলে যেমন সিদ্ধি প্রাপ্ত হয় না, তেমনি কর্মত্যাগ করেও সিদ্ধি পেতে পারে না। প্রজাপতি ব্রহ্মা সৃষ্টিকালে প্রজাদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন, 'তোমরা নিজ নিজ কর্তব্যকর্মের দ্বারা একে অন্যের সহায়তা কর ও অন্যের উন্নতির সহায়ক হও, তাহলেই তোমরা সেই পরম শ্রেয়কে লাভ করবে।' সৃষ্টিচক্রের মর্যাদা অনুসারে যে সকল মানুষ নিজ নিজ কর্তব্য পালন

করে না, এই সংসারে তাদের বেঁচে থাকা অর্থহীন। মনুষ্যরূপে অবতীর্ণ হলে ভগবানের কর্তব্যকর্ম বলে কিছু থাকে না বটে, তবে লোকশিক্ষার জন্য নিজ কর্তব্য তিনি তৎপরতার সঙ্গে পালন করেন। জ্ঞানী মহাপুরুষগণেরও নিজ নিজ কর্তব্যকর্ম দক্ষতার সঙ্গে পালন করাই বিধেয়। নিজ কর্তব্য নিষ্কাম ভাবে পালন কালে মানুষ যদি মৃত্যুমুখেও পতিত হয় তাতে তার কল্যাণই হয়ে থাকে।

চতুর্থ অধ্যায়

সমস্ত কর্ম ক্ষয় করার এবং সমস্ত কর্মবন্ধন থেকে মুক্তি পাবার দুটি উপায় আছে—কর্মের তত্ত্ব জানা এবং সেই তত্ত্বজ্ঞানকে উপলব্ধি করা।

ভগবান তো সৃষ্টি কার্য করেনই কিন্তু তাতে তাঁর কর্তৃত্বাভিমান এবং ফলাসক্তি না থাকায়, বন্ধনের কারণ হয় না। যে ব্যক্তি কর্মে নিয়োজিত থেকেও কর্মফলের কামনা, মমতা পোষণ করেন না, অর্থাৎ যিনি সর্বদা কর্মফলে নির্লিপ্ত থাকেন এবং নির্লিপ্ত হয়ে কর্ম করেন তিনি কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে যান। যিনি সমস্ত কর্মে সংকল্পবিহীন ও কামনারহিত হয়েছেন, তাঁর কর্ম বলে আর কিছু থাকে না। যিনি কর্ম ও কর্মফলে আসক্তিবিহীন তিনি যথাযথ ভাবে কাজ করলেও কর্ম তাঁকে বন্ধনে ফেলে না। কেবলমাত্র শরীর নির্বাহের জন্য যিনি কর্ম করেন এবং যিনি সিদ্ধি-অসিদ্ধিতে নির্বিকার থাকেন তাঁর কৃতকর্ম বন্ধনের কারণ হয় না। যে ব্যক্তি কেবল কর্মের ধারাবাহিকতা ঠিক রাখবার জন্যই কর্ম করে, তার কর্ম সম্পূর্ণ ক্ষয় হয়ে যায়।

এই কর্মতত্ত্ব সম্যক্রূপে অবহিত হলে মানুষ কর্ম-বন্ধন থেকে মুক্ত হয়।

জড়ত্ব (বিষয়) থেকে সম্বন্ধ-বিচ্ছেদ হওয়াই হল তত্ত্বজ্ঞান প্রাপ্ত হওয়া। এই তত্ত্বজ্ঞান নানা সামগ্রীর সাহায্যে সাধিত যজ্ঞের থেকেও শ্রেষ্ঠ। তত্ত্বজ্ঞান প্রাপ্ত হলে মানুষের সকল কর্ম সমাপ্ত হয়। তত্ত্বজ্ঞান লাভ হলে মোহগ্রস্ত হতে হয় না। অত্যন্ত পাপী ব্যক্তিও যদি এই জ্ঞান প্রাপ্ত হয়, তবে সেও সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হয়। অগ্নি যেমন সমস্ত ইন্ধনকে ভস্মীভূত করে, তেমনি জ্ঞানরূপ অগ্নি মানুষের সকল কর্ম ভস্মীভূত করে।

পঞ্চম অধ্যায়

অনুকূল বা প্রতিকূল পরিস্থিতিতে মানুষের সুখী-দুঃখী বা রাজী-নারাজ হওয়া উচিত নয়; কারণ যে সকল মানুষ সুখ-দুঃখ ইত্যাদি দ্বন্দ্বে প্রভাবিত হয়, তারা সংসার চেতনার ওপরে উঠতে পারে না।

স্ত্রী-পুত্র-পরিবার বা ধন-সম্পত্তি ত্যাগ করলেই সন্ন্যাসী হওয়া যায় না। যিনি রাগ-দ্বেষ বর্জিত হয়ে আপন কর্তব্য পালন করেন, তিনিই প্রকৃত সন্ন্যাসী। অনুকূল পরিস্থিতিতে যিনি পুলকিত হন না এবং প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও উদ্বিগ্ন হন না, এইরূপ দ্বন্দ্ব-রহিত ব্যক্তিই স্ব-রূপে (পরমাত্মায়) স্থিত থাকেন। সাংসারিক সুখ-দুঃখ এবং অনুকূলতা-প্রতিকূলতা ইত্যাদি দ্বন্দ্বই দুঃখের কারণ। অতএব বুদ্ধিমান ব্যক্তির কখনও তাতে বদ্ধ হওয়া উচিত নয়।

ষষ্ঠ অধ্যায়

যে কোনও সাধনপথ অবলম্বন করা হোক না কেন, পরিণামে মনে (অন্তঃকরণে) সমত্ব-ভাব আসা চাই। কারণ, সমত্ব না এলে মানুষ অনুকূল বা প্রতিকূল পরিস্থিতিতে এবং মান-অপমানে নির্বিকার থাকতে পারে না। এর তাৎপর্য এই যে, অন্তঃকরণে সমত্ব না এলে সুখ-দুঃখ ইত্যাদি দ্বন্দ্বের প্রভাব দূর হয় না এবং মন ধ্যানে সমাহিত হতে পারে না।

যে ব্যক্তি নিজ প্রারব্ধ (ভাগ্য) অনুযায়ী প্রাপ্ত অনুকূল-প্রতিকূল পরিস্থিতিতে, বর্তমান কর্মের সমাপ্তি-অসমাপ্তি কিংবা সিদ্ধি-অসিদ্ধিতে, মান-অপমান, বিষয়-আশয়

ইত্যাদি এবং ভাল-মন্দ ব্যক্তির সান্নিধ্যে অবিচলিত থাকতে পারেন, তিনি-ই শ্রেষ্ঠ। যিনি সাধ্যরূপ সমতা সাধনের উদ্দেশ্যে মন ও ইন্দ্রিয় সংযমপূর্বক পরমাত্মার ধ্যানে নিরত হন, তাঁর সকল প্রাণী এবং তাদের সুখ-দুঃখে সমত্ববুদ্ধি প্রাপ্তি হয়। যে ব্যক্তি এই সমত্ব লাভ করার ইচ্ছা রাখেন, তিনি বেদোক্ত সকাম কর্ম অতিক্রম করেন। সমদর্শী ব্যক্তি সকামভাবসম্পন্ন তপস্বী, জ্ঞানী বা কর্মী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

সপ্তম অধ্যায়

সবকিছু ভগবান বাসুদেবেরই রূপ,—এই সত্য মানুষকে অনুভব করতে হবে।

সূত্র দ্বারা নির্মিত মণিগুলি[১] যেমন মালায় গ্রথিত থাকে, তেমনি ভগবান সমস্ত সংসারে ওতপ্রোত হয়ে আছেন। পৃথিবী, জল, তেজ ইত্যাদি তত্ত্বে; চন্দ্র, সূর্য ইত্যাদি রূপে ; সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ভাবে এবং সকল কর্মে সর্বতোভাবে ভগবানই বিরাজিত। ব্রহ্ম, জীব, ক্রিয়া, সংসার, ব্রহ্মা ও বিষ্ণুরূপেও ভগবানই প্রকাশিত। এই প্রকার তত্ত্বরূপে সবকিছু অবশ্যই ভগবানেরই প্রকাশ।

অষ্টম অধ্যায়

মৃত্যুকালীন চিন্তাধারা অনুযায়ী জীবের গতি লাভ হয়, সেইজন্য মানুষের সবসময় সাবধান থাকা উচিত। যেন অন্তিম সময়ে ভগবৎস্মৃতি জাগরূক থাকে।

অন্তিমকালে অর্থাৎ শরীর ত্যাগ করার সময় মানুষ যে বস্তু, ব্যক্তি ইত্যাদির বিষয়ে চিন্তা করে, সেই অনুসারেই তাঁর পরজন্মে নতুন শরীর প্রাপ্তি ঘটে। যিনি মৃত্যুসময়ে ভগবানের চিন্তা করতে করতে দেহত্যাগ করেন, তিনি ভগবানকেই পান। তাঁর আর 'জন্ম-মৃত্যু' হয় না। সুতরাং মানুষের সর্ব সময়ে, সর্ব অবস্থাতে এবং শাস্ত্রবিহিত সমস্ত কর্ম করার সময় ভগবানকে স্মরণ রাখা উচিত, যাতে অন্তিমকালে তাঁর ভগবৎ-স্মরণ হয়। সারাজীবন মানুষ অনুরাগ সহকারে যে কাজ করতে ভালবাসে, মৃত্যুকালে প্রায়শঃ সেইটিই তার স্মরণে আসে।

নবম অধ্যায়

ব্যক্তি যে কোন বর্ণ, আশ্রম, সম্প্রদায়, দেশ বা জাতিরই হোন না কেন, প্রত্যেকেই ভগবৎপ্রাপ্তির অধিকারী। সকলেই ভগবানের প্রতি অগ্রসর হতে পারেন এবং ভগবানের আশ্রয় গ্রহণ করে তাঁকে লাভ করতে পারেন।

ভগবান সখেদে বলেছেন যে, 'জীব মনুষ্য শরীর প্রাপ্ত হয়ে, আমাকে পাওয়ার অধিকার পেয়েও আমাকে না চেয়ে, আমার দিকে না এসে বৃথাই জাগতিক বন্ধনে (জন্ম-মৃত্যুচক্রে) পতিত হয়। আমার প্রতি বিমুখ হয়ে কেউ আমাকে অবহেলা করে, কেউ আসুরী বৃত্তি আশ্রয় করে আবার কেউ সকাম ভাবসম্পন্ন হয়ে যাগ-যজ্ঞ অনুষ্ঠান করে জন্ম-মৃত্যু চক্রে আবর্তিত হয়। কিন্তু কেউ যদি অত্যন্ত পাপীও হয় বা কারও অতি নীচ কুলে জন্ম হয়, তবে তার বর্ণ-আশ্রম-দেশ আচার-ব্যবহার যা-ই হোক না কেন সে ব্যক্তি আমার আশ্রয় গ্রহণ করলে আমাকেই পাবে। অতএব মনুষ্যদেহ লাভ করে জীবের আমাকেই ভজনা করা উচিত।'

দশম অধ্যায়

মানুষের চিন্তাশক্তিকে ভগবৎ চিন্তাতেই নিয়োজিত করা উচিত।

সংসারে কোন ব্যক্তি-বিশেষে বা কোন বস্তুতে বিশেষ লক্ষণ, বৈশিষ্ট্য, মহত্ত্ব, অলৌকিকত্ব, সৌন্দর্য ইত্যাদি যা কিছু দেখা যায়, মন যাতে বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়—সেই সবই প্রকৃতপক্ষে ভগবানেরই

[১]সুতো দিয়ে বিশেষভাবে তৈরি সূত্র-গুটিকা বা 'মণি'।
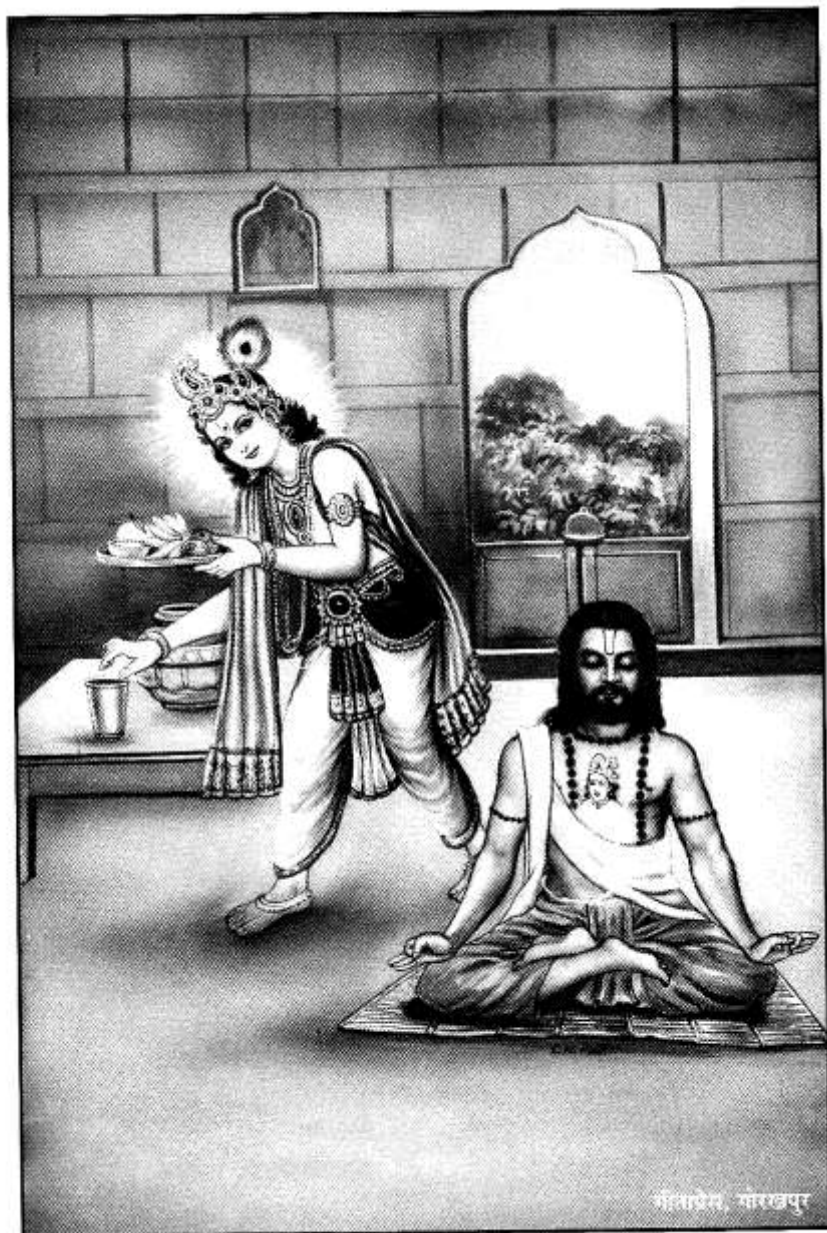
योगक्षेम-वहन

Sustaining Yoga and Kshema

नटवर

The Cosmic Dancer
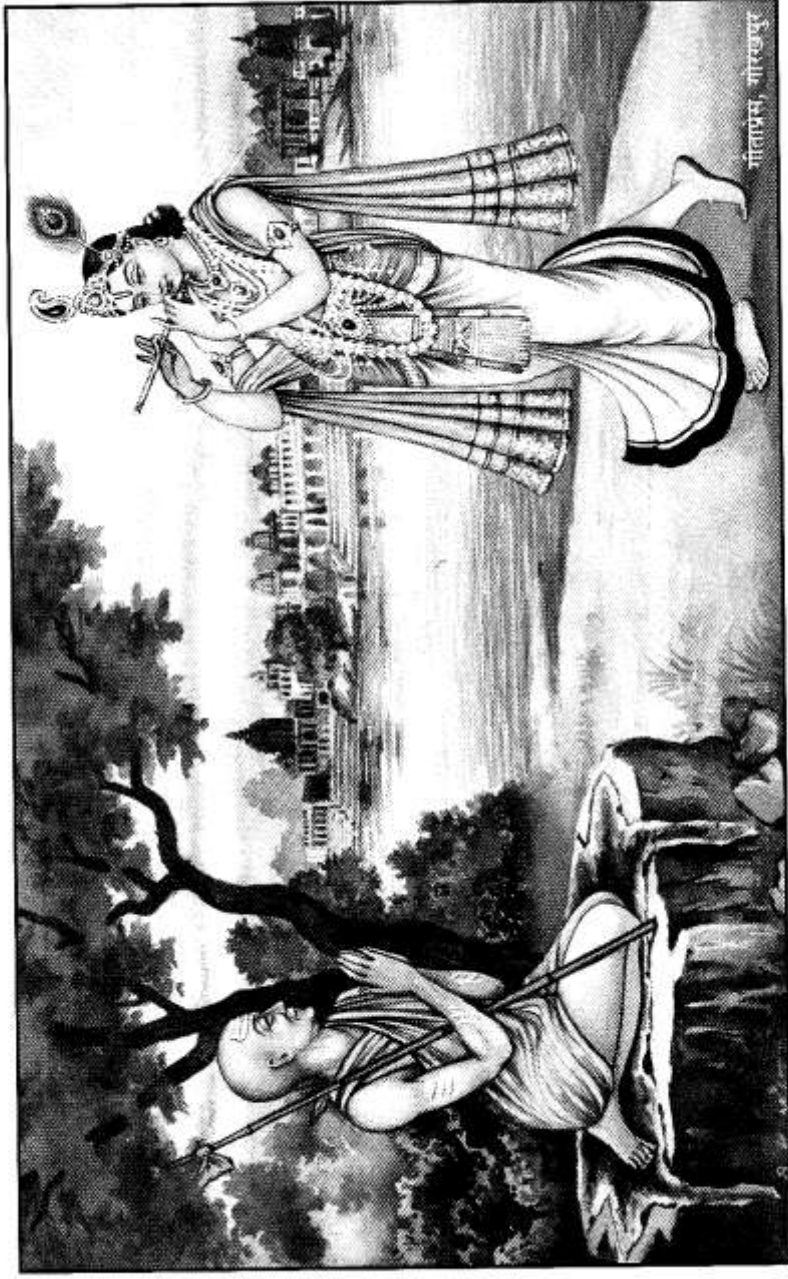
मधुसूदन सरस्वतीको परमतत्त्वके दर्शन

Vision of Supreme Reality to Madhusudan Saraswati
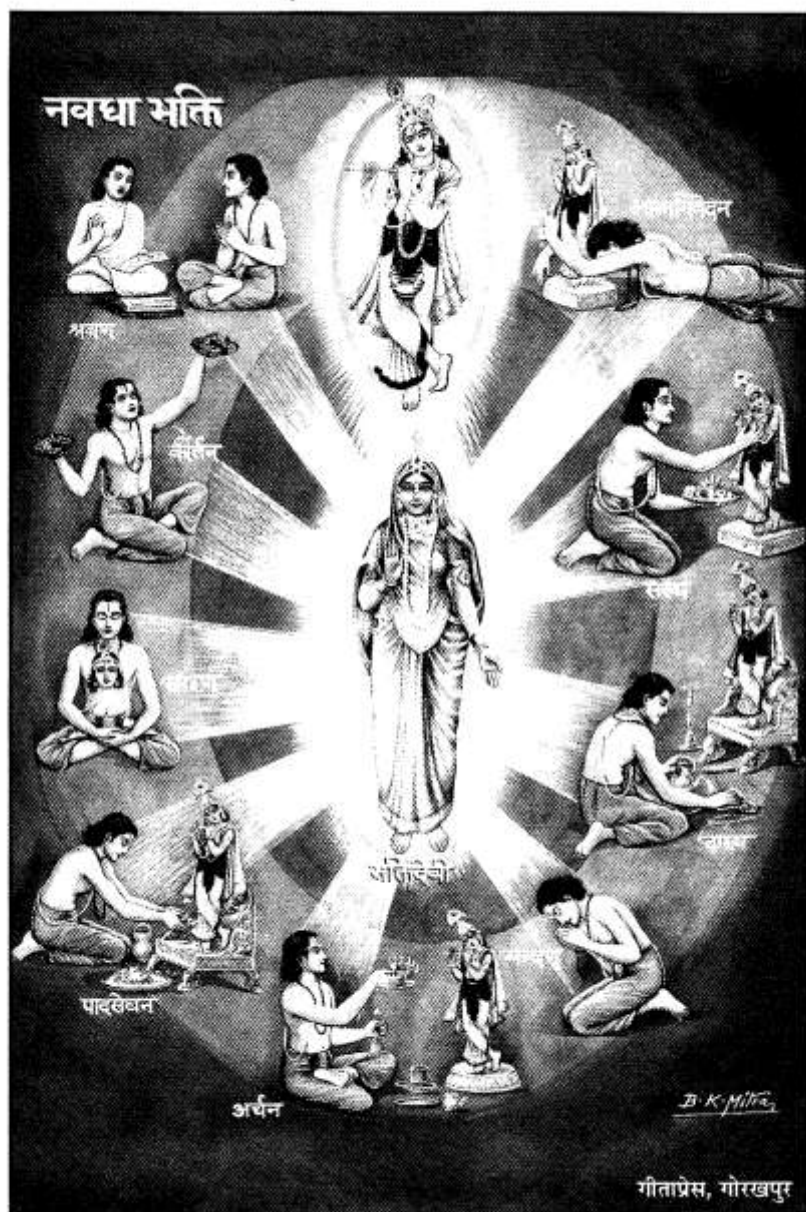
नवधा भक्ति

Ninefold Devotion

বিশেষত্ব। অতএব ঐ সমস্ত বিশেষ ব্যক্তি বা বস্তুতে মোহিত না হয়ে ভগবানেরই মনন করা উচিত। এই-ই হল বিভূতিসমূহ বর্ণনা করার তাৎপর্য।

একাদশ অধ্যায়

ভগবৎকৃপায় অর্জুন যে দিব্য বিশ্বরূপ দর্শন করেছিলেন তা সকল মানুষের পক্ষে দেখা সম্ভব নয়। কিন্তু আদি অবতার রূপে প্রকটিত এই জগৎ-সংসারকে শ্রদ্ধাপূর্বক ভগবানেরই রূপ মনে করতে পারলে প্রত্যেক ব্যক্তিই বিশ্বরূপ দর্শন করতে পারে।

অর্জুন বিনম্রভাবে ভগবানের কাছে বিশ্বরূপ দর্শন করাবার প্রার্থনা জানালে ভগবান তাঁকে দিব্যচক্ষু প্রদান করে নিজ বিশ্বরূপ দর্শন করিয়েছিলেন। এর ফলে অর্জুন ভগবানের দেহে অনেক মুখ, চোখ, হাত ইত্যাদি দর্শন করলেন ; দর্শন করলেন ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শঙ্করকে এবং আরো দেখলেন দেবগণ, গন্ধর্বগণ, সিদ্ধগণ ও সর্প ইত্যাদিকে। এছাড়াও অর্জুন বিশ্বরূপে দর্শন করলেন সৌম্য, উগ্র, অত্যুগ্র ইত্যাদি বিভিন্ন স্তর।

এই দিব্য বিশ্বরূপ আমাদের মতো সাধারণ মানুষ দর্শন করতে পারে না, কিন্তু চর্মচক্ষে যে জগৎ-সংসার ধরা পড়ে তাকেই ভগবানের রূপ মনে করে আমরা নিজেদের উদ্ধার করতে পারি। কারণ এই জগৎ-সংসার ভগবানের থেকেই প্রকটিত, তিনিই সবকিছু হয়ে আছেন।

দ্বাদশ অধ্যায়

ভক্ত ভগবানের অত্যন্ত প্রিয়, কারণ তিনি শরীর-ইন্দ্রিয়-মন-বুদ্ধিসহ নিজেকে ভগবানের নিকট সমর্পণ করেন।

যিনি পরম শ্রদ্ধাপূর্বক নিজ চিত্তকে ভগবানে নিবিষ্ট করেন সেই ভক্তই সর্বশ্রেষ্ঠ। ভগবৎপরায়ণ ভক্ত যদি নিজ সম্পূর্ণ কর্ম ভগবানে সমর্পণ করে অনন্য নিষ্ঠায় তাঁর উপাসনা করেন, তবে তাঁর সংসার-সাগর থেকে উদ্ধারকারিরূপে সক্রিয় হন স্বয়ং ভগবান। যিনি নিজ মন-বুদ্ধি ভগবৎ চিন্তায় নিবিষ্ট করে রাখেন তিনি ভগবানের সঙ্গেই বসবাস করেন। যাঁর প্রত্যেক প্রাণীর প্রতি বন্ধুত্ব এবং করুণার ভাব থাকে, যিনি অহংকার ও মমতারহিত, যিনি কোন প্রাণীকে উদ্বিগ্ন করেন না বা নিজেও কারও দ্বারা কখনও উদ্বিগ্ন হন না, যিনি নতুন কর্ম প্রারম্ভে অনুৎসুক, যিনি অনুকূল বা প্রতিকূল উভয় অবস্থায় মান-অপমানে সম-ভাবাপন্ন এবং সকল অবস্থাতেই সতত সন্তুষ্ট, তিনিই ভগবানের প্রিয় ভক্ত। মানুষ ভগবৎপরায়ণ হয়ে যদি তাঁর সঙ্গে একত্ব অনুভব করে, তবে তারা সকলেই ভগবানের প্রিয় হয়ে উঠতে পারে।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

জগৎ-সংসারে একমাত্র পরমাত্ম-তত্ত্বই হচ্ছে জ্ঞাতব্য বিষয়। সম্যক্‌রূপে তাঁকেই জানা উচিত। এই তত্ত্ব যিনি সম্যক্‌রূপে জানতে পারেন তিনি সেই পরমাত্মার সঙ্গে অভিন্নতা লাভ করেন।

যে পরমাত্মাকে জানলে মানুষ অমরত্ব প্রাপ্ত হয়, সর্বত্রই সেই পরমাত্মার হস্ত, পদ, মস্তক, চক্ষু এবং কর্ণ বিরাজমান। তিনি সর্বেন্দ্রিয় বিবর্জিত হলেও সমস্ত বিষয় তাঁর দ্বারাই প্রকাশিত হয়। সম্পূর্ণ গুণরহিত হয়েও তিনি সমস্ত গুণের ভোক্তা, আসক্তিহীন হয়েও তিনি সমস্ত প্রাণীর পালক ও পোষক। সর্বভূতের অন্তরে তিনি, বাহিরেও তিনি এবং সমস্ত জড় তথা চরাচর প্রাণিরূপেও এক তিনিই বিদ্যমান। সমগ্র প্রাণিকুলে ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রতীয়মান হলেও তিনি এক এবং অবিচ্ছিন্ন। সকল জ্ঞানের তিনিই প্রকাশক। ভিন্ন-ভিন্ন প্রাণীর মধ্যে তিনি সমভাবে বিরাজ করেন। গতিশীল প্রাণীর মধ্যে তিনি গতিহীন অবস্থায় বিরাজিত, (মরণশীল) প্রাণীর মধ্যে তিনি অবিনাশিরূপে অবস্থিত। এই প্রকারে যিনি পরমাত্মার যথার্থ স্বরূপ অবগত হন, তিনি পরমাত্মাকেই লাভ করেন।

চতুর্দশ অধ্যায়

সমস্ত জগৎ-সংসার ত্রিগুণাত্মক; ত্রিগুণের অতীত হতে হলে গুণসমূহ এবং তাদের বৃত্তিগুলিকে অবশ্যই জানা প্রয়োজন।

প্রকৃতিজাত তিনটি গুণ—সত্ত্ব-রজঃ-তমঃ জীবাত্মাকে শরীর ও সংসারে আসক্তি, মোহ ইত্যাদির দ্বারা বদ্ধ করে রাখে। সত্ত্বগুণ সুখ এবং জ্ঞানের প্রতি আসক্তি দ্বারা, রজোগুণ কর্মের আসক্তি দ্বারা ও তমোগুণ প্রমাদ, আলস্য এবং নিদ্রার দ্বারা আবদ্ধ করে রাখে। রজোগুণ ও তমোগুণকে অভিভূত করে যখন সত্ত্বগুণের প্রাবল্য হয় তখন অন্তঃকরণে রজঃ ও তমোগুণের বিরোধী বৃত্তির প্রকাশ দেখা যায়। সত্ত্বগুণ ও তমোগুণকে দমিত করে যখন রজোগুণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, তখন অন্তঃকরণে লোভ, ক্রিয়াশীলতা ইত্যাদি সত্ত্ব ও তমোগুণের বিরুদ্ধ বৃত্তিগুলি বেড়ে যায়। সত্ত্বগুণ ও রজোগুণকে দমিত করে যখন তমোগুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, তখন হৃদয়ে অবিবেচনা, কর্মে অনীহা, প্রমাদ, মোহ ইত্যাদি সত্ত্ব ও রজোগুণের বিরুদ্ধ বৃত্তিসমূহ বেড়ে ওঠে। এইরূপে এই গুণগুলির বৃত্তিসমূহের বৃদ্ধিতে মৃত্যু-পথযাত্রী (প্রাণী) সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ বৃত্তি অনুযায়ী উচ্চ, মধ্য বা নিম্নলোক প্রাপ্ত হন। কিন্তু যিনি এই গুণগুলি ব্যতীত আর কিছুকে কর্তা বলে মনে করেন না অর্থাৎ 'সম্পূর্ণ ক্রিয়া গুণ দ্বারাই ঘটিত, আমার দ্বারা নয়' বলে জানেন তিনি এই গুণগুলির অতীত হয়ে ভগবৎপ্রাপ্ত হন। অনন্য ভক্তির আশ্রয় গ্রহণ করেও মানুষ ত্রিগুণাতীত হতে পারে।

পঞ্চদশ অধ্যায়

'জগৎ-সংসারের মূল আধার তথা শ্রেষ্ঠতম পরম পুরুষ হলেন পরমাত্মা'। প্রথমাবধি দৃঢ়তাপূর্বক এই সত্যটি ধারণ করে থাকলে মানুষ সর্বজ্ঞ ও কৃতকৃত্য হয়ে যায়।

অনাদিকাল থেকে যাঁর দ্বারা সংসার-চক্র প্রবাহিত এবং যাঁকে পেলে জীব সংসারে পুনরায় ফিরে আসে না, সেই পরমাত্মার অনুসন্ধানই কর্তব্য। জ্ঞানদৃষ্টিসম্পন্ন সাধক নিজের মধ্যেই সেই পরমাত্মাকে অনুভব করেন। সেই পরমাত্মাই সূর্য, চন্দ্র আর অগ্নিতে তেজরূপে থেকে জগৎকে প্রকাশিত করেন। তিনিই পৃথিবীতে প্রবিষ্ট থেকে তাকে ধারণ করে আছেন। তিনিই রসময় চন্দ্ররূপে বৃক্ষ, লতা আদি সবকিছুর পুষ্টিসাধন করেন। তিনি সর্বপ্রাণীর দেহে জঠরাগ্নিরূপে খাদ্যসমূহ পরিপাক করেন। তিনিই সকলের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত, বেদসমূহের স্রষ্টা, বেদসমূহের জ্ঞাতা ও বেদসমূহে জ্ঞাতব্য। তিনি সমস্ত সংসারের পালন ও পোষণ করেন। তিনি এই নশ্বর সংসারের অতীত তথা অবিনাশী জীবাত্মার চেয়ে উত্তম। ত্রিলোকে এবং বেদসমূহে তিনিই পুরুষোত্তম নামে প্রসিদ্ধ। তাঁকে সর্বশ্রেষ্ঠরূপে বরণ করে অনন্যচিত্তে তাঁর ভজন করা উচিত।

ষোড়শ অধ্যায়

দুর্গুণ দুরাচারের ফলেই মানুষ চুরাশী লক্ষ যোনি প্রাপ্ত হয় এবং নরকে গমন করে। সুতরাং মানুষের সদ্‌গুণ এবং সদাচার অবলম্বন করে সংসার-বন্ধন এবং জন্ম-মৃত্যু চক্র থেকে মুক্তি পাওয়ার চেষ্টা করা উচিত।

যে ব্যক্তি দম্ভ, দর্প, অভিমান, কাম, ক্রোধ, লোভ ইত্যাদি আসুরী প্রকৃতি ত্যাগ করে অভয়-অহিংসা-সত্য-অক্রোধ-দয়া-যজ্ঞ-দান-তপস্যা ইত্যাদি দৈবী সম্পদের গুণসমূহ ধারণ করেন, তিনি সংসার-বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে যান। কিন্তু যে ব্যক্তি কেবল অন্যায়, দুরাচার, কাম, ক্রোধ, লোভ, চিন্তা, অহংকার ইত্যাদিকে আশ্রয় করে সেই নিয়েই ব্যাপৃত থাকে, সেই আসুরী প্রকৃতির মানুষ চুরাশী লক্ষ জন্ম ভ্রমণ করে এবং নরক প্রাপ্ত হয়।

সপ্তদশ অধ্যায়

যাঁরা শাস্ত্রের বিধান জানেন কিংবা যাঁরা শাস্ত্রবিধি জানেন না, তাঁদের সকলেরই উচিত যে কোন শুভকর্ম ভগবানকে স্মরণ করে, ভগবানের নাম উচ্চারণ করে আরম্ভ করা।

যাঁরা শাস্ত্রবিধি জানেন না, কিন্তু শ্রদ্ধা সহকারে পূজা অর্চনা করেন তাঁদের শ্রদ্ধা বা নিষ্ঠা তিন প্রকারের হয়—সাত্ত্বিকী, রাজসী এবং তমসী। নিজ নিজ ভাব অনুসারে তাঁদের পূজিত দেবতাও তিন প্রকারের। যিনি পূজা আদি ক্রিয়া করেন না তাঁর শ্রদ্ধার পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর আহার্য দ্বারা। কারণ সকলকেই আহার করতে হয়।

অষ্টাদশ অধ্যায়

মানুষের উদ্ধারের উপায় হিসাবে তার রুচি, যোগ্যতা ও শ্রদ্ধানুযায়ী তিন প্রকার সাধন প্রণালীর উল্লেখ করা হয়েছে—কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগ বা শরণাগতি। এর কোন একটি প্রণালী অনুসারে সাধন করলেই মানুষ উদ্ধার প্রাপ্ত হবে।

আসক্তি ও ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করে যে ব্যক্তি যজ্ঞ-তপস্যা-দান ও নিত্য কর্তব্য-কর্ম করেন এবং যিনি কুশল-অকুশল কর্মে রাগ-দ্বেষ করেন না, তিনিই প্রকৃতপক্ষে ত্যাগী। নির্দিষ্ট কর্ম করলেও তিনি পাপভাগী হন না এবং তাঁর ইহলোক বা পরলোকে কোথাও কোন কর্মফল ভোগ করতে হয় না। সমস্ত সংশয়-সন্দেহ দূরীভূত হয়ে তিনি নিজ স্বরূপে স্থিত হন। একেই কর্মযোগ বলা হয়।

যে ব্যক্তি সাত্ত্বিক জ্ঞান, কর্ম, বুদ্ধি, ধৃতি এবং সুখকে অবলম্বন করে কর্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্ব থেকে মুক্ত হন, তিনি যদি সমস্ত প্রাণিকুল ধ্বংসও করেন তবুও তাঁর কোনও পাপ হয় না। নিজ স্বরূপে স্থিত হওয়ায় তাঁর পরাভক্তি প্রাপ্তি হয় এবং এর ফলে তিনি পরমাত্মতত্ত্বকে যথার্থ-রূপে জেনে তাতে প্রবেশ করেন। একে বলা হয় জ্ঞানযোগ।

যে ব্যক্তি ভগবৎ আশ্রয় গ্রহণ করে সর্বদা শুভকর্ম যথাযথভাবে সাধন করেন, তিনি ভগবৎ কৃপায় অবিনাশী পদ প্রাপ্ত হন। যে ব্যক্তি ভগবৎ পরায়ণ হয়ে সম্পূর্ণ কর্ম ভগবানে অর্পণ করেন, তিনি ভগবৎকৃপায় সমস্ত বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করেন। যিনি স্বয়ং শরীর-মন-ইন্দ্রিয়সহ ভগবানে নিয়োজিত হন, তিনি তাঁকেই লাভ করেন। যিনি সর্ব ধর্মের আশ্রয় পরিত্যাগ করে অনন্যভাবে কেবল ভগবানেরই শরণ গ্রহণ করেন, তাঁকে ভগবান সমস্ত পাপ হতে মুক্ত করেন। এই হল ভক্তিযোগ।

(২) গীতা-সম্বন্ধীয় প্রশ্নোত্তর

গীতাভ্যাসেন যে জাতাঃ সাধকেহপি সংশয়াঃ।
অত্র তেষাং সমাধানং ক্রিয়তে হি সমাসতঃ॥

প্রশ্ন—কৌরবপক্ষের সেনারা শঙ্খ, ভেরী, ঢোল ইত্যাদি নানাপ্রকার বাদ্য বাজালেন (১।১৩), কিন্তু পাণ্ডবপক্ষের সেনারা কেবল শঙ্খ (১।১৫-১৯) বাজালেন কেন?

উত্তর—যুদ্ধে বিপক্ষ সেনাদের উপর কেবল বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের প্রভাবই পড়ে, সাধারণ ব্যক্তিদের নয়। কৌরবপক্ষের সেনাপতি ভীষ্ম প্রথম শঙ্খ বাজানোর পরে অন্যসকলে নানা বাদ্য বাজালেন কিন্তু ঐ সব বাদ্যধ্বনির প্রভাব পাণ্ডবসেনাদের উপর কিছুমাত্র পড়ে নি। অথচ পাণ্ডবপক্ষের বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিরা যখন নিজ নিজ শঙ্খ বাজালেন তাতে কৌরবসেনাদের হৃদয় যেন বিদীর্ণ হয়ে গেল, সেই ধ্বনির এমনই প্রভাব!

প্রশ্ন—ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তো জানতেনই যে, ভীষ্ম দুর্যোধনকে খুশী করবার জন্যই শঙ্খ বাজিয়েছেন (১।১২), যুদ্ধারম্ভের ঘোষণা করেন নি। তাহলে শ্রীকৃষ্ণ কেন শঙ্খ বাজালেন (১।১৪)?

উত্তর—ভীষ্ম শঙ্খবাদন করামাত্র কৌরবপক্ষের সমস্ত বাদ্য একসঙ্গে বেজে ওঠে, সেই সময়ে পাণ্ডবপক্ষ থেকে কোন বাদ্যধ্বনি না হলে যুদ্ধের রীতি-বিরুদ্ধ কাজ হত। কারণ তাতে পাণ্ডবপক্ষের হার মেনে নেওয়া বোঝাতো। সুতরাং ভক্তপরায়ণ ভগবান পাণ্ডব-সেনাপতি ধৃষ্টদ্যুম্নের অপেক্ষা না করে নিজেই সর্বপ্রথম শঙ্খধ্বনি করে ওঠেন।

প্রশ্ন—প্রথম অধ্যায়ে অর্জুন ধর্মসম্বন্ধে অনেক কথা বলেছেন, তিনি যখন ধর্মসম্বন্ধে এতকিছু জানতেন, তাহলে তিনি মোহগ্রস্ত হলেন কেন?

উত্তর—আত্মীয়-স্বজনের প্রতি মমতা বিবেককে দাবিয়ে রাখে এবং বিবেকের প্রাধান্য নষ্ট করে মায়া-মমতায় ভুলিয়ে রাখে। অর্জুনেরও আত্মীয়-স্বজনের মমতায় মোহ উৎপন্ন হয়েছিল।

প্রশ্ন—অর্জুন যখন লোভই পাপের কারণ বলে জানেন (১।৩৮, ৪৫) তাহলে 'মানুষ না চাইলেও কেন পাপ করে' এই প্রশ্ন (৩।৩৬) কেন করলেন?

উত্তর—কুটুম্ব-জনিত মোহে অর্জুন (প্রথম অধ্যায়ে) যুদ্ধ থেকে বিরত থাকাকে ধর্ম এবং যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়াকে অধর্ম বলে মনে করেছিলেন অর্থাৎ শরীরাদিসহ সব-কিছুকেই তিনি পার্থিব দৃষ্টি দিয়ে বিচার করেছিলেন। সেইজন্যই অর্জুন লোভকেই যুদ্ধক্ষেত্রে স্বজন বধের হেতু হিসাবে মনে করেছিলেন। কিন্তু পরে গীতার উপদেশ শ্রবণ করে তাঁর মধ্যে নিজের প্রকৃত কল্যাণের জন্য আগ্রহ জাগ্রত হয় (৩।২)। তাই তাঁর প্রশ্ন যে, মানুষ অনিচ্ছা সত্ত্বেও কেন অনুচিত কার্য করে? লক্ষণীয় হল যে এই অর্জুনই প্রথম অধ্যায়ে মোহাবিষ্ট অবস্থায় প্রশ্ন করেছিলেন এবং তিনিই তৃতীয় অধ্যায়ে সাধকের মতো প্রশ্ন করছেন।

প্রশ্ন—জীবাত্মা (শরীরী) অবিনাশী, এঁর বিনাশ কারও দ্বারা সম্ভব নয় (২।১৭), ইনি কাকেও হত্যা করেন না এবং নিজেও হত হন না (২।১৯), তাহলে মানুষ প্রাণী হত্যা করলে তো তার পাপ হওয়া উচিত নয়?

উত্তর—দেহগত প্রাণকে দেহচ্যুত করলে পাপ হয়, কারণ প্রত্যেক প্রাণীই দেহাশ্রয়ে বেঁচে থাকতে চায়। সিদ্ধ মহাত্মাগণের বেঁচে থাকার কোন আগ্রহ না থাকলেও তাঁদের হত্যা করলে গুরুতর পাপের ভাগী হতে হয়। কেননা তাঁদের জীবন সকলেরই রক্ষণীয়, সকলেই চান তাঁরা বেঁচে থাকুন। তাঁরা জীবিত থাকলে প্রাণী মাত্রেরই অতীব হিত সাধিত হয় এবং সকল প্রাণী শাশ্বত শান্তির সন্ধান পায়। যে বস্তু প্রাণীদিগের জন্য যত বেশী আবশ্যক, তা নষ্ট করলে তত বেশী পাপের ভাগী হতে হয়।

প্রশ্ন—আত্মা নিত্য, সর্বব্যাপী ও স্থির স্বভাবসম্পন্ন (২।২৪)। তাহলে পুরাতন শরীর পরিত্যাগ করে অপর নতুন শরীরে আশ্রয় গ্রহণ করা তাঁর পক্ষে কিভাবে সম্ভবপর হয় (২।২২)?

উত্তর—প্রকৃতির অংশরূপ শরীরকে আত্মা যখন নিজের বলে মেনে নেন, সেটিকে তাঁর সঙ্গে একাত্ম মনে

করেন, সেই সময় আত্মা প্রকৃতির এই অংশের আসা-যাওয়া, বাঁচা-মরা, ইত্যাদিকে নিজেরই আসা-যাওয়া বা বাঁচা-মরা বলে মনে করেন। সেই দৃষ্টিতেই আত্মার অন্য শরীরে চলে যাওয়ার কথা বলা হয়েছে। বাস্তবিক পক্ষে তত্ত্বতঃ আত্মার আসা-যাওয়া অথবা বাঁচা-মরা বলে কিছু নেই-ই।

প্রশ্ন—ভগবান বলেছেন যে, ক্ষত্রিয়দের জন্য (অন্যায়ের বিরুদ্ধে) যুদ্ধ ছাড়া কল্যাণের আর কোন উপায় নেই (২।৩১), তাহলে কি কেবল লড়াই করলেই ক্ষত্রিয়দের কল্যাণ হয় ? অন্য কোন সাধনা দ্বারা কল্যাণ লাভ সম্ভব নয় ?

উত্তর—কথাটি ঠিক তা নয়। সেই সময় যুদ্ধের প্রাসঙ্গিকতা ছিল এবং অর্জুন যুদ্ধ পরিত্যাগ করে ভিক্ষান্ন গ্রহণ করাকে শ্রেষ্ঠ মনে করেছিলেন। সেইজন্যই ভগবান বলেছেন যে, এইরূপ ধর্মযুদ্ধ স্বতঃ প্রাপ্ত হওয়া যে কোন যুদ্ধবীর ক্ষত্রিয়ের কল্যাণ লাভের এক মস্ত বড় সুযোগ। এইরূপ সুযোগ পেয়েও যদি কোন যুদ্ধবীর ক্ষত্রিয় যুদ্ধ না করেন তবে তাঁর অপযশ হয়, তিনি সমস্ত গণ্যমান্য ব্যক্তির কাছে লঘুতা প্রাপ্ত হন, শত্রুরাও নিন্দা করে তাঁর সম্বন্ধে অকথ্য কথা বলতে থাকে (২।৩৪-৩৬)। এর তাৎপর্য হচ্ছে যে, সেই সময় যুদ্ধের প্রাসঙ্গিকতা থাকায় ভগবান অর্জুনকে 'যুদ্ধকে শ্রেষ্ঠ সাধন' বলে বলেছেন। একথা ঠিক নয় যে, যুদ্ধ ছাড়া অন্য সাধনায় ক্ষত্রিয় নিজকল্যাণ করতে পারে না। কেননা পূর্বেও বহু রাজা চতুর্থ আশ্রমে বনবাসী হয়ে সাধন ভজন করেছেন এবং তাতে তাঁদের কল্যাণ সাধিত হয়েছে।

প্রশ্ন—কর্ম শুরু না করা এবং কর্মত্যাগ করা—এই দুটি একই কথা, কেননা দুটিতেই কর্মের অভাব আছে। অতএব 'কর্মের অভাবে সিদ্ধি হয় না'—এইরূপ বলাই সঙ্গত ছিল। তবুও ভগবান (৩।৪) উপরিউক্ত দুটি কথা একই সাথে বলেছেন কেন ?

উত্তর—ভগবান ঐ দুটি কথা কর্মযোগ এবং জ্ঞানযোগের পরিপ্রেক্ষিতে বলেছেন। কর্মযোগে নিষ্কামভাবে কর্ম করলেই সমত্বের উপলব্ধি হয় ; কারণ মানুষ যদি কর্ম না করে তাহলে 'সিদ্ধি অসিদ্ধিতে আমার সমত্ব আছে কি নেই'— তা সে কি করে জানবে ? সেইজন্যই ভগবান বলেছেন, কর্ম আরম্ভ না করলে সিদ্ধি প্রাপ্ত হওয়া যায় না। জ্ঞানযোগে বিবেক দ্বারা সমত্ব প্রাপ্তি হয়, কেবল কর্ম ত্যাগ করলেই হয় না। তাই ভগবান বলেছেন কর্মত্যাগ করামাত্রই সিদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়া যায় না। এর তাৎপর্য এই যে, কর্মযোগ বা জ্ঞানযোগ দুই পথেই কর্ম কোনো প্রতিবন্ধক নয়, দুই পথেরই মুখ্য বিষয় হল কর্তৃত্ববোধের ত্যাগ।

প্রশ্ন—কোনো মানুষই সারাক্ষণ কাজ করে না বা ঘুমানো, শ্বাস-প্রশ্বাস নেওয়া, চোখ বন্ধ করা খোলা ইত্যাদি কাজ 'আমি করি'— এইরূপ মনে করে না। তাহলে তৃতীয় অধ্যায়ের পঞ্চম শ্লোকে কী করে বলা হল যে, মানুষ কোনো অবস্থায়ই ক্ষণমাত্র সময়ও কর্ম ছাড়া থাকে না ?

উত্তর—যতক্ষণ কেউ প্রকৃতির সঙ্গে নিজেকে সম্বন্ধ বলে মনে করেন, ততক্ষণ তিনি কোন কর্ম করুন বা না করুন তাতে ক্রিয়াশীলতা থাকে। এই ক্রিয়া দুই প্রকারের, ক্রিয়া করা এবং ক্রিয়া হওয়া ! দুটি বিভাগই প্রকৃতির সঙ্গে সম্বন্ধবশতঃই ঘটে থাকে। কিন্তু যখন প্রকৃতির সঙ্গে সম্বন্ধ থাকে না, তখন 'করা' বা 'হওয়া' বলে কিছুই থাকে না ; তখন 'হয়'ই থাকে, 'করলে' কর্তা, 'হলে' ক্রিয়া আর 'হয়'তে তত্ত্বটি থাকে। বাস্তবে কর্তৃত্ব থাকলেও 'হয়' থাকে আর ক্রিয়া থাকলেও 'হয়' থাকে। অর্থাৎ কর্তা ও ক্রিয়া দুটিতেই 'হয়'-এর অভাব ঘটে না। কিন্তু 'হয়'তে কর্তা ও ক্রিয়া দুইয়েরই অভাব হয়।

প্রশ্ন—বারিপাতের সঙ্গে হোমরূপ যজ্ঞের সম্বন্ধ আছে অর্থাৎ বিধিপালন পূর্বক হোম (যজ্ঞ) করা হলে বৃষ্টিপাত হয়, তবুও তৃতীয় অধ্যায়ের চতুর্দশ শ্লোকে **'যজ্ঞাদ্ভবতি পর্জন্যঃ'** এই অংশে যজ্ঞ শব্দটি হোমরূপী যজ্ঞরূপে গ্রহণ না করে কর্তব্য কর্মরূপ অর্থে কেন গ্রহণ করা হয়েছে ?

উত্তর—প্রকৃতপক্ষে কর্তব্যচ্যুত হয়ে অকর্তব্য ঘটালে যথাযথভাবে বর্ষা হয় না, আকাল হয়। কর্তব্য কর্ম করলে সৃষ্টিচক্র সুচারুরূপে চলে আর কর্তব্য কর্ম না করলে সৃষ্টিচক্রের গতি ব্যাহত হয়। গোরুর গাড়ীর চাকা যদি ঠিক থাকে গাড়ীও ঠিকভাবে চলে, কিন্তু চাকার যদি কোন অংশ ভেঙ্গে যায় তবে সমস্ত গাড়ীটির উপরই তার প্রভাব পড়ে। এইরূপ কেউ যদি নিজ কর্তব্য থেকে চ্যুত হয়,

তাহলে তার প্রভাব সমস্ত সৃষ্টিচক্রের উপরই পড়ে। বর্তমানে মানুষ নিজ নিজ কর্তব্য ঠিকমত পালন করে না এবং অকর্তব্যমূলক ব্যবহার করে, এইজন্যই আকাল হয় এবং কলহ-অশান্তি ইত্যাদি বেড়ে যাচ্ছে। মানুষ যদি নিজ নিজ কর্তব্য ঠিকমতো পালন করে, তাহলে দেবগণও তাঁদের কর্তব্য ঠিকমতো পালন করবেন এবং বৃষ্টিও সময় মতই হবে।

দ্বিতীয়তঃ অর্জুনের প্রশ্ন (৩।১-২) এবং ভগবানের উত্তর (৩।৭-৯) তথা প্রকরণ(৩।১০-১৩) বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায় যে, কর্তব্যকর্মের প্রবহমানতা বিদ্যমান এবং পরের শ্লোকগুলিতেও (৩।১৪-১৬) সেই কর্তব্যকর্মের কথা বলা হয়েছে। সুতরাং এখানে কর্তব্যকর্মকে যজ্ঞরূপে নেওয়াই যুক্তিসঙ্গত।

প্রশ্ন—পরমাত্মা যদি সর্বব্যাপীই হন তাহলে তাঁকে (৩।১৫) কেবল যজ্ঞেই নিত্য প্রতিষ্ঠিত কেন বলা হয়, তিনি দ্বিতীয় কোন স্থানে কি প্রতিষ্ঠিত নন্?

উত্তর—সর্বব্যাপী পরমাত্মাকে যজ্ঞে অর্থাৎ কর্তব্য কর্মে নিত্য প্রতিষ্ঠিত বলার তাৎপর্য এই যে, যজ্ঞ হল তাঁর উপলব্ধির স্থান। যেমন জমিতে সর্বত্র জল থাকলেও তা কুয়ো হতে পাওয়া যায়, তেমনি পরমাত্মা সর্বত্র পরিপূর্ণ থাকা সত্ত্বেও নিজ নিজ কর্তব্য কর্ম নিষ্কামভাবে করলে তবেই তাঁকে পাওয়া যায়। এর গূঢ়ার্থ এই যে, যিনি নিজ কর্তব্য কর্ম সঠিকভাবে পালন করেন, তিনি সর্বব্যাপী পরমাত্মাকে অনুভব করতে পারেন!

প্রশ্ন—ভগবান বলেন যে, 'আমিও কর্তব্য পালন করি, কেন না আমি যদি সাবধানতাপূর্বক কর্তব্য পালন না করি, তবে লোকেরাও কর্তব্যচ্যুত হবে' (৩।২২-২৪)। তাহলে এখন লোকে কর্তব্যচ্যুত হয়ে পড়ছে কেন?

উত্তর—ভগবানের উক্তি এবং আচরণের প্রভাব তাঁদের ওপরই পড়ে যাঁরা আস্তিক, যাঁরা ভগবানের উপর শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস রাখেন। যাঁরা ভগবানে শ্রদ্ধা বা বিশ্বাস রাখেন না, তাঁদের ওপর ভগবানের উক্তি বা আচরণের প্রভাব পড়ে না।

প্রশ্ন—জ্ঞানী পুরুষ নিজ প্রকৃতি বা স্বভাব অনুসারে কর্ম করেন (৩।৩৩), কিন্তু তার দ্বারা তিনি বদ্ধ হন না। অন্য প্রাণিসকলও নিজ নিজ প্রকৃতি অনুযায়ী কর্ম করে, কিন্তু তারা তাতে আবদ্ধ হয়। —এরূপ কেন হয়?

উত্তর—জ্ঞানী মহাপুরুষগণের প্রকৃতি রাগ-দ্বেষরহিত, শুদ্ধ ; তাঁরা নিজ প্রকৃতিকে বশীভূত করে কর্ম করেন, তাই তাঁদের কর্ম বদ্ধ করতে পারে না। অপরপক্ষে, অন্য প্রাণী প্রকৃতির বশীভূত হয়ে রাগ ও দ্বেষপূর্বক কর্ম করে, তাই তারা কর্মজালে বদ্ধ হয়ে পড়ে। সুতরাং মানুষের উচিত নিজ প্রকৃতি এবং স্বভাবকে নির্মল ও শুদ্ধ করা এবং নিজ অশুদ্ধ স্বভাবের বশীভূত হয়ে কোন কর্ম না করা।

প্রশ্ন—চতুর্থ অধ্যায়ের সপ্তম শ্লোকে ভগবান বলেছেন যে, 'আমি সাকার রূপে নিজেকে প্রকটিত করি', আবার নবম অধ্যায়ের চতুর্থ শ্লোকে বলেছেন যে, 'আমি অব্যক্তরূপে সমস্ত জগতে ব্যাপ্ত হয়ে আছি'। তাহলে যিনি একস্থানে প্রকট হন, তিনি সর্বস্থানে কিভাবে ব্যাপ্তরূপে থাকেন, যিনি সর্বব্যাপক তিনি আবার একটি নির্দিষ্ট স্থানে কিভাবে প্রকটিত হতে পারেন?

উত্তর—প্রাকৃত অগ্নি (সূক্ষ্মাবস্থায়) সর্বত্র ব্যাপক রূপে থেকেও যখন কোন একটি স্থানে প্রকটিত হতে পারে এবং একস্থানে প্রকটিত হয়েও সেই অগ্নির অভাব যদি অন্য কোথাও না হয়, তাহলে প্রকৃতির অতীত যে ভগবান, যিনি অলৌকিক, যাঁর সমস্ত কিছু করার সামর্থ্য আছে, তিনি যদি সমস্ত জায়গায় ব্যাপকভাবে থেকেও একটি স্থানে প্রকটিত হন তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। অর্থাৎ অবতারত্ব গ্রহণ করলেও ভগবানের সর্বব্যাপকতা যেমন তেমনি থাকে।

প্রশ্ন—এই 'মনুষ্যলোকে কর্ম-জনিত সিদ্ধি শীঘ্র লাভ করা যায়'—(৪।১২), কিন্তু তাতো দেখা যায় না! এরূপ কেন?

উত্তর—কর্ম-জনিত সিদ্ধি অর্থাৎ কর্মফল দুই প্রকার—তাৎকালিক এবং কালান্তরিক। তাৎকালিক ফল শীঘ্রই দেখা যায় এবং কালান্তরিক ফল পরে যথাসময়ে বোঝা যায়, শীঘ্র দেখা যায় না। খাদ্য গ্রহণ করলে ক্ষুধা নিবৃত্ত হয়, জল খেলে পিপাসা মেটে, শীতবস্ত্র পরিধান করলে শীতানুভূতি কমে—এই সমস্ত হল তাৎকালিক ফল। এই রূপ কাউকে প্রসন্ন করতে হলে তাঁর স্তুতি বা প্রার্থনা করলে, সেবা করলে তিনি প্রসন্ন হন। গ্রহশান্তির জন্য বিধিপূর্বক পূজা করলে গ্রহশান্তি হয়। মহামৃত্যুঞ্জয় মন্ত্র জপ করলে রোগাদি দূর হয়, গয়াতে

বিধিপূর্বক শ্রাদ্ধ করলে জীব প্রেতযোনি থেকে মুক্তি পায় এবং তার সদ্‌গতি হয়—এই সবই কর্মের তাৎকালিক ফল। এই তাৎকালিক ফলের কথা চিন্তায় রেখেই লোকে দেবতাদের উপাসনা করে। তাই 'মনুষ্যলোকে কর্ম-জনিত সিদ্ধি শীঘ্র প্রাপ্ত হওয়া যায়'—এইরূপ বলা হয়েছে।

প্রশ্ন—জ্ঞানী ব্যক্তি ব্রাহ্মণ, চণ্ডাল, গাভী, হস্তী, কুকুর ইত্যাদিতে সমদর্শী হয়ে থাকেন (৫।১৮)। তাহলে বর্ণ-আশ্রম ইত্যাদির বাধানিষেধ কিজন্য ?

উত্তর—জ্ঞানী পুরুষদের ব্যবহার ব্রাহ্মণ, চণ্ডাল, গাভী, হস্তী প্রভৃতির সঙ্গে তাদের শরীর অনুযায়ী যথাযোগ্যরূপে হয়ে থাকে। শরীর নিত্য পরিবর্তনশীল, এইরূপ পরিবর্তনশীল শরীরে বিষমবুদ্ধি থাকবে এবং সেটি থাকাই উচিত। সমস্ত প্রাণীর সঙ্গে খাওয়া-দাওয়া ইত্যাদি ব্যবহারে একত্ব বা সমানতা রক্ষা করা কারো পক্ষে সম্ভব নয়, অর্থাৎ সকলের সঙ্গে ব্যবহারে পার্থক্য থাকবেই ; এরূপ পার্থক্যের মধ্যেও তত্ত্বদর্শী এক পরমাত্মাকেই সবার মধ্যে সমরূপে বিরাজমান দেখতে পান। এইজন্যই ভগবান তত্ত্বদর্শী মানবকে **'সমদর্শিনঃ'** বলে অভিহিত করেছেন **'সমবর্তিনঃ'** বলে নয়। 'সমবর্তী' অর্থাৎ সম ব্যবহার যে করে তা হল যম বা মৃত্যুর নাম[১] অর্থাৎ যিনি সকলের সঙ্গে একই ব্যবহার করেন, সমানভাবে মৃত্যুমুখে আকর্ষণ করেন।

প্রশ্ন—ভগবান প্রাণিমাত্রেরই সুহৃদ (৫।২৯), কোন কারণ ব্যতিরেকেই তিনি সকলের হিত কামনা করেন। তাহলে তিনি প্রাণিকুলকে উচ্চ-নিম্ন নানা গতিতে কেন প্রেরণ করেন ?

উত্তর—সকলের সুহৃদ বলেই তো ভগবান সমস্ত প্রাণীকে তাদের নিজ নিজ কর্ম অনুসারে উচ্চ-নিম্ন গতিতে প্রেরণ করে তাদের পাপ-পুণ্য থেকে শুদ্ধ করেন ও পাপ-পুণ্যের বন্ধন থেকে মুক্ত করে ঊর্ধ্বলোকে প্রেরণ করেন (৯।২০-২১, ১৬।১৯-২০)।

প্রশ্ন—গীতাতে কোথাও বলা হয়েছে যে সাত্ত্বিক, রাজসিক, তামসিক ইত্যাদি গুণ ভগবান থেকে উৎপন্ন (৭।১২), কোথাও বলা হয়েছে প্রকৃতি থেকে উৎপন্ন (১৩।১৯, ১৪।৫), আবার কোথাও স্বভাবজাত বলে বর্ণনা করা হয়েছে (১৮-৪১)। তাহলে গুণগুলি ঠিক ঠিক কোথা হতে উৎপন্ন, ভগবান থেকে, না প্রকৃতি থেকে, নাকি স্বভাব থেকে ?

উত্তর—যেখানে ভক্তির প্রকরণ আছে, সেখানে গুণগুলি ভগবান থেকে উৎপন্ন বলা হয়েছে, যেখানে জ্ঞানের প্রকরণ সেখানে বলা হয়েছে গুণগুলি প্রকৃতিজাত এবং যেখানে কর্মবিভাগের বর্ণনা আছে সেখানে গুণগুলি স্বভাবজাত বলে বর্ণিত হয়েছে। ভগবান সকলের প্রভু, সুতরাং প্রভুর দৃষ্টিতে যদি দেখা যায় তাহলে গুণগুলি ভগবান থেকেই উদ্ভূত। সব কিছু উৎপত্তির কারণ প্রকৃতি, কারণের দৃষ্টিতে দেখলে গুণসমূহ প্রকৃতি হতে জাত। আবার ব্যবহারিক দৃষ্টিতে গুণগুলি প্রাণীদের স্বভাব থেকে উৎপন্ন হয়। এর তাৎপর্য এই যে, গুণগুলি প্রভুর বিবেচনায় ভগবানের থেকে জাত, কারণের দৃষ্টিতে প্রকৃতির এবং সাংসারিক অভিব্যক্তির দৃষ্টিতে ব্যক্তির নিজস্ব। সুতরাং তিনটি কথাই ঠিক।

প্রশ্ন—যিনি বহু জন্ম ধরে সাধন করে এসেছেন ও সিদ্ধ হয়েছেন তিনিই পরমগতি প্রাপ্ত হন (৬।৪৫)। তাহলে যে সব মানুষ অনেক জন্ম সংসিদ্ধ নন অর্থাৎ পূর্বের অনেক জন্মে সাধনা করে সিদ্ধ হননি, তাঁরা এই জন্মে কীভাবে উদ্ধার পেতে পারেন ?

উত্তর—এই শ্লোকটি যোগভ্রষ্টের প্রসঙ্গে বলা হয়েছে। পূর্বের মনুষ্যজন্মে সংসারে বীতরাগ হয়ে সাধনা করাতে শুদ্ধি লাভ হয়েছে কিন্তু জীবনের অন্তিমক্ষণে সাধনায় বিচলিত হওয়ায় তাঁর হয়তো স্বর্গাদি ফল প্রাপ্তি হল এবং সেখানে ভোগে অরুচি হওয়ায় শুদ্ধি প্রাপ্তি হয় এবং শুদ্ধাচারী এবং শ্রীসম্পন্ন ব্যক্তিদের গৃহে জন্ম হয়। এই জন্মে পরমাত্মপ্রাপ্তির জন্য সাধনা করায় তাঁর শুদ্ধি হয়। এইরূপ তিন জন্মে শুদ্ধি ঘটাকেই বহুজন্মের দ্বারা সিদ্ধিলাভ বলা হয়। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায়, মানুষমাত্রই বহুজন্ম-সংসিদ্ধ অর্থাৎ বর্তমান মনুষ্য জন্মের পূর্বে সে যদি স্বর্গাদিলোকে গিয়ে থাকে, তাহলে স্বর্গবাস দ্বারা পুণ্যের ফল ভোগ করায় পুণ্যফল থেকে শুদ্ধ হয়েছে আর

[১]'সমবর্তী পরেতরাট্' (অমরকোষ ১।১।৫৮)

যদি নরকবাস ঘটে, তাহলে সে পাপের ফল নরক ভোগ করে পাপ থেকে শুদ্ধ হয়েছে। আর যদি চুরাশী লক্ষ জন্ম প্রাপ্ত হয়, তাহলে চুরাশী লক্ষ জন্মের দ্বারা প্রাপ্ত কর্মফল ভোগ করে তার শুদ্ধি হয়েছে। এইভাবে শুদ্ধ হওয়াকেই বহুজন্ম দ্বারা সিদ্ধি প্রাপ্ত হওয়া বলা হয়। সুতরাং প্রত্যেক মানুষই নিজের উদ্ধার ও কল্যাণ করতে পারে। প্রত্যেক মানুষই ভগবৎপ্রাপ্তির অধিকারী। যদি মানুষ ভগবৎপ্রাপ্তির অধিকারী না হয়, তাহলে ভগবান কেন এই মনুষ্য শরীর দেবেন ?

প্রশ্ন—অনেক জন্মের পর 'সব কিছুই ভগবান বাসুদেব'—এইরূপ জ্ঞান হয় (৭।১৯), তাহলে এই জন্মে মানুষের ভগবৎপ্রাপ্তি কীরূপে হবে ?

উত্তর—এই শ্লোকে '**বহূনাং জন্মনামন্তে**' পদটির অর্থ 'অনেক জন্মের শেষে' নয়, পক্ষান্তরে 'অনেক জন্মের পর শেষ জন্মে, এই মনুষ্য শরীরে',— এইরূপ অর্থ হয়। কারণ এইবারের মনুষ্যজন্মই তার সমস্ত জন্মের শেষ জন্ম। ভগবান মানুষের কল্যাণের জন্যই নিজে থেকে তাদের মনুষ্যজন্ম দিয়েছেন অর্থাৎ মানুষকে তার কল্যাণ করার পুরো অধিকার দিয়েছেন। এখন সে পুনরায় জন্মগ্রহণের জন্য সচেষ্ট হবে, না নিজের উদ্ধার করবে এই বিষয়ে সে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।

গীতাতে ভগবান বলেছেন যে, 'মৃত্যুকালে মানুষ যে ভাব স্মরণ করে শরীর ত্যাগ করে, সে সেই ভাবই প্রাপ্ত হয়' (৮।৬)। 'মানুষ যে যে দেবতাকে যেমন ভাবে পূজা করতে চায় আমি সেই সেই দেবতার প্রতি তাদের শ্রদ্ধা-ভক্তি অচলা করে দিই' (৭।২১)। ভগবানের এইরূপ বাক্যে মনুষ্যজন্মের স্বাতন্ত্র্য পরিস্ফুট হয়। মানুষ সকামভাবে শুভকর্ম করে স্বর্গেও যেতে পারে, পাপকর্ম করে পশু-পক্ষী, ভূত-পিশাচ ইত্যাদি জন্ম তথা নরক গমনও করতে পারে ; আবার পাপ-পুণ্যরহিত হয়ে ভগবানকেও পেতে পারে। এই অন্তিম মনুষ্য জন্মে সে যা চায় তাই করতে পারে।

এই মনুষ্য জন্ম যেমন সমস্ত জন্মগুলির অন্তিম জন্ম, তেমনি সমস্ত জন্মের আদিও এই জন্মই। কারণ বহু জন্মের কর্মের ফলেই স্বর্গ, নরক এবং চুরাশী লক্ষ জন্ম পরিগ্রহ করতে হয়। এই মনুষ্যজন্মেই সমস্ত জন্মগুলির বীজ বোনা হয়ে থাকে।

প্রশ্ন—ভগবান অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যতের সমস্ত প্রাণীকেই জানেন (৭।২৬), সুতরাং কোন প্রাণী কোন্ গতি প্রাপ্ত হবে—তা ভগবান নিশ্চয়ই জানেন অর্থাৎ ভগবানের জ্ঞাতসারে যার যেমন গতি হবার, সে সেই গতিই পায়, তাহলে মানুষের নিজের উদ্ধারের স্বাতন্ত্র্য কোথায় ?

উত্তর—ভগবান সকল প্রাণীর অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যতের খবর যে জানেন তা কোন্ প্রাণী কোন্ গতিতে যাবে সেই গতিবিধি নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। ভগবান অংশীরূপে স্বাভাবিক ভাবেই তাঁর অংশরূপ সকল প্রাণীর বিষয় অবহিত আছেন, তথা সমস্ত প্রাণীর সকল বিষয় ভগবানের জ্ঞানগোচরে স্বতঃই রয়েছে, এই হল উপরিউক্ত বক্তব্যের তাৎপর্য। প্রাণিকুলের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণের জন্যই যদি ভগবান তাদের সম্বন্ধে সব জানতেন তাহলে, 'মানুষ আমাকে লাভ না করে জন্ম-মৃত্যুর চক্র পথে যাচ্ছে (৯।৩)' ; 'আমাকে না পেয়ে নিম্নগতির দিকে চলে যাচ্ছে (১৬।২০)', এইরূপ খেদ করতেন না। কেননা তিনি যদি মানুষের গতিবিধি নিশ্চিত করে থাকেন তাহলে তাঁর দুঃখ কিসের ? দ্বিতীয়তঃ, শ্রুতি ও স্মৃতিকে ভগবানেরই নির্দেশ বলে মান্য করা হয়—'**শ্রুতিস্মৃতী মমৈবাজ্ঞে**'। শ্রুতি এবং স্মৃতিতে বিধি-নিষেধ দেওয়া আছে যে, 'শুভকর্ম কর, নিষিদ্ধ কর্ম করো না', 'শুভকর্ম করলে তোমার সদ্গতি হবে এবং নিষিদ্ধ কর্ম করলে দুর্গতি হবে'। ভগবান যদি প্রাণীদের গতিবিধি আগে থেকেই ঠিক করে রাখেন, তাহলে শ্রুতি-স্মৃতির বিধি-নিষেধ কাদের ওপর প্রযোজ্য হবে ? এর তাৎপর্য এই যে মানুষ নিজ উদ্ধার করার ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র।

প্রশ্ন—নবম অধ্যায়ের ষষ্ঠ শ্লোকে ভগবান বলেছেন যে, সমস্ত প্রাণিকুল আমাতে স্থিত এবং ত্রয়োদশ অধ্যায়ের ত্রিংশ শ্লোকে বলেছেন যে, সকল ভাব, প্রাণী ইত্যাদি একই প্রকৃতিতে স্থিত। তাহলে বাস্তবে প্রাণী ভগবানে স্থিত, না প্রকৃতিতে স্থিত ?

উত্তর—তত্ত্বগতভাবে ভগবানের অংশ হওয়াতে সকল প্রাণী ভগবানেই স্থিত এবং তাদের কখনো ভগবান হতে আলাদা হওয়া সম্ভবও নয়। কিন্তু প্রাণিসকলের শরীর প্রকৃতি হতে উৎপন্ন হওয়ায় অর্থাৎ প্রকৃতির অংশ হওয়ায় প্রকৃতিতেই স্থিত।

প্রশ্ন—'আমি সমস্ত প্রাণীর মধ্যে সমানরূপে অবস্থিত, কিন্তু যাঁরা আমার ভজনা করেন, তাঁরা আমাতে অবস্থিত, আমিও তাঁদের মধ্যেই অবস্থিত (৯।২৯)',—ভগবানের এই পক্ষপাত কেন ? যদি পক্ষপাত থাকেই তবে, 'আমি সমস্ত কিছুর মধ্যে সমভাবে অবস্থিত' একথা কিভাবে সঠিক হয় ?

উত্তর—এই পক্ষপাতই তো সমত্ব ! যাঁরা ভজনা করেন আর যাঁরা করেন না, তাঁদের মধ্যে ভগবান যদি একই সমান ভাব রাখেন তাহলে সমতা কিভাবে হয় ? ভজনা করার মাহাত্ম্যই বা কি ? সুতরাং যাঁরা ভজনাদি করেন এবং যাঁরা করেন না তাঁদের সঙ্গে যথাযোগ্য ব্যবহার করাই হল ভগবানের সমত্বভাব। তিনি যদি তা না করতেন সেটাই হত বিষম ব্যবহার। বাস্তবিক বিবেচনায় দেখা যায় ভগবানে বিষমতা বলে কিছু নেই-ই। আসলে এই যে বিষমতা দেখা যায় তা ঘটেছে তাঁদেরই জন্য যাঁরা সংসারে নিরাসক্ত হয়ে ভগবানে শরণাগত হন। তাঁদের অনন্য ভাবের কারণেই ভগবানের মধ্যে এই বিষমতা আপনা থেকে হয়ে যায়, তিনি যেচে করেন না।

প্রশ্ন—ভগবৎ দর্শন হলে আর মোহ থাকে না। অর্জুন ভগবানের বিরাটরূপ, চতুর্ভুজরূপ ও দ্বিভুজরূপ—তিনরূপই দর্শন করেছিলেন, তবুও তাঁর মোহ দূরীভূত হয়নি কেন ?

উত্তর—দর্শন দেওয়ার পর ভক্তের মোহ দূর করা এবং তত্ত্বজ্ঞান করানোর দায়িত্ব স্বয়ং ভগবানের। অর্জুনের মোহ পরে দূর হয়েছিল (১৮।৭৩), তাতে এই সিদ্ধ হয় যে ভগবৎ দর্শনের পরে অবশ্যই মোহ দূর হয়। কিন্তু অর্জুন নিজ মোহ নষ্টের কারণ হিসাবে গীতোপদেশকে মনে করেন নি বা ভগবৎ দর্শনকেও নয়। তিনি ভগবৎকৃপাই এর কারন বলে স্বীকার করেছেন—'ত্বৎপ্রসাদাৎ' (১৮।৭৩)।

প্রশ্ন—ত্রয়োদশ অধ্যায়ের দ্বাদশ শ্লোকে পরমাত্মাকে 'জ্ঞেয়' বলা হয়েছে, আবার অষ্টাদশ অধ্যায়ের অষ্টাদশ শ্লোকে জগৎ-সংসারকে 'জ্ঞেয়' বলা হয়েছে । এর তাৎপর্য কি ?

উত্তর—দুটি বিষয় সম্পূর্ণ আলাদা। ত্রয়োদশ অধ্যায়ের দ্বাদশ শ্লোকে বলা হয়েছে পরমাত্মাকে জানা অবশ্য কর্তব্য, কেননা পরমাত্মাকে যথার্থরূপে জানতে পারলে প্রকৃত কল্যাণ হয়। অষ্টাদশ অধ্যায়ের অষ্টাদশ শ্লোকে বলা হয়েছে যে, যা কিছু দৃশ্য বস্তু দৃষ্টিগোচর হয় তাই হল সংসার। সংসারে ব্যবহারের মাধ্যমে কার্যসিদ্ধি হয়।

প্রশ্ন—ভগবান সবার হৃদয়ে বসবাস করেন (১৩।১৭, ১৫।১৫, ১৮।৬১), কিন্তু আজকাল ডাক্তাররা হৃদয়কে নতুন করে প্রত্যারোপণ করেন, তাহলে ভগবান কোথায় থাকেন ?

উত্তর—ভগবান সমস্ত স্থানেই বিরাজমান, হৃদয় তাঁর উপলব্ধির স্থান ; কারণ হৃদয় শরীরের প্রধান অঙ্গ এবং সমস্ত শ্রেষ্ঠভাব হৃদয়েই উৎপন্ন হয়। যেমন গরুর সারা শরীরে দুধ থাকলেও তা কেবল তার স্তন হতেই পাওয়া যায় অথবা পৃথিবীর সর্বত্র জল থাকলেও তা যেমন কেবল কূপাদি হতে পাওয়া যায় তেমনি ভগবান সর্বত্র সমানভাবে বিরাজ করলেও হৃদয়েই তাঁকে উপলব্ধি করা যায়।

চিকিৎসক যে হৃদয় প্রত্যারোপণ করেন তাকে হৃৎপিণ্ড বলে। হৃৎপিণ্ডে যে হৃদয়-শক্তি থাকে, সেই শক্তিতে ভগবান থাকেন। চিকিৎসা এই হৃৎপিণ্ডেরই হয়, তার শক্তির নয়। শক্তি তার নিজস্ব স্থানে যেমন তেমনি থাকে। যেমন চোখকে দেখা যায়, চোখের শক্তি বা নেত্রেন্দ্রিয় দেখা যায় না, কারণ এটি সূক্ষ্মশরীরে অবস্থান করে। ঠিক এইভাবে হৃৎপিণ্ড দেখতে পাওয়া যায়, তার শক্তিকে নয়।

প্রশ্ন—নিজেকে শরীরে স্থিত বলে মনে করলেই পুরুষ (চেতন) ভোক্তা হয়, কিন্তু ত্রয়োদশ অধ্যায়ের একবিংশ শ্লোকে ভগবান প্রকৃতিতে অবস্থিত পুরুষকে ভোক্তা বলেছেন—তা কি করে হয় ?

উত্তর—পুরুষ (চেতন) প্রকৃতিতে স্থিত—একথার তাৎপর্য এই যে, যেমন বিবাহের দ্বারা স্বামীর সঙ্গে স্ত্রীর সকল আত্মীয়গণের সম্পর্ক গড়ে উঠে, ঠিক তেমনই এই শরীরে নিজের স্থিতি মেনে নিলে অর্থাৎ একটি শরীরের সঙ্গে নিজের সম্বন্ধ স্বীকার করলে সমগ্র প্রকৃতির সঙ্গে, সকল শরীরের সঙ্গে তাঁর সম্বন্ধ হয়ে যায়।

প্রশ্ন—নিজেকে শরীরে স্থিত বলে মেনে নিলেই পুরুষ কর্তা এবং ভোক্তা হয়ে থাকে ; কিন্তু ত্রয়োদশ অধ্যায়ের একত্রিংশ শ্লোকে ভগবান বলেছেন যে, এই পুরুষ শরীরে স্থিত থেকেও কর্তা এবং ভোক্তা নয় । এর

তাৎপর্য কি ?

উত্তর—এখানে ভগবান প্রাণীদের যথার্থ স্বরূপ জানাচ্ছেন এই বলে যে, বাস্তবে অত্যন্ত অজ্ঞান মানুষও স্বরূপতঃ কখনও কর্তা বা ভোক্তা হয় না অর্থাৎ তার মধ্যে কোনরূপ কর্তৃত্ব বা ভোক্তৃত্ব আসে না। কিন্তু অজ্ঞানতার কারণে মানুষ নিজেকে কর্তা বা ভোক্তা বলে মনে করে (৩।২৭, ৫।১৫) এবং সে কর্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্বের বন্ধনে বদ্ধ হয়। মানুষের মধ্যে যদি কর্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্ব ভাব না থাকে, তাহলে সে সারা পৃথিবীকে ধ্বংস করলেও কাউকে মারেও না এবং বদ্ধও হয় না (১৮।১৭)।

প্রশ্ন—রজোগুণের তাৎকালিক বর্ধিত বৃত্তিতে এবং রজোগুণের আধিক্যে প্রাণী দেহত্যাগ করলে সে মনুষ্য শরীর নিয়ে জন্মগ্রহণ করে (১৪।১৫, ১৮)— এই দুটি বাক্যে প্রমাণিত হয় যে, এই মনুষ্যলোকে সমস্ত মানুষই রজোগুণসম্পন্ন, অর্থাৎ সাত্ত্বিক বা তামসিক গুণসম্পন্ন নয়। কিন্তু গীতাতে স্থানে স্থানে তিনটি গুণের কথাই আলোচিত হয়েছে, (৭।১৩, ১৪।৬-৮, ১৮।২০-৪০ ইত্যাদি)। এর অর্থ কি ?

উত্তর—ঊর্ধ্বগতি, মধ্যগতি এবং অধোগতি— এই তিনটিতে তিনটি গুণ থাকে। কিন্তু ঊর্ধ্বগতিতে সত্ত্বগুণের, মধ্যগতি বা মনুষ্যলোকে রজোগুণের এবং অধোগতিতে তমোগুণের প্রাধান্য থাকে। সেইজন্যই তিনটি গতিতেই প্রাণী সাত্ত্বিক, রাজস বা তামসিক স্বভাব সম্পন্ন হয়।[1]

প্রশ্ন—চতুর্দশ অধ্যায়ের সপ্তদশ শ্লোকে বলা হয়েছে যে অজ্ঞান উৎপন্ন হয় তমোগুণ থেকে এবং অষ্টম শ্লোকে অজ্ঞান থেকেই তমোগুণের জন্ম জানানো হয়েছে, এর অর্থ কি ?

উত্তর—যেমন গাছ থেকে বীজ জন্মায় এবং ঐ বীজ থেকে পুনরায় গাছ, তেমনি তমোগুণ থেকে অজ্ঞানতা আসে এবং ঐ অজ্ঞানতা থেকে আবার তমোগুণ বৃদ্ধি পায়, পুষ্টিলাভ করে।

প্রশ্ন—অশ্বত্থগাছ বৃক্ষ শ্রেণীর মধ্যে পূজ্য বলে মনে করা হয়, তাহলে ভগবান পঞ্চদশ অধ্যায়ের তৃতীয় শ্লোকে সংসাররূপ অশ্বত্থ গাছকে কাটতে বলেছেন কেন ?

উত্তর—অশ্বত্থগাছ বৃক্ষশ্রেণীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ। ভগবান এই গাছকে নিজ স্বরূপ হিসাবে দেখিয়েছেন (১০।২৬)। ঔষধরূপেও এর অনেক মহিমা। কথিত আছে যে, এই গাছের শিকড় বেটে খেলে বন্ধ্যা নারীও পুত্রলাভ করতে পারে। অশ্বত্থ সকলকে আশ্রয় দেয়। এর নীচে ছোট ছোট গাছ বেড়ে ওঠে। অশ্বত্থ কাউকে বাধা দেয় না, সেইজন্য অশ্বত্থ গাছ কেউ কাটে না ; যে জন্য বাড়ির দেওয়াল, ছাদের ওপর, কুয়োর মধ্যে যত্র তত্র এই গাছ বেড়ে ওঠে। অশ্বত্থ, বট, পাকুড় ইত্যাদিকে যজ্ঞবৃক্ষ বলা হয় অর্থাৎ এইসব গাছের কাঠে যজ্ঞের হোমাদি কাজ সম্পন্ন হয়। অতএব ভগবান জগতের রূপক হিসাবে অশ্বত্থ গাছকে দেখিয়েছেন। কারণ এই জগৎ-সংসার কাউকে কিছুতে বাধা দেয় না। জগৎ-সংসার ভগবানেরই রূপ। আসলে নিজস্ব অনুরাগ-বিদ্বেষ, কামনা-মমতা-আসক্তি ইত্যাদিই বাধা হয়ে দাঁড়ায়। তাই ভগবান জগৎ-সংসার রূপ অশ্বত্থবৃক্ষ ছেদন করতে বলেননি— এতে যে কামনা-মমতা-আসক্তি ইত্যাদি আছে, যার জন্য মানুষ জন্ম-মরণ চক্রে আবর্তিত হয়, সেইগুলিকে বৈরাগ্যরূপ অস্ত্র দ্বারা ছেদন করতে বলেছেন।

প্রশ্ন—পঞ্চদশ অধ্যায়ের চতুর্থ শ্লোকে ভগবান বলেছেন যে, 'সেই আদি পুরুষ পরমাত্মারই আমি শরণ লই'—তমেব চাদ্যং পুরুষং প্রপদ্যে,—তাহলে ভগবানও কি কারোর শরণ গ্রহণ করেন ?

উত্তর—ভগবান কারোর শরণ নেন না, তিনি তো সকলের উপর। লোকশিক্ষার জন্য ভগবান সাধকের ভাষাতে বলে সাধককে বোঝাচ্ছেন যে তাঁরা যেন, 'সেই আদি পরমাত্মারই আমি শরণাগত', এই প্রকার চিন্তা করেন।

প্রশ্ন—জীবসকল পরমাত্মারই অংশ (১৫।৭), তাহলে কী জীবগণ পরমাত্মা থেকেই জন্মগ্রহণ করেছে ? না কি পরমাত্মার খণ্ডবিশেষ ?

উত্তর—তা ঠিক নয়। জীবসকল অনাদি এবং সনাতন, পরমাত্মা পূর্ণ-স্বরূপ ; সুতরাং জীব কিভাবে পরমাত্মার অংশবিশেষ হতে পারে ? আসলে জীবও

[1] এই বিষয়ে বিশদ জানতে হলে গীতার 'সাধক-সঞ্জীবনী' টীকার চতুর্দশ অধ্যায়ের অষ্টাদশ শ্লোকটি দ্রষ্টব্য।

পরমাত্মস্বরূপ, কিন্তু জীব যখন প্রকৃতির অংশ শরীর-ইন্দ্রিয়-মন-বুদ্ধি প্রভৃতিকে 'আমি-আমার' বলে মনে করে, তখন সে অংশ-বিশেষ হয়। যখন সে ঐ সমস্ত পরিত্যাগ করে, তখনই সে পূর্ণ স্বরূপ হয়ে যায়।

প্রশ্ন—প্রথমে সাত্ত্বিক আহারের ফল বা পরিণাম বর্ণনা করে তারপর ভোজ্য পদার্থের বর্ণনা করা হয়েছে এবং রাজসিক আহারের প্রথমে ভোজ্য পদার্থের বর্ণনা করে পরে ফলের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু তামসিক আহারে ফলের বর্ণনা করাই হয় নি (১৭।৮-১০), এরকম কেন ?

উত্তর—সাত্ত্বিক মানুষ প্রথমে খাদ্যের ফল বা পরিণামের কথা ভাবেন, তারপর তিনি আহারাদিতে প্রবৃত্ত হন, সেইজন্যই প্রথমে পরিণাম ও পরে খাদ্য-পদার্থের বর্ণনা করা হয়েছে। রাজসিক মানুষের দৃষ্টি প্রথমে খাদ্য পদার্থের দিকে, বিষয়েন্দ্রিয় ইত্যাদির দিকে যায়, পরিণামের দিকে নয়। রাজসিক ব্যক্তির দৃষ্টি যদি প্রথমে পরিণামের দিকে যায়, তাহলে তাঁর রাজসিক আহারাদিতে প্রবৃত্তি হবে না। সেইজন্যই রাজসিক আহারের প্রথমে খাদ্য পদার্থ এবং পরে পরিণাম বর্ণিত হয়েছে। তামসিক ব্যক্তি মূঢ়তায় আচ্ছন্ন থাকে তাই তার আহার এবং তার পরিণাম নিয়ে কোনো বিচার বিবেচনার দৃষ্টি থাকে না। আহার ন্যায়যুক্ত কিনা, তাতে আমাদের অধিকার আছে কি না, শাস্ত্রের কোনো বাধা বা নিষেধ আছে কিনা এবং তার পরিণাম আমাদের পক্ষে শুভকর কিনা এইসব ব্যাপার নিয়ে তামসিক ব্যক্তি কখনও বিচার-বিবেচনা করে না। এইজন্য তামসিক আহারের পরিণাম নিয়ে কোন আলোচনা করা হয়নি।

প্রশ্ন—ঈশ্বর নিজ মায়া দ্বারা সমস্ত প্রাণীকে সংসারে পরিভ্রমণ করান (১৮।৬১)। তাহলে কি ঈশ্বরই প্রাণিদিগকে পাপ পুণ্যে নিয়োজিত করেন ?

উত্তর—মানুষ যেমন রেলগাড়ীতে উঠলে সেই গাড়ী অনুসারেই বাধ্য হয়ে তাকে যেতে হয়, তেমনি প্রাণী শরীররূপী যন্ত্রে যখন আরূঢ় হয় অর্থাৎ শরীর-যন্ত্রের সঙ্গে 'আমি-আমার' সম্বন্ধ পাতিয়ে বসে, তখন সেই জীবকে তার স্বভাব এবং কর্ম অনুসারে পরিভ্রমণ করতে হয়, কর্মের ফল ভোগ করতে হয়, পাপ বা পুণ্য তিনি করান না।

প্রশ্ন—ভগবান প্রথমে অর্জুনকে **'তমেব শরণং গচ্ছ'** বাক্য দ্বারা অন্তর্যামী পরমাত্মার শরণ গ্রহণ করতে বলেছেন (১৮।৬২), পরে আবার **'মামেকং শরণং ব্রজ'** বাক্য দ্বারা নিজ শরণে আসতে বলেছেন (১৮।৬৬)। অর্জুনকে যদি নিজ শরণে আনারই তাঁর ইচ্ছা ছিল, তাহলে অন্তর্যামী পরমাত্মার শরণ গ্রহণ করার কথা কেন বলেছিলেন ?

উত্তর—ভগবান প্রথমে বলেছেন যে, 'আমার শরণাগত ভক্ত আমার কৃপায় শাশ্বত পদ প্রাপ্ত হয় (১৮।৫৬)', আরও বলেছেন যে, 'মৎপরায়ণ হয়ে আমাতে চিত্ত রেখে তুমি সমস্ত বিঘ্ন অতিক্রম করে যাবে (১৮।৫৭-৫৮)'। ভগবানের এইরূপ আশ্বাসেও অর্জুন কিছু বলেন নি, স্বীকার করেন নি। তখন ভগবান বললেন, 'যদি তুমি আমার শরণ না নিতে চাও, তাহলে সেই অন্তর্যামী পরমাত্মার শরণ নাও। আমি অতি গোপনীয় জ্ঞান তোমাকে বলে দিলাম, এখন তোমার যা ইচ্ছা, তাই কর (১৮।৬৩)'। এই কথায় অর্জুন ঘাবড়ে গিয়ে ভাবলেন যে ভগবান তাহলে তাঁকে ত্যাগ করছেন। তখন ভগবান অর্জুনকে সর্বগুহ্যতম কথাটি বললেন, 'তুমি কেবল আমারই শরণাগত হও'।

প্রশ্ন—ভগবান গীতায় তিনস্থানে (৩।৩, ১৪।৬, ১৫।২০তে) অর্জুনকে **'অনঘ'** নামে সম্বোধন করেছেন, তাতে প্রমাণিত হয় যে ভগবান অর্জুনকে পাপরহিত ব্যক্তি বলে মানেন, তবে তিনি আবার কেন বলেছেন যে, 'আমি তোমাকে সর্ব পাপ থেকে মুক্ত করে দেব (১৮।৬৬) ?'

উত্তর—যে ব্যক্তি ভগবানের সম্মুখীন হয়, তার পাপের অন্ত ঘটে। অর্জুন (২।৭) ভগবানের সম্মুখীন হয়েছিলেন, তাই তিনি পাপরহিত হন, ভগবানের দৃষ্টিতেও তিনি পাপরহিত। অর্জুন মনে করতেন যে, 'যুদ্ধে কুটুম্ব বধ করলে পাপ হবে (১।৩৬, ৩৯, ৪৫)।' অর্জুনের এরূপ মনে করার কারণেই ভগবান বলেছেন, 'আমি তোমাকে সর্ব পাপ থেকে মুক্ত করে দেব।'

প্রশ্ন—অর্জুন যখন প্রথমেই বলে দিয়েছিলেন যে, 'আমার মোহ দূর হয়েছে'—**'মোহোহয়ং বিগতো মম'**

(১১।১) তাহলে দ্বিতীয়বার বলার কী প্রয়োজন ছিল যে, 'আমার মোহ নষ্ট হয়েছে'—**'নষ্টো মোহঃ'**(১৮।৭৩)?

উত্তর—সাধন পথে অগ্রসর হওয়ার সময় সাধকের পারমার্থিক লক্ষণসমূহ অনুভূত হতে থাকে ; তখন তিনি মনে করেন যে, পরমতত্ত্ব তিনি সম্যক্‌ভাবে জেনে গেছেন, কিন্তু আসলে পূর্ণতা না পাওয়া পর্যন্ত তা সামগ্রিকভাবে জানা যায় না। এইরূপ অর্জুনও দ্বিতীয় অধ্যায় থেকে দশম অধ্যায় পর্যন্ত ভগবানের প্রভাব ইত্যাদি সম্বন্ধে শুনে অত্যন্ত প্রসন্ন হন এবং মনে করেন যে, 'আমার মোহ দূর হয়েছে'। তাই নিজের দৃষ্টিতে তিনি বলেছিলেন, **'মোহোঽয়ং বিগতো মম।'** কিন্তু ভগবান তা স্বীকার করেন নি। পরে অর্জুন ভগবানের বিশ্বরূপ দেখে ভীত হয়ে পড়লে ভগবান তাঁকে জানান, —এটিই হচ্ছে তোমার মূঢ়ভাব বা মোহ। এতে অর্জুনের মোহিত হওয়া উচিত নয় —**'মা চ বিমূঢ়ভাবঃ'** (১১।৪৯)। ভগবানের এই কথায় প্রমাণিত হয় যে, অর্জুনের মোহ সর্বতোভাবে তখনও দূরীভূত হয় নি। সেইজন্যই পরে যখন অর্জুন সর্বগুহ্যতম কথা শুনে বললেন, 'আপনার কৃপায় আমার মোহ নষ্ট হয়েছে এবং স্মৃতি প্রাপ্ত হয়েছি'—**'নষ্টো মোহঃ স্মৃতির্লব্ধা ত্বৎপ্রসাদান্ময়াচ্যুত'** (১৮।৭৩), তখন ভগবান কোন উত্তর না দিয়ে মৌন রইলেন এবং উপদেশ দেওয়া বন্ধ করলেন। এর দ্বারা প্রমাণিত হয়, ভগবানও স্বীকার করে নিয়েছেন যে অর্জুনের মোহ তখন দূরীভূত হয়েছে।

প্রশ্ন—গীতার শেষে সঞ্জয় কেবলমাত্র বিরাটরূপটিই স্মরণ করেছেন কেন (১৮।৭৭)? চতুর্ভুজ রূপের স্মরণ করেন নি কেন?

উত্তর—ভগবানের চতুর্ভুজরূপ প্রসিদ্ধ কিন্তু বিরাটরূপ ততো প্রসিদ্ধ নয়। বিরাটরূপ যতো দুর্লভ, চতুর্ভুজরূপ ততো দুর্লভও নয়। কারণ ভগবান তাঁর চতুর্ভুজরূপ দেখার উপায় বলেছেন (১১।৫৪), কিন্তু বিরাটরূপ দর্শন করার উপায় তিনি বলেন নি। সেইজন্য সঞ্জয় অত্যন্ত অদ্ভুত সেই বিরাটরূপ স্মরণ করেছেন।

প্রশ্ন—অর্জুনের মোহ সম্পূর্ণরূপে দূর হয়েছিল এবং মোহ একবার দূর হলে পুনরায় তা আসতেই পারে না — **'যজ্জ্ঞাত্বা ন পুনর্মোহমেবং যাস্যসি'** (৪।৩৫)। তাহলে যখন অভিমন্যুর মৃত্যু হল, তখন অর্জুনের আত্মীয়বোধক মোহ হল কেন?

উত্তর—ওটি মোহ নয়, বস্তুতঃ লোকশিক্ষা। মোহ দূর হওয়ার পর মহাপুরুষরা যে আচরণ করেন, তা সকলের জন্য শিক্ষামূলক, আদর্শস্বরূপ। অভিমন্যুর মৃত্যুতে কুন্তী, সুভদ্রা, উত্তরা সকলে অত্যন্ত দুঃখ পেয়েছিলেন। তাই তাঁদের দুঃখ প্রশমনের জন্য অর্জুনের মাধ্যমে এইরূপ শোক ও মোহের যেন অভিনয় হয়েছিল, লীলা ঘটেছিল। প্রমাণস্বরূপ বলা যায়, অভিমন্যুর মৃত্যুর পর অর্জুন জয়দ্রথ বধের জন্য যে সমস্ত প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, তা সব শাস্ত্র এবং স্মৃতির নির্দেশ অনুসারেই (মহাভারত দ্রোণ ৭৩।২৫-৪৫)। যদি অর্জুন মোহগ্রস্ত থাকতেন, তাহলে কি তাঁর শাস্ত্র এবং স্মৃতির উপদেশ মনে থাকত? কি করে এত সাবধান হতে পারতেন? কারণ মোহগ্রস্ত ব্যক্তি পুরানো কথা মনে রাখতে পারেন না এবং নতুন কিছুও ঠিক করতে পারেন না (২।৬৩)। কিন্তু অর্জুনের সব কথাই মনে ছিল, তিনি শোকগ্রস্ত ছিলেন না। তাতেই প্রমাণিত হয় যে অর্জুনের শোক লীলামাত্র ছিল।

প্রশ্ন—মোহ দূর হলে এবং স্মৃতি প্রাপ্ত হলে আর কখনও বিস্মৃতি আসে না। তাহলে 'অনুগীতা'তে অর্জুন কী করে বললেন যে, 'আমি তো সেই জ্ঞান ভুলে গেছি' (মহাভারত, আশ্বমেধিকপর্ব ১৬।৬)?

উত্তর—ভগবান গীতোপদেশের সময় অর্জুনকে ভক্তিযোগ এবং কর্মযোগের অধিকারী মনে করে (মধ্যম পুরুষের সম্বোধনে) ভক্তিযোগ ও কর্মযোগের উপদেশ দিয়েছিলেন। অর্জুন ভক্তিযোগ ও কর্মযোগের কথা ভোলেন নি, তিনি আসলে জ্ঞানযোগের কথা ভুলে গিয়েছিলেন। এইজন্য অনুগীতায় ভগবান জ্ঞানেরই উপদেশ দিয়েছিলেন।

প্রশ্ন—অনুগীতাতে ভগবান বলেছেন, সেই সময় আমি যোগে স্থিত হয়ে গীতা উপদেশ দিয়েছিলাম, কিন্তু এখন আমি আর সেইরূপ উপদেশ দিতে পারব না (মহাভারত, আশ্বমেধিকপর্ব, ১৬।১২-১৩)। তাহলে কি ভগবান কখনও যোগে স্থিত থাকেন, কখনও থাকেন না? ভগবানের জ্ঞানও কি স্থির নয়?

উত্তর—গো-বৎস যখন দুধ পান করে, তখন গাভীর

শরীরে যত দুধ সব স্তনে এসে যায়, সেইরূপ শ্রোতা উৎকণ্ঠিত হয়ে কিছু জিজ্ঞাসা করলে বক্তার মধ্যে বিশেষ ভাব স্ফুরিত হতে থাকে। গীতায় অর্জুন উৎকণ্ঠিত হয়ে ব্যাকুলতাপূর্বক নিজের কল্যাণ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, সেইজন্য তখন ভগবানের মধ্যে বিশেষ ভাব উৎপন্ন হয়েছিল। কিন্তু অনুগীতাতে অর্জুনের মধ্যে সেইরূপ ব্যাকুলতা ও উৎকণ্ঠা ছিল না, তাই গীতার বর্ণনা যেরূপ সরস হয়েছে অনুগীতাতে ঠিক সেরূপ হয়নি।

প্রশ্ন—গীতার দশম অধ্যায়ে যেমন ভগবান অর্জুনকে নিজ বিভূতি সম্বন্ধে বলেছেন তেমনি শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধের ষোড়শ অধ্যায়ে ভগবান উদ্ধবকেও নিজ বিভূতি জানিয়েছেন। গীতা এবং ভাগবতে বক্তা যখন সেই এক ভগবান শ্রীকৃষ্ণই, তাহলে দুটি গ্রন্থে বলা বিভূতিগুলোর মধ্যে পার্থক্য কেন ?

উত্তর—আসলে ভগবানের বিভূতি সম্বন্ধে বলার উদ্দেশ্য কোনো বস্তু বা ব্যক্তি ইত্যাদির মহত্ত্ব জানানো নয়, আসলে নিজের (ভগবানের) চিন্তন করাবার জন্যই এইসব বলা। গীতা এবং ভাগবতে দুই স্থানে বলা বিভূতিগুলোর মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল ভগবানের চিন্তন করানো। এই অর্থেই যেখানে কোন বিশিষ্ট ভাব দেখা যায়, সেই সেই বস্তু বা ব্যক্তিতে বিশেষ ভাব না দেখে কেবল ভগবানের বিশেষত্বই দর্শনীয় এবং ভগবানের প্রতিই মনের বৃত্তিকে চালিত করা উচিত। এর তাৎপর্য এই যে, মন যে কোনো স্থানেই যাক না কেন সেখানেই ভগবানের কথা ভাবতে হবে। এইজন্য ভগবান বিভূতিসমূহের বর্ণনা করেছেন (১০।৪১)।

প্রশ্ন—ভাগবতে ভগবান উদ্ধবকে উপদেশ দিয়েছিলেন বলে তা যেমন 'উদ্ধবগীতা' নামে পরিচিত, তেমনি গীতার নামও 'অর্জুনগীতা' হওয়া উচিত ছিল, তা না হয়ে এর নাম 'ভগবদ্গীতা' হল কেন ?

উত্তর—ভাগবতে উদ্ধব স্বয়ং ভগবানের কাছে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছিলেন, সেইজন্য সেই কথোপকথন-এর নামকরণ 'উদ্ধবগীতা' রাখাই যুক্তিযুক্ত হয়েছে। কিন্তু 'গীতা' উপদেশ দেওয়ার কথা স্বয়ং ভগবানের মনেই এসেছিল, কারণ অর্জুন যুদ্ধ করতেই এসেছিলেন, উপদেশ শুনতে নয়। গীতা উপদেশ দেবার কথা মনে আসাতেই শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের রথ পিতামহ ভীষ্ম এবং গুরু দ্রোণাচার্যের সামনে উপস্থিত করেন এবং বলেন, 'হে পার্থ! কুরুবংশীয়দের দেখ',—'**কুরূন্ পশ্য**' (১। ২৫)। ভগবান যদি ঐরূপ না বলে, বলতেন যে 'ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণকে দেখ'—'**ধার্তরাষ্ট্রান্ পশ্য**', তাহলে অর্জুনের মধ্যে এই মোহ জাগ্রত হত না, যুদ্ধ করার একটা প্রবল ইচ্ছা জাগত এবং ভগবানেরও গীতা বলার সুযোগ হত না। গীতা উপদেশ দেবার সুযোগ হয়েছিল 'কুরুবংশীয়দের দেখ', এই কথাটি বলাতেই, কারণ কুরুবংশ বললে ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণ এবং পাণ্ডবগণ উভয়কেই বোঝায়। অতঃপর নিজ আত্মীয়গণকে দেখে অর্জুনের সুপ্ত মোহ জাগরিত হয়েছিল, ফলে তিনি নিজ কর্তব্য-অকর্তব্য নির্ণয় করতে অসমর্থ হয়ে ভগবানের শরণাগত হলেন এবং নিজ কল্যাণ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন। এইজন্যই ভগবানের দেওয়া উপদেশের নাম ভগবদ্গীতা রাখাই যুক্তিযুক্ত বা উচিত।'

প্রশ্ন—যখন যুদ্ধের প্রস্তুতি সম্পূর্ণ হয়েছে, এইরকম (অল্প) সময়ে ভগবান এইরূপ গীতার মত বিরাট উপদেশাবলী কিভাবে দিলেন ?

উত্তর—ভগবানের মায়াই যখন অঘটন-ঘটন-পটীয়সী তখন স্বয়ং ভগবান অল্প সময়ে অনেক কিছুই যে বলতে পারবেন, এতে আশ্চর্য হওয়ার কি আছে ?

মহাভারত দেখলে মনে হয় তখন সময় অল্প ছিল না। অর্জুন ভগবানকে দুই পক্ষের সেনাদের মাঝে রথ উপস্থিত করতে বলায় ভগবান অর্জুনের রথকে দুই পক্ষের সেনাদের মধ্যে স্থাপিত করেন। যখন রথ দুটি পক্ষের মধ্যে অবস্থান করছে এবং একই পরিবারভুক্ত সদস্যগণ নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলছেন তখন দুই পক্ষের সেনারা কী করে যুদ্ধ করবে ? সুতরাং তারা শান্তভাবেই অপেক্ষা করছিল।

গীতার উপদেশাবলী শেষ হলে যুধিষ্ঠির নিঃশঙ্কচিত্তে কৌরবসেনাদের মধ্যে গেলেন, তাঁর সঙ্গে ভীম, অর্জুন, নকুল, সহদেব এবং শ্রীকৃষ্ণও গেলেন এবং ভীষ্ম, দ্রোণাচার্য, কৃপাচার্য প্রমুখের সঙ্গে মিলিত হয়ে কথাবার্তা বললেন। সেখান থেকে ফেরার সময় যুধিষ্ঠির ঘোষণা করলেন যে, 'এই সমস্ত কৌরবসেনা যুদ্ধে ধ্বংস হবে,

যদি কারো বাঁচার ইচ্ছা থাকে, তাহলে তারা আমাদের সেনাদলে যোগ দিতে পারে।'

যুধিষ্ঠিরের এইরকম ঘোষণা শুনে দুর্যোধনের ভাই যুযুৎসু নাকাড়া বাজিয়ে পাণ্ডবসেনাদের মধ্যে চলে এলেন। এর পর যুদ্ধ শুরু হল। এর থেকেই প্রমাণিত হয় যে, গীতার উপদেশ দেওয়ার যথেষ্ট সময় ছিল।

প্রশ্ন—ভগবান গীতা গদ্যে বলেছিলেন না পদ্যে ?

উত্তর—সেইসময় যে ভাষা প্রচলিত ছিল, সেই ভাষাতেই অর্জুন প্রশ্ন করেছেন এবং তাতেই ভগবান উত্তর দিয়েছেন, উপদেশ দিয়েছেন। আসলে যেখানে জিজ্ঞাসা সমাধানের জন্য তীব্র ব্যাকুলতা থাকে সেখানে বক্তা বা শ্রোতা কারোরই মন ভাষার দিকে থাকে না, তাদের মন তখন ভাবের দিকে থাকে। বলার সময় যদি কোন উদাহরণ মনে পড়ে তখন সেই উদাহরণটি যে ভাষায় থাকে, সেই ভাষাতেই বলা হয়। এইভাবেই ভগবান অর্জুনকে সরল গদ্যেই উপদেশ দিয়েছেন এবং যেখানে উদাহরণ স্বরূপ শ্রুতি থেকে কিছু উল্লেখ করেছেন সেখানে সেগুলি যেমন শ্রুতিতে আছে তেমন পদ্যেই বলেছেন, যেমন 'যদক্ষরং বেদবিদো বদন্তি' (৮।১১) ইত্যাদি। তাৎপর্য হচ্ছে গীতার উপদেশ গদ্যে ও পদ্যে, দুভাবেই বলা হয়েছে। উপদেশগুলি শ্লোকবদ্ধ করেছেন শ্রীবেদব্যাস।

প্রশ্ন—শ্রীবেদব্যাস এগুলি শ্লোকবদ্ধ করলে গীতা ভগবানের বাণী কি করে হল ?

উত্তর—বেদব্যাসের (কর্ম) কৃতি এতই বিলক্ষণ যে, বক্তা যেভাবেই বলুন না কেন তিনি তা ঠিক সেই ভাষাতেই প্রকাশ করতে পারতেন। ভাগবতে ব্রহ্মা, গোপবালক, গোপিনীদের এবং ভগবানের উক্তিগুলি লক্ষ্য করলে দেখা যায় ব্রহ্মার কথনরীতি একরকমের, গোপবালকদের কথা গ্রাম্য ধরনের, গোপিনীদের ভাষা স্ত্রীলোকদের মত এবং ভগবানের ভাষা অন্য আর এক ধরনের। সেইরকম শ্রীবেদব্যাস গীতায় ভগবানের বাণীগুলিও তাঁর ভাষারই মতো শ্লোকবদ্ধ করেছেন। সুতরাং গীতা যে ভগবানেরই বাণী—তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

প্রশ্ন—গীতা অনুযায়ী কর্মযোগ জ্ঞানযোগেরই সাধন না স্বতন্ত্র ?

উত্তর—গীতাতে কর্মযোগকে জ্ঞানযোগের সাধন-রূপেও বলা হয়েছে এবং স্বতন্ত্ররূপেও দেখান হয়েছে। যেমন 'কর্মযোগ ছাড়া জ্ঞানযোগীর সিদ্ধি লাভ করা কঠিন (৫।৬)', 'যিনি কর্মযোগ দ্বারা নিজ অন্তঃকরণকে শুদ্ধ করেন নি, তিনি নিজ মধ্যস্থিত পরমাত্মতত্ত্ব অবগত হন না (১৫।১১)'—এইস্থানে ভগবান কর্মযোগকে জ্ঞান-যোগের প্রাক-সাধন হিসাবে দেখিয়েছেন।

'জ্ঞানযোগ এবং কর্মযোগ, এই দুটি পথই পরমাত্মার কাছে পৌঁছবার সমোপযোগী' (৫।৫), 'কর্মযোগ দ্বারা মানুষ তার নিজ মধ্যে স্থিত পরমাত্মতত্ত্বকে অনুভব করে' (১৩।২৪)। এইস্থানে ভগবান কর্মযোগকে 'স্বতন্ত্র' বলেছেন। এর তাৎপর্য এই যে, কর্মযোগ জ্ঞানযোগের সাধন হিসাবেও চিহ্নিত এবং স্বতন্ত্রভাবেও তা কল্যাণ সাধন করে।

প্রশ্ন—কর্মযোগের সাধনে সেবাই মুখ্য, কিন্তু গীতায় কর্মযোগ প্রকরণে সেবার কথা আসে নি কেন ?

উত্তর—গীতার মধ্যে 'যজ্ঞার্থ-কর্ম', 'লোক-সংগ্রহ' ইত্যাদি যে সমস্ত শব্দ আছে সেগুলি সেবামূলক বলেই মনে করতে হবে। কারণ লোকমর্যাদা সুরক্ষিত রাখবার জন্য নিজ স্বার্থ এবং অহংকার ত্যাগ করে শুধুমাত্র বিশ্বের জন্য যে কাজ করা যায়, সেগুলিকে 'সেবা'-ই বলা হয়।

(৩) গীতায় ঈশ্বরবাদ

ষট্‌স্বেব দর্শনেষ্বীশো ন তথাপেক্ষিতো মতঃ।
কল্যাণার্থং তু জীবানাং গীয়তে গীতয়েশ্বরঃ॥

অন্যান্য দর্শন থেকে গীতায় ঈশ্বরবাদ বিশেষরূপে বলা হয়েছে। ন্যায়, বৈশেষিক, যোগ, সাংখ্য, পূর্ব-মীমাংসা এবং উত্তরমীমাংসা—এই ছয়টি দর্শনের একমাত্র উদ্দেশ্য জীবের কল্যাণসাধন। কিন্তু এতে মুখ্যভাবে ঈশ্বরের বর্ণনা নেই। এর মধ্যে ন্যায়দর্শনে, 'যা কিছু হচ্ছে সব ঈশ্বরের ইচ্ছাতেই হচ্ছে'—এইরূপে ঈশ্বরকে বরণ করা হলেও, মুক্তির জন্য ঈশ্বরের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করা হয় নি। এই দর্শন একুশ প্রকারের দুঃখের বিনাশকেই মুক্তির কারণ বলে জানিয়েছেন। 'বৈশেষিক দর্শনে'-ও জীবকল্যাণে ঈশ্বরের প্রয়োজনের কথা না বলে, আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক এবং আধিভৌতিক, এই ত্রিতাপনাশেরই আলোচনা করা হয়েছে। 'যোগদর্শনে' প্রধানতঃ চিত্তবৃত্তি-নিরোধের কথাই বলা হয়েছে। চিত্তবৃত্তি-নিরোধে স্বরূপে স্থিতি হয়ে যায়। হ্যাঁ, চিত্তবৃত্তি-নিরোধের সাধনায় ঈশ্বরের প্রণিধান বা শরণাগতিকেও একটি উপায় হিসাবে দেখানো হয়েছে, কিন্তু সেই উপায়কে মুখ্যভাবে ধরা হয় নি। 'সাংখ্যদর্শন' এবং 'পূর্ব মীমাংসা' জীবের কল্যাণের জন্য ঈশ্বরের কোন প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেন না। 'উত্তর মীমাংসা'-তে (বেদান্ত-দর্শনে) ঈশ্বরের প্রসঙ্গ বিশেষভাবে আসে নি, বস্তুতঃ জীব এবং ব্রহ্মের একত্বের কথাই বিশেষভাবে আলোচিত হয়েছে। বৈষ্ণব আচার্যগণ ঈশ্বরের বিশেষত্বের কথা জানালেও, গীতাতে যে ভাবে বিবৃত হয়েছে, সেইভাবে তাঁরা প্রকাশ করেন নি।

গীতায় ঈশ্বরভক্তির কথা প্রধানরূপে এসেছে। অর্জুন যতক্ষণ পর্যন্ত ভগবানের শরণাগত না হয়েছেন, ততক্ষণ ভগবান কোন উপদেশ দেন নি। যখন অর্জুন ভগবানের শরণাগত হয়ে নিজের কল্যাণ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলেন, তখন ভগবান গীতার উপদেশ দিতে আরম্ভ করলেন। উপদেশের শেষেও ভগবান **'মামেকং শরণং ব্রজ'** (১৮।৬৬) বলে নিজের প্রতি শরণাগতিকে অত্যন্ত গোপনীয় এবং শ্রেষ্ঠ বলে জানিয়েছেন এবং অর্জুনও **'করিষ্যে বচনং তব'** (১৮।৭৩) বলে পূর্ণ শরণাগতি স্বীকার করেছেন।

গীতোক্ত কর্মযোগেও ঈশ্বরের আদেশরূপে ঈশ্বরেরই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। যেমন **'কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন'** (২।৪৭) ; **'যোগস্থঃ কুরু কর্মাণি'** (২।৪৮) ; **'নিয়তং কুরু কর্ম ত্বম্'** (৩।৮) ; **'কুরু কর্মৈব তস্মাৎ ত্বম্'** (৪।১৫) ইত্যাদি। এইরূপে গীতোক্ত জ্ঞানযোগেও ঈশ্বরের অব্যভিচারিণী ভক্তিকে জ্ঞান-প্রাপ্তির সাধন বলে জানানো হয়েছে (১৩।১০, ১৪।২৬)।

গীতার মূল শ্লোকসমূহ অবলোকন করলে দেখা যায় যে জীবের কল্যাণের জন্য ঈশ্বরের প্রয়োজন অত্যধিক।

জ্ঞাতব্য

প্রশ্ন—ঈশ্বরকে আমরা কেন মানব (স্বীকার করব) ?

উত্তর—ঈশ্বর আছেন, তাই মানতে হয়।

প্রশ্ন—ঈশ্বর যে আছেন, তার প্রমাণ কি ?

উত্তর—জগতে যে সকল বস্তু দেখা যায় তার কেউ না কেউ নির্মাণকর্তা আছেন ; কেননা, সৃষ্টিকর্তা ব্যতিরেকে কোন বস্তু তৈয়ারী হয় না। তেমনই সমুদ্র, পৃথিবী, চন্দ্র, সূর্য, বায়ু, নক্ষত্রাদি যা কিছু আমরা দেখতে পাই তারও কেউ নির্মাণকারী নিশ্চয়ই আছেন। এই সমস্ত জিনিসের রচয়িতা আমাদের মতো সামান্য মানুষ নিশ্চয়ই নন। এর নির্মাণকর্তা বা রচয়িতা এক সর্বসমর্থ ঈশ্বরই হতে পারেন। দ্বিতীয়তঃ, সমুদ্রের নিজ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত থাকা, চন্দ্র-সূর্যের নিয়মিত সময়ে উদয়-অস্ত হওয়া, এসবের নিয়ামক বা সঞ্চালক নিশ্চয়ই কেউ আছেন। এদের নিয়ামক সর্বসমর্থ ঈশ্বরই হতে পারেন।

প্রশ্ন—সমুদ্র, পৃথিবী, চন্দ্র ইত্যাদির সৃষ্টি এবং পরিচালনা তো প্রকৃতি করে। সব কিছু প্রকৃতির দ্বারাই হয়। তাহলে ঈশ্বরকে সৃষ্টিকর্তা এবং নিয়ামক বলে কেন মানব ?

উত্তর—আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করছি, প্রকৃতি জড়, না চেতন অর্থাৎ তাতে চৈতন্য আছে কি নেই ? যদি আপনি প্রকৃতিকে জ্ঞান- চৈতন্যসম্পন্ন বলে মনে করেন, তাহলে তাকেই আমি 'ঈশ্বর' বলছি। আমাদের শাস্ত্রে শক্তিকেও ঈশ্বর বলে বর্ণনা করা হয়েছে। অতএব আপনার এবং আমার মেনে নেওয়াতে মাত্র শব্দের প্রভেদ, আসল তত্ত্বে কোনো ভেদ নেই। আর যদি মনে করেন প্রকৃতি জড় পদার্থ, তাহলে জড় প্রকৃতির দ্বারা জ্ঞানপূর্বক ক্রিয়া কখনও হওয়া সম্ভব নয়। প্রাণী সৃষ্টি, তাদের শুভাশুভ কর্মের ফল দেওয়া ইত্যাদি কর্ম জড় প্রকৃতির দ্বারা কখনও সম্ভব নয়। কারণ জ্ঞানপূর্বক ক্রিয়া ছাড়া জগতের প্রাণীদের সুচারুভাবে সঞ্চালন হতে পারে না। জড়প্রকৃতিতে পরিবর্তন হতে পারে, কিন্তু তাতে জ্ঞানপূর্বক কর্ম সম্পাদনের শক্তি নেই। সেইজন্য 'ভগবান আছেন'— তা মানতেই হবে।

এক পক্ষ বলছেন 'ঈশ্বর নেই', দ্বিতীয় পক্ষ বলছেন 'ঈশ্বর আছেন'। যদি 'ঈশ্বর নেই'—একথাই সত্য বলে প্রমাণিত হয়, তাহলেও আস্তিক এবং নাস্তিক দুই পক্ষই সমান ভাবে থাকবে অর্থাৎ যাঁরা ঈশ্বর মানেন তাঁদের কোন ক্ষতি হবে না। কিন্তু যদি 'ঈশ্বর আছেন'—এই কথাই সত্য বলে প্রমাণিত হয়, তবে যাঁরা ঈশ্বর মানেন তাঁদের ঈশ্বর প্রাপ্তি হবে এবং ঈশ্বরকে যাঁরা মানেন না তাঁরা রিক্ত থেকে যাবেন। সুতরাং 'ঈশ্বর আছেন' এরূপ স্বীকার করাই সকলের পক্ষে লাভজনক। কিন্তু শুধু ঈশ্বরকে মেনে সন্তুষ্ট হলেই চলবে না, তাঁকে লাভ করতে হবে ; কারণ, তাঁকে পাবার সামর্থ্য সকল মানুষেরই আছে।

প্রাপ্তিযোগ্য কোন বস্তু থাকলে তবেই তার সম্বন্ধে বিধিনিষেধ বাক্য প্রযোজ্য হয়—'প্রাপ্তৌ সত্যাং নিষেধঃ'। এ কথা কেউ বলা প্রয়োজন মনে করে না যে, 'ঘোড়ার ডিম হয় না'। কারণ যা হতেই পারে না তার প্রসঙ্গে নিষেধ করাই অবাস্তব। তেমনি যদি ঈশ্বর না-ই থাকেন তাহলে— 'ঈশ্বর নেই'—একথা বলার মানেই হয় না। সুতরাং 'ঈশ্বর নেই' বলাতেই প্রমাণিত হয় যে তিনি আছেন।

যে ব্যক্তি ইংরাজী ভাষার অস্তিত্ব মানেন, তিনিই তা শেখবার চেষ্টা করতে পারেন, পড়াশুনা করে ইংরাজী ভাষা আয়ত্ত করতে পারেন। কিন্তু যাঁরা ইংরাজী ভাষার অস্তিত্বই স্বীকার করেন না, তাঁরা তা শেখবার প্রয়াস কেন করবেন ? যেমন, কারোর যদি ইংরাজীতে 'তার' (টেলিগ্রাম) আসে, সে ইংরাজী জানা ব্যক্তির দ্বারা তার মর্মোদ্ধার করে জানতে পারে যে তার কেউ খুব অসুস্থ এবং সেস্থানে গিয়ে সত্যই সে যদি জানতে পারে লোকটি ঠিকই অসুস্থ ছিল তখন তাকে বিশ্বাস করতেই হয় যে তারটি যখন ইংরাজী ভাষাতে লেখা তখন ইংরাজী ভাষা যথার্থই আছে। যে ব্যক্তি ঈশ্বর প্রাপ্তির জন্য সত্যি সত্যি আগ্রহী তাঁর সঙ্গে সাধারণ ব্যক্তির (যাঁরা ঈশ্বর লাভের জন্য সচেষ্ট নন) অনেক পার্থক্য দেখা যায়। তাঁর সঙ্গ করলে, কথা শুনলে মনে শান্তি পাওয়া যায়। শুধু মানুষের নয়, বস্তুতঃ পশুপক্ষী ইত্যাদিও তাঁর কাছে গেলে শান্তি পায়। যাঁর ঈশ্বরপ্রাপ্তি ঘটেছে তাঁর মধ্যে অনেক বিশেষ লক্ষণ দেখা যায়, যা কিনা সাধারণ মানুষের থাকে না। ঈশ্বর না থাকলে তাঁদের মধ্যে এই বিশেষ লক্ষণ কোথা থেকে আসে ? সুতরাং মানতেই হবে যে ঈশ্বর আছেন।

মনুষ্যমাত্রই নিজের মধ্যে কিছু অপূর্ণতা, শূন্যতা অনুভব করে। এই অপূর্ণতাকে পূর্ণ করার যদি কোন কিছু না থাকত, তাহলে মানুষ এই অপূর্ণতা অনুভবই করত না। যেমন মানুষের খিদে পেলে প্রমাণিত হয় যে খাবার বস্তু কিছু আছে। যদি খাদ্যবস্তু না থাকত, তাহলে মানুষের খিদে পেত না। পিপাসা পেলে প্রমাণিত হয় পানীয় বস্তু কিছু আছে, পানীয় না থাকলে মানুষ পিপাসা অনুভব করত না। সেভাবেই মানুষের অপূর্ণতা অনুভব হলে প্রমাণিত হয় যে, সেটি পূর্ণ করার মতো কোন কিছু আছে। যদি না পূর্ণতত্ত্ব থাকত তাহলে মানুষ অপূর্ণতা অনুভব করত না। এই পূর্ণতত্ত্বকেই ঈশ্বর বলা হয়।

কোন বস্তু থাকলে সেটি পাবার ইচ্ছা হয়। যে বস্তু নেই, সেটি পাবার ইচ্ছাও হয় না। যেমন কারো কখনও আকাশের ফল খেতে বা আকাশের ফুলের আঘ্রাণ নিতে ইচ্ছা করবে না ; কারণ, আকাশে ফল বা ফুল হয়ই না। মানুষমাত্রেরই এই ইচ্ছা হয় যে 'আমি যেন চিরজীবী হই (কখনও না মরি)', 'সমস্ত কিছুর জ্ঞান প্রাপ্ত হই (যেন অজ্ঞান না থাকি)', এবং 'সদা সুখী হই (কখনও দুঃখ যেন না পাই)'। আমি 'চিরকাল জীবিত থাকি'— এই হল 'সৎ'-এর ইচ্ছা, 'সকল জ্ঞান প্রাপ্ত হই'— এ হচ্ছে

'চিৎ'-এর ইচ্ছা, 'সদা সুখে থাকি'—এই হচ্ছে 'আনন্দের' ইচ্ছা। এর দ্বারা প্রমাণিত হয়, যে সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ বলে এমন কিছু আছে যা পাবার ইচ্ছা সকল মানুষের মধ্যেই আছে। এই তত্ত্বকেই ঈশ্বর বলা হয়।

কোনো মানুষ যখন অন্য মানুষকে নিজের চেয়ে বড় বলে মেনে নেয়, তাতে আসলে সে ঈশ্বরবাদকেই স্বীকার করছে বোঝায়। কেননা এই বড় হওয়ার পরম্পরা যেখানে পৌঁছায়, সেটিকেই ঈশ্বর বলে। **'পূর্বেষামপি গুরুঃ কালেনানবচ্ছেদাৎ।'** (পাতঞ্জল যোগদর্শন ১।২৬)। কোন মানুষ থাকলেই তার একজন বাবাও থাকবেন এবং তাঁর বাবারও একজন বাবা থাকবেন। এই পরম্পরা যেখানে সমাপ্ত হয়, তারই নাম ঈশ্বর—**'পিতাসি লোকস্য চরাচরস্য'** (১১।৪৩)। একজন বলশালী থাকলে বুঝতে হবে, তার চেয়েও একজন বেশী বলশালী আছেন। এই উত্তরোত্তর যেখানে গিয়ে সমাপ্ত হয়, তারই নাম ঈশ্বর, কেননা তাঁর তুল্য বলশালী কেউ নেই। কেউ বিদ্বান হলে, তাঁর চেয়েও বেশী বিদ্বান আর কেউ থাকবেন। এই বিদ্যাবত্তার যেখানে সমাপ্তি তিনিই ঈশ্বর, কারণ তাঁর সমান বিদ্বান কেউ নেই—**'গুরুর্গরীয়ান্'** (১১।৪৩)। এর তাৎপর্য হচ্ছে যে বল, বুদ্ধি, বিদ্যা, যোগ্যতা, ঐশ্বর্য, শোভা ইত্যাদি গুণগুলির যেটি শেষ সীমা, অর্থাৎ পূর্ণতা, তাকেই ঈশ্বর বলা হয়; কেননা তাঁর সমকক্ষ আর কেউ নেই,—**'ন ত্বৎসমোঽস্ত্যভ্যধিকঃ কুতোঽন্যঃ'** (১১।৪৩)।

বস্তুতঃ ঈশ্বর মেনে নেবারই বিষয়, বিচার করবার বিষয় নয়। বিচার্য বিষয় সেটাই হতে পারে যাতে জিজ্ঞাসা থাকে এবং জিজ্ঞাসা সে বিষয়েই হতে পারে যার সম্বন্ধে আমাদের কিছুটা জানা আর কিছু অজানা। কিন্তু যাঁর সম্বন্ধে আমরা কিছুই জানি না, তাঁর বিষয়ে জিজ্ঞাসা বা বিচার করা যায় না। তাঁকে আমরা মানি বা না মানি এ ব্যাপারে আমরা স্বতন্ত্র বা স্বাধীন। এই জগৎ-সংসার দৃষ্টিগোচর হলেও এর আসল তত্ত্ব কি তা আমরা জানি না; অতএব জগৎ-সংসার বিচার করে বোঝার বিষয়। তেমনি জীবাত্মা স্থাবর বা জঙ্গমরূপে শরীরধারীরূপে দৃষ্টিগোচর হয়ে থাকেন। কিন্তু জীবাত্মা আসলে কি তা আমরা জানি না, অতএব জীবাত্মাও বিচার করে বোঝার বিষয়। কিন্তু ঈশ্বর সম্বন্ধে আমরা কিছুই জানি না, সুতরাং ঈশ্বর বিচার বা তর্কের বিষয় নয়, বস্তুতঃ তিনি শ্রদ্ধা এবং মান্য করারই বিষয়। শাস্ত্রের দ্বারা অথবা তত্ত্বদর্শী বা ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করেছেন এমন সাধু ও মহাপুরুষের কাছে শুনেই ঈশ্বর আছেন বলে বিশ্বাস করা হয়। শাস্ত্র এবং সাধু দুই-ই বিশ্বাস করার বিষয়। যেমন বেদ ও পুরাণ ইত্যাদিতে হিন্দুদের বিশ্বাস আছে কিন্তু মুসলমানদের নেই, তেমনি সাধু মহাপুরুষদেরও কেউ মান্য করেন, কেউ করেন না; বস্তুতঃ তাঁদের সাধারণ মানুষ বলে মনে করেন।

প্রশ্ন—ঈশ্বর না মেনেও কি মানুষ উদ্ধার পেতে পারে, সংসার-বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারে?

উত্তর—হ্যাঁ, হতে পারে। এমন সম্প্রদায়ও আছে, যারা ঈশ্বর মানে না, সেই সমস্ত সম্প্রদায়ের নীতি-নির্দেশগুলি তৎপরতার সঙ্গে পালন করলে মানুষ সংসার থেকে মুক্ত হয়। সাংসারিক দুঃখ কষ্ট থেকে মুক্তি পেতে পারে। কিন্তু ভগবৎপ্রেমে মানুষ যে ক্রমবর্ধমান পরমানন্দ অনুক্ষণ অনুভব করে সেই প্রাপ্তি তাদের হয় না। তবে যদি তাদের ঈশ্বরের প্রতি কোন বিরোধ বা দ্বেষ বা মতান্তর না থাকে তাহলে তাদের ভগবৎ-প্রেম প্রাপ্তি হতে পারে, তা তারা ঈশ্বর মানুক বা না মানুক। বক্তব্য এই যে, নিজের সিদ্ধান্তের প্রতি অনুরাগ আছে এবং অপরের সিদ্ধান্তে বিরোধ না করে যিনি নিরপেক্ষ থাকেন, মুক্তির পর ভগবানের প্রতি তাঁর প্রেম জাগ্রত হতে পারে। মানুষ ভগবানকে স্বীকার করলেই যে তিনি তত্ত্বজ্ঞান করাবেন নচেৎ নয়, এমন নয়।

বাস্তবে উৎপত্তি ও বিনাশশীল পদার্থের প্রতি আকর্ষণই মুক্তির পথে প্রধান বাধা। মানুষ যদি এই উৎপত্তি ও বিনাশশীল পদার্থে সর্বতোভাবে মমতাহীন এবং রাগ-রহিত হয় তাহলে সে মুক্ত হবে অর্থাৎ তার পরাধীনতা ঘুচবে।

প্রশ্ন—গীতায় ঈশ্বরকে কতরূপে বর্ণনা করা হয়েছে?

উত্তর—গীতায় ঈশ্বরকে তিনটি রূপে বর্ণনা করা হয়েছে, সগুণ-সাকার, সগুণ-নিরাকার এবং নির্গুণ-নিরাকার। তাৎপর্য এই যে, ঈশ্বরকে যদি 'সগুণ' ও 'নির্গুণ' বলে মেনে নেওয়া হয় তাহলে 'সগুণ'-এর দুটি ভেদ হয়—'সগুণ-সাকার' এবং 'সগুণ-নিরাকার' কিন্তু নির্গুণের একটিই ভেদ—'নির্গুণ-নিরাকার।' যদি ঈশ্বরকে 'সাকার-নিরাকার' বলে মানা হয় তবে

'সাকার'-এর একটি প্রকার হয় 'সগুণ-সাকার', তথা নিরাকার-এর দুটি প্রকার হয় 'সগুণ-নিরাকার' এবং 'নির্গুণ-নিরাকার'। গীতায় সপ্তম অধ্যায়ে উনত্রিংশ-ত্রিংশ শ্লোকগুলিতে, অষ্টম অধ্যায়ের অষ্টম শ্লোক থেকে যোড়শ শ্লোক পর্যন্ত এবং একাদশ অধ্যায়ের অষ্টাদশ শ্লোকে ঈশ্বরের সগুণ-সাকার, সগুণ-নিরাকার এবং নির্গুণ-নিরাকার—এই তিনরূপের বর্ণনা করা হয়েছে।

প্রশ্ন—কিছু ব্যক্তি ঈশ্বরকে মায়াময় বলে মানেন। তাঁরা মনে করেন যে নির্গুণ-নিরাকার ব্রহ্মই একমাত্র মায়ারহিত, ঈশ্বর তো মায়াদ্বারা যুক্ত। এইরূপ মনে করা কতদূর যুক্তিযুক্ত ?

উত্তর—গীতা এইরূপ মনে করেন না। গীতা ঈশ্বরকে মায়ার অধিপতি বলে মানেন। মায়া ঈশ্বরের বশেই থাকেন। ভগবান বলেছেন, 'আমি নিজ প্রকৃতিকে বশে এনে নিজ যোগমায়া দ্বারা প্রকট হই' (৪।৬)। আসল বক্তব্য এই যে, যে সকল জীব মায়া দ্বারা আবদ্ধ, তাদের শিক্ষার জন্য ঈশ্বর এই মায়াকে স্বীকার করে নিজ ইচ্ছায় অবতাররূপ গ্রহণ করেন। যেমন, যে ইংরেজ হিন্দী ভাষা জানে না তাকে হিন্দী ভাষা বোঝাতে হিন্দী এবং ইংরাজি জানা এমন ব্যক্তির প্রয়োজন যিনি তাকে ইংরাজিতে বোঝাতে পারেন। কিন্তু সেই ব্যক্তি, যিনি ইংরাজিতে তর্জমা করে দেন, তিনি ইংরেজের অধীন বা আশ্রিত নন। কেন না তিনি অপরকে বোঝাবার জন্য এই কাজ করছেন, নিজের জন্য তাঁর ইংরাজি জানার কোন প্রয়োজন নেই। এইরূপ মায়াবদ্ধ জীবের জন্য, তাদের শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে ঈশ্বর প্রকৃতিকে বশীভূত করে অবতাররূপে জীবের মধ্যে আবির্ভূত হন।

ঈশ্বর মায়ার অধিপতি বা মালিক একথা তিনি গীতায় স্পষ্টভাবে বার বার বলেছেন—যেমন ঈশ্বর জীবজগতের অধিপতি হয়েও অবতাররূপ গ্রহণ করেন (৪।৬), ঈশ্বর গুণ এবং কর্ম অনুসারে চার বর্ণের সৃষ্টি করেছেন (৪।১৩) ; যে ব্যক্তি সকাম ভাবে দেবতার উপাসনা করেন, তাঁর ফল দানের ব্যবস্থা ঈশ্বরই করেন (৭।২২), মহাপ্রলয়ে সমস্ত জীবজগৎ প্রকৃতিতে লীন হয়ে যায় এবং পুনরায় মহাসর্গ বা কল্পের সুরুতে ঈশ্বর তাদের সৃষ্টি করেন (৯।৭-৮)। সমস্ত প্রজাতিতে যত জীব জন্মগ্রহণ করে প্রকৃতি তাদের মায়ের মত এবং ঈশ্বর তাদের পিতার মত (১৪।৩-৪), ঈশ্বর সকল প্রাণীর হৃদয়ে অবস্থান করেন এবং তাদের নিজ নিজ স্বভাব অনুযায়ী পরিভ্রমণ করান (১৮।৬১)। যেমন স্বর্ণকার যন্ত্রপাতির দ্বারা গহনা তৈরী করেন কিন্তু তিনি নিজে সেই সব যন্ত্রের অধীন নন্, কেননা তিনি গহনা তৈরী করার উদ্দেশ্যেই যন্ত্রপাতি ব্যবহার করেন, তেমনি ঈশ্বর জগৎ-সংসার সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যেই এই প্রকৃতিকে স্বীকার করেন।

যে নিজে বদ্ধ সে অপরকে বন্ধন মুক্ত করবে কি করে ? তা সে করতেই পারে না। জীব স্বয়ং বদ্ধ হয়ে আছে, সুতরাং সে কি করে অপরকে বন্ধন থেকে মুক্ত করবে ? কিন্তু ঈশ্বর বন্ধনবিরহিত, অতএব (জীব যদি চায় তাহলে) জীবকে বন্ধন এবং পাপ থেকে মুক্ত করতে একমাত্র তিনিই পারেন (১৮।৬৬)। মায়ার বন্ধনে আবদ্ধ জীবের উপাসনা করে উপাসক বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারে না, কিন্তু ঈশ্বরের উপাসনা করলে বন্ধন থেকে মুক্ত হয়, তাৎপর্য এই যে, ঈশ্বর কখনও জীব হন না এবং জীবও কখনও ঈশ্বর হয় না। হ্যাঁ, অনন্যভক্তি দ্বারা জীব ঈশ্বরের সঙ্গে অভিন্ন হতে পারে, ঈশ্বরে লীন হতে পারে কিন্তু ঈশ্বর হতে পারে না।

প্রশ্ন—ঈশ্বরের নমুনা কি ?

উত্তর—ঈশ্বরের নমুনা জীবাত্মা, কেননা ঈশ্বর নিত্য ও নির্বিকার এবং জীবাত্মাও নিত্য এবং নির্বিকার। কিন্তু জীবাত্মা প্রকৃতির বশ হয় আর ঈশ্বর কখনও প্রকৃতির বশ হন নি এবং হবেনও না।

সকলেরই 'আমি আছি' নিজের এই সত্তার অনুভূতি হয়। তাদের কখনও সন্দেহ হয় না যে, 'আমি আছি, না নেই' ; বা কখনও পরীক্ষা করে দেখে না অথবা নিজের অস্তিত্বের অভাবও অনুভব করে না। শরীর আগেও ছিল না, পরেও থাকবে না, কিন্তু নিজ অস্তিত্বের উপর নজর দিলে এমন অনুভূতি হয় না যে, 'আমি ছিলাম না।' হ্যাঁ, এই বিষয়ে 'জানা নেই' এরূপ বলা গেলেও 'আমি ছিলাম না'—এরূপ বলা যায় না। কেননা নিজের অস্তিত্ব কখনও ছিল না এই অভাবাত্মক অনুভূতি কারোরই হয় না। বর্তমানেও শরীর প্রতিক্ষণেই ক্ষয় হচ্ছে, মৃত্যুর পথে এগিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু 'আমি ফুরিয়ে যাচ্ছি'—এরকম কেউ অনুভব করে

না বরং অনুভব করে যে 'এই শরীর লয়ের দিকে এগোচ্ছে'। শরীরের অ-ভাব তিনিই অনুভব করতে পারেন যিনি নিজে ভাবরূপ। 'নেই'কে জানতে 'আছে' রূপ সত্তাই সক্ষম হতে পারে। সুতরাং এই কথাই প্রমাণিত হয় যে, শরীরের অ-ভাব বোধকারী জীবাত্মা অবশ্যই স্বয়ং ভাবরূপ তথা সৎরূপ।

দেখা শোনা এবং বোঝার যে জগৎ তা আগে ছিল না, পরে থাকবে না এবং বর্তমানে নিত্য ক্ষয়ের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। সংসার কাল যেমন ছিল আজ তেমন নেই, এমন কি এক ঘণ্টা আগে যা ছিল একঘণ্টা পরে তা আর থাকে না। অতএব জগৎ প্রতিক্ষণ ধ্বংসের পথে, ফুরিয়ে যাবার পথে এগোচ্ছে। কিন্তু যে আধারের ওপর নির্ভর করে এই সংসার বিরাজ করছে তিনি এমন এক প্রকাশক, রচয়িতা, আধার বা সর্বসমর্থ অস্তিত্ব যাঁর কখনও কোন পরিবর্তন হয় না। এই জগতে দেশ, কাল, বস্তু ব্যক্তি বা পরিস্থিতির যে সব পরিবর্তন হয় তা সবই সেই অপরিবর্তনীয় সত্তাকে অবলম্বন করে হয়। যেমন স্বচ্ছ আকাশে মেঘ ঘনায়, বৃষ্টি হওয়ার উপক্রম হয় এবং মেঘ গর্জন শোনা যায়। বিদ্যুৎ চমকায়, বৃষ্টি পড়তে থাকে, কখনও শিলাও পড়তে থাকে, তা সত্ত্বেও কিন্তু আকাশ যেমন তেমনই থাকে, আকাশের কোন পরিবর্তন হয় না। ঈশ্বর এইরূপ আকাশেরই মতো। তাঁতে জগৎ উৎপন্ন এবং লয় হওয়া, দেশ-কাল, বস্তু-ব্যক্তি, ঘটনা-পরিস্থিতির পরিবর্তন হওয়া, ইত্যাদি বিবিধ কার্যসকল হয়ে যায়, কিন্তু ঈশ্বর যেমন নির্বিকার ও পরিবর্তন-রহিত তেমনি একইরূপে থাকেন।

(৪) গীতায় শ্রীকৃষ্ণের ভগবত্তা

নরো ন যোগী ন তু কারকশ্চ নাংশাবতারো ন নয়প্রবীণঃ।
ভবাশ্রয়ত্বাচ্চ গুণাশ্রয়ত্বাৎ কৃষ্ণস্তু সাক্ষাদ্ ভগবান্ স্বয়ং হি॥

শাস্ত্রে ভগবত্তার লক্ষণ জানাতে গিয়ে বলা হয়েছে—

উৎপত্তিং প্রলয়ং চৈব ভূতানামাগতিং গতিম্।
বেত্তি বিদ্যামবিদ্যাং চ স বাচ্যো ভগবানিতি॥

(বিষ্ণুপুরাণ ৬।৫।৭৮)

'যিনি সমস্ত প্রাণিকুলের উৎপত্তি, বিনাশ এবং আগমন-নির্গমন ও বিদ্যা-অবিদ্যাকে জানেন, তিনিই ভগবান নামে অভিহিত।'

মনোযোগ সহকারে গীতার প্রতি লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, উপরি-উক্ত সমস্ত লক্ষণই ভগবান শ্রীকৃষ্ণে বিদ্যমান রয়েছে।

যেমন ভগবান গীতায় বলেছেন—'মহাসর্গের (কল্পের) প্রারম্ভে আমি নিজ প্রকৃতিকে বশ করে সমস্ত প্রাণিকুল সৃজন করে থাকি এবং মহাপ্রলয়ে সমস্ত প্রাণিজগৎ আমার প্রকৃতিতে বিলীন হয় (৯।৭-৮)। ব্রহ্মার দিবস আরম্ভে (কল্পের শুরুতে) প্রাণিজগৎ ব্রহ্মার সূক্ষ্ম-শরীর হতে জন্ম নেয় এবং ব্রহ্মার রজনী সমাগমে (প্রলয়কালে) সমস্ত প্রাণী ব্রহ্মার সূক্ষ্ম-শরীরে লীন হয় (৮।১৮-১৯)। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ প্রাণিজগতের এইরূপ উৎপত্তি ও প্রলয় বিষয়ে অবহিত থাকেন।'

ভগবান বলেছেন, 'আমি সমস্ত প্রাণীর অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ ও তাদের গতিবিধি সম্বন্ধে অবহিত আছি (৭।২৬)'। যে ব্যক্তি স্বর্গপ্রাপ্তির জন্য যজ্ঞ, দান ইত্যাদি শুভকর্ম করে স্বর্গলোকে গমন করেন তিনি সেখানে নিজ পুণ্যফল ভোগ করে পুনরায় এই পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করেন (৯।২০-২১)। শুক্ল এবং কৃষ্ণ দুটি গতি বা পথ আছে। যেসব প্রাণী শুক্লপক্ষে গত হয়, তাদের আর ফিরে আসতে হয় না এবং কৃষ্ণপক্ষে গত প্রাণীকে আবার জন্ম নিতে হয় (৮।২৬)। আসুরী স্বভাবসম্পন্ন ব্যক্তি বারংবার আসুরী জন্ম প্রাপ্ত হয় এবং পুনরায় অধমগতি অর্থাৎ ভয়ংকর নরকে গমন

করে (১৬।১৯-২০)। এইরূপে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত প্রাণীর যাতায়াত গমনাগমন সম্বন্ধে অবহিত আছেন।

অর্জুন ভগবানকে বলেছেন, 'প্রাণিকুলের গতির বিষয়ে আপনি ব্যতীত আর কেউ বলতে পারে না, আপনি প্রাণীদের গতি-বিষয়ক আমার এই সন্দেহ দূর করতে পারেন (৬।৩৯)'। অর্জুনের এই কথায় প্রমাণিত হয় যে, প্রাণীদের গতিবিধি এবং গমনাগমন সম্বন্ধে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণরূপে অবগত।

ভগবান বলেছেন, 'আমি সমস্ত প্রাণীদের মধ্যে পরিব্যাপ্ত এবং প্রাণিসকলও আমাতে স্থিত, কিন্তু আমি প্রাণিসমুদয়ে স্থিত নই বা প্রাণিসকল আমাতে নেই, অর্থাৎ সবকিছুই আমি (৯।৪-৫), এই বিদ্যাই রাজবিদ্যা।' 'আসুরী ভাবাপন্ন মূঢ় মানুষ আমার শরণাগত হয় না (৭।১৫)। এই হচ্ছে অবিদ্যা।' বিদ্যা এবং অবিদ্যাকে শ্রীকৃষ্ণ এরূপই জানেন।

সমস্ত প্রাণীর উৎপত্তি ও প্রলয়, গমনাগমন এবং বিদ্যা-অবিদ্যাকে এরূপ জানেন বলেই শ্রীকৃষ্ণ যে সাক্ষাৎ ভগবান—তা প্রমাণিত হয়।

যে মানুষ সৎ কর্ম করে সাধনা দ্বারা উচ্চাবস্থা প্রাপ্ত হন তাঁকে সকলে মহাপুরুষ বলে। যাঁরা মনে করেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ একজন মহাপুরুষ মাত্র ছিলেন, তাঁদের সে ধারণা একেবারেই ভুল। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অবতার ছিলেন। যে ব্যক্তি সাধনা দ্বারা উচ্চাবস্থা প্রাপ্ত হন তাঁকে 'উত্তার' বলে, অবতার নয়। অবতার তাঁরই নাম—যিনি নিজ স্থিতিতে স্থিত থেকেও কোন বিশেষ কার্য করার জন্য অবতরণ করেন অর্থাৎ মনুষ্যাদিরূপে আবির্ভূত হন। কোন শিক্ষক যখন কোন শিশুকে বর্ণমালা শেখান তখন তিনি 'অ, আ, ই, ঈ' ইত্যাদি স্বরবর্ণ এবং 'ক, খ, গ, ঘ' ইত্যাদি ব্যঞ্জনবর্ণ স্বয়ং উচ্চারণ করে শিশুটিকে শেখান এবং তার হাত ধরে তাকে দিয়ে লেখান। শিশুটিকে শেখাতে গিয়ে তাঁকেও বারংবার লিখতে এবং পড়তে হয়, এইসময় শিক্ষককে শিশুদের স্তরে নেমে আসতে হয়। কিন্তু শিশুদের মধ্যে অবতরণ করলেও তাঁর বিদ্যাবত্তা যেমন ছিল তেমনই থাকে। এইভাবে সাধুগণের রক্ষা ও দুষ্টের বিনাশ এবং ধর্ম স্থাপনের উদ্দেশ্যেই তিনি অজ(জন্মরহিত) হয়েও জন্মগ্রহণ করেন, অবিনাশী হয়েও বিনাশী (অপ্রকট) হন এবং সমস্ত প্রাণীর প্রভু বা ঈশ্বর হয়েও মাতাপিতার আজ্ঞাকারী সন্তানরূপে জন্মগ্রহণ করেন (৪।৬)। অবতাররূপে জন্মগ্রহণ করলেও তাঁর অজ, অবিনাশী এবং ঈশ্বর ভাব কিছুমাত্র কমে না, তিনি যেমন ছিলেন তেমনই থাকেন।

যাঁরা মনে করেন যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ একজন যোগী ছিলেন, ভগবান ছিলেন না তাঁদের ধারণা একেবারেই ভুল। তিনিই যোগী যাঁর মধ্যে যোগ থাকে। যোগের আটটি অঙ্গ, যার সর্বপ্রথম হল 'যম'। যম পাঁচপ্রকার—অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য এবং অপরিগ্রহ। অতএব যিনি যোগী তিনি সর্বদা সত্যই বলেন, যদি অসত্য বলেন, তবে তিনি যোগী পদবাচ্য নন, কারণ তিনি যোগের প্রথম অঙ্গেরও পালন করেন নি। অতএব ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে যোগী মেনে নিলে তাঁকে ভগবান বলেও মানতে হবে। কেননা গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্থানে স্থানে নিজেকে ভগবান বলে ব্যক্ত করেছেন ; যেমন—

'আমি সমস্ত প্রাণীর ঈশ্বর হয়েও অবতাররূপে আবির্ভূত হই (৪।৬)। আমি সমস্ত প্রাণীর হৃদয়ে অধিষ্ঠিত (১৫।১৫)। যে সকল ব্যক্তি স্বদেহে ও পরদেহে অবস্থিত আত্মরূপী ঈশ্বরকে দ্বেষ করেন তাদের আমি আসুরী যোনিতে নিক্ষেপ করি (১৬।১৮-১৯)। যে সমস্ত অশ্রদ্ধাসম্পন্ন ব্যক্তি দম্ভ, অহংকার, কামনা, আসক্তি এবং বলগর্বিত হয়ে শাস্ত্রবিধিবিরুদ্ধ কঠোর তপস্যা করেন, তারা নিজ পঞ্চভূতবিশিষ্ট দেহ তথা অন্তঃকরণে স্থিত আমাকেও কষ্ট দেন (১৭।৫-৬)।'

অন্বয়-ব্যতিরেকেও নিজ ঈশ্বরত্ব বর্ণনা করে ভগবান বলেছেন, 'যিনি আমাকে সর্বলোকের মহান ঈশ্বর বলে মানেন, তিনি পরমা শান্তি লাভ করেন (৫।২৯), যিনি আমাকে অজ, অবিনাশী, মহান ঈশ্বর বলে মানেন তিনি মোহ ও সকল পাপ হতে মুক্ত হন (১০।৩)। কিন্তু আমার ঈশ্বর ভাব না জেনে যারা আমাকে মানুষ ভেবে অবহেলা করে তারা মূঢ় (মূর্খ) (৯।১১)। যারা আমাকে সমস্ত যজ্ঞের ভোক্তা তথা সমস্ত জগৎ সংসারের অধীশ্বর বলে মানে না, তাদের পতন অনিবার্য (৯।২৪)।'

যে জ্ঞেয়-তত্ত্বকে জানলে অমরত্ব প্রাপ্তি হয় (১৩।১২), আমিই সেই জ্ঞেয়-তত্ত্ব ; কারণ সমস্ত বেদ দ্বারা জ্ঞাতব্য যে তত্ত্ব তা আমিই (১৫।১৫)। আমি এই

জগৎ-সংসারের সৃষ্টিকর্তা। আমি এই জগৎ-সংসার রচনা করি। আমি ব্যতীত এই সৃষ্টির রচনাকারী আর কেউ নেই। এই জগতে আমিই ওতপ্রোত হয়ে আছি (৭।৬-৭)। সাত্ত্বিক, রাজসিক এবং তামসিক ভাব (ক্রিয়া, পদার্থ ইত্যাদি) আমা হতেই জাত (৭।১২)। প্রাণিগণের বুদ্ধি, জ্ঞান, মোহহীনতা ইত্যাদি ভাব আমা হতেই উৎপন্ন হয় (১০।৪-৫)। চর-অচর, স্থাবর-জঙ্গমে এমন কোন বস্তু বা প্রাণী নেই যা আমার সঙ্গে সম্বন্ধ-রহিত (১০।৩৯)। এই সমস্ত জগৎ আমার একাংশেই স্থিত (১০।৪২)।

আমি নিজ প্রকৃতিকে বশীভূত করে এই জগৎ সৃষ্টি করি (৯।৮), আমার অধিষ্ঠানবশতঃই অর্থাৎ আমার সত্তা থেকে জীবনীশক্তি পেয়ে প্রকৃতি এই জগৎ চরাচরের সৃষ্টি করে (৯।১০)।

দশম অধ্যায়ের বিংশ শ্লোক থেকে অষ্টত্রিংশ শ্লোক পর্যন্ত ভগবান নিজ বিভূতির প্রকাশ করেছেন। আবার একাদশ অধ্যায়ে অর্জুনকে দিব্যদৃষ্টি দিয়ে তাঁর অব্যয়, অবিনাশী, দিব্য, বিরাট-রূপ দেখিয়েছেন। এই অত্যুগ্র বিরাটরূপ দেখে অর্জুন ভীত হলে ভগবান তাঁর চতুর্ভুজ রূপ দেখিয়ে অর্জুনকে সান্ত্বনা প্রদান করেন এবং পরে আবার দ্বিভুজরূপে ফিরে আসেন ইত্যাদি। এর তাৎপর্য এই যে শ্রীকৃষ্ণ যদি যোগী হন তাহলে তিনি সত্য বলেন, এবং যদি সত্য বলেন তাহলে তিনি ঈশ্বর, কেননা শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং নিজেকে ঈশ্বর বলেছেন। অতএব যিনি শ্রীকৃষ্ণকে যোগী বলে মানেন, তাঁকে 'শ্রীকৃষ্ণই ঈশ্বর'—একথা মানতেই হবে।

(৫) গীতায় অবতারবাদ

সর্বাগমেষু যে প্রোক্তা অবতারা জগৎপ্রভোঃ।
তদ্রহস্যং হি গীতায়াং কৃষ্ণেন কথিতং স্বয়ম্ ॥

যিনি নিজ স্থিতি থেকে নিম্নে অবতরণ করেন তাঁকে 'অবতার' বলা হয়। যেমন কোন শিক্ষক কোন বালককে পড়াবার সময় তার সমকক্ষ হয়ে পড়াতে থাকেন, অর্থাৎ তিনি নিজে 'ক, খ, গ, ঘ' ইত্যাদি অক্ষর উচ্চারণ করে বালককে উচ্চারণ শেখান এবং হাত ধরে তাকে অক্ষরগুলি লিখতে শেখান, এটি হল সেই বালকের কাছে শিক্ষকের অবতার অর্থাৎ অবতরণ। গুরুও যেমন নিজ শিষ্যের সম-স্থিতিতে এসে অর্থাৎ শিষ্য যাতে বুঝতে পারে, এমনভাবে তার যোগ্যতা অনুসারে উপদেশ দেন, তেমনি ভগবান মানুষকে ঠিকমত ব্যবহার এবং পারমার্থিক শিক্ষা দেবার জন্য মানুষের সম-স্থিতিতে আসেন, অবতাররূপ ধারণ করেন।

ভগবান সাধারণ মানুষের মতো জন্মান না। জন্ম না নিলেও তিনি জন্মের লীলা করেন, অর্থাৎ মাতৃগর্ভেই আসেন, কিন্তু মানুষের মতো গর্ভে প্রবিষ্ট হন না। যখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দেবকীর আশ্রয় নিলেন, তখন প্রথমে তিনি বসুদেবের মনে উদয় হলেন ও চক্ষু দ্বারা দেবকীর মধ্যে প্রবিষ্ট হলেন এবং দেবকী মনের দ্বারা তাঁকে ধারণ করলেন।[১] গীতায় ভগবান বলেছেন—'আমি অজ (জন্মরহিত) হওয়া সত্ত্বেও জন্মগ্রহণ করি, অর্থাৎ আমার

---

[১]ততো জগন্মঙ্গলমচ্যুতাংশং সমাহিতং শূরসুতেন দেবী। দধার সর্বাত্মকমাত্মভূতং কাষ্ঠা যথাঽঽনন্দকরং মনস্তঃ ॥
(শ্রীমদ্ভাগবত ১০।২।১৮)

'...যথা দীক্ষাকালে গুরুঃ শিষ্যায় ধ্যানমুপদিশতি শিষ্যশ্চ ধ্যানোক্তাং মূর্তিং হৃদি নিবেশয়তি তথা বসুদেবো দেবকীদৃষ্টৌ স্বদৃষ্টিং নিদধৌ। দৃষ্টিদ্বারা চ হরিঃ সংক্রামন্ দেবকীগর্ভে আবির্বভূব। এতেন রেতোরূপেণাধানং নিরস্তম্।' (অন্বিতার্থ-প্রকাশিকা)

জন্মরহিত স্বভাব যেমন তেমনি থাকে। আমি অব্যয় (স্বরূপে নিত্য) আত্মা হয়েও অন্তর্ধান হই অর্থাৎ আমার তাতে নিত্য-প্রকাশিত স্বভাবের কিছুমাত্র হানি হয় না। আমি সমস্ত প্রাণিকুলের, সমস্ত জগৎ-সংসারের ঈশ্বর বা প্রভু হওয়া সত্ত্বেও অবতাররূপে মাতাপিতার আজ্ঞা পালন করি, তাতে আমার ঈশ্বরত্ব বা ঐশ্বর্য কিছুমাত্র কমে না। মানুষ নিজ-স্বভাবের বশ হয়ে জন্মগ্রহণ করে কিন্তু আমি আমার স্বভাবকে বা প্রকৃতিকে বশ করে স্বাধীনভাবে স্বেচ্ছায় অবতার রূপে জন্মগ্রহণ করি (৪।৬)।'

ভগবান নিজের অবতারত্ব গ্রহণের কাল চিহ্নিত করতে গিয়ে বলেছেন, 'যখন ধর্ম হ্রাস পেয়ে অধর্ম বর্ধিত হয়ে ওঠে তখনি আমি অবতারূপে জন্মগ্রহণ করি, জগতে প্রকাশিত হই' (৪।৭)। নিজের অবতরণের প্রয়োজন জানাতে গিয়ে বলেছেন, 'ভক্তদের এবং তাদের ভাব রক্ষার জন্য, অন্যায়-অত্যাচারকারী দুষ্টদের দমনের জন্য, ধর্মের সংস্থাপন বা দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠা এবং ধর্মের পুনরুত্থানের জন্য আমি যুগে যুগে অবতাররূপে জন্ম নিই, অবতার গ্রহণ করি (৪।৮)। এইরূপ জন্মরহিত অবিনাশী এবং ঈশ্বররূপ আমার মহেশ্বর পরমভাবকে না জেনে যেসব মানুষ আমাকে অবহেলা করে, তিরস্কার করে, তারা মূর্খ। এইসব মূর্খ, মূঢ় ব্যক্তি আসুরী, রাক্ষসী এবং মোহিনী প্রকৃতির বশবর্তী হয়ে যা কিছু আশা করে, যা কিছু শুভকর্ম করে, যে বিদ্যা আহরণ করে, তা সমস্তই ব্যর্থ হয়ে যায় অর্থাৎ তাতে কোনও সৎ ফল পাওয়া যায় না (৯।১১-১২)। যে মানুষ আমার সর্বশ্রেষ্ঠ অবিনাশী পরম ভাবকে না জেনে অব্যক্ত পরমাত্মাকে জন্ম-মৃত্যু চক্রে আবদ্ধ বলে মনে করে, সে ব্যক্তি বুদ্ধিহীন। এইরূপ ব্যক্তির নিকট আমি আমার আসলরূপে প্রকাশিত হই না (৭।২৪-২৫)।'

নাটকের সময় কেউ সঙ্ সাজলে তখন সে অন্যদের কাছে তার আসল পরিচয় দেয় না। কারণ সে তার আসল পরিচয় দিয়ে দিলে খেলাই পণ্ড হয়ে যাবে। এইরূপ ভগবান যখন অবতার হয়ে আসেন তখন সকলের কাছে নিজের আসল রূপ প্রকাশিত করেন না, সকলকে নিজ পরিচয়ও দেন না, —'নাহং প্রকাশঃ সর্বস্য' (৭।২৫)। কেননা নিজ পরিচয় দিয়ে দিলে আর লীলা করতে পারবেন না। যেমন নাটকের সময় ভয়ংকর রূপের কোন সঙ্কে দেখলে তার আত্মীয়স্বজনও চিনতে পারে না, ভয় পায়। তখন সঙ্ সাজা লোকটি কিন্তু নিজের প্রিয়জনকে সঙ্কেতে নিজ পরিচয় দিয়ে বলে, 'অরে! তুই ভয় পাসনি, আমি তো সে-ই।' তেমনি ভগবানের অবতার-দেহ দেখে কোন ভক্ত ভয় পেলে ভগবান তাকে নিজ পরিচয় দিয়ে বলেন, 'ভাই! ভয় পেয়ো না, আমিই তো সে-ই।'

দুই বন্ধু ছিল। একজন বাজারে গিয়ে দোকান খুলল এবং জিনিসপত্র সাজাল, যাতে খরিদ্দার জিনিসপত্র দেখে কিনতে পারে। অন্যজন পুলিশের বেশ ধারণ করে তার কাছে গিয়ে তাকে খুব ধমক দিতে লাগল। 'আরে! তুই এই রাস্তার ওপর কেন দোকান খুলেছিস, শিগ্গির সব ওঠা, নাহলে তোর নামে নালিশ পাঠাচ্ছি।' তার কথায় সেই দোকানদার বন্ধুটি ভয় পেয়ে দোকান গোটাতে লাগল। তার এই ভীত ভাব দেখে পুলিশ সাজা বন্ধুটি বলল, 'আরে! তুই ভয় পাস্‌নি, আমি তোর সেই বন্ধু।' এইরূপ অর্জুনের সামনে ভগবান যখন বিরাটরূপে প্রকটিত হলেন, তখন অর্জুন ভয় পেয়েছিলেন। তখন ভগবান নিজের সত্য পরিচয় দিয়ে অর্জুনকে সান্ত্বনা জানালেন।

এখানে মানুষের মনে একটি প্রশ্ন উঠতে পারে, বর্তমানে ধর্ম লোপ পাচ্ছে এবং অধর্ম বেড়ে যাচ্ছে এবং উন্নতমনা পুরুষেরাও দুঃখ পাচ্ছেন, তবুও ভগবান কেন অবতাররূপে জন্মগ্রহণ করছেন না! এর উত্তর হচ্ছে যে, এখনও ভগবানের অবতরণের সময় হয় নি। কারণ শাস্ত্রে, কলিযুগে যেরূপ অধঃপতনের কথা বলা আছে, তার থেকেও বেশী অধঃপতন যদি হয় তবেই ভগবান অবতার- দেহ ধারণ করেন। এখনও সেই সময় হয় নি। ত্রেতাযুগে রাক্ষসেরা ঋষি-মুনিদের মেরে খেয়ে হাড়ের পাহাড় তৈরী করেছিল, তবেই ভগবান অবতরণ করেছিলেন। বর্তমান কলিযুগে দেখা যায় যে, সেইরূপ অত্যাচার-অনাচার এখনও হয় নি। ধর্ম যদি সামান্য মাত্রায় হ্রাস পায়, ভগবান আধিকারিক পুরুষদের পাঠিয়ে তা ঠিকমতো চালাবার ব্যবস্থা করেন অথবা স্থানে স্থানে সাধু-মহাত্মা প্রকটিত হয়ে তাঁদের আচরণ এবং ভাষণ দ্বারা মানুষকে সঠিক পথে পরিচালনা করেন।

একভাবে দেখতে গেলে ভগবানের অবতার নিত্য। এই জগৎ-সংসার ভগবানেরই অবতার-রূপ।

সাধকগণের কাছে সাধ্য এবং সাধনরূপেই ভগবান অবতীর্ণ। ভক্তদের জন্য ভক্তিরূপে, জ্ঞানযোগিগণের কাছে জ্ঞেয়রূপে, কর্মযোগিগণের কাছে কর্তব্যরূপে ভগবানই অবতার! ক্ষুধিতের কাছে অন্নরূপে, পিপাসার্তদের কাছে জলরূপে, বস্ত্রহীনদের কাছে বস্ত্ররূপে এবং রোগিগণের কাছে ঔষধরূপে তাঁরই অবতাররূপ। ভোগিগণের কাছে ভোগরূপে, লোভীদের কাছে অর্থ, বস্ত্র ইত্যাদি রূপেই তিনি অবতীর্ণ। গরমে শীতল ছায়া, শীতে উষ্ণ বস্ত্র ভগবানের অবতার রূপ। এর তাৎপর্য এই যে জড়-চেতন, স্থাবর-জঙ্গম ইত্যাদি সকল রূপই তাঁর অবতার রূপ, কেননা বাস্তবে তিনি ছাড়া দ্বিতীয় কোন কিছুর অস্তিত্বই নেই—**'বাসুদেবঃ সর্বম্'** (৭।১৯) **'সদসচ্চাহম্'** (৯।১৯)। কিন্তু যে ব্যক্তি জগৎ-সংসার রূপে প্রকটিত প্রভুকে ভোগ্য মনে করে নিজেকে তার অধিকারী ভাবে, তার পতন হয় এবং সে জন্ম-মরণ চক্রে আবর্তিত হতে থাকে।

যাঁরা মনে করেন ভগবান শুধুই নিরাকার, সাকার হন না, তাঁদের সে ধারণা একেবারেই ভুল। কেননা প্রাণিমাত্রই অব্যক্ত (নিরাকার) এবং ব্যক্ত (সাকার) হয়ে থাকে। এর অর্থ এই যে সমস্ত প্রাণী প্রথমে অব্যক্ত, মাঝে ব্যক্ত এবং শেষে আবার অব্যক্ত হয়ে যায় (২।২৮)। পৃথিবীরও দুই রূপ নিরাকার এবং সাকার। পৃথিবী তন্মাত্ররূপে নিরাকার এবং স্থূলরূপে সাকার হয়ে আছে। জল পরমাণুরূপে নিরাকার এবং মেঘ, বৃষ্টি, শিলারূপে সাকার হয়ে আছে। বায়ু নিস্পন্দরূপে নিরাকার, স্পন্দনরূপে সাকার। দিয়াশলাই, কাঠ, পাথর ইত্যাদিতে আগুন নিরাকাররূপে অবস্থিত এবং ঘর্ষণ ইত্যাদি সাধন দ্বারা সাকার রূপ ধারণ করে। এইরূপে সৃষ্টিমাত্রই নিরাকার এবং সাকার হতে থাকে। প্রলয় এবং মহাপ্রলয় কালে সৃষ্টি নিরাকার থাকে এবং কল্প ও মহাকল্পের সময়ে সাকার রূপ ধারণ করে। যদি প্রাণিকুল নিরাকার ও সাকার হতে পারে, পৃথিবী, জল ইত্যাদি মহাভূত নিরাকার ও সাকার হতে পারে, সৃষ্টিও নিরাকার-সাকার হতে পারে, তাহলে ভগবান কি নিরাকার ও সাকার হতে পারেন না? তাঁর নিরাকার ও সাকার হওয়াতে কিসের বাধা? এইজন্য ভগবান গীতায় বলেছেন, 'সমস্ত জগৎ আমার অব্যক্ত স্বরূপে ব্যাপ্ত হয়ে আছে'—**'ময়া ততমিদং সর্বং জগদব্যক্তমূর্তিনা'** (৯।৪)। এখানে ভগবান নিজেকে **'ময়া'** পদ দ্বারা ব্যক্ত বা সাকার এবং **'অব্যক্তমূর্তিনা'** বাক্য দ্বারা অব্যক্ত বা নিরাকার বলে জানিয়েছেন। সপ্তম অধ্যায়ের চতুর্বিংশ শ্লোকে ভগবান বলেছেন, 'যারা আমাকে অব্যক্ত বা নিরাকার বলেই শুধু মানে, ব্যক্ত বা সাকার বলে নয়, তারা বুদ্ধিহীন আর যারা ব্যক্ত বা সাকার বলে মনে করে, অব্যক্ত বা নিরাকার বলে নয়, তারাও বুদ্ধিহীন। কেননা এই দুই পক্ষই আমার পরম ভাবকে জানে না।'

প্রশ্ন—অবতারী ভগবানের দেহ কেমন হয়?

উত্তর—আমাদের জন্ম কর্ম অনুযায়ী হয় কিন্তু ভগবানের অবতার-দেহ ধারণ কর্মের জন্য হয় না। অতএব আমাদের শরীর যেমন মাতাপিতার রজ-বীর্যের থেকে সৃষ্ট হয়, ভগবান সেই ভাবে শরীর ধারণ করেন না। জীবনকালে ইনি সাধারণ মানুষের মতোই লীলা করেন বটে কিন্তু ইনি জন্মান না, আবির্ভূত হন **'সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া'** (৪।৬)। আমাদের আয়ু কর্ম অনুযায়ী সীমিত কিন্তু ভগবানের আয়ু সীমিত হয় না। তিনি নিজ ইচ্ছানুসারে যতদিন পৃথিবীতে প্রকটিত থাকতে চান, ততদিন থাকতে পারেন। আমাদের অজ্ঞতার জন্য অনুকূল-প্রতিকূল পরিস্থিতিতে নিজ কর্মফল ভোগ করতে হয়, কিন্তু ভগবানকে এসব ভোগ করতে হয় না, তিনি কখনও সুখী বা দুঃখী হন না।

আমাদের শরীর পঞ্চভূতের উপাদানে সৃষ্ট; কিন্তু ভগবানের অবতার-দেহ পঞ্চভূত হতে সৃষ্ট নয়। আসলে ইনি সচ্চিদানন্দময় **'সচ্চিৎসুখৈকবপুষঃ পুরুষোত্তমস্য'**; **'চিদানন্দময় দেহ তুম্হারী'** (শ্রীরামচরিতমানস ২।১২৭।৩)। 'সৎ' দ্বারা ভগবানের অবতার-দেহ সৃষ্ট হয়, 'চিৎ' দ্বারা হয় তাঁর শরীরের প্রকাশ, 'আনন্দ' দ্বারা তাঁর শরীরে আকর্ষণ ঘটে। সেই শরীর, যাঁরা ভগবান মানেন এবং মানেন না, উভয়ের কাছেই স্বতঃপ্রিয় বলে মনে হয়। সুতরাং ভগবানের শরীর মানুষের মতো কেবল হাড়, মাংস, রক্ত ইত্যাদির সমাহার নয়। কিন্তু অবতার লীলার সময় তাঁর চিন্ময় শরীর পাঞ্চভৌতিক শরীরের মতো দেখায়। ভক্তের ভাব অনুযায়ী তাঁরও খিদে পায়, পিপাসা লাগে, ঘুম পায়, তিনি গরম-ঠাণ্ডা অনুভব করেন এবং ভয়ও পান।

দেবতাদের দেহ যদিও দিব্য বলা হয়, তবু তাঁদের দেহও পাঞ্চভৌতিক। স্বর্গের দেবতাদের শরীর তেজঃ তত্ত্বপ্রধান, বায়ু দেবতার শরীর বায়ুতত্ত্ব প্রধান, বরুণ দেবতার শরীর জলতত্ত্ব প্রধান, মানুষের শরীর পৃথিবীতত্ত্ব প্রধান হয়। কিন্তু ভগবানের শরীর এইসব তত্ত্বরহিত, চিন্ময়। দেবতাদের শরীর দিব্য হলেও নিত্য নয়, তাঁরা মরণশীল। যাঁরা আজান দেবতা তাঁরা মহাপ্রলয়ে ভগবানে লীন হয়ে যান ; যাঁরা পুণ্য কর্মের ফলে স্বর্গে গিয়ে সেখানে দেবতা নামে অভিহিত হন, তাঁরা তাঁদের পুণ্যকর্ম ক্ষয় হলে পুনরায় মর্ত্যলোকে আসেন এবং জন্ম-মরণ চক্রে বাহিত হন। (ভগবানের পাপ-পুণ্য হয় না, কারও দেওয়া অভিশাপ তাঁর লাগে না, কিন্তু অভিশাপের মর্যাদা রক্ষার্থে তিনি তা স্বীকার করে নেন।)

প্রশ্ন—যোগী এবং ভগবানের সর্বজ্ঞতায় কি প্রভেদ ? কেননা যোগীও সবকিছু জানতে পারেন, আবার ভগবানও তা পারেন।

উত্তর—যিনি সাধনা দ্বারা শক্তিলাভ করেন, তাঁর সামর্থ্য ও সর্বজ্ঞতা সীমিত হয়। তিনি দূরের কোন বিষয়, কারও মনের কথা জানতে চাইলে তা জানতে পারেন। কিন্তু তা জানবার জন্য তাঁর নিজ সাধনক্ষমতা প্রয়োগ করতে হয়। ভগবানের সামর্থ্য ও সর্বজ্ঞতা অসীম। অতীত, বর্তমান বা ভবিষ্যৎকে জানবার জন্য শক্তি বিশেষ ভগবানকে প্রয়োগ করতে হয় না, তিনি স্বতঃ স্বাভাবিকভাবেই তা জানেন, কারণ তাঁর সর্বজ্ঞতা স্বতঃ ও স্বাভাবিক।

প্রশ্ন—যোগী যতদিন ইচ্ছা নিজ শরীর রক্ষা করতে পারেন। ভগবানও তাই, তাহলে দুজনের পার্থক্য কি ?

উত্তর—যোগী প্রাণায়ামের দ্বারা নিজ শরীর অনেকদিন পর্যন্ত রক্ষা করতে পারেন, কিন্তু তাঁকে প্রাণায়ামের পরাধীন হয়ে থাকতে হয়। ভগবানকে মানুষরূপে প্রকট থাকতে হলে কারও পরাধীন হতে হয় না। তিনি সদা-সর্বদা স্বাধীন। বিশেষত্ব এই যে, যোগীর শক্তি সাধনা দ্বারা লব্ধ, অতএব তা সীমিত, অপরপক্ষে ভগবানের শক্তি স্বতঃসিদ্ধ, তাই তা অসীম।

প্রশ্ন—যোগীকেও ভগবান বলা হয় এবং অবতারী ঈশ্বরকে ভগবান বলা হয়, তাহলে দুইয়ে কি প্রভেদ ?

উত্তর—ষড়ৈশ্বর্য সম্পন্ন হলে—অণিমা, মহিমা, গরিমা ইত্যাদি সিদ্ধি লাভ হলে যোগীকে ভগবান বলা হয়, কিন্তু তার দ্বারা তিনি ভগবান হয়ে যান না। কেননা তিনি ভগবানের মতো স্বাধীনভাবে সৃষ্টি-রচনা ইত্যাদি কাজ করতে পারেন না। বিশেষ তপোবল সহায়তায় বিশ্বামিত্রের মতো কিছু সৃষ্টি রচনা করতে পারলেও, তাঁর সেই শক্তি সীমিতই হয়ে থাকে এবং তাতেও তপোবলের প্রভাব থাকেই।

ভগবত্তা দুই প্রকারের—সাধনা দ্বারা সাধ্য এবং স্বতঃসিদ্ধ। যোগ ইত্যাদি সাধনা দ্বারা যে ভগবত্তা (অলৌকিক ঐশ্বর্য ইত্যাদি) প্রকাশ পায় তা সীমিত হয়, অসীম নয় ; কেননা তা আগে ছিল না, সাধনা করার পরেই এসেছে। কিন্তু ভগবানের ভগবত্তা অসীম, অনন্ত ; কারণ তা কোন উপায় দ্বারা লব্ধ নয়, তা স্বতঃসিদ্ধ।

প্রশ্ন—বেদব্যাস আদি কারক[১] পুরুষদেরও ভগবান বলা হয় এবং অবতাররূপী ঈশ্বরকেও ভগবান বলা হয়, দুইয়ের তফাৎ কি ?

উত্তর—বেদব্যাস ইত্যাদি কারক-পুরুষকে ভগবানের কলাবতার বা অংশাবতার বলা হয়। তাঁরা ভগবানের ইচ্ছাতেই এখানে অবতার শরীর ধারণ করেন। অবতার হয়ে তাঁরা ধর্মের স্থাপনা এবং সাধুগণের রক্ষার ব্যবস্থা করেন বটে কিন্তু দুষ্টের দমন করেন না। কারণ দুষ্টের বিনাশ একমাত্র ভগবানেরই কাজ, কারক পুরুষদের নয়।

আজকাল কিছু লোক কিছু বিশেষত্ব অর্জন করে নিজেকে 'ভগবান' বলে প্রচার করে এবং নামের সঙ্গে 'ভগবান' শব্দ যোগ করে নেয়, এরা সব আসলে পাষণ্ড। নিজেকে ভগবান বলে নিজের পূজা করাতে চায়, নিজ স্বার্থ সিদ্ধি করার জন্য লোক ঠকাতে চায়। মানুষের এইসব চক্রান্তে পড়ে নিজের সর্বনাশ করা উচিত নয়। এই তথাকথিত ভগবানদের থেকে দূরে থাকাই উচিত।

কোন কোন সম্প্রদায়ের লোকেরা সম্প্রদায়ের মূল আচার্য পুরুষকে শ্রদ্ধা ও ভক্তিতে অবতার বা ভগবান বলে

[১]কারক-পুরুষ তাঁদের বলা হয় যাঁরা ঈশ্বর লাভ করে ভগবদ্ধামে নিবাস করেন এবং ভগবদ্ ইচ্ছায় লোক-হিতার্থে পৃথিবীতে আসেন।

বিবৃত করেন, কিন্তু আসলে তিনি ভগবান নন। এইসব আচার্য মানুষকে ভগবানের দিকে নিয়ে যান, কুপথ থেকে সুপথে নিয়ে যান। এইজন্য তাঁরা সেই সম্প্রদায়ের মানুষের কাছে ভগবানের চেয়েও বেশী পূজনীয় হতে পারেন[1] কিন্তু ভগবান হতে পারেন না।

(৬) গীতায় মূর্তিপূজা

যে সনাতনধর্মস্থাঃ শ্রদ্ধাপ্রেমসমন্বিতাঃ।
মূর্তিপূজাং ন কুর্বন্তি মূর্তৌ তু প্রভুপূজনম্॥

আমাদের সনাতন বৈদিক সিদ্ধান্তে ভক্তগণ মূর্তিপূজা করেন না, তাঁরা পরমাত্মার পূজা করেন। বিশেষত্ব হল এই যে, যে পরমাত্মা ব্যাপ্তিস্বরূপ, তাঁকে বিশেষভাবে অনুধ্যান করার জন্যই মূর্তি করা, ঐ মূর্তির মধ্যেই ধ্যান এবং চিন্তন সহজসাধ্য হয়।

যদি মূর্তিরই পূজা করা হোত তাহলে পূজকের ভিতর সেই পাথরের মূর্তি সম্পর্কে এরূপ ভাব হোত যে, 'তুমি কোন একটি পর্বত হতে এসেছ, কোন এক ব্যক্তি তোমায় তৈরী করেছে, কোন এক ব্যক্তি দ্বারা তুমি এখানে আনীত। অতএব হে প্রস্তরদেব ! তুমি আমার কল্যাণ করো।' কিন্তু এমন তো কেউ বলে না, তাহলে মূর্তির পূজা কিভাবে হল ? ভক্তেরা মূর্তির পূজা করেন না, তাঁরা মূর্তিতে ভগবানেরই পূজা করেন অর্থাৎ মূর্তিভাব দূর করে ভগবদ্‌ভাবে পূজা করেন। এইভাবে মূর্তিতে ভগবানের পূজা করলে সর্বত্রই ভগবানের অনুভব হয়। ভগবৎপূজায় ভগবানের প্রতি ভক্তিভাবের প্রথম সঞ্চার হয়। পরে ভক্ত সিদ্ধ হয়ে গেলেও তাঁর ভগবানের পূজা চলতেই থাকে।

মূর্তিতে তাঁকে পূজার বিষয়ে গীতায় ভগবান বলেছেন, 'ভক্তগণ ভক্তিপূর্বক আমাকে নমস্কার করে আমার পূজা করেন (৯।১৪)', 'যে ভক্ত শ্রদ্ধা এবং অনুরাগ পূর্বক পত্র-পুষ্প, ফল-জল ইত্যাদি আমাকে অর্পণ করেন, তাঁদের দেওয়া উপচার আমি গ্রহণ করে থাকি' (৯।২৬)। দেবগণ (বিষ্ণু-শিব-শক্তি-গণেশ-সূর্য, ঈশ্বর কোটির এই পঞ্চ দেবতা), ব্রাহ্মণগণ, আচার্যগণ, মাতা-পিতা প্রমুখ গুরুজনগণ এবং জ্ঞানী জীবন্মুক্ত মহাত্মাদের পূজা করাকে শারীরিক তপ বলা হয় (১৭।১৪)। যদি সামনে এঁদের মূর্তি না থাকে তাহলে কাকে নমস্কার করা হবে ? কাকে পত্র-পুষ্প, ফল-জল ইত্যাদি প্রদান করা হবে, কারই বা পূজা করা হবে ? এতে এই প্রমাণিত হয় যে, গীতায় মূর্তিপূজার কথাও বলা হয়েছে।

এইরূপ গাভী, তুলসী, অশ্বত্থ, ব্রাহ্মণ, তত্ত্বজ্ঞ জীবন্মুক্ত ব্যক্তি, গিরিগোবর্ধন, গঙ্গা-যমুনা ইত্যাদিকে পূজা করাও ভগবানকেই পূজা করা। এঁদের পূজা করলে 'সমস্ত স্থানেই পরমাত্মা আছেন', এই কথা অতি সরলভাবে অনুভব করা যায়। অতএব সর্বত্র পরমাত্মাকে অনুভব করতে গাভী ইত্যাদির পূজা অত্যন্ত সহায়ক হয়। কেননা যে পূজা করে, 'সর্বত্রই পরমাত্মার অধিষ্ঠান' এই কথা সে মানতে আরম্ভ করে। কিন্তু যে ব্যক্তি পূজার ধার দিয়েও যায় না, কেবল বাক্-সর্বস্ব, তার 'সর্বত্র পরমাত্মার অধিষ্ঠান' এই অনুভব সম্ভব হয় না। বিশেষত্ব এই যে মূর্তিদ্বারা ভগবৎপূজন, কল্যাণের এবং শ্রেয়ের সাধন।

ভগবৎপূজন ছাড়া অস্থি-মাংসের পূজা অর্থাৎ নিজ শরীরকে দামী দামী অলঙ্কার ও কাপড় দিয়ে সাজানো, নিজ গৃহ সুন্দর ভাবে তৈরী করা, সুন্দর সুন্দর জিনিসপত্র দিয়ে মনোহর রূপে সাজানো—এও এক প্রকারের মূর্তিপূজা কিন্তু এই পূজা মানুষকে নিম্নগামী করে দেয়।

জ্ঞাতব্য

প্রায় সব আস্তিক ব্যক্তিই মানেন যে ভগবান সর্বত্র পরিপূর্ণ রূপে বিরাজিত। বাস্তবিক পক্ষে এটা তাঁরাই

---

[1] মোরে মন প্রভু অস বিশ্বাসা। রাম তে অধিক রাম কর দাসা।
রামসিন্ধু ঘন সজ্জন ধীরা। চন্দন তরু হরি সন্ত সমীরা॥ (শ্রীরামচরিতমানস ৭।১২০।৮-৯)

মানেন যাঁরা মূর্তি, বেদ, সূর্য, অশ্বত্থ, তুলসী, গাভী ইত্যাদিকে ভগবান মনে করে পূজা শুরু করেছেন। কারণ যাঁরা ঐসব বস্তু এবং প্রাণীতে ভগবান আছেন বলে মনে করেন, তাঁরা স্বতঃই সকল বস্তু এবং সকল প্রাণীতে ভগবানের উপস্থিতি রয়েছে বলে মেনে নেবেন। যাঁরা মনে করেন কেবল মূর্তিতেই ভগবান আছেন তাঁদের 'প্রাকৃত (আরম্ভিক) ভক্ত বলা হয়[১] কেননা তাঁরা একটি নির্দিষ্ট স্থানে ভগবানের পূজা শুরু করেছেন। অতএব তাঁরা ভগবানের মুখোমুখি হয়েছেন।' কিন্তু যিনি 'ভগবান সর্বত্র আছেন'—এইরূপ বলেন অথচ তাঁর মধ্যে কোনকিছুর প্রতিই ভালবাসার ভাব, পূজার ভাব, শ্রেষ্ঠত্বের ভাব কিছুমাত্র নেই, তাঁকে ভক্ত বলা যাবে না, কেননা তিনি শুধু কথার কথা বলেন যে 'ভগবান সর্বত্র আছেন', সত্যিই তা তিনি মানেন না, অতএব এই ব্যক্তি ভগবানের সম্মুখীন হন নি।

মূর্তিতে ভগবানের পূজা শ্রদ্ধার বিষয়, তর্কের নয়। যাঁর শ্রদ্ধা আছে, তাঁর কাছে ভগবানের মহত্ত্ব প্রকটিত হয়। তাঁর করা পূজাও ভগবান গ্রহণ করেন, তাঁর হাত থেকে খাবার গ্রহণ করেন। যেমন ভক্তিমতী করমার কাছ থেকে ভগবান খিচুড়ী খেয়েছিলেন, ধন্না ভক্তের থেকে পরোটা খেয়েছিলেন, ভক্তিমতী মীরার হাত থেকে দুধ খেয়েছিলেন ইত্যাদি। এর বিশেষত্ব এই যে শ্রদ্ধা ও ভক্তিদ্বারা ভগবান মূর্তির মধ্যে জীবন্তরূপ পরিগ্রহ করেন।

প্রশ্ন—ভক্তেরা ভগবানকে যে ভোগ অর্পণ করেন, তা যে ভগবান গ্রহণ করেন তার প্রমাণ কি ?

উত্তর—ভগবানের রাজত্বে বস্তুর প্রাধান্য নেই, আছে ভাবের প্রাধান্য। ভাবের জন্যই ভগবান ভক্ত-অর্পিত বস্তু এবং পূজাদি ক্রিয়াকর্ম স্বীকার করেন। ভক্তের যদি ভাব হয় ভগবানকে খাওয়াবার তখন ভগবানেরও খিদে পায় এবং তিনি প্রকট হয়ে ভোজন করেন। ভক্তের ভাবে বা ভালোবাসাতে ভগবান যে বস্তু গ্রহণ করেন, সে বস্তু আর বিনষ্ট হয় না। তা দিব্য বা চিন্ময় হয়ে যায়। যদি এইরূপ ভাব না-ও হয়, কিছু কম হয়, তাহলেও ভক্ত ভোগ অর্পণ করলেই ভগবান সন্তুষ্ট হন। ভগবানের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য বস্তু বা ক্রিয়ার প্রাধান্য নেই, শুধু ভাবেরই প্রাধান্য। সাধুরা বলেন—

> **ভাব ভগত কী রাবড়ী, মীঠী লাগে 'বীর'।**
> **বিনা ভাব 'কালূ' কহে, কড়বী লাগে খীর॥**

আমার সঙ্গে এক ব্যক্তির দেখা হয়েছিল। তাঁর একজন সাধুর উপরে খুব শ্রদ্ধা ছিল এবং তিনি সাধুর খুব যত্ন করতেন। তিনি বলতেন, 'সাধুর যখনই পিপাসা লাগত আমার মনে হতো যে তাঁর পিপাসা পেয়েছে, অতএব আমি জল নিয়ে যেতাম এবং তিনি জল পান করতেন।' সেইরূপ যাঁরা পতিব্রতা রমণী, তাঁরাও স্বামীর ক্ষুধা-তৃষ্ণার খবর ঠিক মতো বুঝতে পারেন এবং স্বামী কি খেতে ভালোবাসেন তাও তাঁরা বুঝতে পারেন। স্বামীকে খেতে দিলে তিনিও বলে ওঠেন, 'আজ আমার এইটাই খাবার ইচ্ছা হয়েছিল।' এইভাবেই যাঁর মনে ভগবানকে ভোগ দেবার আন্তরিক বাসনা হয় তাঁর স্বতঃই ভগবানের রুচি এবং ক্ষুধা-তৃষ্ণার বিষয়ে ধারণা হয়ে যায়।

এক মন্দিরে একজন পূজারী ছিলেন। তাঁর ইষ্ট ছিলেন গোপাল। তিনি রোজ ছোট লাড্ডু বানাতেন এবং রাত্রে যখন গোপালকে শয়ন করাতেন, মাথার কাছে লাড্ডু রেখে দিতেন। কারণ বালকের রাত্রে ক্ষুধা পেয়ে যায়। একদিন পূজারী লাড্ডু রাখতে ভুলে যান, তখন গোপাল পূজারীকে স্বপ্নে দেখা দেন এবং বলেন তাঁর খিদে পেয়েছে। এইরূপ আর একটি ঘটনা আছে। এক সাধু ছিলেন। ইনি প্রতিবছর দেওয়ালীর পর ঠাণ্ডার সময় ভগবানকে কাজু, বাদাম, পেস্তা, আখরোট ইত্যাদি ভোগ দিতেন। পরে কাজু, বাদাম ইত্যাদির দাম খুব বেড়ে যাওয়ায় তিনি চীনা বাদাম দিয়ে ভোগ দিতে শুরু করলেন। একদিন রাত্রে ভগবান স্বপ্নে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কিরে, তুই আমাকে শুধু চীনা বাদামই খাওয়াবি ?' সেইদিনের পর থেকে পুনরায় ভগবানকে কাজু ইত্যাদি দিয়ে ভোগ দিতে আরম্ভ করলেন। প্রথমে তাঁর মনে কিছু দ্বিধা ছিল যে, 'কি জানি ভগবান ভোগ গ্রহণ করেন কিনা ?' যখন ভগবান স্বপ্নে এইভাবে বললেন তখন তাঁর দ্বিধা দূর হল। এর তাৎপর্য এই যে কেউ ভগবানকে আদর করে ভোগ দিলে তাঁরও ক্ষুধা পায় এবং

[১]অর্চায়ামেব হরয়ে পূজাং যঃ শ্রদ্ধয়েহতে।
ন তদ্ভক্তেষু চান্যেষু স ভক্তঃ প্রাকৃতঃস্মৃতঃ॥ (শ্রীমদ্ভাগবত ১১।২।৪৭)

তিনি তা গ্রহণ করেন।

এক সাধু ছিলেন তাঁর আহার অত্যন্ত বেশী ছিল। একবার তাঁর দেহ রোগগ্রস্ত হয়। কোন এক ব্যক্তি তাঁকে পরামর্শ দেয় যে, 'মহারাজ, আপনি গরুর দুধ খান এবং বাছুরটি দুধ খাওয়ার পর যেটুকু বাঁচবে মাত্র সেইটুকুই খাবেন।' তিনি সেই মত করতে লাগলেন। গো-বৎস পেট ভরে মায়ের দুধ খাওয়ার পর তিনি গরুর দুধ দোহাতেন, তাতে মাত্র একপো বা দেড়পো দুধ পেতেন, কিন্তু তাতেই তাঁর পেট ভরে যেত। কিছুদিনের মধ্যেই তাঁর অসুখ সেরে গেল এবং তিনি সুস্থ হলেন। যদি ন্যায়সঙ্গত বস্তুতে এতো শক্তি থাকে যে অল্পমাত্রায় গ্রহণ করলেও তৃপ্তি হয় এবং অসুখ সেরে যায় তাহলে যে বস্তু ভাবপূর্বক দেওয়া হয় তার সম্বন্ধে কিছু আর বলার অপেক্ষা থাকে না।

সকলেই অনুভব করে থাকেন যে কেউ যদি ভাব দ্বারা বা অনুরাগ সহকারে ভোজন করায় তাহলে সেই আহারে সুস্বাদ পাওয়া যায় এবং সেই আহার দ্বারা বৃত্তিসকলও ভালো থাকে। শুধু মানুষের ওপর নয়, পশুদের ওপরও এর প্রভাব পড়ে। যে গোবৎসের মা-গাভীটি মারা যায়, লোকে তাকে অন্য গাভীর দুধ খাওয়ায়, তাতে সেই বাছুরটি বেঁচে যায় ঠিকই কিন্তু হৃষ্টপুষ্ট হয় না। কিন্তু যদি সেই গোবৎসটি তার নিজের মায়ের দুধ খেত তাহলে অল্প খেলেও সে হৃষ্টপুষ্ট হতো, কেননা তার মা তাকে দুধ খাওয়াবার সময় আদর করত, গা চেটে দিত, সেই ভালোবাসাতেই সে পুষ্ট হোত। যদি মানুষ বা পশুর ওপরে ভাবের প্রভাব পড়ে তাহলে অন্তর্যামী ভগবানের ওপরেও যে ভাবের প্রভাব পড়বে তাতে আর বলার কি আছে ? বিদুরের স্ত্রীর এইরূপ ভাব ছিল বলেই ভগবান তাঁর হাত থেকে কলার খোসা পর্যন্ত খেয়েছিলেন। গোপিনীদের এইভাব ছিল বলেই ভগবান তাঁদের হাত থেকে কেড়ে দই, মাখন খেয়েছিলেন। শ্রীব্রহ্মাকে ভগবান বলছেন —

নৈবেদ্যং পুরতো ন্যস্তং চক্ষুষা গৃহ্যতে ময়া।
রসং চ দাসজিহ্বায়ামশ্নামি কমলোদ্ভব॥

'হে কমলোদ্ভব ! আমার সামনে অর্পিত ভোগসমূহ আমি নেত্র দ্বারা গ্রহণ করি ; কিন্তু তার স্বাদ আমি ভক্তদের জিহ্বাদ্বারাই গ্রহণ করি।'

একথা সাধুদের কাছে শুনেছি যে, ভাবদ্বারা অর্পিত ভোগদ্রব্য ভগবান কখনও দৃষ্টি দ্বারা, কখনও স্পর্শ দ্বারা আবার কখনও স্বয়ং কিছুটা গ্রহণও করেন।

হামাগুড়ি দেওয়া শিশু কোন বস্তু নিয়ে তার বাবাকে দিলে যেমন তিনি খুব খুশী হন এবং অনেক উঁচুতে হাত দেখিয়ে বলেন, 'বাছা, তুই এতবড় হ, অর্থাৎ, আমার থেকেও বড় হয়ে ওঠ।' কেন, বস্তুটি কি অলভ্য ছিল যে শিশুটি সেটি দেওয়ায় তার বাবা বিশেষ কিছু পেলেন ? না, তা নয় ! কেবল শিশুর দেবার ভাবটি দেখে বাবা প্রসন্ন হলেন। এইরূপ ভগবানেরও কোন জিনিসের অভাব নেই, অথবা তাঁর কোন কিছু প্রাপ্তিরও ইচ্ছা নেই, কেবল ভক্তের দেবার ভাবটির জন্যই তিনি প্রসন্ন হন। কিন্তু যারা লোক দেখানোর জন্য বা লোক ঠকানোর জন্য মন্দির সাজায়, ভগবানের বিগ্রহ সাজায়, ভাল ভাল জিনিস দিয়ে ভোগ অর্পণ করে, তাদের নৈবেদ্য ভগবান গ্রহণ করেন না। কেননা তা ভগবানের প্রকৃত পূজা নয়, সেটি আসলে ব্যক্তিগত স্বার্থের ও অর্থেরই পূজা।

যেভাবেই সম্ভব হোক না কেন, যাঁরা ভগবানকে ভোগ নিবেদন করেন এবং তাঁর পূজা-অর্চনা করেন, এইরকম ব্যক্তিকে যারা পাষণ্ড বলে এবং অহংকারবশতঃ ভাবে, 'আমি ওদের চেয়ে ভাল, আমি পাষণ্ড নই' তাদের কখনো কল্যাণ হয় না। যে সব ব্যক্তি যে ভাবেই হোক কোন উত্তম কর্ম করেন, তাঁদের কাজের সেই অংশ তো ভাল হয়ই, তাঁদের ব্যবহার, চলাফেরার মধ্যেও ভালত্ব প্রকাশ পায়। কিন্তু যারা অহংকারবশতঃ উত্তম ব্যবহার পরিত্যাগ করে, পরিণামে তাদের অকল্যাণই হয়।

প্রশ্ন—অসৎ ব্যক্তিগণ যখন মূর্তি ভেঙ্গে ফেলে তখন ভগবান নিজের প্রভাব ও অলৌকিকত্ব কেন প্রদর্শন করেন না ?

উত্তর—মূর্তির উপর যার কোন ভালবাসা নেই, যার মূর্তিপূজক ব্যক্তিদের ওপর হিংসাভাব থাকে, সেই হিংসাভাব নিয়ে যারা মূর্তি ভেঙ্গে ফেলে তাদের জন্য ভগবান তাঁর প্রভাব এবং মহিমা কেনই বা প্রকাশিত করবেন ? ভগবানের মহত্ত্ব শ্রদ্ধাভাবের ক্ষেত্রেই প্রকাশিত হয়।

যাঁরা মূর্তিপূজা করেন তাঁদের 'মূর্তিতে ভগবান আছেন', এই বিশ্বাস পূর্ণভাবে না থাকার জন্যই অধার্মিক ব্যক্তি মূর্তি ভাঙ্গতে চায় এবং ভগবানও তাঁর মহিমা

তাদের কাছে প্রকাশ করেন না। আবার যে সব ভক্তের 'মূর্তিতে ভগবান আছেন' এরূপ দৃঢ়শ্রদ্ধা-বিশ্বাস থাকে, সেখানে ভগবান নিজ মহিমা প্রকাশ করেন। যেমন, গুজরাটে সুরাটের কাছে এক শিবের মন্দির আছে। তাতে যে শিবলিঙ্গ আছে, তাঁর গাত্রে অসংখ্য ছিদ্র। তার কারণ যখন মুসলমানেরা সেই শিবলিঙ্গটি ভাঙতে এসেছিল তখন সেই লিঙ্গ থেকে অসংখ্য বড় বড় ভ্রমর বেরিয়েছিল এবং দুর্বৃত্তদের তাড়িয়ে দিয়েছিল।

যে ছাত্র পরীক্ষায় পাস করতে চায়, সে-ই পরীক্ষককে সম্ভ্রম জানায়, তাঁর আজ্ঞাবহ হয় ; কারণ পরীক্ষক যদি উত্তীর্ণ করান তবে সে উত্তীর্ণ হবে আর ফেল করালে অনুত্তীর্ণ থেকে যেতে হবে। কিন্তু ভগবানের কোন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার দরকার হয় না, কারণ তাতে তাঁর মহত্ত্ব কিছু বাড়বে না। আবার উত্তীর্ণ না হলেও তাঁর মহত্ত্ব কিছু মাত্র কমবে না। রাবণ যখন ভগবান রামের পরীক্ষা নেবার জন্য মায়াবী মারীচকে স্বর্ণমৃগ করে পাঠিয়েছিলেন এবং ভগবান রাম স্বর্ণমৃগের পিছনে দৌড়েছিলেন অর্থাৎ রাবণের পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ হয়েছিলেন, দুষ্ট রাবণের পরীক্ষাতে উত্তীর্ণ হয়ে ভগবানের কোন প্রশংসাপত্রের প্রয়োজন ছিল কি ? সেইভাবেই অসৎ লোকেরা ভগবানের পরীক্ষা নেওয়ার জন্য মন্দির ভাঙেন এবং ভগবান তাঁদের পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ হন, তাঁদের সামনে নিজ প্রভাব প্রকাশিত করেন না, কারণ অসৎ লোকেরা অসৎভাব নিয়েই তাঁর সম্মুখীন হয়ে থাকে।

একটিকে বস্তুগুণ এবং অপরটিকে ভাবগুণ বলা হয়। এই দুটি গুণ পৃথক। যেমন স্ত্রী, মা এবং বোন — এদের তিনজনের শরীর একই প্রকার অর্থাৎ স্ত্রীর শরীর যেমন, মায়েরও তেমন এবং বোনের শরীরও সেই একই রকম ভাবে গঠিত। অতএব এই তিনেতেই বস্তুগুণ অভিন্ন। কিন্তু স্ত্রীর সঙ্গে একভাব, মায়ের সঙ্গে আরেক ভাব এবং বোনের সঙ্গে অন্যপ্রকার ভাব থাকে। সুতরাং বস্তুগুণ একপ্রকার হলেও ভাবগুণ পৃথক্ পৃথক্ হয়ে থাকে। জগতে বিভিন্ন স্বভাবের ব্যক্তি, বস্তু ইত্যাদি আছে, অতএব তাদের বস্তুগুণ বিভিন্ন, কিন্তু সবার মধ্যেই ভগবান পূর্ণরূপে আছেন—এই ভাবগুণটি একই। এইরূপ মূর্তিতে যাঁর শ্রদ্ধা আছে, তাঁর মধ্যে 'মূর্তিতে ভগবান বিরাজ করেন,'—এই ভাবগুণ থাকে। মূর্তিতে যাঁর শ্রদ্ধা নেই, তিনি 'মূর্তি পাথর, পিতল, রূপো ইত্যাদির তৈরী'—এই বস্তু-গুণসম্পন্ন হন। এর বিশেষত্ব এই যে, পূজকের যদি মূর্তিতে ভগবৎভাব থাকে তাহলে তাঁর কাছে মূর্তি সাক্ষাৎ ভগবানই। যদি পূজকের ভাব এই হয় যে, মূর্তি পিতলের, পাথরের বা রূপার তাহলে তার কাছে সেই মূর্তি কেবলমাত্র পাথর বা পিতল ইত্যাদির হয়েই প্রতিভাত হয়। কারণ ভগবান ভাবেই বিরাজিত—

> ন কাষ্ঠে বিদ্যতে দেবো ন শিলায়াং ন মৃৎসু চ।
> ভাবে হি বিদ্যতে দেবস্তস্মাদ্ ভাবং সমাচরেৎ॥
> (গরুড়পুরাণ, উত্তরখণ্ড ৩।১০)

দেবতা কাঠেও থাকেন না এবং পাথর বা মাটিতেও না, ভাবেই দেবতার বাস, সেইজন্য ভাবকেই প্রধানরূপে মানা উচিত।

এক বৈরাগী বাবাজী ছিলেন। তাঁর কাছে দুটি স্বর্ণের মূর্তি ছিল। একটি গণেশের অপরটি ইঁদুরের। দুটিই সম ওজনের ছিল। বাবাজী একবার রামেশ্বর যাওয়া স্থির করলেন। সেইজন্য তিনি এক স্বর্ণকারের কাছে গিয়ে বললেন, 'ভাই! এই মূর্তি দুটির বদলে কত টাকা দেবে?' স্বর্ণকার সে দুটি ওজন করে দুটিরই পাঁচশত টাকা করে দাম, অর্থাৎ দুটিই সমমূল্যের বলে জানালেন। বাবাজী বললেন, 'আরে! তুমি দেখতে পাচ্ছ না, একজন প্রভু, অপর জন তাঁর বাহন? যা দাম গণেশের সেই একই দাম ইঁদুরের ? তা কেমন করে হয় ?' স্বর্ণকার উত্তর দিলেন, 'বাবা, আমি গণেশজী আর তাঁর ইঁদুরের দাম বলিনি, আমি তো সোনার দাম বলেছি।' এর বিশেষত্ব হল যে বাবাজীর দৃষ্টি ছিল গণেশ এবং ইঁদুরের ওপর আর স্বর্ণকারের দৃষ্টি ছিল সোনার ওপর অর্থাৎ বাবাজী ভাবগুণ দেখেছেন, আর স্বর্ণকার বস্তুগুণ বিচার করেছেন। তেমনি যারা মূর্তি ভাঙে তারা বস্তুগুণ দেখে অর্থাৎ সেটি পাথরের না পিতলের এরূপই বিচার করে। ভগবানও তাদের ধারণা অনুযায়ী পাথর ইত্যাদি রূপেই অবস্থান করেন।

বাস্তবে দেখতে গেলে স্থাবর-জঙ্গম ইত্যাদি ভগবৎস্বরূপই। যাঁর মধ্যে ভাবগুণ অর্থাৎ ভগবানের ভাবনা আছে তিনি সব কিছুই ভগবৎস্বরূপ দেখতে পান। কিন্তু যাঁর মধ্যে বস্তুগুণ অর্থাৎ জড়বস্তুর ভাবনা-চিন্তা থাকে, তিনি স্থাবর-জঙ্গম ইত্যাদি সবকিছুকে পৃথক্ পৃথক্

ভাবে দেখেন। এই কথাই মূর্তির বিষয়েও বুঝে নিতে হবে।

মানুষ শ্রদ্ধা-ভাব রেখে মূর্তির পূজা করে, স্তুতি ও প্রার্থনা করে। কারণ সে মূর্তির মধ্যে বিশেষ ভাব দেখতে পায়। যে ব্যক্তি মূর্তি ভাঙ্গে, সেও মূর্তির মধ্যে তারই মতো বিশেষরূপ অবলোকন করে। যদি তা না দেখবে, তবে সে মূর্তিগুলি ভাঙ্গবেই বা কেন ? অন্য পাথর ইত্যাদি ভাঙ্গে না কেন ? সুতরাং সেই ব্যক্তিও মূর্তিতে বিশেষরূপ আছে বলেই মানে। শুধু মূর্তিতে যাঁরা শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস রাখেন তাঁদের ওপর ঈর্ষ্যাবশতঃ, তাঁদের দুঃখ দেবার জন্য তারা মূর্তি ভাঙ্গে।

যে সব ব্যক্তি শাস্ত্র-বিধি অনুসারে নির্মিত মন্দির এবং সেখানে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করে স্থাপিত মূর্তিগুলি ভগ্ন করে তারা নিজেদের স্বার্থ-সিদ্ধি করার জন্য, পূজকদের মর্যাদা নষ্ট করার জন্য, নিজ অহংকার ও নাম স্মরণীয় করার জন্য এবং ভগ্নমূর্তি দর্শনে বহু প্রজন্ম পর্যন্ত হিন্দুদের যন্ত্রণায় দগ্ধ করার জনাই হিংসাবশে তা করে। পরিণামে তারা ঘোর নরকে পতিত হয় ; কেননা তাদের নীতিই হচ্ছে অন্যকে দুঃখ দেওয়া, অন্যকে নাশ করা। খারাপ উদ্দেশ্যের ফলও খারাপই হয়। আবার যে সব ব্যক্তি মন্দির এবং মূর্তিগুলি রক্ষা করার জন্য নিজেদের সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করেন, নিজেদের প্রাণ সমর্পণ করেন—তাঁদের উদ্দেশ্য মহৎ হওয়ায় তাঁরা সদ্‌গতি প্রাপ্ত হন।

আমরা যখন কোন বিদ্বান ব্যক্তিকে সম্মান জানাই, তাতে আমরা তাঁর বিদ্যাকেই সম্মান জানালাম, হাড়মাংসের শরীরটিকে নয়। এইরূপই যে ব্যক্তি মূর্তিতে ভগবানকে মানেন, তাঁরা আসলে ভগবানকেই সম্মান জানিয়ে থাকেন, মূর্তিকে নয়। সুতরাং যাঁরা ভগবানকে মানেন না, তাঁদের নিকট ভগবানের মহিমা প্রকটিত হতে পারে না। অপরপক্ষে যাঁরা মূর্তিতে ভগবান মানেন, তাঁদের নিকট ভগবানের মহিমা প্রকটিত হয়।

প্রশ্ন—আমরা মূর্তিপূজা কেন করব ? মূর্তিপূজার আবশ্যকতা কি ?

উত্তর—নিজের ঈশ্বরানুরাগ বাড়াবার জন্য, তা জাগ্রত করার জন্য এবং ভগবানকে প্রসন্ন করার জন্য মূর্তিপূজা করা উচিত। আমাদের অন্তঃকরণে সংসারের যে বিশেষ রূপ অঙ্কিত আছে, যে মমতা-আসক্তি ইত্যাদি আছে, তা দূর করার জন্য ঠাকুরের পূজা করা উচিত। ফুলমালা দিয়ে সাজানো, সুন্দর বস্ত্রাদি পরানো, আরতি করা, নৈবেদ্য নিবেদন করা ইত্যাদির খুবই প্রয়োজন আছে। অর্থাৎ মূর্তিপূজার দ্বারা আমাদের দুই প্রকার লাভ হয়—ভগবদ্ভাব জাগ্রত হয় তথা বৃদ্ধি পায় এবং সাংসারিক বস্তুর প্রতি মমতা ও আসক্তি দূর হয়।

মানুষের জীবনে অন্ততঃ এমন একটি আশ্রয় থাকা প্রয়োজন যার জন্য সে নিজের সব কিছু ত্যাগ করতে পারে। সেই স্থান হতে পারে ভগবান বা কোন সাধু-মহাত্মা বা হতে পারে মাতা-পিতা বা আচার্য-শিক্ষক। এর ফলে মানুষের পার্থিব চিন্তা কমে যায় এবং ধার্মিক তথা আধ্যাত্মিক ভাবনা বাড়ে।

একবার কয়েকজন তীর্থযাত্রী কাশী পরিক্রমা করেছিলেন। সেখানকার এক পাণ্ডা যাত্রীদের মন্দিরের সঙ্গে পরিচয় করাচ্ছিলেন, শিবলিঙ্গকে প্রণাম করাচ্ছিলেন এবং পূজাআচ্চা করাচ্ছিলেন। সেই যাত্রীদের মধ্যে কিছু আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গীর ছোক্‌রা ছিল। তাদের স্থানে স্থানে প্রণাম ইত্যাদি করা পছন্দ হচ্ছিল না। সেইজন্য তারা পাণ্ডাকে বলল, 'পাণ্ডাজী, স্থানে স্থানে মাথা ঠুকে কি লাভ ?' সেখানে এক সাধু দাঁড়িয়ে ছিলেন, তিনি তাদের বললেন, 'ভাই, যেমন এই হাড়-মাংসের মধ্যে তোমরা আছ, এই মূর্তির মধ্যে তেমনি ভগবান আছেন। তোমাদের বয়স তো অল্প, কিন্তু এই শিবলিঙ্গ বহু বছরের, সুতরাং বয়সের দৃষ্টিতে এই শিবলিঙ্গ তোমাদের থেকে বড়। শুদ্ধতার দৃষ্টিতে দেখলে হাড়-মাংস অশুদ্ধ কিন্তু পাথর শুদ্ধ। স্থায়িত্বের কথা ভাবলে হাড়ের থেকে পাথর অনেক বেশি মজবুত। যদি পরীক্ষা করতে চাও তো নিজের মাথা পাথরে ঠুকে দেখতে পারো তোমাদের মাথা ভাঙ্গে, না মূর্তি ! তোমাদের অনেক প্রকারের দুর্গুণ বা দুরাচার থাকতে পারে, মূর্তিতে কিন্তু কোন দুর্গুণ বা দুরাচার নেই। তাই যে ভাবেই দেখ না কেন মূর্তি সব প্রকারেই শ্রেষ্ঠ। সুতরাং মূর্তি পূজনীয়। তোমরা তোমাদের নামের নিন্দাকে নিজের নিন্দা এবং নামের প্রশংসাকে নিজের প্রশংসা বলে মনে কর ; শরীরের অনাদরে নিজেদের অনাদর এবং শরীরের আদরে নিজেদের আদর বলে মনে কর। তাহলে মূর্তিতে ভগবানের পূজা, স্তুতি-প্রার্থনা ইত্যাদি করলে ভগবান কি সেই পূজা স্তুতি-

প্রার্থনাকে গ্রহণ করেন না ? আরে ভাই ! লোকে তোমার যে নাম ও রূপের সম্মান করে, তা তোমার স্বরূপ নয়, তবু তাতে তুমি খুশী হও। ভগবানের স্বরূপ তো সর্বব্যাপী, অতএব এই মূর্তিতেও তাঁর স্বরূপ বিরাজিত। কাজেই আমরা যদি এই মূর্তিকে পূজা করি, তবে কি তিনি প্রসন্ন হবেন না ? আমরা যত বেশী আন্তরিকতায় তাঁর পূজা করব, তিনি ততো বেশী প্রসন্ন হবেন।'

কোন আস্তিক ব্যক্তি যদি মূর্তিপূজায় অনিচ্ছুকও হন তবুও তাঁর দ্বারা প্রকারান্তরে মূর্তিপূজা হয়ই। কেমন করে ? তিনি যদি বেদাদি গ্রন্থ মানেন এবং সেই অনুযায়ী চলার প্রয়াস করেন, তাহলে প্রকারান্তরে তাঁর দ্বারা মূর্তিপূজাই হয়। কারণ বেদও (লিখিত পুস্তক হিসাবে) তো মূর্তিই। বেদ ইত্যাদি গ্রন্থকে সম্মান জানানোও একপ্রকার মূর্তিপূজা। এই রূপেই মানুষ গুরু, মাতা-পিতা-অতিথি প্রমুখের যে সম্মান করে ও সৎকার করে, অন্ন-জল-বস্ত্রাদি দ্বারা সেবা করে—এসবই মূর্তি পূজা। কারণ গুরু, মাতা-পিতা প্রমুখের দেহ জড় হলেও সেই দেহকে সম্মান জানালে তাঁদেরই সম্মান জানানো হয়। ফলে তাঁরা সন্তুষ্ট হন। এর তাৎপর্য হল এই যে, মানুষ যখন কাউকে কোনরূপে সম্মান বা সৎকার করে তা মূর্তি পূজারই নামান্তর হয়ে ওঠে। মানুষ যদি ভাবদ্বারা মূর্তিতে ভগবৎ পূজন করে তা হলে তাও ভগবানেরই পূজা হয়।

এক বৈরাগী বাবাজী ছিলেন। তিনি একটি বারান্দার তলায় থাকতেন ও সেইস্থানেই শালগ্রাম শিলার পূজা করতেন। যারা মূর্তিপূজা মানতো না তাদের বাবাজীর মূর্তিপূজাদির ক্রিয়াকলাপ পছন্দ হতো না। সেইসময় সেখানে হুক সাহেব নামে একজন ইংরেজ অফিসার এসেছিলেন। সেই অফিসারের কাছে অন্যান্য ব্যক্তিরা নালিশ করল যে, এই ব্যক্তি মূর্তিপূজা করে সর্বব্যাপী পরমাত্মার অপমান করছে ইত্যাদি ইত্যাদি। হুক সাহেব ক্রোধান্বিত হয়ে বাবাজীকে ডাকলেন এবং তাঁকে সেই স্থান ত্যাগ করার নির্দেশ দিলেন। পরের দিন বাবাজী হুক সাহেবের এক মূর্তি তৈরী করে সারা শহর ঘুরতে লাগলেন। সবাইকে দেখিয়ে সেই মূর্তিতে জুতো মারতে লাগলেন এবং বলতে থাকলেন যে, হুক সাহেব একেবারে বেআক্কেল, এর কোন বুদ্ধিশুদ্ধি নেই ইত্যাদি। লোকেরা তাই দেখে আবার হুক সাহেবের কাছে গিয়ে নালিশ করল যে, বাবাজী তাঁকে গালি দিচ্ছেন এবং তাঁর মূর্তি তৈরী করে তাতে জুতো মারছেন। হুক সাহেব বাবাজীকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি আমার অপমান করছ কেন ?' বাবাজী বললেন, 'আমি আপনার কোনরকম অপমান করিনি, আমি তো এই মূর্তির অপমান করছি, কেননা এ বড় মূর্খ।' এই বলে তিনি আবার মূর্তিতে জুতো মারলেন। হুক সাহেব বললেন, 'আমার মূর্তিকে অপমান করা মানেই আমার অপমান করা।' বাবাজী বললেন, 'আপনি এই মূর্তিতে অবস্থিত নন তবুও শুধুমাত্র উপলক্ষরূপে মূর্তির অপমান করলে তার প্রভাব আপনার উপর পড়েছে। আমার ভগবান সর্বত্র, সর্বকালে সর্ববস্তুতে বিরাজিত। সুতরাং কেউ যদি শ্রদ্ধাপূর্বক তাঁর মূর্তিতে পূজা করে তাহলে ভগবান কি প্রসন্ন হন না ? আমি যদি মূর্তিতে ভগবানকে পূজা করি তবে তাতে তাঁর সম্মান করা হয়, না অসম্মান ?' হুক সাহেব বললেন, 'যাও, তুমি এখন থেকে স্বাধীনভাবে মূর্তিপূজা করতে পারো।' বাবাজী নিজ স্থানে গমন করলেন।

প্রশ্ন—কিছুলোক মন্দিরে অথবা মন্দিরের কাছে বসে মাংস, মদ ইত্যাদি নিষিদ্ধ জিনিস খায়, তবুও ভগবান তাদের বাধা দেন না কেন ?

উত্তর—মা-বাবার সামনে শিশুরা দুষ্টুমি করলে তো মা-বাবা তাদের দণ্ড দেন না ; কারণ তাঁরা বোঝেন, 'এরা আমাদেরই সন্তান, অবুঝ, সব কিছু জানে না।' এইরূপ ভগবানও বোঝেন যে, 'এরা আমারই অবুঝ সন্তান।' তাই ভগবানের দৃষ্টি তাদের আচার-ব্যবহারের দিকে যায়ই না। কিন্তু যারা মন্দিরে নিষিদ্ধ পদার্থ সেবন করে ও নিষিদ্ধ আচরণ করে, তাদের এই অন্যায়-কর্মের কর্মজনিত-ভোগ অবশ্যই ভুগতে হয়।

প্রশ্ন—পূর্বে কবীর প্রভৃতি কিছু সন্ত মূর্তিপূজা নিষেধ করেছিলেন কেন ?

উত্তর—যে সময়ে যেটি প্রয়োজন হয়, সাধু এবং মহাপুরুষেরা আবির্ভূত হয়ে তখন সেইরূপ কার্য করেন। যেমন, পূর্বে যখন শৈব এবং বৈষ্ণব ভক্তদের মধ্যে প্রচুর কলহ হোত, সেই সময় তুলসীদাসজী 'শ্রীরামচরিতমানস' রচনা করলেন, যার ফলে দুই পক্ষের ভক্তগণের কলহ দূরীভূত হল। গীতার ওপরও অনেক টীকা রচিত হয়েছে, কারণ যে সময় যেমন প্রয়োজন দেখা দিয়েছে,

মহাপুরুষগণের হৃদয়ে তেমনি প্রেরণা জেগেছে এবং তাঁরা গীতার ওপর সেইরূপ টীকা রচনা করেছেন। যে সময়ে বৌদ্ধ মতের বাড়াবাড়ি, তখনই শঙ্করাচার্য আবির্ভূত হলেন এবং সনাতন ধর্ম প্রচার করলেন। এইরূপ যখন মুসলমানদের শাসন ছিল, তখন তারা মন্দির, দেবমূর্তি চূর্ণ-বিচূর্ণ করত। অতএব সেই সময় কবীর আদি মহাপুরুষগণ বলেছিলেন, 'আমাদের মন্দিরের বা মূর্তিপূজার কোন প্রয়োজন নেই ; কারণ পরমাত্মা কেবল মন্দির বা মূর্তিতে থাকেন না, তিনি সর্বস্থানে বিরাজিত রয়েছেন। আসলে ঐ সন্তগণের মূর্তিপূজা বন্ধ করার উদ্দেশ্য ছিল না ; তাঁরা যে কোনও ভাবে জনসাধারণের মনকে ফেরাতে চেয়েছিলেন পরমাত্মার দিকে।'

প্রশ্ন—এখন তো সময় বদলে গেছে, মুসলমানেরা মন্দির বা মূর্তি ভাঙছে না, তবুও কেন সেই সম্প্রদায়ের অনুগামীরা মূর্তিপূজা বা সাকার ঈশ্বর-রূপের বিরোধিতা করেন ?

উত্তর—নিজ মতবাদের প্রচার প্রতিষ্ঠার আগ্রহ থাকার জন্যই অপরের মতকে খণ্ডন করা হয়ে থাকে। কারণ এখন যেসব ব্যক্তি মন্দির, মূর্তিপূজা বা অপরের মতবাদকে খণ্ডন করতে চায়, সেই বিরুদ্ধবাদী ব্যক্তিরা আসলে পরমাত্মতত্ত্বকে চায় না, নিজ উদ্ধার চায় না, তারা নিজেদের পূজা চায়, নিজেদের দল ভারী করতে চায়, নিজেদের সাম্প্রদায়ের প্রসার চায়। এইরূপ মতবাদীদের পরমাত্মপ্রাপ্তি ঘটে না। যারা নিজেদের মতেই শুধু আগ্রহী থাকে, তারা গোঁড়া হয় এবং তাদের কথা গ্রহণীয় হয় না—

বাতুল ভূত বিবস মতবারে।
তে নহিঁ বোলহিঁ বচন বিচারে॥

(শ্রীরামচরিতমানস ১।১১৫।৪)

এইরূপ 'মতবাদী' ব্যক্তি আসল তত্ত্ব জানতে পারে না—

হরীয়া রত্তা তত্ত্বকা, মতকা রত্তা নাঁহি।
মতকা রত্তা সে ফিরৈ, তাঁয় তত্ত্ব পায়া নাঁহি॥
হরীয়া তত্ত্ব বিচারিয়ৈ ক্যা মত সেতী কাম।
তত্ত্ব বসায়া অমরপুর, মতকা যমপুর ধাম॥

নিরাকার মার্গের সাধক যদি সাকারবাদীর মূর্তির অবজ্ঞা করেন তাহলে তিনি নিজ ইষ্টদেবকেই হেয় করেন। কারণ তাঁর নিজ ধারণা অনুযায়ী এটাই প্রমাণিত হয় যে, যেস্থানে সাকার দেবতা আছেন সে স্থানে নিরাকারের স্থান নেই, অর্থাৎ তিনি সর্বব্যাপী নন, পরিচ্ছিন্ন বা একস্থান নিবাসী। যদি তিনি মনে করেন যে সাকার মূর্তির মধ্যেও নিজ নিরাকার ইষ্ট আছেন, তাহলে তিনি সাকার দেবতাকে অবজ্ঞা কেন করবেন ? দ্বিতীয় কথা, নিরাকার উপাসনাকারীরা মনে করেন, 'পরমাত্মা সাকার নন, তাঁর অবতারও হয় না, মূর্তিও না', তাহলে তাঁদের সর্বসমর্থ পরমাত্মা অবতার দেহ ধারণ করতে, সাকার হতে অসমর্থ বা কমজোরী, অর্থাৎ তাঁদের পরমাত্মা তাহলে সর্বসমর্থ নন। বাস্তবে পরমাত্মা এরকম নন। পরমাত্মা সাকার- নিরাকার সবকিছুই— **'সদসচ্চাহম্'** (৯।১৯)। অতএব বিচার করতে হয় এই যে, আমরা নিজেদের কল্যাণ চাইব, না সাকার নিরাকার মতবাদ নিয়ে ঝগড়া করব ? যদি আমরা আমাদের পছন্দ অনুযায়ী সাকার বা নিরাকারের পূজা করি তাহলে তাতেই আমাদের কল্যাণ সাধিত হবে।

তেরে ভাবৈ জো করৌ, ভলৌ বুরৌ সংসার।
'নারায়ন' তু বৈঠিকে, আপনৌ ভুবন বুহার॥

যদি ঝগড়াই করতে হয় তো পৃথিবীতে ঝগড়া করার অনেক বিষয় আছে। ধন-সম্পত্তি, জমি, বাড়ী-ঘর ইত্যাদির জন্য লোকে তো ঝগড়া করেই থাকে, এই পারমার্থিক পথে এসে আবার ঝগড়া কিসের ? আমি সাকার বা নিরাকার উপাসনায় যদি রতই থাকি তবে অপরের মতবাদ খণ্ডন করার আমার সময় কোথায় ? অপরের মতবাদ খণ্ডন করতে যে সময় ব্যয় হয় সেই সময়টুকু যদি নিজ ইষ্টের উপাসনায় ব্যয় করি তবে আমার অনেক লাভ হবে।

অপরের মতবাদ খণ্ডন করার তাৎপর্য হল নিজের উপাস্যকে অবজ্ঞা করবার জন্য অপরকে আমন্ত্রণ করা। এর ফলে আমার লোকসানই হবে। আমি যখন অন্যের নিরাকার মতবাদ খণ্ডন করলাম তখন তো আমি নিজ সাকার ইষ্টকে অবজ্ঞা করার জন্যই তাকে নিমন্ত্রণ করলাম, তাকে সুযোগ দিলাম যে, 'এবার তুমি আমার সাকারবাদ খণ্ডন কর'। এই মতবাদ খণ্ডনের দ্বারা না আমার কিছু লাভ হয়, না অপরের। দ্বিতীয় কথা, অপরের

মতবাদ খণ্ডন করলে নিজের যে কিছুমাত্র কল্যাণ হয় একথাও কেউ লেখেনি। যাঁরা অপরের মতবাদ খণ্ডন করেছেন, তাঁরাও বলেননি যে অপরের মতবাদ খণ্ডন করলে তোমার ভালো হবে, কল্যাণ হবে। আমি যদি কারো মতবাদ বা উপাস্যকে খণ্ডন করি তাহলে আমার অন্তঃকরণ অপবিত্র হবে, খণ্ডনের চিন্তা-ভাবনা অনুসারে দ্বেষ সৃষ্টি হবে, যার ফলে আমার পূজা উপাসনাতে বাধার সৃষ্টি হবে এবং আমি ইষ্টের প্রতি বিমুখ হয়ে পড়ব। সুতরাং মানুষের কারো মতের বা ইষ্টভাবের খণ্ডন করা উচিত নয়, কাউকে অপমান, ভর্ৎসনা করা উচিত নয়, কারণ সকলেই নিজ নিজ রুচি অনুযায়ী ভাব এবং শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস অনুযায়ী নিজ ইষ্টের উপাসনা করেন। পরমাত্মা সাধকের ভাব, অনুরাগ এবং শ্রদ্ধা-বিশ্বাসেই সাড়া দেন। অতএব নিজের মতে, উপাস্য দেবতায় শ্রদ্ধা-বিশ্বাস রেখে সেই মত অনুযায়ী তৎপরতার সঙ্গে সাধনায় লেগে যাওয়া কর্তব্য। এটিই হল পরমাত্মাকে লাভ করার উপায়। অপরের মত খণ্ডন করা বা অপমান করা পরমাত্ম-প্রাপ্তির পথ নয়, তা পতনেরই পথ।

যে সমস্ত মহাপুরুষ মূর্তি পূজার মতবাদ খণ্ডন করেছেন তাঁরা সেই স্থানে নাম-জপ, সৎসঙ্গ, গুরুবাণী, ভগবৎ-চিন্তন, ধ্যান ইত্যাদির ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। অতএব যাঁরা মূর্তিপূজা ত্যাগ করেছেন অথচ নিজের মতানুসারে নাম-জপ ইত্যাদিতে তৎপরতার সঙ্গে সাধন শুরু করেন নি, তাঁরা দুই দিক থেকেই রিক্ত হয়ে থাকেন। তাঁদের থেকে মূর্তি পূজনকারী শ্রেষ্ঠ, কেননা তিনি নিজ মতানুযায়ী তাঁর সাধনায় লেগে রয়েছেন।

এর পরেও যদি কেউ বলে যে, 'অপর ব্যক্তির মতবাদ খণ্ডন করা আমার উদ্দেশ্য নয়, আমি নিজের উপাসনাকে দৃঢ় করছি, নিজের অনন্য ভাবকে প্রতিষ্ঠিত করছি',— তবে এর উত্তর হচ্ছে যে, অপরের মতবাদ খণ্ডন করলে নিজের অনন্য ভাব প্রতিষ্ঠিত হয় না। অনন্যভাব হচ্ছে এই যে, আমার ইষ্ট ছাড়া দ্বিতীয় কোন তত্ত্বই নেই। আমার প্রভু সগুণও এবং নির্গুণও। সবই আমার প্রভুর রূপ। অপরে প্রভুর যা খুশী নাম দিক না কেন তিনি আমারই প্রভু ! আমার প্রভুকে অনেক রূপে বিভিন্নভাবে উপাসনা করা হয়। অতএব যিনি নির্গুণকে মানেন তিনি আমার সগুণ প্রভুর মহিমা বাড়ান ; কেননা আমার সগুণ প্রভুই ওদের কাছে নির্গুণ। তাই যাঁরা নির্গুণের উপাসনা করেন তাঁরা আমাদের সম্মাননীয় ব্যক্তি। এইরূপ করলেই অনন্যভাব হয়। কোন মতবাদ খণ্ডন করা অনন্যভাব তৈরীর সাধন নয়। যিনি শ্রদ্ধা বিশ্বাসপূর্বক, সহজ-সরল ভাবে নিজের ইষ্টের উপাসনায় মগ্ন থাকেন, তাঁর ইষ্টের, তাঁর উপাসনায় ব্যাঘাত করলে তাঁর হৃদয়ে আঘাত লাগে, তিনি দুঃখিত হলে ব্যাঘাতকারীর খুব অপরাধ হয় যার ফলে তার সাধনা সিদ্ধ হয় না।

অনন্যতার নামে অপরের মতবাদ খণ্ডন করা ভালোত্বের অজুহাতে মন্দ করা। খারাপ ভাবেই যদি খারাপ জিনিস আসে, তা হলে ভালো লোক তার থেকে রক্ষা পেতে পারে। কিন্তু ভালোত্বের ছদ্মবেশে যখন খারাপ আসে তখন তার থেকে রক্ষা পাওয়া কঠিন হয়ে পড়ে। যেমন সীতার কাছে রাবণ ও হনুমানের কাছে কালনেমি সাধুর বেশে এসেছিল বলে সীতা এবং হনুমান দুজনেই প্রতারিত হয়েছিলেন। অর্জুন যুদ্ধরূপী ঘোর কর্মের অজুহাতে নিজের কর্তব্য ত্যাগ করতে চেয়েছিলেন— 'দুর্যোধনেরা ধর্ম কি তা জানে না, ওদের লোভ গ্রাস করেছে। কিন্তু আমি জানি ধর্ম কি, আমার লোভ নেই, আমি অহিংসক' ইত্যাদি। এভাবে অর্জুনের মধ্যেও ভালোর অজুহাতে (অছিলায়) মন্দ এসে উপস্থিত হয়েছিল। সেই মন্দমতিকে দূর করার জন্য ভগবানকে যথেষ্ট প্রয়াস করতে হয়েছে, সুদীর্ঘ উপদেশ দিতে হয়েছে। যদি খারাপ রূপে অর্জুনের মধ্যে এই মন্দমতি আসত, তাহলে তা দূর করতে এত সময় লাগত না। এইরূপ একনিষ্ঠতার অজুহাতে যদি অপরের মতবাদের প্রতি অবজ্ঞার ভাব আসে আর আমরা আমাদের অমূল্য সময়, সামর্থ্য বুদ্ধি ইত্যাদি অপরের মতবাদ খণ্ডনে ব্যয় করি, তাহলে আমাদের পতনই হবে। অতএব সাধকের উচিত তিনি যেন সাবধানতার সঙ্গে নিজ সময়, যোগ্যতা, সামর্থ্য ইত্যাদি নিজের ইষ্টের উপাসনায় নিবিষ্ট রাখেন।

প্রশ্ন—ভগবানের স্বয়ম্ভূ মূর্তি কিভাবে তৈরী হয় ?

উত্তর—স্বয়ম্ভূ মূর্তি যদি তৈরী হয় তবেই এই প্রশ্ন ওঠে। স্বয়ম্ভূ মূর্তি তৈরীই হয় না, তিনি স্বয়ং প্রকটিত হন। তাই তাঁর নাম স্বয়ম্ভূ, নাহলে তিনি স্বয়ম্ভূ কি করে হলেন ?

প্রশ্ন—মূর্তি স্বয়ম্ভূ বা কারো দ্বারা তৈরী, তা কি করে চেনা যায় ?

উত্তর—সকলেই তা চিনতে পারেন না। যেমন কোন ব্যক্তি একটি মানুষকে একবার যদি দেখে, পরে আবার দেখা হলে চিনতে পারে। তেমনি যিনি ভগবানের সাক্ষাৎ দর্শন পেয়েছেন, তিনিই স্বয়ম্ভু মূর্তি চিনতে পারেন।

প্রশ্ন—স্বয়ম্ভু মূর্তি এবং তৈরি করা মূর্তির দর্শন, পূজা ইত্যাদির মহিমা কিরূপ ?

উত্তর—শ্রদ্ধা এবং বিশ্বাস যদি থাকে, তাহলে 'দর্ভে' ঋষিদের এবং 'সুপারীতে' গণেশের পূজা করলেও লাভ হয়। তেমনি শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস যদি হয় এবং ভগবদ্ভাব যদি থাকে তাহলে তৈরী করা মূর্তির পূজা, দর্শন প্রভৃতিতে লাভ হয়। তবে স্বয়ম্ভু মূর্তিতে ভক্তি ও শ্রদ্ধা-বিশ্বাস হলে বিশেষ ও শীঘ্র লাভ হয়। যেমন, কোন সাধুর লিখিত পুস্তক পড়ার থেকে তাঁর মুখ থেকে সরাসরি শোনায় বেশী লাভ হয়। সঞ্জয়ও গীতাগ্রন্থের বিষয়ে বলেছিলেন যে, 'আমি সাক্ষাৎ ভগবানকে এটি বলতে শুনেছি।' (১৮।৭৫)।

প্রশ্ন—সংসারের সব কিছুর সঙ্গে যেমন সহজ সরল ভাবে এবং অনায়াসে সম্বন্ধ পাতানো যায়, ভগবানের সঙ্গে তেমন সম্বন্ধ হয় না, এর কারণ কি ?

উত্তর—এর কারণ এই যে মানুষ শরীরকেই 'আমি' বলে মনে করে। নিজেকে শরীর বলে মনে করায় সংসারের সঙ্গে সহজে সম্বন্ধ তৈরি হয়ে যায়। কারণ শরীর এবং সংসারের মধ্যে ঐক্য-ভাব আছে। যার সঙ্গে একত্র বা সমজাতীয়ত্ব হয় তার সঙ্গে অনায়াসে সম্বন্ধ জোড়া যায়। যেমন যে নিজেকে ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয় ইত্যাদি বলে মনে করে, তার ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয় ইত্যাদির সঙ্গে এবং যে নিজেকে বিদ্বান বা ব্যবসায়ী ইত্যাদি বলে মনে করে তার বিদ্বান বা ব্যবসায়ী ইত্যাদির সঙ্গে সহজেই সম্বন্ধ হয়ে যায়—**'সমানশীলব্যসনেষু সখ্যম্'**। ভগবানকে প্রত্যক্ষভাবে দেখা যায় না এবং নিজেকে মূর্তি (শরীর) বলে জানে, কাজেই তার পক্ষে দেবমূর্তিতে ভগবানের ভাব আনাই সহজ। অতএব যতক্ষণ শরীরকে আমি বলে মনে করা যাবে ততক্ষণ মূর্তিতে ভগবানপূজা অবশ্যই করা উচিত। ভগবৎপ্রাপ্তি হওয়ার পরেও মূর্তিপূজা ত্যাগ করা উচিত নয়। কেননা যে সাধনা দ্বারা মানুষ লাভবান হয় তার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকাই উচিত, তা ত্যাগ করা উচিত নয়।

(৭) গীতায় ভগবন্নাম

কৃষ্ণেতি নামানি চ নিঃসরন্তি রাত্রিন্দিবং বৈ প্রতিরোমকূপাৎ।
যস্যার্জুনস্য প্রতি তং সুগীতগীতে ন নাম্নো মহিমা ভবেৎ কিম্॥

নাম এবং নামী অর্থাৎ ভগবন্নাম এবং ভগবান অভেদ ; অতএব দুটিকে স্মরণ করার একই মাহাত্ম্য। ভগবন্নাম তিন রূপে নেওয়া যায়—

(১) **মনের দ্বারা**—মনের দ্বারা নাম স্মরণ হয়, যার বর্ণনা ভগবান **'যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ'** (৮।১৪) পদদ্বারা করেছেন।

(২) **বাণীর দ্বারা**—বাণীর দ্বারা নামজপ হয়, যাকে ভগবান **'যজ্ঞানাং জপযজ্ঞোঽস্মি'** (১০।২৫) পদদ্বারা নিজের স্বরূপ বলেছেন।

(৩) **কণ্ঠদ্বারা**—কণ্ঠদ্বারা জোরে উচ্চারণ করে কীর্তন করা হয়, যার বর্ণনা ভগবান **'কীর্তয়ন্ত'** (৯।১৪) পদদ্বারা করেছেন।

গীতায় ভগবান ওঁ, তৎ এবং সৎ পরমাত্মার এই তিন নাম বলেছেন—**'ওঁ তৎসদিতি নির্দেশো ব্রহ্মণস্ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ'** (১৭।২৩)। প্রণব বা ওঁকারকে ভগবান নিজের স্বরূপ বলে জানিয়েছেন—**'প্রণবঃ সর্ববেদেষু'** (৭।৮)। **'গিরামস্ম্যেকমক্ষরম্'** (১০।২৫)। ভগবান বলেছেন, যে মানুষ ওঁ—এই এক অক্ষর প্রণব উচ্চারণ করে এবং আমাকে স্মরণ করে শরীর ত্যাগ করে, সে পরমগতি প্রাপ্ত হয় (৮।১৩)।

অর্জুনও ভগবানের বিরাট রূপের স্তুতি দ্বারা নামের মহিমা কীর্তন করেছেন, যেমন—'হে প্রভু ! অনেক

দেবতা ভীত বিহ্বল হয়ে হাত জোড় করে আপনার মহিমা কীর্তন করছেন (১১।২১)'; 'হে অন্তর্যামী ভগবান! আপনার নাম ইত্যাদির কীর্তন করায় এই সম্পূর্ণ জগৎ আনন্দে বিভোর হয়ে প্রেমানুরাগ প্রাপ্ত হচ্ছে। আপনার নামাদি কীর্তনে ভীত হয়ে রাক্ষসগণ দশদিকে ছুটে পালাচ্ছে এবং সিদ্ধগণ আপনাকে নমস্কার জানাচ্ছে। এসবই অত্যন্ত উচিত কাজ (১১।৩৬)।'

জ্ঞাতব্য

সুষুপ্তি বা গভীর নিদ্রার সময়ে সকল ইন্দ্রিয় মনে, মন বুদ্ধিতে, বুদ্ধি অহং-এ এবং অহং অবিদ্যাতে লীন হয়ে যায়, অর্থাৎ সুষুপ্তিতে অহংভাবের আভাসও থাকে না। গভীর নিদ্রাভঙ্গে প্রথমে অহংভাবের আভাস হয়, পরে ক্রমশঃ দেশ, কাল, অবস্থা ইত্যাদির আভাস হয়। কিন্তু গভীর নিদ্রায় নিদ্রিত ব্যক্তির নাম ধরে ডাকলে সে জেগে ওঠে, অর্থাৎ অবিদ্যাতে লীন হওয়া গভীর নিদ্রায় নিদ্রিত ব্যক্তি পর্যন্ত শব্দ পৌঁছায়। তাৎপর্য এই যে শব্দে অচিন্তনীয় শক্তি আছে, তাই শব্দ অবিদ্যাকে ভেদ করে অহং পর্যন্ত পৌঁছায়। যেমন অনাদিকাল থেকে অবিদ্যায় আচ্ছাদিত জ্ঞানহীন ব্যক্তির মতো সংসারে মোহগ্রস্ত ব্যক্তির গুরুমুখে উপদেশ শ্রবণ করলে নিজের স্বরূপ সম্বন্ধে বোধ জাগ্রত হয়, অর্থাৎ অবিদ্যাসম্পন্ন মানুষকে শব্দদ্বারা তত্ত্বজ্ঞান করানো যায়।[১] এইরূপ যে ব্যক্তি তৎপরতার সঙ্গে ভগবৎ-নাম জপ করে, ঐ নাম তাকে স্বরূপের বোধ করায় এবং ভগবানের দর্শন পাইয়ে দেয়।

তত্ত্বজ্ঞ, জীবন্মুক্ত মহাপুরুষের মুখনিঃসৃত বাণীতে যে শব্দ (উপদেশ) নিঃসৃত হয়, শ্রদ্ধাসহকারে যদি তা কেউ শোনে তবে তার আচরণ, ভাব, সবকিছু শুধরে যায় এবং অজ্ঞান দূরীভূত হয়ে সে বোধসম্পন্ন হয়। কিন্তু যার বাণীতে অসত্য, কটুত্ব, বৃথা বাগাড়ম্বর, নিন্দা, পরচর্চা ইত্যাদি দোষ থাকে তার কথায় কারো উপর কোন প্রভাব পড়ে না; কারণ তার এরূপ আচরণের ফলে শব্দের শক্তি সংকুচিত হয়, তাতে শক্তি থাকে না। এইভাবেই স্বয়ং বক্তার মধ্যেও ভ্রম, প্রমাদ, লিপ্সা এবং করণাপাটব—এই চারপ্রকার দোষ থাকে। বক্তা যে বিষয়টির বর্ণনা করছেন, তিনি যদি তা ঠিকমতো না জানেন অর্থাৎ কিছুটা জানেন আর কিছুটা জানেন না—তবে একে '**ভ্রম**' বলা হয়। যিনি উপদেশ দেবার সময় সতর্ক থাকেন না, বেপরোয়া হয়ে কথা বলেন, শ্রোতা কোন শ্রেণীর, তারা কতটা বোঝে এই সমস্ত তিনি উপেক্ষা করেন—একে বলা হয় '**প্রমাদ**'। যে কোন ভাবে (আমার) পূজা হোক, সম্মান হোক, শ্রোতারা প্রচুর টাকা পয়সা দিক, আমার স্বার্থ সিদ্ধ হোক, শ্রোতারা কোন প্রকারে অধীন হোক, সব পরিস্থিতি অনুকূল হোক, বক্তা যদি এই সব ইচ্ছা রাখেন,—তাকে বলে '**লিপ্সা**'। বক্তব্যের শৈলীতে কুশলতা নেই, বক্তা শ্রোতার ভাষা জানেন না, শ্রোতা কি ধরনের কথা বুঝতে পারবে অর্থাৎ কিভাবে বর্ণনা করলে শ্রোতারা বুঝতে পারবে তা জানে না, একে করণাপাটব বলা হয়। এই চার দোষ বক্তার মধ্যে থাকলে তাঁর কথায় শ্রোতার জ্ঞান উৎপন্ন হয় না। এই সকল দোষরহিত যে সকল শব্দ, তার দ্বারা শ্রোতার জ্ঞান উৎপন্ন হয়। শ্রোতাও যদি শ্রদ্ধা, বিশ্বাস, জিজ্ঞাসা, তৎপরতা, সংযতেন্দ্রিয়তা ইত্যাদিতে যুক্ত হয় এবং পরমাত্মপ্রাপ্তি যদি তার উদ্দেশ্য হয়, তাহলে বক্তার কথায় তাঁর জ্ঞান হয়। এর তাৎপর্য এই যে, বক্তা অযোগ্য হলে শ্রোতার ওপর কোন প্রভাব পড়ে না এবং শ্রোতা অযোগ্য হলে তার ওপর বক্তার কোন প্রভাব পড়ে না। দুজনের যোগ্যতা থাকলে তাহলেই বক্তার কথার প্রভাব শ্রোতার ওপরে পড়ে। কিন্তু ভগবানের নামে এমনই শক্তি যে, মানুষ যেভাবেই তাঁর নামজপ করুক না কেন তার তাতে মঙ্গলই হয়।

ভাঁয় কুভাঁয় অনখ আলসহূঁ।
নাম জপত মঙ্গল দিসি দসহূঁ॥

(শ্রীরামচরিতমানস ১।২৮।১)

ভগবানের নাম যদি অবহেলা, সঙ্কেত বা পরিহাস ইত্যাদির ছলেও করা হয়, তাহলেও তিনি পাপের নাশ করবেনই।

সাঙ্কেত্যং পারিহাস্যং বা স্তোভং হেলনমেব বা।
বৈকুণ্ঠনামগ্রহণমশেষাঘহরং বিদুঃ॥

(শ্রীমদ্ভাগবত ৬।২।১৪)

ভগবান নিজের নাম সম্বন্ধে বলেছেন, 'যে জীব শ্রদ্ধা বা অবহেলাতেও আমার নাম উচ্চারণ করে, তার নাম

[১] শব্দে এমন বিশেষ শক্তি আছে যে, যা ইন্দ্রিয়ের সামনে নেই, শব্দ সেই পরোক্ষ বিষয়েরও জ্ঞান করিয়ে দেয়।

সর্বদা আমার অন্তরে থাকে'—

শ্রদ্ধয়া হেলয়া নাম রটন্তি মম জন্তবঃ।
তেষাং নাম সদা পার্থ বর্ততে হৃদয়ে মম॥

প্রশ্ন—গুড়ের কথা বললে মুখে তো মিষ্টিভাব আসে না, তবে ভগবানের নাম করে কি হবে?

উত্তর—যে বস্তুর নাম গুড়, তার সেই নামে গুড় নামক বস্তুর অভাব আছে অর্থাৎ গুড়ের নামটির মধ্যে গুড় নেই। যতক্ষণ রসনেন্দ্রিয় বা জিভের সঙ্গে গুড়ের সম্বন্ধ না করা হচ্ছে ততক্ষণ মুখ মিষ্টতা লাভ করে না, কেননা জিভে গুড় নেই। ঠিক এইরকমই ধনীর নাম নিলে ধন প্রাপ্ত হয় না। কেননা ধনী নামটির মধ্যে ধনের কোন অস্তিত্ব নেই। কিন্তু ভগবানের নামটির সঙ্গে ভগবান সর্বদা হাজির। নামী (ভগবান) থেকে নাম আলাদা নন এবং নাম থেকে নামী (ভগবান) আলাদা নন। নামীতে নাম উপস্থিত এবং নামেও নামী হাজির। অতএব নামীর অর্থাৎ ভগবানের নাম নিলে ভগবানকে পাওয়া যায়, নামী স্বয়ং প্রকটিত হন।

প্রশ্ন—নামতো কেবলমাত্র শব্দ, তার দ্বারা কী কার্য সিদ্ধ হবে?

উত্তর—সাধারণভাবেও শব্দমাত্রে অচিন্ত্য শক্তি আছে এবং নামে ভগবানের সঙ্গে সম্বন্ধ তৈরি করার এক বিশেষ ক্ষমতা আছে। অতএব যে কোন প্রকারেই নাম নেওয়া হোক না কেন, তার দ্বারা মঙ্গলই হয়। যে বিশেষ ভাবসহ নাম জপ করে তার খুব শীঘ্রই লাভ হয়।

সাদর সুমিরন জে নর করহীঁ।
ভব বারিধি গোপদ ইব তরহীঁ॥

(শ্রীরামচরিতমানস ১।১১৯।২)

নামজপের সময় যদি ভাব কম হয় তাহলেও নাম জপে লাভ হয়, তবে কতদিন পর হবে— তা বলা যায় না। নামজপের সংখ্যা বেশী বাড়িয়ে দিলে ভাব তৈরী হয়; কেননা যাঁরা নাম জপ করেন, তাঁদের অন্তরে সূক্ষ্ম ভাব থাকেই, নামের সংখ্যা বাড়ালে সেই ভাব প্রকটিত হয়।

নামজপ কোন নিছক ক্রিয়া নয়। এটি এক প্রকারের উপাসনা; কারণ নামজপে জপকারীর লক্ষ্য এবং সম্বন্ধ ভগবানের দিকেই থাকে। যেমন কর্মদ্বারা কল্যাণ হয় না, কর্ম নিজের ফল দান করে নষ্ট হয়ে যায়, কিন্তু কর্মের সঙ্গে মুখ্যভাবে যদি নিষ্কামভাব থাকে তাহলে সেই কর্ম কল্যাণকারী হয়ে ওঠে। তেমনি নামজপ যদি মুখ্যভাবে ভগবানকে লক্ষ্য রেখে করা হয়, তা হলে নামজপের দ্বারা ভগবৎসাক্ষাৎকার হয়ে যায়। ভগবানকেই মুখ্যরূপে লক্ষ্য করলে নাম চিন্ময় হয়ে ওঠে এবং তা ক্রিয়ারূপে থাকে না। শুধু তাই নয়, সেই চিন্ময়তা জপকারীতেও নেমে আসে, অর্থাৎ যে ব্যক্তি জপ করেন তাঁর শরীরও চিন্ময় হয়ে যায়, তাঁর শরীরের জড়ত্ব নষ্ট হয়। যেমন, সন্ত তুকারাম সশরীরে ঈশ্বরধামে গমন করেছিলেন, ভক্তিমতী মীরার দেহ ভগবানের বিগ্রহে মিশে গিয়েছিল, কবীরের দেহ অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল এবং সেই স্থানে ফুল পাওয়া গিয়েছিল। চোখামেলার অস্থিতে 'বিট্‌ঠল' নামের ধ্বনি শোনা যেত।

প্রশ্ন—শাস্ত্র এবং সাধুসন্তগণ ভগবৎনামের যে মহিমা গান করেছেন, তা কতদূর সত্য?

উত্তর—শাস্ত্র এবং সাধুসন্তগণ ভগবৎনামের যে মহিমা গান করেছেন, তা পুরোপুরি সত্য। শুধু তাই নয়, আজ পর্যন্ত যত নাম-মহিমা গীত হয়েছে তাতেও তাঁর নামমহিমা পুরোপুরি কীর্তন করা হয়নি। এখনো অনেক নামমহিমা বাকী আছে। কারণ ভগবান অনন্ত, তাই তাঁর নাম-মহিমাও অনন্ত—**'হরি অনন্ত হরিকথা অনন্তা'** (শ্রীরামচরিতমানস ১।১৪০।৩)। নামের পুরো মহিমা স্বয়ং ভগবানও বলতে সক্ষম নন—**'রামু ন সকহিঁ নাম গুন গাঈ'** (১।২৬।৪)।

প্রশ্ন—নামের যে মহিমা গীত হয়েছে, যে সমস্ত ব্যক্তি নাম জপ করেন তা তাঁদের মধ্যে দেখা যায় না, এর কারণ কি?

উত্তর—নামের মাহাত্মকে স্বীকার না করলে নামকে অবহেলা বা অপমান করা হয়, তাই সেই নাম তত প্রভাব ফেলে না। মন দিয়ে নামজপ না করা, ইষ্টের প্রতি ধ্যান সহকারে নাম জপ না করা এবং হৃদয় থেকে নামকে মাহাত্ম্য না দেওয়া ইত্যাদি দোষ ঘটলে নামের মাহাত্ম্য শীঘ্র দেখা যায় না। হ্যাঁ, কোনভাবে মুখে নাম-জপ করতে থাকলে তাতেও লাভ হয়, তবে এতে সময় লাগে। মন লাগুক না লাগুক নিরন্তর নামজপ করলে, কখনো বাদ না দিলে নাম মহারাজের কৃপায় সব কাজ হয়ে যায় অর্থাৎ মন লাগতে থাকে, নামের ওপর শ্রদ্ধা জাগ্রত হয়।

যদি ভগবৎনামে অনন্য ভক্তি থাকে এবং নিরন্তর

নামজপ হতে থাকে, তবে সত্যই তাতে লাভ হয় ; কারণ, ভগবৎনাম জাগতিক নামের মতো নয়। ভগবান চিন্ময় ; তাঁর নামও তাই চিন্ময় বা চেতন। রাজস্থানে বুধারাম নামে একজন সাধু ছিলেন। তিনি তৎপরতার সঙ্গে নামজপ শুরু করলেন। ক্রমে এমন হল যে স্বল্প সময়ের জন্যও নামজপ বাদ পড়লে তাঁর অসহ্য মনে হতো। খাবার তৈরী হয়ে গেলে মা খেতে ডাকতেন, তিনি খেয়ে এসে আবার নামজপ করতে লেগে যেতেন। একদিন তিনি মাকে বললেন, 'মা, রুটি খেতে অনেক সময় লাগে, তুমি কেবল দালিয়া (গমের খিচুড়ি) করে থালায় পরিবেশন করবে, ঠাণ্ডা হয়ে গেলে আমাকে খেতে ডাকবে।' মা তখন সেইমত ব্যবস্থা করলেন। আবার কিছুদিন পর বুধারাম বললেন, 'মা খিচুড়ি খেতেও সময় লাগে, এবার থেকে রাব্ (আটা এবং জলের মিশ্রণ বিশেষ) কোরো আর ঠাণ্ডা হলে তখন খেতে ডেকো।' এইভাবে নামজপ করতে থাকলে তবেই বাস্তবিক লাভ হয়।

প্রশ্ন—শ্রদ্ধা-বিশ্বাস পূর্বক নামজপ করলেই যদি লাভ হয়, তাহলে আবার নামের কি মহিমা ? তাতে তো শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসেরই মহিমা হয় ?

উত্তর—যেমন রাজাকে রাজা বলে না মানলে রাজা-দ্বারা যে লাভ হবার সেটি হয় না, পণ্ডিতকে পণ্ডিত বলে স্বীকার না করলে তাঁর কাছে যে লাভ হবার কথা সেই লাভ পাওয়া যায় না, তেমনি সাধু ও মহাত্মাদেরও সাধু ও মহাত্মারূপে না মানলে তাঁদের কাছ থেকে যে উপকার হবার তা হয় না। ভগবান অবতার রূপে আত্মপ্রকাশ করলে তাঁকে ভগবান বলে না মানলে তাঁর কাছ থেকে যে লাভ পাবার থাকে তা হয় না। কিন্তু রাজা প্রভৃতির কাছ থেকে লাভ পাওয়া না গেলেও তাতে তাঁদের কিছু কি ক্ষতি হয় ? ক্ষতি হয় তাদেরই যারা না মানে। তেমনি যারা নামে শ্রদ্ধা-বিশ্বাস করে না তারা নামজপ থেকে যে লাভ হওয়ার তা পায় না। কিন্তু তাতে নামের মহিমা কিছু মাত্র কমে না। ক্ষতি তাদেরই হয় যারা নামে শ্রদ্ধা-বিশ্বাস করে না।

নামে অনন্ত শক্তি। শ্রদ্ধা-বিশ্বাসে নামের শক্তি বাড়ে এবং শ্রদ্ধা-বিশ্বাস না থাকলে কমে—একথা ঠিক নয়। তবে যাঁদের নামে শ্রদ্ধা-বিশ্বাস থাকে তাঁরা নামের দ্বারা লাভবান হন এবং যাঁদের তা থাকে না তাঁদের লাভ হয় না। দ্বিতীয়তঃ যাঁরা নামে শ্রদ্ধা-বিশ্বাস করেন না, তাঁদের নামাপরাধ হয়।

প্রশ্ন—শ্রদ্ধা-বিশ্বাস ছাড়াও আগুনে হাত দিলে হাত পুড়ে যায়, তা হলে বিনা শ্রদ্ধা-বিশ্বাসে নাম করলে তৎক্ষণাৎ তার মহিমা প্রকটিত হয় না কেন ?

উত্তর—অগ্নি ভৌতিক বস্তু, তা শুধু ভৌতিক বস্তুকেই পোড়ায়। কিন্তু ভগবানের নাম অলৌকিক, দিব্য। নামজপকারী ব্যক্তির নামের দ্বারা যেমন ভাব বাড়তে থাকে, তেমনি নামের মহিমা তার কাছে প্রকটিত হতে থাকে, নাম-মহিমার অনুভূতি হতে থাকে এবং নামের মধ্যে বিচিত্র, অলৌকিক অনেক কিছু দেখতে থাকে। নামে এমন এক বিচিত্র ভাব আছে যে মানুষ বিনা ভাবে বা শ্রদ্ধায় যদি সব সময় নাম করতে থাকে, তাহলেও তার সামনে নামের শক্তি প্রকটিত হয়ে পড়বে, তবে তাতে কিছু সময় লাগতে পারে।

প্রশ্ন—একবার নাম করলেই কি সব পাপ নষ্ট হয়ে যায় ?

উত্তর—হ্যাঁ, আর্তভাবে যদি একবার নাম করা যায় তাহলে সব পাপ নষ্ট হয়ে যায়। অন্তিম সময়ে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষাকারী কাউকে সামনে দেখতে পাওয়া যায় না, সব দিক থেকেই নিরাশ হতে হয় ; সেই সময় আর্তভাবে একবার যদি মুখ থেকে ভগবানের নাম উচ্চারিত হয়, তাহলে সেই একবার করা নামই সমস্ত পাপরাশিকে নষ্ট করে দেয়। যেমন গজেন্দ্রকে কুমীর টেনে জলে নিয়ে যাচ্ছিল, গজেন্দ্র দেখল, 'এখন আমাকে রক্ষা করার কেউ নেই। সাক্ষাৎ মৃত্যু হাজির হয়েছে, তখন সে আর্তভাবে একবার তাঁর নাম স্মরণ করল। নাম স্মরণ করামাত্র ভগবান এলেন এবং কুমীরকে মেরে গজেন্দ্রকে রক্ষা করলেন।'

ভগবানের নামে যাঁর শ্রদ্ধা-বিশ্বাস এবং অনন্যভাব আছে, তিনি একবার নাম করলেই কল্যাণ হয়।

প্রশ্ন—যদি একবার নাম করলেই সব পাপ দূরীভূত হয়, তাহলে বার বার নাম নেওয়ার কি প্রয়োজন ?

উত্তর—বার বার নাম নিতে নিতেই সেই আর্তভাব আসে। মোটরের ইঞ্জিনকে চালু করতে গেলে যেমন বার বার হাতল ঘোরাতে হয়। হাতল ঘোরানোয় ইঞ্জিন

প্রথমবারেই চালু হবে, না আরও পাঁচ-দশ বার হাতল ঘোরাতে হবে তা বলা যায় না ; কিন্তু হাতল ঘোরাতে ঘোরাতে কোন একবার ইঞ্জিন চালু হয়ে যায়। তেমনি বার বার ভগবানের নাম নিতে নিতে কোন না কোন সময় সেই বিশেষ আর্তভাব এসে যায়। তাই বার বার নাম করা খুবই প্রয়োজন।

প্রশ্ন—যে সমস্ত মানুষ নাম জপ করেন এবং নিষিদ্ধ কর্মও করেন, তাঁদের কি উদ্ধার হবে ?

উত্তর—সময় এলে তাদের উদ্ধার তো হবেই। কেননা, যে কোন প্রকারেই ভগবানের নাম নেওয়া হোক না কেন তা নিষ্ফল হয় না। কিন্তু নামজপের যে প্রত্যক্ষ প্রভাব, তা তারা দেখতে পাবে না। আসলে যাঁর পরমাত্মাকে পাওয়াই একমাত্র উদ্দেশ্য নয়, তাঁর দ্বারা নিষিদ্ধ কর্মও হয়। যাঁর উদ্দেশ্য একমাত্র পরমাত্মপ্রাপ্তি, তাঁর দ্বারা কোন নিষিদ্ধ কর্ম হওয়া সম্ভব নয়। যেমন যার লক্ষ্য একমাত্র উপার্জন ও সঞ্চয়, সে এমন কোন কাজ করে না যাতে অর্থের অপচয় হয়। সে অর্থের ক্ষতি সহ্য করতে পারে না। যদি কোন কারণে অর্থক্ষতি হয় তো সে অস্থির হয়ে যায়। তেমনি যাঁর ধ্যেয় পরমাত্মপ্রাপ্তি, তিনি সাধনার বিপরীত কোন কাজ করেন না। যদি কোন ব্যক্তি এমন বিপরীত কাজ করে, তাহলে প্রমাণিত হয় যে এখনো পরমাত্মপ্রাপ্তি তার ধ্যেয় নয়।

সাধকের উচিত পরমাত্মপ্রাপ্তিকেই দৃঢ়ভাবে ধ্যেয় করে রাখা এবং নাম জপ করতে থাকা, তাহলে তার দ্বারা আর কোন গর্হিত কাজ হয় না। যদি কোন নিষিদ্ধ কাজ তার দ্বারা হয়েও যায়, তাতে সে এতো অনুতপ্ত হয় যে পরে আর কখনও সেই কাজ তার দ্বারা হয় না।

প্রশ্ন—যে অনেক পাপ করেছে, সে ভগবানের নাম করতে পারে না, তাহলে সে কি করবে ?

উত্তর—একথা ঠিক। যার পাপ বেশী, সে ভগবানের নাম নিতে পারে না।

বৈষ্ণবে ভগবদ্ভক্তৌ প্রসাদে হরিনাম্নি চ।
অল্পপুণ্যবতাং শ্রদ্ধা যথাবন্নৈব জায়তে ॥

অর্থাৎ যার অল্প পুণ্য, তার ভক্তে, ভক্তিতে, ভগবৎপ্রসাদে এবং ভগবৎ নামে শ্রদ্ধা হয় না।

যেমন শরীরে পিত্তের প্রকোপ বাড়লে রোগীর মিছরীও তেতো লাগে, কিন্তু যদি সে মিছরী খেতে থাকে, তাহলে তার পিত্ত শান্ত হয় এবং ক্রমশঃ মিছরী মিষ্টি লাগে। তেমনি পাপ বেশী হলে নাম ভালো লাগে না ; কিন্তু যদি নাম জপ শুরু করে দেওয়া হয়, তবে পাপ নাশ হয়ে যায় এবং নাম ভালো লাগতে থাকে, মিষ্টি লাগতে থাকে এবং নামজপের প্রত্যক্ষ লাভও দেখতে পাওয়া যায়।

প্রশ্ন—যার ভাগ্যে নামজপ লেখা আছে, সে তো নাম নিতে পারে, তার মুখে নাম উচ্চারণ হতে পারে ; কিন্তু যার ভাগ্যে নামজপ লেখা নেই, সে কি ভাবে নাম নেবে ?

উত্তর—এক 'হওয়া' আর অন্যটি 'করা'। ভাগ্য অর্থাৎ পুরানো কর্মের ফল 'হওয়া', আর নতুন কর্ম 'করা' হয়, তা 'হওয়া'-র অন্তর্ভুক্ত নয়। যেমন ব্যবসা হল 'করা' ও তাতে লাভ বা লোকসান হল 'হওয়া' ; কৃষিকাজ হল 'করা' এবং ফল হল ফসল 'হওয়া' বা 'না হওয়া'; মন্ত্র সকামভাবে জপ বা অনুষ্ঠান হল 'করা' এবং নীরোগ হওয়া না হওয়া ইত্যাদি ফল হল 'হওয়া'। বদ্রীনাথ যাওয়া—এই যাত্রারূপী কর্ম হল 'করা' আর চলতে চলতে পৌঁছানো— এটা হল 'হওয়া'। লাভ-ক্ষতি, বাঁচা-মরা, যশ-অপযশ এ সমস্তই হল 'হওয়ার' অন্তর্ভুক্ত কেননা এ সমস্তই পূর্বজন্মকৃত কর্মের ফল[1]। কিন্তু নাম জপ 'করা' হল নতুন কর্ম। এটি নবীন কর্মের অন্তর্ভুক্ত ; 'হওয়ার' অন্তর্ভুক্ত নয়। এটি করার ক্ষেত্রে সকলেই স্বাধীন। হ্যাঁ, তাতে এই কথা হতে পারে যে যদি কেউ পূর্বে নাম জপ করে থাকে, তাহলে নামজপের মহিমা শুনলেই তার মনে নাম জপ করবার ইচ্ছা জাগবে এবং সে সেটি অত্যন্ত সহজভাবে করতে থাকবে। কিন্তু যে পূর্বে নাম জপ করেনি, সে যদি নামজপের মহিমা

[1]সুনহু ভরত ভাবী প্রবল বিলখি কহেউ মুনিনাথ। হানি লাভু জীবনু মরনু জসু অপজসু বিধি হাথ॥
(শ্রীরামচরিতমানস ২।১৭১)

শোনেও তবু তার শীঘ্র নামজপের ইচ্ছা হবে না। কিন্তু যিনি নামজপের মহিমা জানাচ্ছেন তিনি যদি অনুভবী হন তাহলে তাঁর কাছ থেকে যে শোনে, তার নামে রুচি আসে এবং ঐ অনুভবী ব্যক্তির সঙ্গে থাকতে থাকতে তারও নামজপ করা সহজ হয়ে যায়।

ভাগ্যে যা লেখা থাকে সেটি হল 'ফল', নতুন কর্মের ফল নয়। নামজপ করা যদি একবার শুরু হয় তা হতেই থাকবে ; কেননা, নামজপ করা নতুন কর্ম, নতুন উপাসনা। সুতরাং 'আমার ভাগ্যে নামজপ করা, সৎসঙ্গ করা, শুভ কর্ম করা লেখা নেই'— এইসব বলা বাজে বাহানা মাত্র। 'নামজপ, সৎসঙ্গ ইত্যাদি আমার ভাগ্যে নেই'— এইরূপ ভাব পোষণ করা কুসঙ্গতুল্য, যা নামজপ ইত্যাদি করার ভাবকে নষ্ট করে।

প্রশ্ন—নাম জপের দ্বারা ভাগ্য বা প্রারব্ধ কি বদলাতে পারে ?

উত্তর—হ্যাঁ, ভগবৎনাম জপ করলে, কীর্তন করলে প্রারব্ধ বদলায়, নতুন প্রারব্ধ সৃষ্টি হয় ; যে বস্তু পাবার নয় তা পাওয়া যায়, অসম্ভব সম্ভব হয়—সাধু এবং মহাপুরুষ এটি অনুভব করেছেন। যিনি কর্মের ফল বিধান করেছেন, তাঁকে যদি কেউ ডাকে, তাঁর নাম নেয় তাহলে নামজপকারীর প্রারব্ধ যে বদলাতে পারে তাতে আশ্চর্য কি ? যারা ভিক্ষা করে, যাদের ভরপেট অন্ন জোটে না, তারা যদি পবিত্র হৃদয়ে নামজপ করতে শুরু করে, তাহলে তাদের খাদ্য এবং বস্ত্রের অভাব ঘুচে যায়। কোন জিনিসের আর অনটন থাকে না। কিন্তু নামজপকে প্রারব্ধ বদলানো বা পাপনাশক হিসাবে ব্যবহার করা উচিত নয়। অমূল্য রত্নের বদলে যেমন কয়লা কেনা বুদ্ধিমানের কাজ নয়, অমূল্য ভগবৎনামও তেমনি সাধারণ কাজে ব্যয়িত করা বুদ্ধিমানের পরিচয় নয়।

প্রশ্ন—কেবল নামজপের দ্বারাই যখন সর্ব পাপ নাশ হয়, তাহলে শাস্ত্রে পাপমুক্ত হওয়ার জন্য নানাপ্রকার প্রায়শ্চিত্তের কথা কেন বলা হয়েছে ?

উত্তর—নামজপের দ্বারা জ্ঞাত-অজ্ঞাত ইত্যাদি সমস্ত পাপেরই প্রায়শ্চিত্ত হয়, সমস্ত পাপ দূরীভূত হয়। কিন্তু নামে শ্রদ্ধা-বিশ্বাস হয় না বলে শাস্ত্রে নানা প্রকার প্রায়শ্চিত্তের কথা বলা হয়েছে। যদি নামের উপর শ্রদ্ধা-বিশ্বাস থাকে, তাহলে অন্য প্রায়শ্চিত্তের প্রয়োজন হয় না। নামজপকারী ভক্ত দ্বারা যদি কোন পাপ হয়েও যায় বা কোন ভুলও হয়, তাহলে তার জন্য প্রায়শ্চিত্ত করার প্রয়োজন নেই। আন্তরিকতার সঙ্গে নামজপ করলে সব মোচন হয়ে যায়।

প্রশ্ন—কেউ যদি সকামভাবে নামজপ করে, তাহলে কি নামজপের মাহাত্ম্য নষ্ট হয়ে যায় ?

উত্তর—যদিও সাংসারিক তুচ্ছ কামনাগুলির পূর্তির উদ্দেশ্যে ভগবানের নাম নিয়োগ করা বুদ্ধিমানের কাজ নয়, তবু সকামভাবেও যদি ভগবানের নামজপ করা যায় তাতে নামের মাহাত্ম্য নষ্ট হয় না। নামজপকারীর পারমার্থিক লাভ হবেই। কেননা নামের সঙ্গে ভগবানের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ আছে। তবে হ্যাঁ, নামকে সাংসারিক কামনা পূর্তির উদ্দেশ্যে প্রয়োগ করে নামের যে অসম্মান হয়, তাতে তার পারমার্থিক লাভ কম হয়। যদি তৎপরতার সঙ্গে নামজপে লেগে থাকা যায়, নামপরায়ণ হওয়া যায়, তাহলে নামের কৃপায় সকামভাব দূর হয়। ধ্রুব রাজ্য পাবার আশায় সকামভাবে নামজপ করেছিলেন ; কিন্তু যখন তিনি ভগবানের দর্শন পেলেন, তখন রাজ্য এবং পদ পেয়েও তিনি সন্তুষ্ট হলেন না, তিনি নিজ সকামভাবের জন্য অনুতপ্ত হলেন। অর্থাৎ ভগবদ্ দর্শনেই তাঁর সকামভাব দূরীভূত হল।

যে ব্যক্তি সকামভাবে নামজপ করেন, তাঁরও নামের কৃপায় অন্তিম সময়ে নাম স্মরণে আসতে পারে এবং তাঁর কল্যাণ হতে পারে।

প্রশ্ন—শাস্ত্র তথা সাধুগণ বলেন যে, এত সংখ্যায় নাম জপ করলে ভগবানের দর্শন পাওয়া যায়, সত্যিই কি তাই হয় ?

উত্তর—হ্যাঁ,

'হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥'

এই মন্ত্র সাড়ে তিন কোটি জপ করলে ভগবদ্ দর্শন হয়—**'কলিসন্তরণোপনিষদ্'**-এ এইরূপ বলা আছে। 'রাম' নাম তের কোটি বার জপ করলে ভগবদ্দর্শন হয়—সমর্থ রামদাসবাবাজী তাঁর 'দাসবোধ' গ্রন্থে এরূপ লিখেছেন। যদি নামে এবং ভগবানে শ্রদ্ধা-বিশ্বাস এবং অনুরাগ বেশী থাকে, তাহলে উপরিউক্ত সংখ্যায় জপ করার আগেই ভগবদ্ দর্শন হতে পারে।

প্রশ্ন—**নহি কলি করম ন ভগতি বিবেকূ। রাম নাম অবলম্বন একূ।** (শ্রীরামচরিতমানস ১।২৭।৪)—এইরূপ বলার অর্থ কি?

উত্তর—কলিযুগে যজ্ঞাদি শুভকর্মের আচার-অনুষ্ঠান যথাযথভাবে করা অত্যন্ত কঠিন এবং তার বিধি-বিধান ঠিকমত জানা ব্যক্তিও খুঁজে পাওয়া কঠিন। তাই কলিযুগে শুভকর্মের অনুষ্ঠান এবং বিধি পালন ঠিকভাবে না হওয়ায় যজ্ঞকারীর দোষ-স্পর্শ ঘটে।

বৈধীভক্তির সাধন বিধি ও বিধান দ্বারা করা হয়। কিন্তু কোন্ ইষ্ট দেবতাকে কোন্ বিধিতে পূজা করা উচিত — এইসব জানা ব্যক্তি আজকাল খুব কম আছে। তাই ঐরূপে পূজা অর্চনা করা কলিযুগে অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়েছে।

জ্ঞানমার্গ কঠিন এবং সেই জ্ঞানমার্গের সাধনা জানাবার মত সমর্থ পুরুষ পাওয়াও অত্যন্ত কঠিন। সুতরাং বিবেকমার্গে চলা কলিযুগে খুবই দুঃসাধ্য। ফলতঃ কলিযুগে কর্ম, ভক্তি এবং জ্ঞান এই তিনটি সাধনমার্গই কঠিন হয়ে পড়েছে। কিন্তু ভগবানের নামজপ স্মরণ করা কঠিন নয়। ভগবানের নাম সকলেই করতে পারে, কারণ তাতে কোন বিধিনিষেধ নেই। বালক, বৃদ্ধ, স্ত্রী, পুরুষ, রোগী প্রভৃতি সকলেই সবসময় সকল অবস্থাতেই তাঁর নাম করতে পারে।

নাম হচ্ছে একটি সম্বোধন, আহ্বান। তাতে আর্তভাবই মুখ্য, বিধিনিষেধ মুখ্য নয়। সুতরাং প্রত্যেক মানুষ আর্তভাবে ভগবানকে আহ্বান করতে পারে।

প্রশ্ন—নামজপে মন লাগে না আর মন না লাগলে নামজপ করে কিছু লাভ হয় না। বলাও হয়েছে—

মালা তো কর মেঁ ফিরে, জীভ ফিরৈ মুখ মাহিঁ।
মনুবাঁ তো চহুঁ দিসি ফিরৈ, য়হ তো সুমিরন নাহিঁ॥

উত্তর—মন যদি না লাগে তাহলে স্মরণও হবে না—একথা সত্য, কিন্তু নামজপ হবে না একথা দোঁহাতে বলা নেই। মন না লাগলে স্মরণ হবে না তো নাই হোক। কিন্তু নাম জপ তো হবে। নাম জপ কখনো ব্যর্থ হতে পারে না, অতএব মন লাগুক না লাগুক জপ করতে থাকা উচিত।

যখন মন লাগবে, তখন নামজপ করব— এইরকম হওয়া উচিত নয়। হ্যাঁ, যদি আমি নামজপ করতে থাকি তবে তাতে মনও লেগে যাবে, কেননা জপের পরিণামই হচ্ছে মন লাগা।

প্রশ্ন—শাস্ত্রে আছে, যে ব্যক্তি নাম না নিতে চায়, নামে যার কোন শ্রদ্ধা নেই তাকে নাম শোনান উচিত নয়, কেননা তাতে নামাপরাধ হয়। কিন্তু গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু আদি মহাপুরুষগণ তবে যাদের নামে শ্রদ্ধা নেই তাদেরও কেন নাম শুনিয়েছিলেন?

উত্তর—যে ব্যক্তি নাম শুনতে চায় না, মুখেও বলতে চায় না, নামের অপমান করে, তাকে নাম শোনান উচিত নয়—এই হচ্ছে বিধি; শাস্ত্রের আদেশ। তবুও সাধু-মহাপুরুষগণ দয়াপূর্বক তাদের নাম শোনান। তাঁদের কৃপাদানে কোন বিধি-নিষেধের নিয়ম প্রযোজ্য হয় না। মহাপুরুষের দয়া-কর্ম সমস্ত বিধিনিষেধের অতীত। মহাত্মাদের দয়া অহৈতুকী হয়, হেতু ছাড়াই করা হয়। যেমন, কোন ভগবৎপ্রাপ্ত সাধু বা মহাপুরুষ যদি নিজ সামর্থ্যে অপরকে কিছু দেন, তাহলে তা প্রাপকের পূর্বকর্মের ফল নয়, তা হল ঐ সাধু বা মহাপুরুষের দয়া। তেমনি গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু দয়াপরবশ হয়ে অসৎ, পাপী ব্যক্তিদেরও ভগবৎ নাম শুনিয়েছেন।

প্রশ্ন—যদি মরণাপন্ন পশু বা পক্ষী ইত্যাদিকে ভগবৎনাম শোনান হয়, তাহলে কি তাদের উদ্ধার হতে পারে?

উত্তর—পশু-পক্ষী ইত্যাদি ভগবৎনামের প্রভাব বোঝে না। তবে যদি আপনা থেকেই নামের প্রভাব এসে পড়ে, তবে তার বিরুদ্ধতাও করে না। তারা নামের নিন্দা, অপমান অথবা ঘৃণাও করে না। সুতরাং তাদের মৃত্যুর সময়ে যদি নাম শোনান হয়, তাহলে তাদের ওপর নামের প্রভাব কার্যকরী হয় অর্থাৎ নামের প্রভাবে তাদের উদ্ধার হয়ে যায়।

প্রশ্ন—মৃত্যুকালে কেউ যদি তার 'নারায়ণ' 'বাসুদেব' প্রভৃতি পুত্রদের নাম করে, ভগবান তা নিজের নাম বলেই মেনে নেন, এরূপ কেন হয়?

উত্তর—ভগবান অত্যন্ত দয়ালু, তিনি আমাদের এই বিশেষ সুযোগ দিয়েছেন যে যদি মানুষ শেষ সময়েও কোনও প্রকারে তাঁর নাম নেয়, তাঁকে স্মরণ করে, তাহলে তার কল্যাণ হবে। কারণ ভগবান জীবের কল্যাণের জন্যই তাকে মনুষ্য শরীর দিয়েছেন এবং জীব যদি কল্যাণ লাভ করতে সমর্থ হয়, তাহলে জীবকে

ভগবানের মনুষ্য শরীর দেওয়া এবং জীবের মনুষ্যশরীর গ্রহণ সার্থক হয়।

কিন্তু মানুষ নিজের কল্যাণ না করেই শরীর ত্যাগ করতে উদ্যত, তাই ভগবান তাকে সুযোগ দেন যে, 'এখন চলে যাওয়ার সময়েও যদি কোন প্রকারে তুমি আমার নাম করো, আমাকে স্মরণ করো তবে কল্যাণ হবে।' মৃত্যু সময়ে ভয়ানক যমদূতকে দেখে যেমন অজামিল নিজ পুত্র নারায়ণকে ডাকলেন, ভগবান সেটি তাঁর নামরূপে গ্রহণ করে নিজের চার পার্ষদকে পাঠালেন অজামিলের কাছে।

এর তাৎপর্য হল এই যে, মানুষকে রাত-দিন, খাওয়া-পরা চলায়-ফেরায়, শয়নে-জাগরণে সব সময় ভগবানের নাম স্মরণ রাখা উচিত।

(৮) গীতায় ফলসহ বিবিধ উপাসনার বর্ণনা

গোবিন্দাচার্যদেবানাং পিতৃণাং যক্ষরক্ষসাম্।
উপাসনা চ ভূতানাং ফলং প্রোক্তং তু ভাবতঃ॥

গীতায় ভগবান, আচার্য, দেবতা, পিতৃপুরুষ, যক্ষ-রাক্ষস, ভূত-প্রেত প্রভৃতির উপাসনা (বিস্তারিত ভাবে বা সংক্ষেপে) ফলসহিত বর্ণিত হয়েছে যেমন—

১) অর্থার্থী, আর্ত, জিজ্ঞাসু এবং জ্ঞানী (অনুরাগী) —এই চার প্রকারের ভক্ত ভগবানের ভজনা করেন অর্থাৎ তাঁর শরণাগত হন (৭।১৬)

ভগবানের ভজন-পূজনকারী ভক্ত ভগবানকে প্রাপ্ত হন—'**মদ্ভক্তা যান্তি মামপি**' (৭।২৩) ; '**যান্তি মদ্‌যাজিনোঽপি মাম্**'[১] (৯।২৫)।

২) যিনি বাস্তবে জীবন্মুক্ত, তত্ত্বজ্ঞ ও ভগবৎপ্রেমী মহাপুরুষ, যাঁর জীবনযাত্রা শাস্ত্রনির্দেশ অনুসারে নির্বাহ হয়, তিনিই প্রকৃত 'আচার্য'। এইরূপ আচার্যের আজ্ঞা পালন করা, তাঁর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নিজের জীবন তৈরী করাই হল তাঁর উপাসনা (৪।৩৪ ; ১৩।৭)। এইভাবে আচার্যের উপাসনাকারী মানুষও মৃত্যুকে অতিক্রম করেন (৪।৩৫) ; (১৩।২৫)।

৩) যে সব ব্যক্তি কামনা-বাসনায় মগ্ন হয়ে থাকে এবং ভোগবিলাস ও অর্থসংগ্রহ ছাড়া আর কিছুই করার নেই বলে মনে করে, তারা ভোগসামগ্রী প্রাপ্তির আশায় বেদোক্ত সকামকর্ম করে থাকে (২।৪২-৪৩)। কর্মের সিদ্ধি বা ফল আশা করেন যেসব ব্যক্তি, তাঁরা দেবতাদের পূজা করেন, কেননা মনুষ্যলোকে কর্মজনিত সিদ্ধি অত্যন্ত শীঘ্র পাওয়া যায় (৪।১২)। সুখভোগের কামনায় যাদের বিবেক রুদ্ধ, তারা ভগবানকে ত্যাগ করে দেবতাদের শরণাপন্ন হয় এবং নিজ নিজ স্বভাবের বশবর্তী হয়ে কামনাপূর্তির উদ্দেশ্যে অনেক নিয়ম এবং উপায় অবলম্বন করে (৭।২০)। ভগবান বলেছেন, যে ভক্ত যে দেবতাকে পূজা করতে চায়, আমি সেই দেবতার প্রতি তার শ্রদ্ধা দৃঢ় করে দিই। তখন সে শ্রদ্ধাযুক্ত হয়ে সেই দেবতার পূজা করে। কিন্তু তার সেই উপাসনার ফল আমার বিধানমতই পেয়ে থাকে (৭।২১-২২)। তিনটি বেদে বর্ণিত সকাম কর্মপালনকারী, সোমরস পানকারী পাপরহিত ব্যক্তি যজ্ঞ দ্বারা ইন্দ্রের পূজা করে স্বর্গ প্রাপ্তি কামনা করে (৯।২০)। যারা কামনা রেখে শ্রদ্ধাপূর্বক অন্য অন্য দেবতার পূজা করে, বাস্তবে তারাও আমারই পূজা করে ; কিন্তু তাদের এই পূজা বৈধী পূজা নয়। (৯।২৩)।

দেবতাদের পূজনকারী ব্যক্তিগণ স্বর্গলোকে গমন করে

[১]গীতায় ভগবানের উপাসনার কথাই মুখ্য ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। এই 'গীতা-দর্পণ' পুস্তকটিতেও বিভিন্ন স্থানে ভগবানের উপাসনার অনেক প্রকারের ব্যাখ্যা করা হয়েছে। সেইজন্য এখানে ভগবানের উপাসনার বর্ণনা অত্যন্ত সংক্ষেপে করা হল।

এবং সেখানে নিজ পুণ্য ফল ভোগ করে পুনরায় মর্তলোকে ফিরে আসে (৯।২০-২১)। দেবতাদের যারা পূজা করে, তারা দেবতাকে লাভ করে এবং দেবলোকে গমন করে **'দেবান্ দেবযজঃ'** (৭।২৩) ; **'যান্তি দেবব্রতা দেবান্'** (৯।২৫)।

৪) পূর্বপুরুষগণের ভক্তগণ পিতৃগণের পূজা করে এবং তার ফলস্বরূপ তারা পিতৃলোক প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ পিতৃলোকে গমন করে—**'পিতৃন্ যান্তি পিতৃব্রতাঃ'** (৯।২৫)। (কিন্তু যদি তারা নিষ্কামভাবে কর্তব্য মনে করে পূজাদি করে, তাহলে তারা মুক্ত হয়ে যায়।)

৫) রজঃগুণ প্রধান ব্যক্তিগণ যক্ষ এবং রক্ষঃদের পূজা করে (১৭।৪) এবং তার ফলস্বরূপ যক্ষ এবং রক্ষঃলোক প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ ঐসব যোনি প্রাপ্ত হয়।[1]

৬) তমোগুণ-প্রধান ব্যক্তি ভূত-প্রেতাদির পূজা করে (১৭।৪)। যারা ভূত প্রেতাদির পূজা করে তারা ভূত-প্রেতলোক প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ সেইসকল যোনিতে জন্ম গ্রহণ করে—**'ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যাঃ'** (৯।২৫)।[2]

গীতায় নিষ্কামভাবে ব্যক্তি, দেবতা, পিতৃ, যক্ষ-রক্ষ ইত্যাদির সেবা ও পূজা নিষেধ করা হয় নি। উপরন্তু নিষ্কামভাবে সকলের সেবা এবং উপকার করার অনেক মহিমা কীর্তন করা হয়েছে (৫।২৫; ৬।৩২ ; ১২।৪)। এর তাৎপর্য এই যে নিষ্কামভাবে এবং শাস্ত্রের বিধানমত কেবল দেবতাদের পুষ্টির জন্য, তাঁদের উন্নতির জন্য যে কর্তব্যকর্ম, পূজা ইত্যাদি করা হয় তার দ্বারা মানুষ বদ্ধ হয় না, বরং সেই পরমাত্মাকেই প্রাপ্ত হয় (৩।১১)। এইরূপই নিষ্কামভাবে এবং শাস্ত্র আজ্ঞায়, কর্তব্য মনে করে পিতৃগণের তৃপ্তির উদ্দেশ্যে শ্রাদ্ধ-তর্পণ করলে, তাতেও পরমাত্মাকেই প্রাপ্ত হওয়া যায়। যক্ষ-রাক্ষস, ভূত-প্রেত ইত্যাদির উদ্ধারের জন্য, তাদের সুখ-শান্তি দানের উদ্দেশ্যে নিষ্কামভাবে, শাস্ত্রবিধিমতে তাদের নামে গয়াতে শ্রাদ্ধ তর্পণ, ভাগবত-পারণ, দান, ভগবৎ নামের কীর্তন, গীতা-রামায়ণ আদি পাঠ করলে তাদের উদ্ধার হয়, তারা সুখ-শান্তি পায় এবং সাধকগণের পরমাত্মার প্রাপ্তি হয়। যদি ঐসব দেবতা, পিতৃ, যক্ষ-রক্ষ, ভূত-প্রেত ইত্যাদিকে নিজ ইষ্ট মনে করে সকামভাবে তাঁদের পূজা করা হয়, তবে তা বন্ধনের মুখ্য কারণ হয় এবং জন্ম-মৃত্যু ও অধোগতির কারণ হয়।

'ব্যক্তি-দেবতা-পিতৃ-যক্ষ-রক্ষ-ভূত-প্রেত-পশু-পক্ষী ইত্যাদি সকল প্রাণীর মধ্যে আমার প্রভুই আছেন, এই প্রাণীদের রূপেই আমার প্রভু বিরাজিত'— এইরূপ মনে করে ভগবদ্বুদ্ধিতে নিষ্কামভাবে সকলের সেবা করলে পরমাত্মাকে পাওয়া যায়।

উপরিউক্ত দুটি বাক্যের তাৎপর্য এই যে, নিজের সকামভাব এবং যার সেবা করা হয় তাতে ভগবদ্বুদ্ধি না হওয়াই জন্ম-মৃত্যু চক্রে আবর্তিত হওয়ার কারণ। যদি নিজের মধ্যে নিষ্কামভাব থাকে এবং যাঁর সেবা করা হবে, তাঁতে ভগবদ্বুদ্ধি থাকে, তাহলে সেই সেবাই পরমাত্মপ্রাপ্তি করাতে পারে।

একটি বিশেষ কথা হল এই যে, ভগবানের উপাসনা সকামভাবে করলেও সেই উপাসনার দ্বারাও উদ্ধার পাওয়া যায়, যদি তাঁতে অনন্যভাব থাকে। ভগবান গীতায় অর্থার্থী, আর্ত, জিজ্ঞাসু ও জ্ঞানী এই চার প্রকার ভক্তকে উদার বা উৎকৃষ্ট রূপে অভিহিত করেছেন (৭।১৮)। তিনি বলেছেন 'আমাকে যারা পূজা করে তারা আমাকেই পায়' (৭।২৩, ৯।২৫)। মানুষ যে কোন ভাব নিয়েই ভগবানের প্রতি আকৃষ্ট হোক না কেন তার উদ্ধার হবেই।

দেবতা আদির উপাসনার ফল বিনাশশীল (অনিত্য) হয় (৭।২৩) ; কারণ দেব উপাসক ব্যক্তি পুণ্য-ফলের

---

[1] গীতায় ভগবান যক্ষ-রক্ষ পূজার বর্ণনা তো করেছেন —'যক্ষরক্ষাংসি রাজসাঃ' (১৭।৪) কিন্তু এই পূজা দ্বারা কি ফল হয় তা বর্ণনা করেন নি। এর তাৎপর্য এই যে যেমন দেবতাদের পূজা করলে দেবলোক প্রাপ্ত হওয়া যায় (৯।২৫), তেমনি যক্ষ-রক্ষ পূজা যারা করে, তারা যক্ষ-রক্ষঃলোক প্রাপ্ত হয়। কারণ যক্ষ-রাক্ষসও দেবযোনি হবার ফলে দেবতাগণের অন্তর্গত।

[2] সপ্তদশ অধ্যায়ের চতুর্দশ শ্লোকে 'দেব-দ্বিজ-গুরু- প্রাজ্ঞপূজনং' পদ দ্বারা যে দেবতা, ব্রাহ্মণ, গুরুজন এবং বিদ্বান প্রমুখ ব্যক্তির পূজার কথা বলা হয়েছে, তাকে এখানে বর্ণিত উপাসনার অন্তর্গত করা হয় নি। কারণ সেখানে শুধু 'শারীরিক তপের (কেবল শরীর সম্বন্ধীয় পূজা, আপ্যায়ন, সৎকার ইত্যাদি) কথাই বলা হয়েছে, যা অনাদিকাল থেকে মুক্তি লাভের একটি উপায়। দ্বিতীয়তঃ সেই দেবতা, ব্রাহ্মণ ইত্যাদির পূজা কেবল শাস্ত্র-আজ্ঞা মনে করে কর্তব্যরূপে পালন করা হয়, তাঁদের ইষ্ট মনে করে নয়।'

শক্তিতে স্বর্গাদি উচ্চলোকে গমন করে এবং পুণ্য ক্ষয় হলে পুনরায় মর্ত্যজগতে জন্ম নেয়। কিন্তু পরমাত্মার প্রাপ্তি অবসিত হয় না (৮।১৬)। কারণ এই জীব পরমাত্মারই অংশ (১৫।৭)। সুতরাং জীব যখন নিজ অংশী পরমাত্মার কৃপায় তাঁকে প্রাপ্ত হয়, তখন সে আর সেখান থেকে ফিরে আসে না (৮।২১, ১৫।৬)। পরমাত্মার কৃপা নিত্য এবং স্বর্গাদিলোকে যাবার যে পুণ্য, তা অনিত্য।

জ্ঞাতব্য

প্রশ্ন—ভগবান বলেছেন যে, ভূত-প্রেতাদির উপাসনাকারী পরজন্মে ভূত-প্রেতই[1] হয়ে যায় (৯।২৫), এরূপ কেন হয়?

উত্তর—ভূত-প্রেতাদির উপাসনাকারীর অন্তঃকরণে ভূত-প্রেতের প্রাধান্য থাকে এবং ভূত-প্রেতই তাদের উপাস্য হয়। অতএব মৃত্যুকালে তার মনে প্রেতাদির চিন্তাই থাকে এবং সেই চিন্তা অনুসারে সে ভূত-প্রেতের যোনিই লাভ করে (৮।৬)।

যদি কোন মানুষ এরূপ ভাবে যে, 'এখন আমি পাপ ব্যভিচার অত্যাচার যা করবার সব করে নিই, যখন মৃত্যুর সময় হবে তখন ভগবানের নাম নিয়ে নেব, ভগবানকে স্মরণ করে নেব'; এ চিন্তা একেবারেই ভুল। কারণ মানুষ সারাজীবন যেমন কর্ম করে, মনে যেমন চিন্তা করে, অন্তিম সময়ে প্রায়শঃ সেটিই তার স্মরণে আসে। সুতরাং দুরাচার ব্যক্তির মৃত্যুকালে নিজ দুরাচারের কথাই চিন্তায় আসবে এবং সে নিজ পাপকর্মের ফলস্বরূপ নীচ যোনিতে জন্মগ্রহণ করবে, ভূত-প্রেত হয়েই জন্ম নেবে।

যদি কোন ব্যক্তি কাশী, মথুরা, বৃন্দাবন, অযোধ্যাদি ধামে বাস করে চিন্তা করে যে, 'তীর্থধামে বসবাস করলে এবং মৃত্যু হলে তার সদ্গতি হবে, দুর্গতি হতেই পারে না', এবং তারপরে সে পাপ, দুরাচার, ব্যভিচার, ছল-চাতুরি এবং চুরি-ডাকাতি ইত্যাদি কর্মে লিপ্ত হয়, তাহলে মৃত্যুর পর তার ভয়ঙ্কর দুর্গতি হয়। তার মৃত্যু প্রায়শঃ কোন কারণবশতঃ তীর্থস্থানের বাইরেই হয় এবং সে ভূত-প্রেত হয়। যদি তার তীর্থধামেও মৃত্যু হয়, তথাপি পাপ কর্মের জন্য সে ভূত-প্রেতই হয়।

প্রশ্ন—প্রেতযোনি যাতে না হতে হয় তার জন্য মানুষের কি করা উচিত?

উত্তর—এই মনুষ্য শরীর পরমাত্মপ্রাপ্তির জন্যই সৃষ্ট হয়েছে। সুতরাং মানুষের উচিত সাংসারিক ভোগ এবং অর্থসংগ্রহের আসক্তিতে বদ্ধ না হয়ে ভগবানের শরণাগত হওয়া। এর দ্বারাই মানুষ অধোগতি এবং ভূত-প্রেত ইত্যাদির যোনি থেকে বাঁচতে পারে।

প্রশ্ন—ভূত-প্রেত এবং পিতৃগণের মধ্যে পার্থক্য কি?

উত্তর—যদিও ভূত-প্রেত-পিশাচ-পিতৃগণ ইত্যাদি সকলকেই দেবযোনি বলে,[2] কিন্তু এতে কিছু পার্থক্য আছে। ভূত-প্রেতের দেহ বায়ুপ্রধান, অতএব সকলে এদের দেখতে পায় না। তবে এরা যদি কাউকে নিজরূপ দেখাতে চায়, তাহলে দেখাতে পারে। তাদের মলমূত্রাদি অশুদ্ধ বস্তু খেতে হয়, শুদ্ধ অন্ন, জল তারা গ্রহণ করতে পারে না। কিন্তু কেউ যদি তাদের নামে শুদ্ধ পদার্থ দেয়, তারা তা খেতে পারে। ভূত-প্রেতাদির শরীর থেকে দুর্গন্ধ নির্গত হয়।

পূর্বপুরুষ পিতৃগণকে ভূত-প্রেতের থেকে উচ্চাবস্থার বলে মনে করা হয়। তাঁরা প্রায়ই নিজ আত্মীয়গণের সঙ্গে সম্বন্ধ রাখেন এবং তাদের রক্ষা করেন ও সহায়ক হন। আত্মীয়-কুটুম্বদের ব্যবসায়, চাকরি ইত্যাদিতে সৎ-পরামর্শ দিয়ে রক্ষা করেন। যদি গৃহস্থগণ সম্পত্তি ভাগ করতে চান, তবে তা ভাগ করে দেন ইত্যাদি।

পূর্বপুরুষগণ গোদুগ্ধে তৈরী গরম গরম পায়েস খেতে ভালোবাসেন এবং গঙ্গাজলের মত শীতল জল পান করেন, শুদ্ধ জিনিস গ্রহণ করেন। কেউ কেউ আবার গৃহস্থদের দুঃখও দেন, জ্বালাতন করেন। আসলে এ সবই

---

[1] যে এখান থেকে চলে যায় অর্থাৎ যার মৃত্যু হয়, তাকে 'প্রেত' বলা হয় এবং তার মৃত্যুর পরে তার জন্য যে ক্রিয়াকর্মাদি করা হয়, তাকে 'প্রেতকর্ম' বলা হয়। যে নিজ পাপ কর্মের ফলস্বরূপ ভূত এবং পিশাচ যোনিতে জন্ম নেয়, তাকেও 'প্রেত' বলা হয়। অতএব এখানে পাপের জন্য যারা নীচ যোনিতে জন্ম নেয়, তাদের বোঝাতে 'প্রেত' শব্দটিই ব্যবহার করা হয়েছে।

[2] বিদ্যাধরোঽপ্সরোযক্ষরক্ষোগন্ধর্বকিন্নরাঃ। পিশাচো গুহ্যকঃ সিদ্ধো ভূতোঽমী দেবযোনয়ঃ॥ (অমরকোষ ১।১।১১)

যার যার স্বভাবের পার্থক্য অনুযায়ী হয়।

মানুষের মধ্যে যেমন চতুর্বর্ণ, উচ্চ-নীচ এবং স্বভাব ইত্যাদির ভেদাভেদ থাকে, তেমনি পূর্বপুরুষগণ, ভূত-প্রেত, পিশাচ ইত্যাদিতেও বর্ণ, জাতি এইসবের ভেদাভেদ থাকে।

প্রশ্ন—কারা মৃত্যুর পর ভূত-প্রেত হয় ?

উত্তর—যে মানুষের খাওয়া দাওয়া অশুদ্ধ, যার আচরণ মন্দ, যে দুর্গুণ-দুরাচারে লিপ্ত, যার স্বভাব অপরকে দুঃখ দেওয়া, যে কেবল নিজ জেদ বজায় রাখে, এই প্রকার ব্যক্তি মৃত্যুর পর ক্রূর স্বভাববিশিষ্ট ভূত-প্রেত হয়। সে যার মধ্যে প্রবেশ করে, তাকে প্রভূত দুঃখ দেয় এবং মন্ত্রাদির দ্বারাও তাকে শীঘ্র অপসারণ করা যায় না।

যে মানুষের স্বভাব সৌম্য, যিনি অপরকে দুঃখ দিতে চান না ; কিন্তু সাংসারিক বস্তু, স্ত্রী, পুত্র, অর্থ, সম্পত্তিতে আসক্ত ও মমতাসম্পন্ন, সেই ব্যক্তি মৃত্যুর পর সৌম্যস্বভাববিশিষ্ট প্রেত হন। তিনি যদি কারো শরীরে প্রবিষ্ট হন, তাহলে তাকে দুঃখ দেন না এবং তাকে নিজ গতি সম্বন্ধে অবহিত করেন।

যার বিদ্যা ইত্যাদি সম্বন্ধে অনেক অহংকার ও অভিমান আছে এবং সেইজন্য সে অন্য ব্যক্তিকে হেয় মনে করে ও অপমান অবজ্ঞা করে, অপরকে বুঝতে চায় না, এই রকম ব্যক্তি মৃত্যুর পর ব্রহ্মদৈত্য বা জিন হয়। সে যদি কারো মধ্যে প্রবেশ করে বা ভর করে, তাহলে নিজের ইচ্ছা ছাড়া তাকে ত্যাগ করে না। এর ওপর কোন তন্ত্র-মন্ত্রের প্রভাব খাটে না। অপর কেউ তার ওপর মন্ত্র প্রয়োগ করতে গেলে সে স্বয়ং সেই মন্ত্র বলে দেয়।

একটি সত্য ঘটনা। দক্ষিণে মোরোজী পন্থ নামে এক মস্ত বড় বিদ্বান ছিলেন। তাঁর বিদ্যার খুব অহংকার ছিল। তিনি কাউকে নিজের সমান বিদ্বান মনে করতেন না এবং সকলকেই হেয় করতেন। একদিন দুপুরবেলা তিনি স্নান করার জন্য নদীতে যাচ্ছিলেন, রাস্তার ধারে গাছের ওপর দুটি ব্রহ্মদৈত্য বসেছিল। তারা নিজেরা কথাবার্তা বলছিল। একজন ব্রহ্মদৈত্য বলল, 'আমরা দুজন তো এই গাছের দুটি ডালে বসে আছি, তৃতীয় ডালটি খালি রয়েছে, এখানে বসার জন্য কে আসবে ?' অপর ব্রহ্মদৈত্য উত্তর দিল, 'এই যে ব্যক্তিটি নীচে দিয়ে যাচ্ছে সেই এসে ওখানে বসবে, কেননা এর নিজের বিদ্যাবত্তার দারুণ অভিমান'। এদের দুজনের আলোচনা মোরোজী পন্থ শুনতে পেয়ে থেমে গেলেন আর ভাবতে লাগলেন, আরে ! বিদ্যার অভিমানের জন্য আমাকে ব্রহ্মদৈত্য হতে হবে, প্রেতযোনিতে যেতে হবে ? নিজের দুর্গতির কথা ভেবে তিনি অত্যন্ত ঘাবড়ে গেলেন এবং মনে মনে সন্ত জ্ঞানেশ্বরের শরণাগত হয়ে বললেন, 'আমি আপনার শরণাগত, আপনি ছাড়া আমাকে এই দুর্গতি থেকে রক্ষা করার কেউ নেই'। এইরূপ বিবেচনা করে তিনি সেখান থেকে সোজা আলন্দীর উদ্দেশ্যে রওনা হলেন, যেখানে সন্ত জ্ঞানেশ্বর জীবন্ত সমাধিস্থ হয়েছেন। মোরোজী সারাজীবন সেখানেই থেকে গেলেন, নিজের বাড়িতে আর ফিরলেন না। সন্তের শরণাগত হওয়ায় তাঁর বিদ্যার অভিমান চলে গেল এবং তিনি নিজেও একজন সন্ত হলেন।

যে স্ত্রীলোক পরপুরুষকে চিন্তা করে তথা যার পুরুষদের উপর খুব বেশি আসক্তি থাকে, সে মৃত্যুর পর 'ডাইনী' হয়। ভূত-প্রেতাদির মধ্যে প্রায়শঃ এই নিয়ম দেখা যায় যে, পুরুষ ভূত-প্রেত পুরুষদের ওপরই চড়াও হয় এবং স্ত্রী ভূত-প্রেত স্ত্রীলোকদিগের ওপর চড়াও হয় ; কিন্তু ডাইনী কেবল পুরুষদেরই ধরে। ডাইনী দু'প্রকারের হয়—একপ্রকার হচ্ছে, যারা পুরুষদের শোষণ করে অর্থাৎ তাদের রক্ত চুষে খায়, যাতে তাদের শক্তি ক্ষীণ হয়ে যায়। অন্যরা পুরুষদের পোষণ করে, সুখ-আরাম দেয়। এই দুইপ্রকারের ডাইনীই পুরুষদের নিজ বশে রাখে।

এক পুলিস ছিল। সে রাত্রিবেলা কোন এক স্থান থেকে ফিরছিল। পথিমধ্যে জ্যোৎস্নালোকে এক গাছের নীচে সে একটি সুন্দরী মেয়েকে দেখে। সে ঐ মেয়েটির সঙ্গে কথাবার্তা বলায় সেই মেয়েটি বলল, 'আমি তোমার সঙ্গে যাব ?' পুলিসটি বলল, 'আচ্ছা, এসো'। মেয়েটি আসলে ছিল এক ডাইনী, সে পুলিসের পিছন পিছন এল। তারপর থেকে সে রোজ রাত্রে পুলিসটির কাছে আসত, তার সঙ্গে শুত, তার সঙ্গে সঙ্গ করত এবং সকালবেলায় চলে যেত। এইভাবে সে পুলিসটিকে শোষণ করতে লাগল। এক রাত্রে দুজনে শুয়ে পড়েছে, কিন্তু ঘরের আলোটা জ্বলছে, তখন পুলিস মেয়েটিকে বলল, 'আলোটা নিভিয়ে দাও'। মেয়েটি শুয়ে শুয়ে নিজের হাত

লম্বা করে আলো নিভিয়ে দিল। পুলিসটি এবার বুঝতে পারল যে এ কোন সাধারণ মেয়ে নয়, এ এক ডাইনী। সে খুব ভয় পেয়ে গেল। ডাইনী তাকে ভয় দেখাল যে, 'তুমি যদি কাউকে আমার সম্বন্ধে বল, তাহলে আমি তোমাকে মেরে ফেলব।' এইভাবে সে প্রতি রাতে আসত এবং সকালে চলে যেত। পুলিসটির শরীর দিন দিন শুকিয়ে যেতে লাগল। সকলে তাকে জিজ্ঞাসা করতে লাগল, 'ভাই, তুমি এতো শুকিয়ে যাচ্ছ কেন ? কি হয়েছে, আমাদের বলো তো ।' কিন্তু ডাইনীর ভয়ে সে কাউকে কিছু বলত না। একদিন সে দোকান থেকে ওষুধ আনতে গেছে। দোকানদার ওষুধের প্যাকেট করে দিয়েছে, পুলিস সেটি পকেটে করে ঘরে নিয়ে এসেছে। রাত্রে ডাইনী এসে দূর থেকে দাঁড়িয়ে বলতে লাগল, 'তোমার পকেটে যে ওষুধ আছে সেটি বার করে ফেলে দাও।' পুলিসটির সন্দেহ হল যে, 'নিশ্চয়ই এই পুরিয়ায় এমন কোন কেরামতি আছে যে ডাইনী আমার কাছে আসতে পারছে না।' পুলিস ডাইনীকে বলল, 'আমি পুরিয়া ফেলব না।' ডাইনী অনেক করে বলল কিন্তু লোকটি তার কথা শুনল না। যখন তাকে দিয়ে কিছুতেই সেই পুরিয়া ফেলানো গেল না, তখন সে চলে গেল। পুলিসটি পকেট থেকে ওষুধের প্যাকেট বার করে দেখল যে সেটি গীতার ছেঁড়া পাতায় বাঁধা। এইরকম গীতার প্রভাব দেখে সে সবসময় নিজের পকেটে গীতা রাখতে লাগল। ডাইনীটি আর কখনও তার কাছে আসেনি।

যে ব্যক্তি মন্দিরে থাকে, গীতা, রামায়ণ, ভাগবত ইত্যাদি পাঠ করে, ভগবানের আরতি, স্তুতি, প্রার্থনা করে, ভগবৎ-নাম জপ করে এবং এরই সঙ্গে লোককে ঠকায়, ভগবানের ভোগ-সামগ্রী, বস্ত্রাদি চুরি করে, ঠাকুরকে পয়সা উপার্জনের উপায় হিসাবে নেয়, এইসব ব্যক্তি মৃত্যুর পর ভগবৎঅপরাধের জন্য ভূত-প্রেত হতে পারে। কিন্তু এ যদি কোনো ব্যক্তির শরীরে প্রবেশ করে, তাহলে তাকে দুঃখ দেয় না। পূর্বজন্মে কৃত ভগবৎপূজা, আরতি, স্তুতি-প্রার্থনা ইত্যাদি তার স্বভাবে থাকার জন্য সে ভগবৎ-নাম জপ করে, হাতে 'গোমুখী, কমণ্ডলু রাখে' মন্দিরে যায়, পরিক্রমা করে এবং ভগবানের স্তুতি-প্রার্থনাও করে। কোন মানুষের শরীরে প্রবিষ্ট না হয়ে এরা ভগবানের স্তুতি-প্রার্থনা করতে পারে না। বৃন্দাবনে বাঁকে বিহারীর মন্দিরে একটি ছোট বালক আসত। সে সংস্কৃত ভাষা জানত না, কিন্তু বিহারীজীর সামনে দাঁড়িয়ে সংস্কৃতে জোরে জোরে ভগবানের স্তোত্র পাঠ করত। পাঠ করার সময় তার আওয়াজ বালকের মতো শোনাত না, বড়ো মানুষের কণ্ঠস্বর বলে মনে হোত। কারণ তার মধ্যে সেই সময় এক প্রেত প্রবিষ্ট হতো এবং সেই ভগবানের স্তুতি করত, কিন্তু সে কখনো বালকটিকে কষ্ট দিত না। ভগবৎ অপরাধের ফল ভোগ করার পর ভগবৎকৃপায় এরূপ ভূত-প্রেতের সদ্গতি হয়ে প্রেতযোনি থেকে মুক্তি হয়।

মানুষের মধ্যে যারা অত্যন্ত বেশী পাপী, দুর্গুণ-দুরাচার, হিংসাত্মক কার্যকারী, তারা যেমন ভগবানের কথা, কীর্তন, সৎসঙ্গ ইত্যাদিতে থাকতে পারে না, সেখান থেকে উঠে চলে যায়, এইরূপ ভয়ঙ্কর পাপের জন্য যারা ভূত-প্রেত প্রভৃতি নীচ যোনিতে যায়, তারা ভগবৎ-নাম জপ, কথা-কীর্তন এবং সৎসঙ্গ ইত্যাদির সংস্পর্শে আসতে পারে না। যেসব ব্যক্তি ভগবৎ-নাম, কথা-কীর্তন, সৎসঙ্গ ইত্যাদির বিরোধিতা করে, নিন্দা-অপমান করে, তারা ভূত-প্রেত যোনি প্রাপ্ত হয় এবং কথা-কীর্তন, সৎসঙ্গ ইত্যাদির কাছে আসতে পারে না। যদি কথা-কীর্তন ইত্যাদির কাছে এসে পড়ে তো তাদের গায়ে জ্বালা ধরে।

পূজারীর মনে যদি সাংসারিক বস্তুর ওপর কোন লোভ না থাকে, বিগ্রহের ওপর যদি শ্রদ্ধা থাকে, ঠাকুরে অর্পিত জিনিসে প্রসাদ-বুদ্ধি থাকে, ভগবানে নিবেদিত বস্তু প্রসাদরূপে পেয়ে ভক্তিতে গদ্গদ হয়ে নিজেকে ভাগ্যবান বলে মনে করে, 'আমি কি সৌভাগ্যবান ভগবানে অর্পিত বস্তু প্রসাদরূপে পেয়েছি'—এইরূপ সব জিনিসে ভগবানের সম্বন্ধের জন্য মহত্ত্ব যে দেখে, সে ভগবানে অর্পিত বস্তু প্রসাদ হিসাবে গ্রহণ করলে তার ভগবৎ অপরাধ হয় না, তার অন্তঃকরণ ভগবানের মহত্ত্বে ভরপুর থাকায় সে ভূত-প্রেত হতেই পারে না। কিন্তু যার হৃদয়ে বস্তুর ওপর লোভ, কামনা, মমতা, বাসনা ইত্যাদি আছে, সে তীর্থস্থান, মন্দির, যে কোন স্থানে থাকুক না কেন মৃত্যুর পর কামনাদির জন্য ভূত ও প্রেত হয়ে থাকে। তারা ভগবানের পূজা আরতি ইত্যাদি ক্রিয়ারূপে করার জন্য ধর্মস্থানেই থেকে যায়। এইভাবে ভূত-প্রেত যোনিতে জন্ম হওয়ায় তার ভগবদপরাধের ফল পেয়ে যায় এবং

ভগবৎসম্বন্ধীয় ক্রিয়ার ফলও তীর্থস্থানাদিতে থাকায় পেয়ে যায়।

প্রশ্ন—যে ব্যক্তি ভগবৎনাম জপ, স্বাধ্যায় ইত্যাদি করে, সে কি মৃত্যুর পর ভূত-প্রেত হতে পারে ?

উত্তর—এইরূপ মানুষ সাধারণতঃ ভূত-প্রেত হয় না। কিন্তু নাম-জপে রুচির চাইতে যার সাংসারিক বিষয়াদি, নিজের সেবকদের এবং নিজের পছন্দ অনুযায়ী চলার লোকেদের ওপর বেশী মমতা বা আসক্তি হয় এবং মৃত্যুকালে সাধনে স্থিত না হয়ে সাংসারিক বিষয় এবং সেবাকারীর কথা মনে করে, সে ব্যক্তি মৃত্যুর পর ভূত - প্রেত হতে পারে। এরূপ ভূত-প্রেত কাউকে দুঃখ দেয় না বা কাউকে বিরক্ত করে না।

কর্মের গতি বড়ই দুর্জ্ঞেয়—**গহনা কর্মণো গতিঃ** (৪।১৭)। অতএব পাপ-পুণ্য, ভাব ইত্যাদির তারতম্যের ফলেও ভূত-প্রেতাদির যোনিতে জন্ম হতে পারে। ভগবান স্বয়ং বলেছেন যে কর্ম এবং অকর্ম কি—এই বিষয়ে বড় বড় পণ্ডিতেরাও দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে যান, অর্থাৎ প্রকৃত তত্ত্ব বুঝতে পারেন না (৪।১৬)।

প্রশ্ন—দুর্ঘটনাতে মৃত ব্যক্তি বা আত্মহত্যাকারী ব্যক্তি প্রায়ই ভূত-প্রেত কেন হয় ?

উত্তর—অসুখ হলে 'আমাকে মরতে হবে'—এইরূপ আশঙ্কা বা হুঁশ থাকে ; অতএব অসুস্থ ব্যক্তি সংসার থেকে বিমুক্ত হয়ে ভগবানের প্রতি আকৃষ্ট হতে পারে। কিন্তু দুর্ঘটনার সময় মনে কিছু না কিছু মনোবাসনা, চিন্তা থাকে যেটি নিয়ে মানুষ হঠাৎ মারা যায়। যদি সেই সময়ে মনে কোন খারাপ ভাবনা থাকে, ভগবানের ভাবনা না থাকে, তাহলে ভূত-প্রেত হতে হয়। দুর্ঘটনার সময় আক্রমণকারীর প্রতি প্রতিহিংসার মনোভাব থাকায় সেই চিন্তা হতে থাকে, সেইজন্যও দুর্ঘটনাতে মৃত ব্যক্তি ভূত-প্রেত হয়। কিন্তু যে ব্যক্তি সংসার বিমুখ হয়ে পারমার্থিক পথে চলে, সে দুর্ঘটনাদিতে মারা গেলেও ভূত-প্রেত হয় না। তাৎপর্য এই যে অন্তরে সাংসারিক অনুরাগ, আসক্তি, কামনা, মমতা আদি থাকলেই মানুষ অধোগতি প্রাপ্ত হয়। যার অন্তরে সংসারের প্রতি অনুরাগ, আসক্তি ইত্যাদি নেই সে যে কোন দেশে, যে কোন স্থানে, যে কোন সময়ে শরীর ত্যাগ করুক না কেন ভূত-প্রেত হবে না ; কারণ ভূত-প্রেত যোনিতে জন্মাবার মত নীচ মনোবৃত্তি তার অন্তঃকরণে থাকে না।

যে ব্যক্তি ক্রোধান্বিত হয়ে বা কোনো কথায় দুঃখ পেয়ে আত্মহত্যা করে, সে দুর্গতি প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ ভূত-প্রেত-পিশাচ হয়ে থাকে। আত্মহত্যা করা মহাপাপ। কারণ ভগবৎপ্রাপ্তির জন্যই এই শরীরের সৃষ্টি ; অতএব ভগবৎপ্রাপ্তি না করে নিজের হাতে শরীরকে নষ্ট করা ভয়ানক পাপ, ভয়ংকর অপরাধ এবং অতীব দুরাচার। দুরাচারীর সদ্‌গতি হওয়া কঠিন। সুতরাং কখনো আত্মহত্যার চিন্তা মনে না আনা উচিত।

মানুষের যখন কোন বড় বিপদ আসে, ভয়ংকর কোন অসুখ হয়, তখন সে ভাবতে থাকে যে, 'আমি যদি মরে যাই তাহলে সব কষ্ট দূর হবে'। কিন্তু বাস্তবে আত্মহত্যা করলে কর্মের ভোগ বা কষ্ট সমাপ্ত হয় না, কোন না কোন যোনিতে জন্ম নিয়ে তাকে সেটি ভুগতেই হয়। আত্মহত্যার দ্বারা সে আর একটি নতুন পাপ কাজ করে, যার ফলে তাকে নীচ যোনিতে জন্ম নিতে হয়, ভূত-প্রেত হতে হয় এবং হাজার হাজার বছর ধরে দুঃখ পেতে হয়।

প্রশ্ন—ভূত-প্রেত কোথায় থাকে ?

উত্তর—এরা প্রায়শঃ শ্মশানে এবং শ্মশানের বৃক্ষগুলিতে থাকে। পুকুর বা দীঘির পাড়ে বসবাস করে, দীঘির জল এরা খেতে না পারলেও, জলের ঠাণ্ডা হাওয়া এদের ভালো লাগে এবং তাতে এরা সুখ পায়। অশ্বত্থ গাছের স্বভাব সকলকে আশ্রয় দেওয়া, তাই এর ছায়াতেও তারা থাকে। কেউ তাদের নামে ঘর করে দিলে এরা তার মধ্যে থাকে। বাড়ি অনেকদিন খালি পড়ে থাকলেও ভূত-প্রেত সেখানে বসবাস করতে আরম্ভ করে।

প্রশ্ন—ভূত-প্রেতের ভর হওয়া মানুষের শরীরের কোন্ দ্বার দিয়ে তারা প্রবেশ করে ?

উত্তর—ভূত-প্রেতের শরীর বায়ু-প্রধান, অতএব এরা যে কোন দ্বার দিয়েই মানুষের শরীরে প্রবেশ করতে পারে। এরা চোখ-কান-ত্বক ইত্যাদি যে কোন ইন্দ্রিয় দিয়েই শরীরে প্রবেশ করতে পারে। এরা বেশীর ভাগ অশুচি দ্বার অর্থাৎ মলমূত্রের স্থান অথবা নিঃশ্বাস দ্বারা প্রবেশ করে।

প্রশ্ন—শরীরে প্রবেশ করে এরা কোথায় থাকে ?

উত্তর—এরা শরীরে প্রবেশ করে অহংবৃত্তি অর্থাৎ

অন্তঃকরণে থাকে।

'অহং' দুই প্রকারের হয়, ১) অহংভাব এবং ২) অহংবৃত্তি। অহংভাব জীবাত্মায় থাকে এবং অহংবৃত্তি অন্তঃকরণে থাকে। ভূত-প্রেত নিঃশ্বাস দ্বারা মানুষের শরীরে প্রবেশ করে অহংবৃত্তিতে থেকে ইন্দ্রিয়ের স্থানগুলিকে কাজে লাগায়।

প্রশ্ন—শরীরে একের অধিক ভূত-প্রেত কি থাকতে পারে ?

উত্তর—হ্যাঁ, থাকতে পারে। কোন কোন ব্যক্তির শরীরে একাধিক ভূত-প্রেত ঢুকে পড়ে। যখন তারা ঐ ব্যক্তির মুখ দিয়ে কথা বলে, তখন সবার পৃথক পৃথক আওয়াজ শোনা যায়।

প্রশ্ন—মনুষ্য শরীরে প্রবেশ করে এরা কি সবসময় সেই শরীরেই বসবাস করে ?

উত্তর—এরা প্রায়শঃই আসা যাওয়া করে। ভূত-প্রেত ব্যক্তিটির কাছাকাছিই থাকে আবার হাওয়া নির্ভর হওয়ায় কখনো কখনো দূরেও চলে যায়। কোন কোন ভূত আবার সেই ব্যক্তির মধ্যেই সবসময় থাকে।

ভূত-প্রেত যে কোন ব্যক্তিকে দুঃখ দিতে বা যে কোন শরীরে প্রবেশ করার ব্যাপারে স্বাধীন নয়। এরা নিজেদের ইচ্ছানুযায়ী কাজ করতে পারে না। এরা যার অধীনে থাকে তার আদেশানুযায়ীই কাজ করে অর্থাৎ শাসকের ইচ্ছানুসারেই এরা কারো শরীরে প্রবিষ্ট হয় এবং কারোকে দুঃখ দেয়। যদি শাসক আদেশ না দেয় তাহলে কোন সময়েই এরা কারো শরীরে প্রবেশ করতে পারে না। যেমন, সুকর্মের ফলে যদি কেউ স্বর্গলোকে যায় এবং সে যদি মৃত্যুলোকের কারও সঙ্গে সম্পর্ক করতে চায় তাকে সেই লোকের শাসকের আজ্ঞানুসারেই তা করতে হয়। স্বাধীনভাবে সে মৃত্যুলোকে কারো সাথে বাক্যালাপও করতে পারে না। এইরূপ ভূত-প্রেতলোকেও শাসক থাকে, যার আদেশানুযায়ী ভূত-প্রেত সব কাজ করে।

যেমন নরকে ফুটন্ত তেলে জীবকে ফেলে দেওয়া হয়, তাদের শরীর টুকরো টুকরো করে দেওয়া হয়, তবুও যে পাপ কাজের জন্য এরা নরকগামী হয়েছে সেই কর্মভোগ সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত এই প্রাণীরা মরে না। তেমনি মানুষের কোন কুকর্ম ভোগের সময় এলে তাদের মধ্যে ভূত-প্রেত প্রবিষ্ট হয়। যতক্ষণ কর্মভোগ বাকী থাকে, ততক্ষণ যতই কিছু করা হোক, মন্ত্র-যন্ত্র ইত্যাদি প্রয়োগ করা হোক, ভূত-প্রেত ছাড়ে না। যখন কর্মভোগ শেষ হয়, তখন এরা নিজে থেকেই চলে যায়। তাৎপর্য এই যে, যার প্রারব্ধে দুঃখ ভোগ আছে, তার মধ্যেই ভূত-প্রেত প্রবেশ করে, তাকে দুঃখ দেয়।

এমন দেখা যায়, পূর্বপুরুষ কেউ মারা গেলে, আত্মীয়দের মধ্যে কোনো এক বিশেষ ব্যক্তির শরীরেই সে প্রবেশ করে, সবার মধ্যে নয়। এর থেকে জানা যায় যে, যার সাথে তার দায়বদ্ধতা থাকে, তার মধ্যেই পিতৃপুরুষের প্রেত প্রবেশ করে। এইরূপ ভূত-প্রেতও তার মধ্যেই আসে যার সাথে তার দায়বদ্ধতা থাকে।

মানুষের আয়ু থাকলে ভূত-প্রেত কখনও তাকে মারতে পারে না। তার আয়ু শেষ হলে তবেই তাকে মারতে পারে। এই বিষয়ে আমি একটি ঘটনা শুনেছি। প্রায় একশো বছর আগেকার রাজস্থানের একটি ঘটনা। কিছু মুসলমান কসাইখানায় কিছু গোরু নিয়ে যাচ্ছিল। সেখানকার রাজা খবর পেয়ে নিজের সৈন্যদের পাঠালেন। সৈন্যরা মুসলমানদের মেরে গোরুগুলি ছাড়িয়ে নিল। এদের মধ্যে একটি মুসলমান মরে জিন হল এবং রাজার পিছনে লাগল। রাজা অনেক চেষ্টা করলেন, কিন্তু সে ছাড়লো না। জিন বলতে লাগল 'আমি একটি লোকের জীবন নিয়ে তবে যাব'। অবশেষে এক রাজপুত বলল যে, 'আমি নিজেকে বলি দিতে প্রস্তুত'। জিন রাজাকে ছেড়ে দিল এবং তখনই সেই রাজপুতকে মেরে ফেলল। রাজপুতের উইল অনুযায়ী শ্মশানে নিয়ে যাওয়ার আগে তার মৃতদেহটি তার গুরুর কাছে নিয়ে যাওয়া হল। যখন লোকেরা রাজপুতের দেহটি গুরুর চারপাশে পরিক্রমা করে দাহ কার্য করার জন্য নিয়ে যেতে উদ্যত হল তখন গুরুর কাছে উপবিষ্ট এক সাধু গুরুকে বললেন, — 'শব কিছু না পেয়ে চলে যাচ্ছে, একে কিছু দেওয়া উচিত।' গুরু বললেন, 'কিছু করা সম্ভব নয়, এর আয়ু শেষ হয়ে গেছে।' তবুও বিবেচনা করে দু'জনে নিজেদের আয়ু থেকে বারো বছর আয়ু দিয়ে রাজপুতকে জীবিত করলেন। এর তাৎপর্য এই যে রাজার আয়ু পুরো হয়নি, তাই জিন রাজাকে মারতে পারে নি, কিন্তু রাজপুতের আয়ু শেষ হয়ে গিয়েছিল তাই জিন তাকে মেরেছিল।'

প্রশ্ন—মৃগীরোগী এবং ভূত আবিষ্ট ব্যক্তির মধ্যে

প্রায়শঃ একই ধরনের লক্ষণ দেখা যায়, তাদের চেনার উপায় কি ?

উত্তর—মৃগীরোগীর প্রায়ই মূর্ছা হয় কিন্তু ভূতে ধরা লোক মূর্ছা যায় না। তারা কিছু না কিছু বলতেই থাকে। মৃগীরোগীর দেহে একটি জীবাত্মাই থাকে, কিন্তু ভূতে ধরা শরীরে জীবাত্মার সঙ্গে প্রেতাত্মাও থাকে, যে আবিষ্ট ব্যক্তিটিকে নানাপ্রকারে দুঃখ দেয়, জ্বালাতন করে। মৃগীরোগগ্রস্ত ব্যক্তি ওষুধ খেলে ঠিক হয়ে যায়, কিন্তু ভূতগ্রস্ত ব্যক্তি ওষুধে ঠিক হয় না।

প্রশ্ন—যে সব তান্ত্রিক ভূত-প্রেতের বাধা দূর করেন, মৃত্যুর পর তাদের কি গতি হয় ?

উত্তর—ভূত-প্রেতের বাধা দূরকারী তান্ত্রিকেরা মৃত্যুর পর প্রায়শই ভূত-প্রেত হয়ে জন্মায় ; তার অনেক কারণ থাকে, যেমন—

১) ভূত-প্রেতকে দূর করে যে সমস্ত তান্ত্রিক, তাদের বিদ্যা প্রায়ই মলিন হয়। তাদের খাওয়া-দাওয়া এবং চিন্তাও মলিন হয়। এই মলিনতার কারণেই তারা দুর্গতিগ্রস্ত হয় অর্থাৎ মৃত্যুর পর প্রেতযোনি প্রাপ্ত হয়।

২) ভূত-প্রেত কারো শরীরে প্রবেশ করলে, সেখানে সে সুখ পায়, খাওয়া-দাওয়ার জন্য ভালো জিনিস পায় ; সেইজন্য সে সেখান ছেড়ে যেতে চায় না। কিন্তু তান্ত্রিকেরা জোর করে সেখান থেকে তাদের দূর করে সুরার বোতলে ভরে মাটিতে পুঁতে ফেলে অথবা কোন গাছের মধ্যে মন্ত্র দ্বারা প্রবিষ্ট করিয়ে দেয়, সেখানে এরা বহু বছর ক্ষুধা-তৃষ্ণায় ভীষণ কষ্ট পায়। তাদের এরূপ দুঃখ দেওয়া খুব অন্যায় কাজ। কাউকে দুঃখ দেওয়াই পাপ। তাই এই পাপের ফলস্বরূপ এই সব তান্ত্রিকেরা মৃত্যুর পর প্রেতযোনি প্রাপ্ত হয়।

৩) যারা ভূত-প্রেতের বাধা দূর করে সেইসব তান্ত্রিকদের প্রায়শই অপরের হিতসাধনের মনোভাব থাকে না। তারা শুধুমাত্র টাকা-পয়সার জন্যই এই কাজ করে। তারা প্রতারণা এবং চালাকীও করে। সেইজন্য মৃত্যুর পরে তাদের ভূত-প্রেতের যোনিতে যেতে হয়।

যদি তান্ত্রিকদের মনে নিঃস্বার্থভাবে সকলের মঙ্গল করার, উপকার করার চিন্তা থাকে অর্থাৎ যাকে ভূত-প্রেতে ভর করেছে, তাকে মুক্ত করার এবং ভূত-প্রেতকে দেহ থেকে বাইরে এনে গয়াশ্রাদ্ধ ইত্যাদির দ্বারা সদ্‌গতি করার চিন্তা থাকে, চেষ্টা থাকে, তাহলে এমন তান্ত্রিকের প্রেতযোনিতে জন্ম হয় না। যার মনে সকলের জন্য মঙ্গল চিন্তা থাকে তার কখনও দুর্গতি হতে পারে না। ভগবান বলেছেন, 'যে ব্যক্তি সমস্ত প্রাণীর হিতে রত থাকে, সে আমাকেই প্রাপ্ত হয়'—**'তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্বভূতহিতে রতাঃ'** (১২।৪)।

প্রশ্ন—ভূত-প্রেতেদের বোতলে বদ্ধ হওয়া বা মন্ত্র দ্বারা পেরেকের সাহায্যে বৃক্ষে বন্দী হওয়া ইত্যাদি কি তাদেরই কর্মের জন্য, না যারা এই কাজ করে, তারাই এসবের কারণ ?

উত্তর—মুখ্যতঃ তাদের কর্মই এর কারণ। তাদের কোন পাপকর্মের ফলভোগ উপস্থিত হয়, তার জন্য এরা ধরা পড়ে। যদি তাদের ভাগ্যে না থাকে, তবে এদের কেউ ধরতে পারে না। কিন্তু যারা এদের বোতলে বা বৃক্ষাদিতে ধরে রাখার কাজ করে থাকে, তারা খুবই পাপ করে। সুতরাং মানুষের কখনও ভূত প্রেতকে বন্ধন বা মন্ত্র দ্বারা বৃক্ষে বন্দী করার কাজে নিমিত্ত হয়ে পাপের ভাগী হওয়া উচিত নয়। হ্যাঁ, তাদের উদ্ধারের জন্য তাদের নাম করে ভাগবত-সপ্তাহ, গয়াতে শ্রাদ্ধদান, ভগবৎনাম জপ ইত্যাদি করা উচিত অথবা এই সকল ভূত-প্রেত তাদের মুক্তির জন্য যে উপায় জানায়, তাই করা উচিত। যারা এইপ্রকার প্রেতাত্মাদের সদ্‌গতি করে বা করায়, তাদের খুব পুণ্য হয় এবং দুঃখী প্রেতাত্মারা প্রেতযোনি থেকে মুক্তি পেয়ে আশীর্বাদ করে।

প্রশ্ন—ভূত-প্রেতেদের পেরেকের সাহায্যে বৃক্ষাদিতে আবদ্ধ করে তান্ত্রিকেরা তাদের কর্মফল ভোগ করতে তো সাহায্যই করে, তাহলে তান্ত্রিকদের কেন পাপ হয় ?

উত্তর—তান্ত্রিকরা যে পেরেকের সাহায্যে বৃক্ষাদিতে আবদ্ধ করে বা মাটিতে পুঁতে দেয়, তা সেই ভূত প্রেতেদের কর্মফলের ভোগ তো নিশ্চয়ই ; কিন্তু যারা তাদের মন্ত্র দ্বারা বদ্ধ করে, তাদের নতুন পাপ কর্ম যুক্ত হয়, যার শাস্তি তারা পরে পায়। যেমন, কেউ যখন কোন পশু হত্যা করে, সেই পশুটির মৃত্যুর সময় হয়েছিল বলেই সে মরে কারণ তার মৃত্যুর সময় না হলে কেউ তাকে মারতে পারে না। কিন্তু যে তার মৃত্যুর কারণ হয়, সে নতুন পাপভাগী হয়। কেননা সে লোভ, কামনা, স্বার্থাদির জন্যই সেই পশুটিকে হত্যা করে। কামনা রেখে

করা কোনও শুভকর্ম যদি বন্ধনের কারণ হতে পারে, তাহলে কামনা দ্বারা কৃত অশুভকর্ম তো তাকে পাপে বদ্ধ করবেই।

তাৎপর্য এই যে কাউকে দুঃখ দেওয়া, কষ্ট দেওয়া, মারা ইত্যাদি মানুষের কর্তব্য নয়, প্রত্যুত অকর্তব্যই। মানুষ কামনাবশেই অকর্তব্যে প্রবৃত্ত হয় (৩।৩৭)। সুতরাং মানুষের কামনা, স্বার্থ ইত্যাদি ত্যাগ করে সকলের হিতের জন্য কাজ করা উচিত।

প্রশ্ন—যে সব ভূত-প্রেতদের বোতলে বদ্ধ করে দেওয়া হয় এবং মন্ত্র দিয়ে পেরেকের সাহায্যে বৃক্ষাদিতে বদ্ধ করে রাখা হয়েছে, তারা কতদিন সেখানে বন্দী থাকে ?

উত্তর—মন্ত্রশক্তিরও একটা সীমা থাকে, সময় থাকে। সময় পুরো হলে যখন মন্ত্রের শক্তি শেষ হয়ে যায় বা সেই প্রেতটির কর্মভোগ প্রেতযোনির সমাপ্তি হয়ে যায়, তখনই কেবল সেই প্রেতটি সেখান থেকে মুক্তি পায়। যদি তাদের ভোগসীমার মধ্যে কেউ অজানতে বৃক্ষ থেকে সেই পেরেক হটিয়ে দেয়, জমি চাষ করতে গিয়ে যদি বোতল ভেঙ্গে যায় বা গাছ ভেঙ্গে পড়ে তাহলে সেই প্রেত সেখান থেকে ছাড়া পেয়ে যায় ও নিজের স্বভাব অনুসারে পুনরায় অপরকে দুঃখ দিতে আরম্ভ করে।

প্রশ্ন—যদি কোন ব্যক্তি গাছের সেই পেরেক তুলে দেয় বা জমিতে পোঁতা বোতলটি ভেঙ্গে ফেলে, তাহলে তাতে বন্দী ভূতেরা ঐ ব্যক্তির ওপর ভর করে না তো ?

উত্তর—বন্দিত্ব থেকে মুক্তি পেয়ে ভূত-প্রেত ঐ ব্যক্তিকে ভর করতেও পারে, তাই কোন ব্যক্তির এমন কাজ করা উচিত নয়। যে ব্যক্তি ভগবৎপরায়ণ, যে ভগবানের আশ্রয়ে আছে, শ্রীহনুমানের আশ্রয়ে আছে, সে যদি ভূত-প্রেতদের ঐসব বন্দিত্ব থেকে মুক্ত করে, তাহলে ভূত তার কোন ক্ষতি করতে পারে না। উল্টে তাদের দর্শন করলে ঐ ভূত-প্রেত উদ্ধার হয়ে যায়। সাধু-মহাত্মাগণ অনেক ভূত-প্রেতকে মুক্তি দিয়েছেন।

প্রশ্ন—কিছু তান্ত্রিক আছে যারা ভূত-প্রেতদের নিজের বশে এনে তাকে দিয়ে নিজের ঘরের, চাষের কাজ করায়, এরূপ করা উচিত না অনুচিত ?

উত্তর—কোন জীবকে বশে রাখা মানুষের উচিত নয়। তবে হ্যাঁ, কোন ব্যক্তিকে মজুরী দিয়ে যেমন কাজ করানো হয়, তেমনি ভূত-প্রেতদের খাদ্য ঠিকমতো দিয়ে খুশী করে তাদের দিয়ে কাজ করালে কোন দোষ নেই। কিন্তু যেসব সাধক পারমার্থিক সাধনায় থাকেন, তাঁদের এরূপ করা উচিত নয়। যারা সংসারপঙ্কে জড়িয়ে থাকতে চায়, এইসব কাজ তারাই করে।

প্রশ্ন—ভূত-প্রেতেরা খাদ্য কি ভাবে পায় ? এরা কিসে তৃপ্ত হয় ?

উত্তর—ভূত-প্রেতের শরীর বায়ুপ্রধান ; তাই আতর ইত্যাদি সুগন্ধে তারা তৃপ্ত হয় এবং তারা তাতেই অত্যন্ত খুশী হয়ে যায়। তার নাম করে কোন ব্রাহ্মণ বা নিজ ছোট বোন, মেয়ে বা বোনের মেয়েকে ভালো ভালো মিষ্টি খাওয়ালেও এতে তাদের তৃপ্তি হয়ে যায়।

দশ-বারো বছরের একটি ছেলে জলে ডুবে মারা যায় এবং প্রেতযোনি লাভ করে। সে তার বোনের মধ্যে ভর করত এবং নিজের দুঃখের কথা শোনাত। একদিন সে বোনের মধ্যে এল এবং বলল, 'আমি খুব ক্ষুধার্ত'। ছেলেটির পরিজনেরা তখন তার নামে এক ব্রাহ্মণকে ভোজন করাল। ব্রাহ্মণ খেতে থাকলে, খাবার সময় তার মুখ যখন চর্বণ করতে আরম্ভ করল, অন্যঘরে বসে থাকা সেই ছেলেটির বোনের মুখও তেমনি চর্বণ করতে থাকল। ব্রাহ্মণের ভোজন শেষ হলে প্রেতটি তার বোনের মুখ দিয়ে বলল, 'আমার তৃপ্তি হয়েছে'। সুতরাং প্রেতাত্মার নামে যদি কোন শুদ্ধ-পবিত্র ব্রাহ্মণকে খাওয়ানো হয়, তবে সেই ভোজন প্রেতটির উদ্দেশ্য সিদ্ধ করে।

কাছেই পুকুর, নদী বয়ে যাচ্ছে, এই জল প্রেতরা দেখে, কিন্তু সে সেই জল পান করতে পারে না, পিপাসার্তই থাকে। স্নানের পর কোনো প্রেতের নামে বা 'অজ্ঞাতনামা প্রেতাত্মার জল প্রাপ্তি ঘটুক'— এই ভাব নিয়ে আর্দ্রবস্ত্র কোন স্থানে নিংড়ে দিলে প্রেত সেই জল পান করে নেয়। শৌচের অবশিষ্ট কোন কাঁটাগাছ বা আখগাছে ঢেলে দিলে সেই জল পান করে প্রেত তৃপ্ত হয়।

তুলসীদাস যখন শৌচে যেতেন, প্রতিদিন ফেরার সময় অবশিষ্ট জলটি একটি কাঁটাগাছে ঢেলে দিতেন। ঐ গাছে একটি প্রেত বাস করত, যে সেই অশুদ্ধ জল পান করত। একদিন সেই প্রেতটি তুলসীদাসের সামনে হাজির হয়ে বলল, 'আমি পিপাসায় কাতর হয়ে মরে যাচ্ছিলাম, তোমার জলে এখন আমি অত্যন্ত তৃপ্ত হয়েছি। তুমি যা

আমার কাছে নিতে চাও, চেয়ে নাও'। তুলসীদাস মহারাজের ভগবদ্দর্শনের একান্ত আগ্রহ হয়েছিল, তাই তিনি বললেন, 'আমাকে ভগবান রামের দর্শন পাইয়ে দাও।' প্রেতটি বলল, 'দর্শন তো আমি করাতে পারব না, তবে তার উপায় বলতে পারি।' তুলসীদাস বললেন, 'ঠিক আছে, তাই বলো।' সে বলল, 'ঐস্থানে রাত্রে রামায়ণী কথা হয়, সেই কথা শোনার জন্য হনুমান আসেন। তুমি তাঁর পা ধরে থেকো, তিনি তোমাকে ভগবদ্দর্শন করিয়ে দেবেন।' তুলসীদাস বললেন, 'সেখানে তো নিশ্চয়ই অনেক লোক আসে, তার মধ্যে হনুমানকে কীভাবে চিনব ?' প্রেতটি বলল, 'হনুমান কুষ্ঠরোগীর রূপ ধরে এবং অত্যন্ত ময়লা, কুঁচকানো কাপড় পরে আসেন এবং কথা সমাপ্ত হলে সকলে চলে যাবার পর চলে যান। তুলসীদাস প্রেতের কথামত কাজ করলেন এবং তাতে তাঁর হনুমানের দর্শন হল এবং হনুমান ভগবান রামের দর্শন পাইয়ে দিলেন—

তুলসী নফা পিছানিয়ে, ভলা বুরা ক্যা কাম।
প্রেতসে হনুমত মিলে, হনুমত সে শ্রীরাম॥

প্রেতের নাম করে যদি জল ও পিণ্ড দেওয়া হয় বা কোন ব্রাহ্মণকে ছাতা ইত্যাদি দেওয়া হয় তাহলে তা সেই প্রেতই প্রাপ্ত হয়। কিন্তু যার নামে ছাতা উৎসর্গ করা হয়, তার সাথী কোন প্রেত যদি প্রবল পরাক্রান্ত হয়, তবে সে মাঝপথে তা ছিনিয়ে নেয়, তাকে পেতে দেয় না। তাই যাকে দেওয়া হবে তার নামে জল ও পিণ্ড ইত্যাদি যদি খুব বিধি অনুসারে দেওয়া হয়, তবেই সে সেই সব সামগ্রী পায়।

প্রশ্ন—ভূত-প্রেতের বাধা দূর করার উপায় কি ?

উত্তর—প্রেতবাধা দূর করার অনেক উপায় আছে, যেমন—

১) শুদ্ধ পবিত্র হয়ে, সামনে ধূপ জ্বালিয়ে পবিত্র আসনে বসতে হবে এবং হাতে জলের পাত্র নিয়ে 'শ্রীনারায়ণকবচ' (শ্রীমদ্ভাগবত স্কন্ধ ৬, অধ্যায় ৮এ আছে) পুরো পাঠ করে জলের পাত্রে ফুঁ দিতে হবে। এইভাবে কমপক্ষে একুশবার পাঠ করতে হবে এবং প্রত্যেক পাঠের শেষে জলপাত্রে ফুঁ দিয়ে যেতে হবে, তারপর সেই জলটি ভূতে ধরা ব্যক্তিকে পান করাতে হবে এবং কিছু জল তার গায়ে ছেটাতে হবে।

২) গীতাপ্রেস থেকে প্রকাশিত 'রামরক্ষাস্তোত্র' বইটিতে দেওয়া বিধি অনুসারে সিদ্ধ করে নিয়ে এবং রামরক্ষাস্তোত্র পাঠ করতে করতে ভূতে ধরা ব্যক্তিটিকে ময়ূরের পাখা দিয়ে ঝাড়তে হবে।

৩) শুদ্ধ পবিত্র হয়ে 'হনুমানচালীসা' সাত, একুশ বা একশো আটবার পাঠ করে জলকে অভিমন্ত্রিত করতে হবে এবং সেই জল ভূতগ্রস্ত ব্যক্তিকে পান করাবে।

৪) গীতার **'স্থানে হৃষীকেশ তব প্রকীর্ত্যা ------'** (১১।৩৬)—এই শ্লোকটি একশো আটবার পাঠ দ্বারা অভিমন্ত্রিত জল ভূতগ্রস্ত ব্যক্তিকে পান করাবে।

৫) প্রেতগ্রস্ত ব্যক্তিকে ভাগবতের সপ্তাহ-পারায়ণ শোনান উচিত।

৬) প্রেতের কাছ হতে তার নাম পরিচয় জেনে কোন শুদ্ধ পবিত্র ব্রাহ্মণকে দিয়ে ঠিকমতো বিধিপালনপূর্বক গয়া শ্রাদ্ধ করানো উচিত।

৭) প্রেতাবিষ্ট ব্যক্তির নিকট গীতা, রামায়ণ, ভাগবত রাখবে এবং তাকে 'বিষ্ণুসহস্রনাম' শোনাবে।

৮) যে স্থানে ভক্তিপূর্বক যথাযোগ্য মর্যাদা সহকারে গায়ত্রী মন্ত্রের পুরশ্চরণ, বেদপাঠ, পুরাণের কথা হয়, সেখানে প্রেতগ্রস্ত ব্যক্তিকে নিয়ে যাওয়া উচিত। সেই স্থানে গেলেই প্রেতটি মানুষের শরীর থেকে বাইরে বের হয়ে পড়ে, কেননা ভূত-প্রেত কোনো পবিত্র স্থানে থাকতে পারে না। ভূতগ্রস্ত ব্যক্তিকে কিছুদিন সেখানে রেখে তাকে দিয়ে ভগবৎনামজপ, হনুমানচালীসা পাঠ, সুন্দরকাণ্ড পাঠ ইত্যাদি করানো উচিত যাতে প্রেত তার শরীরে পুনঃ প্রবেশ না করতে পারে। এরূপ না করলে প্রেতটি সেই স্থানের আশপাশেই ঘোরাফেরা করতে থাকে এবং ঐ ব্যক্তি সেই স্থান ত্যাগ করা মাত্র আবার তাকে ধরে নেয়।

৯) ষোলো কোষ্ঠকের **'চৌতীসা যন্ত্র'** সিদ্ধ করে নেবে[১]এবং মঙ্গলবার বা শনিবার কোন একদিন আগুনে-শুকনো নারিকেল, ঘি, যব, তিল এবং সুগন্ধী দ্রব্য ইত্যাদির দ্বারা ১০৮ বার আহুতি দেবে। প্রত্যেক বার

[১]চৌতীসা (চৌত্রিশ) যন্ত্র এবং তা লেখবার তথা সিদ্ধ করার বিধি—

আহুতি দেবার সময় বলবে, 'স্থানে হৃষীকেশ'---- (১১।৩৬), এবং প্রত্যেকটি আহুতি দেবার পর আগুনের ওপর 'চৌতীসা যন্ত্র' ঘোরাবে। পরে এই যন্ত্রটি তাবিজে ভরে লাল বা কালো সূতার দ্বারা প্রেতগ্রস্ত ব্যক্তির গলায় পরিয়ে দেবে।

শ্রদ্ধা এবং বিশ্বাসপূর্বক করলে কোন একটি উপায়ে প্রেতবাধা দূর হতে পারে। এইপ্রকার অনুষ্ঠানে প্রারব্ধের বলবত্তার প্রভাব পড়ে। যদি প্রারব্ধের চেয়ে অনুষ্ঠান বলবান হয়, তাহলে লাভ পুরো হয় অর্থাৎ কার্য সিদ্ধ হয় ; কিন্তু অনুষ্ঠানের থেকে যদি প্রারব্ধ বলবান হয়, তাহলে লাভ অল্প হয়, পুরো হয় না।

প্রশ্ন—ব্রহ্মদৈত্য (জিন) থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায় কি ?

উত্তর—(ক) যে ব্যক্তি তৎপরতার সঙ্গে ভগবৎ ভজনা করেন, যাঁর সাধনার অগ্রগতি হয়েছে, যাঁর ভজন এবং স্মরণের জোর আছে, এইরূপ ব্যক্তির কাছে গেলে ব্রহ্মদৈত্য চলে যায়, কারণ ভাগবতী শক্তির সামনে তার শক্তি কাজ করে না।

(খ) ব্রহ্মদৈত্য ভর করা ব্যক্তি যদি কোন সিদ্ধ মহাপুরুষের নিকট যায়, তবে সেই ব্যক্তি ব্রহ্মদৈত্যের হাত থেকে মুক্তি পেয়ে যায় এবং সেই ব্রহ্মদৈত্যও মুক্তিলাভ করে।

(গ) যদি ব্রহ্মদৈত্য গয়াশ্রাদ্ধে আগ্রহী থাকে, তাহলে তার নামে গয়াতে শ্রাদ্ধ করা কর্তব্য, এর দ্বারা সে সদ্‌গতি প্রাপ্ত হয়।

প্রশ্ন—ভূত-প্রেত কাদের কাছে আসে না ?

উত্তর—ভূত-প্রেতের সম্বন্ধ বা জোর সেইসব লোকের উপরই থাকে, যাদের সঙ্গে তাদের পূর্বজন্মের লেনদেন ছিল বা যাদের প্রারব্ধ খারাপ অথবা যেসব ব্যক্তি ভগবানের (পারমার্থিক) পথে বিচরণ করে না অথবা যাদের খাওয়া-দাওয়া অশুদ্ধ বা যারা স্নানাদিতে শুদ্ধি রাখে না বা যাদের আচরণ খারাপ। যাঁরা ভগবৎপরায়ণ, ভগবৎনাম জপ-কীর্তন করেন, ভগবৎকথা শোনেন, খাওয়া-দাওয়া-স্নানাদিতে শুদ্ধি রাখেন, যাঁদের আচরণ শুদ্ধ, তাঁদের কাছে ভূত-প্রেত প্রায়শঃ আসতেই পারে না।

যাঁরা প্রত্যহ শ্রদ্ধা সহকারে গীতা, ভাগবত, রামায়ণ ইত্যাদি সদ্‌গ্রন্থ পাঠ করেন, তাঁদের কাছেও ভূত-প্রেত যায় না। কিন্তু কিছু ভূত-প্রেত এমনও আছে যারা নিজেরাই গীতা, রামায়ণ ইত্যাদি পাঠ করে। এরূপ ভূত সদ্‌গ্রন্থ পাঠকারীর কাছে গেলেও তাদের কষ্ট দিতে পারে না। যদি এইরূপ ভূত-প্রেত সদ্‌গ্রন্থ পাঠকারীর নিকটে আসে, তাহলে তাকে অনাদর করতে নেই ; কারণ অনাদর, অবহেলাতে এরা রেগে যায়।

যিনি প্রত্যহ গঙ্গাজলের চরণামৃত পান করেন, তাঁর কাছেও ভূত-প্রেত আসে না। হনুমানচালীসা বা বিষ্ণুসহস্রনাম পাঠ যারা করেন, তাদের কাছেও ভূত-প্রেত আসে না। একবার দুই ভদ্রলোক গরুর গাড়ীতে করে অন্য গ্রামে যাচ্ছিল। রাস্তাতে এক পিশাচ তাদের গাড়ীর সঙ্গ নিল। এই দেখে ভদ্রলোক দুজন ভয় পেয়ে গেল। একজন তখন বিষ্ণুসহস্রনাম পাঠ করতে আরম্ভ করে। যতক্ষণ গাড়ী অপর গ্রামের সীমার কাছে না এল,

---

৯	১৬	৫	৪
৭	২	১১	১৪
১২	১৩	৮	১
৬	৩	১০	১৫

এই যন্ত্রকে সাদা কাগজ বা ভূর্জপত্রের ওপর আনারের কলম দিয়ে অষ্টগন্ধ (শ্বেত চন্দন, লাল চন্দন, কেশর, কুঙ্কুম, কর্পূর, কস্তুরী, অগর এবং তগর) দ্বারা লিখতে হবে। এই যন্ত্রে এক থেকে ষোল পর্যন্ত অক্ষর আছে, কোনটি বাদ পড়েনি বা কোনটি দ্বিতীয়বার আসেনি। যন্ত্রটি লেখার সময় ১, ২ ইত্যাদি ক্রমানুসারে লিখবে।

এটি সূর্যগ্রহণ, চন্দ্রগ্রহণ বা দীপাবলীর রাত্রে ১০৮-বার লিখলে সিদ্ধ হয়। শীঘ্র সিদ্ধ করতে হলে কোন শনিবারে ধোবীঘাটে বসে যন্ত্রগুলি একে একে লিখে ধোবীর জলভরা গামলায় ফেলবে। এইভাবে ১০৮ টি যন্ত্র গামলায় ফেলার পর সেখান থেকে তুলে প্রবাহিত জলে ফেলবে। এরূপ করলে যন্ত্র সিদ্ধ হয়। যন্ত্র সিদ্ধ হলেও প্রত্যেক গ্রহণ এবং দীপাবলী ও হোলীর রাত্রিতে যন্ত্র ১০৮বার লিখবে ও নদীতে দেবে। (এই যন্ত্রকে 'চৌতীসা যন্ত্র' এজন্য বলা হয়, ৬৪ ভাবে গণনা করলেও এটির যোগফল ৩৪ হবে)। চৌতিসা যন্ত্রের এখানে মাত্র একটি প্রকার করা হয়েছে, এই যন্ত্রটি ৩৮৪ রকমে তৈরী করা যায়।

ততক্ষণ পিশাচ গাড়ীর পিছন পিছন চলছিল, গ্রামের সীমা আসতেই সে অদৃশ্য হয়ে গেল। বিষ্ণুসহস্রনামের প্রভাবে সে গাড়ী আক্রমণ করতে পারেনি।

যার গলায় তুলসী, রুদ্রাক্ষ বা বদ্ধ পারার মালা থাকে ভূত-প্রেত তাকে স্পর্শ করতে পারে না। এক ভদ্রলোক ভোর চারটে নাগাদ ঘোড়ায় করে কোন এক প্রয়োজনে অন্য গ্রামে যাচ্ছিল। শীতের দিন, সূর্যোদয় হতে তখনো প্রায় দেড় ঘন্টা বাকী। সেই ব্যক্তি যেতে যেতে এমন একটা জায়গায় পৌঁছল, যেটি ভূত-প্রেতের অবস্থান হেতু কুখ্যাত ছিল। সেখানে পৌঁছতেই লোকটির সামনে হঠাৎ একটি ভূত গাছের মত বিরাট আকার ধারণ করে রাস্তায় দাঁড়িয়ে পড়ল। ঘোড়া ভয় পেয়ে লাফ মারতে লোকটি ঘোড়া থেকে পড়ে গেল এবং তার দুটি হাতই মচকে গেল। সেই লোকটি অত্যন্ত সাহসী ছিল, তাই পিশাচকে দেখেও ভয় পায়নি। যতক্ষণ না সূর্যোদয় হল, ততক্ষণ পিশাচ সেই লোকটির সামনে দাঁড়িয়ে থাকল, কিন্তু ভদ্রলোকের ওপরে কোন অত্যাচার করেনি এবং স্পর্শও করতে পারেনি, কারণ ভদ্রলোকের গলায় তুলসী মালা ছিল। সূর্যোদয় হলে পিশাচ অদৃশ্য হয়ে গেল এবং লোকটিও ঘোড়ায় করে নিজের বাড়ী ফিরে এল।

সূর্যাস্তের পর থেকে অর্দ্ধেক রাত পর্যন্ত এবং দুপুরের সময়ে ভূত-প্রেতের শক্তি বেশী থাকে এবং তারা বেশী জোর খাটাতে পারে। সকলেই অনুভব করেন যে রাত্রি এবং মধ্যাহ্ন সময়ে শ্মশানাদি স্থানে যেতে যেমন ভয় লাগে, সন্ধ্যা বা সকালে গেলে সেরকম লাগে না। যদি রাত্রে বা মধ্যাহ্নে কোন নির্জন স্থানে যেতে হয় এবং সেখানে পেছন থেকে কেউ ডাকে বা বলে 'আমি যাব', তাহলে কোন উত্তর দেওয়া উচিত নয় এবং চলতে চলতে ভগবৎনাম জপ, কীর্তন, বিষ্ণুসহস্রনাম এবং হনুমানচালীসা, গীতা ইত্যাদি পাঠ শুরু করে দেওয়া উচিত। উত্তর না দিলে প্রেত সেখানেই থেকে যাবে। আমরা যদি উত্তর দিই, বলি 'হ্যাঁ এসো' তাহলে সে আমাদের পিছন ধরবে।

ভূত-প্রেত যেখানে থাকে সেখানে প্রস্রাব করলেও তারা সেই লোকটিকে ভর করে, কেননা তাদের স্থানে প্রস্রাব করা অন্যায়। সুতরাং যে কোন স্থানে প্রস্রাব করা উচিত নয়।

দুর্গতিতে পড়ে আমাদের যাতে প্রেতযোনিতে যেতে না হয় এই সাবধানতার জন্য এবং যাতে গয়াশ্রাদ্ধ করে পিণ্ডজল দিয়ে প্রেতাত্মাদের উদ্ধারের প্রেরণা জাগে সেজন্য এইস্থানে প্রেত-বিষয়ক চর্চা করা হল।

♠ ♠ ♠

(৯) গীতায় আহারীর বর্ণনা

রস্যস্নিগ্ধাদিষু প্রীতিঃ সাত্ত্বিকানাং স্বভাবতঃ। তীক্ষ্ণরুক্ষাদিষু প্রীতী রাজসানাং সুদুঃখদা॥
যাতযামাদিষু প্রীতিস্তামসানাং স্বভাবজা। আহারিণঃ পরীক্ষার্থমাহারা বর্ণিতাস্ততঃ॥

মানুষের যে স্বাভাবিক বৃত্তি, স্থিতি, ভাব তৈরী হয়, সেটি তৈরী হওয়ার পিছনে কিছু কারণ থাকে, তার মধ্যে আহারও একটি কারণ। কথিত হয় 'যেমন অন্ন খাবে, তেমন মন হবে'। সুতরাং আহার যত সাত্ত্বিক হয়, মানুষের বৃত্তিও ততই সাত্ত্বিক হয় অর্থাৎ সাত্ত্বিক বৃত্তি গড়ে তুলতে সাহায্য করে সাত্ত্বিক আহার।

গীতায় খাদ্যের আলাদাভাবে বর্ণনা করা হয়নি, প্রত্যুত আহারী বা ব্যক্তির বর্ণনা হলে সেখানে আহারেরও বর্ণনা এসে যায়। যেমন সাত্ত্বিক ব্যক্তির প্রিয় বলে সাত্ত্বিক আহারের, রাজসিক ব্যক্তির প্রিয় বলে রাজসিক আহারের এবং তামসিক ব্যক্তির প্রিয় বলে তামসিক আহারের বর্ণনা করা হয়েছে (১৭।৮-১০)। সুতরাং গীতায় যেখানে খাদ্যের কথা এসেছে, সেখানে ভগবান আহারী অর্থাৎ ব্যক্তিটির কথা বর্ণনা করেছেন ; যেমন **'নিয়তাহারাঃ'** (৪।৩০) পদ দ্বারা নিয়মিত আহারকারী **'নাত্যশ্নতস্তু যোগোঽস্তি ন চৈকান্তমনশ্নতঃ'** (৬।১৬) পদদ্বারা অধিক ভোজনকারী এবং অত্যল্প ভোজনকারী, **'যুক্তাহারবিহারস্য'** (৬।১৭) পদদ্বারা নিয়মিত ভোজনকারী **'যদশ্নাসি'** (৯।২৭) পদে ভোজ্য পদার্থ ভগবানে অর্পণকারী, এবং **'লঘ্বাশী'** (১৮।৫২) পদদ্বারা

অল্প ভোজনকারীর বর্ণনা করা হয়েছে।

গীতাতে যে তিনটি গুণের (সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ) বর্ণনা করা হয়েছে তাতেও তারতম্য থাকে। সাত্ত্বিক মানুষের মধ্যে সত্ত্বগুণের প্রাধান্য হলেও সঙ্গে রাজসিক-তামসিক ভাব থাকে। রাজসিক মানুষের মধ্যে রজোগুণ প্রাধান্য পেলেও সঙ্গে সাত্ত্বিক ও তামসিক ভাব থাকে, তেমনি তামসিক মানুষের মধ্যে তমোগুণের প্রাধান্য থাকলেও সঙ্গে সাত্ত্বিক-রাজসিক ভাবও থাকে। এর কারণ এই যে সম্পূর্ণ সৃষ্টিই ত্রিগুণাত্মক (১৮।৪০)। দুটি গুণকে দমিত করে একটি গুণ প্রধান হয়ে ওঠে (১৪।১০)। সুতরাং সাত্ত্বিক মানুষের সাত্ত্বিক পদার্থ স্বাভাবিকভাবে প্রিয় লাগলেও তিনটি গুণের মিশ্রণ থাকার ফলে অথবা প্রথমে রাজসিক ও তামসিক ভোজ্য গ্রহণের অভ্যাসে অথবা শরীরে কোন পদার্থ কম হলে অথবা শরীর অসুস্থ হলে কখনও রাজসিক-তামসিক খাদ্য গ্রহণের ইচ্ছা হয়। যেমন খুব নুন বা নোন্তা জিনিস খাবার ইচ্ছা হয় বা আধাপক্ক শাক ইত্যাদি খেতে মনে ইচ্ছা আসে।

রাজসিক ব্যক্তির রাজসিক পদার্থ স্বাভাবিকভাবে প্রিয় লাগলেও তিনটি গুণের সংমিশ্রণ থাকায় অথবা আগে সাত্ত্বিক-তামসিক পদার্থ খাবার অভ্যাসে কিংবা অন্য কোন কারণবশতঃ কখনো কখনো সাত্ত্বিক-রাজসিক পদার্থের ইচ্ছা হয়ে থাকে। যেমন প্রথমে দুধ, কাজু, পেস্তা, বাদাম ইত্যাদি খাওয়া হয়েছে এবং অসুস্থতার জন্য শরীর কমজোরী বা দুর্বল হলে বল বাড়াবার জন্য ঐসব সাত্ত্বিক দ্রব্য খাওয়ার ইচ্ছা হয়। এরকমই কখনো কখনো রসুন, পেঁয়াজ ইত্যাদি তামসিক পদার্থ খাবার ইচ্ছা জাগে।

তামসিক মানুষের তামসিক পদার্থ স্বাভাবিকভাবে প্রিয় লাগলেও কখনো শরীর দুর্বল হলে বা অন্য কোন কারণেও দুধ, ঘি প্রভৃতি সাত্ত্বিক এবং টক, নোন্তা প্রভৃতি রাজসিক পদার্থ খাবার ইচ্ছা জাগে।

সাত্ত্বিক ব্যক্তির পূর্বসংস্কারের জন্য রাজসিক-তামসিক খাদ্য ভোজনের ইচ্ছা হলেও তিনি তা করেন না, কেননা সত্ত্বগুণের প্রাধান্য থাকায় তাঁর বিবেক জাগ্রত থাকে, বিবেকই তাঁকে এই কাজ থেকে বিরত করে। শুধু তাই নয়, সাত্ত্বিক পদার্থ স্বাভাবিকভাবে প্রিয় হলেও তাঁর মনে সাত্ত্বিক পদার্থের জন্য প্রবল ইচ্ছা থাকে না। তীব্র বৈরাগ্য হলে সাত্ত্বিক পদার্থের প্রতিও উপেক্ষা জন্মায়। রাজসিক মানুষও শরীর পুষ্ট ও ঠিক রাখার পক্ষে উপযোগী সাত্ত্বিক ও তামসিক খাদ্য পছন্দ করে। রাগের (আসক্তির) প্রাধান্য থাকায় এই ইচ্ছা বা পছন্দ ঐসব পদার্থ সেবন করতে তাকে বাধ্য করে। তামসিক ব্যক্তিদেরও সাত্ত্বিক ও রাজসিক মানুষের সাহচর্যে সাত্ত্বিক ও রাজসিক পদার্থ গ্রহণ করার ইচ্ছা বা রুচি হয়। কিন্তু মোহ এবং মূঢ়তার প্রাধান্য থাকায় এই ইচ্ছা তাদের ওপর বিশেষ প্রভাব ফেলে না।

সাত্ত্বিক ব্যক্তি যদি সাত্ত্বিক ভোজ্য পদার্থ রাগপূর্বক বেশী মাত্রায় সেবন করে, তবে সেই ভোজন রাজসিক হয়, যা পরিণামে দুঃখ, শোক এবং রোগের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। যদি সে লোভের বশবর্তী হয়ে অধিক মাত্রায় কোন পদার্থ সেবন করে, তবে সাত্ত্বিক ভোজনও তামসিক হয়ে যায় যা অধিক নিদ্রা এবং আলস্যের কারণ হয়।

রাজসিক মানুষও যদি আসক্তিপূর্বক রাজসিক ভোজন করে, তাহলে পরিণামে রোগ, পেট জ্বালা ইত্যাদি হবে। যদি ঐসব পদার্থ অধিক মাত্রায় সেবন করে, তাহলে জ্বালা, দুঃখ, রোগাদির সঙ্গে সঙ্গে নিদ্রা, আলস্য ইত্যাদিও বেড়ে যাবে। কিন্তু ঐ খাদ্যই সে বিচার-বিবেচনাপূর্বক অল্পমাত্রায় যদি নেয়, তাহলে তার পরিণাম রাজস (দুঃখ-শোক) না হয়ে সাত্ত্বিক হয় অর্থাৎ অন্তঃকরণে নির্মলতা, শরীর হাল্কা, প্রফুল্লতা ইত্যাদি হয়। ঘুম কম পাবে এবং আলস্য হবে না, কেননা সে যুক্তাহার করেছে।

তামসিক মানুষ যদি মোহপূর্বক তামসিক ভোজন করে, তাতে তামসিক বৃত্তি অত্যন্ত বেড়ে যায়। যদি সেরূপ খাদ্যও সে অল্পমাত্রায় ভোজন করে, তাহলে ঐরূপ বৃত্তি হয় না ; খাদ্য অনুসারে স্বাভাবিক তামসিক বৃত্তি থাকে অর্থাৎ অধিক মোহজনক বৃত্তি হয় না।

ভোজ্যপদার্থ সাত্ত্বিক হলেও যদি তা ন্যায়ভাবে এবং সৎপথে উপার্জিত না হয় অর্থাৎ নিষিদ্ধ রীতিতে অর্জন করা হয় তবে তার পরিণাম ভাল হয় না। তাতে কোন না কোন ভাবে রাজসিক, তামসিক বৃত্তি এসে যায়, ফলে ঐ খাদ্য-পদার্থের দ্বারা রাগ, নিদ্রা, আলস্য বৃদ্ধি পায়। সুতরাং ভোজ্যপদার্থ সাত্ত্বিক হতে হবে, সত্যপথে উপার্জিত হতে হবে, শুদ্ধভাবে প্রস্তুত করতে হবে, ভগবানকে নিবেদন করে অল্পমাত্রায় গ্রহণ করতে হবে,

তাহলে তার ফল খুবই ভাল হবে।

রাজসিক খাদ্য ন্যায়যুক্ত এবং সত্যপথে উপার্জন করা হলেও খাবার সময়ে খাদ্যদ্রব্যের প্রভাব তো পড়বেই অর্থাৎ পেটে জ্বালা ইত্যাদি হবে। কারণ ভোজ্যপদার্থের শরীরের সঙ্গেই বেশী সম্বন্ধ হয়। তবে খাদ্য-পদার্থ যদি সৎপথে উপার্জন করা হয়, তবে পরিণামে বৃত্তিসকল ভাল হবে এবং রাজসিক বৃত্তি বেশীক্ষণ স্থায়ী হবে না। বৃত্তিতে শোক, চিন্তা ইত্যাদির তীব্রতা থাকে না, শান্তি বজায় থাকে।

তামসিক খাদ্য সৎপথে উপার্জিত হলেও তার দ্বারা তামসিক বৃত্তি তৈরী হবেই। তবে একথা ঠিক যে, সৎপথে উপার্জিত অর্থের তামসিক খাদ্য দ্বারা যে বৃত্তি উৎপন্ন হয়, তা স্থায়ী নয়, সাত্ত্বিক বৃত্তিও তার মধ্যে জেগে উঠবে।

সাত্ত্বিক মানুষের বিবেক জাগ্রত থাকে, সেইজন্য সে প্রথমে পরিণামের কথা ভাবে। সেইজন্যই সাত্ত্বিক আহারে প্রথমে ফল বা পরিণাম বলে পরে খাদ্য পদার্থের বর্ণনা আছে (১৭।৮)। রাজসিক মানুষের রাগ থাকে, ভোজ্যপদার্থে আসক্তি থাকে ; সেইজন্য তার দৃষ্টি খাদ্য-পদার্থের দিকে যায়। তাই রাজসিক আহারে প্রথমে খাদ্যবস্তু ও পরে তার ফল বা পরিণাম বলা হয়েছে (১৭।৯)। তামসিক মানুষের মোহ এবং মূঢ়তা থাকে ; সুতরাং সে মোহপূর্বক আহার করে। সেইজন্য তামসিক আহারে কেবল তামসিক পদার্থের বর্ণনাই আছে, ফল বা পরিণামের বর্ণনা নেই (১৭।১০)।

মানুষ যে কোন বর্ণ, আশ্রম বা সম্প্রদায়েরই হোক না কেন যদি সে পারমার্থিক পথের সাধনাকারী হয়, তাহলে তার রুচি বা আকর্ষণ স্বাভাবিকভাবেই সাত্ত্বিক ভোজনেই হবে, রাজসিক বা তামসিক পদার্থে নয়। সাত্ত্বিক আহারে বৃত্তিসকল সাত্ত্বিক হয় এবং সাত্ত্বিক বৃত্তি উৎপন্ন হলে সাত্ত্বিক আহারই প্রিয় হয়ে ওঠে।

কর্মযোগে নিষ্কামভাবের, জ্ঞানযোগে বিবেকপূর্বক ত্যাগের এবং ভক্তিযোগে ভগবৎভাবের প্রাধান্য থাকে। এই সকল মার্গের সাধকগণের সম্মুখে খাদ্যবস্তু উপস্থিত হলে তাঁদের সেই খাদ্যবস্তুতে কোন আকর্ষণ বা ভালবাসা জন্মায় না। যেমন, কর্মযোগীর কাছে যদি খাবার আনা হয়, তাহলে তাঁর সুখ এবং ভোগবুদ্ধি না থাকায় তিনি রাগপূর্বক আহার করেন না। সুতরাং খাদ্যবস্তু পূর্ণরূপে সাত্ত্বিক না হলেও নিষ্কামভাব ভোজনের হেতু হওয়ায় সেই আহারটি সাত্ত্বিক হয়। জ্ঞানযোগী সমস্ত পদার্থ থেকে বিবেকপূর্বক সম্পর্ক ছেদ করে ; সুতরাং খাদ্যবস্তুর সঙ্গে তাঁর কোন সম্বন্ধ না থাকায় তিনি যা ভোজন করেন তা সাত্ত্বিক হয়। ভক্তিযোগী খাদ্যবস্তু প্রথমে ভগবানকে অর্পণ করে পরে প্রসাদ মনে করে তা গ্রহণ করেন, সুতরাং সেই খাদ্যও সাত্ত্বিক হয়ে যায়।

জ্ঞাতব্য

প্রশ্ন—আয়ুর্বেদ এবং ধর্মশাস্ত্রের মধ্যে বিরোধ কেন ? যেমন আয়ুর্বেদে অরিষ্ট, আসব, মদিরা, মাংস ইত্যাদি খাওয়ার বিধান আছে কিন্তু ধর্মশাস্ত্র এর বিরোধ করে ; এমন কেন হয় ?

উত্তর—শাস্ত্র চার প্রকারের—**নীতিশাস্ত্র, আয়ুর্বেদ-শাস্ত্র, ধর্মশাস্ত্র** এবং **মোক্ষশাস্ত্র**। নীতিশাস্ত্রে ধনসম্পত্তি, জমি-জায়গা ইত্যাদি লাভ করার এবং রক্ষা করার কথাই মুখ্যভাবে আছে। এতে কূটনীতির বর্ণনাও আছে, অপরের সঙ্গে ছল-চাতুরী, বিশ্বাসঘাতকতা ইত্যাদি করার কথাও আছে, যা গ্রহণযোগ্য নয়। আয়ুর্বেদশাস্ত্রে শরীর সম্বন্ধীয় কথাই প্রাধান্য পেয়েছে। সেইজন্য সেখানে এমনসব কথাই আছে যাতে শরীর ঠিক থাকে। যদিও এইসব কথা কোথাও কোথাও ধর্মশাস্ত্রের বিপরীত। ধর্মশাস্ত্রে সুখভোগের কথা প্রাধান্য পেয়েছে, সুতরাং এতে এমন সব কথা আছে যাতে ইহলোকেও সুখ পাওয়া যায় এবং পরলোকে (স্বর্গাদি লোকেও) সুখ পাওয়া যায়। মোক্ষশাস্ত্রে জীবের কল্যাণের কথা প্রাধান্য পেয়েছে, সেইজন্য এখানে সেইসব কথাই স্থান পেয়েছে যার দ্বারা জীবের কল্যাণ হয়, জীব উদ্ধার পায়। মোক্ষশাস্ত্রে ধর্ম-বিরুদ্ধ কথা আসেনি। এতে সকামভাবের বর্ণনাও আছে, কিন্তু তার মহিমা এখানে জানানো হয়নি বরং নিন্দাই করা হয়েছে। কারণ সাধকের যতক্ষণ সকামভাব থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত তার পরমাত্মপ্রাপ্তিতে বাধা ঘটে। ইহলোক এবং পরলোকে সুখের কামনা ত্যাগ করলে ধর্মশাস্ত্রও মোক্ষের সহায়ক হয়।

আয়ুর্বেদশাস্ত্রে শরীরেরই প্রাধান্য থাকে। সুতরাং যে কোন প্রকারে শরীর সুস্থ ও নীরোগ যেন থাকে তার জন্যই আয়ুর্বেদে জড়ি-বুটি দ্বারা তৈরি ঔষধ তথা মাংস, মদ্য, আসব প্রভৃতি সেবনের বিধান দেওয়া আছে। ধর্মশাস্ত্রে সুখভোগের প্রাধান্য আছে। সুতরাং এতেও স্বর্গাদি

প্রাপ্তির জন্য কৃত অশ্বমেধাদি যজ্ঞে পশুবলি ইত্যাদি নানাপ্রকার হিংসার বর্ণনা আছে। বৈদিক মন্ত্র দ্বারা বিধি-নিয়ম পূর্বক কৃত হিংসাকে হিংসা বলে গণ্য করা হয় না। কিন্তু হিংসা বলে না স্বীকার করলেও হিংসার পাপ তো স্পর্শ করবেই।[১] তাছাড়া ভোজনে মাংস সেবন করতে থাকলে মানুষের স্বভাব খারাপ হয়। ফলে তার মধ্যে ক্রমে পরলোকের প্রাধান্য কমতে কমতে স্থূল শরীরেরই প্রাধান্য হয়ে যায় এবং সেই ব্যক্তি পরে শাস্ত্রীয় বিধান ব্যতীতই মাংস খেতে আরম্ভ করে।

আয়ুর্বেদে হিংসার কোন সীমা নেই, কারণ সেটিতে স্থূল শরীরকে ঠিক রাখাই মুখ্য উদ্দেশ্য। অতএব এতে পরলোক খারাপ হল কি না তা নিয়ে পরোয়া নেই। ধর্মশাস্ত্রে হিংসা সীমিতভাবে আছে ; যাতে পরলোক নষ্ট হয়ে যায়, এরূপ হিংসা এতে নেই। কিন্তু ধর্মশাস্ত্রও মানুষের কল্যাণের বা মোক্ষের পরোয়া করে না। তাৎপর্য এই যে ধর্মশাস্ত্র এবং আয়ুর্বেদ দুই-ই প্রকৃতির রাজ্য নিয়ে। যতক্ষণ মানুষের হৃদয়ে বিনাশশীল পদার্থের গুরুত্ব থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত মানুষ পাপ এবং হিংসা থেকে দূরে থাকতে পারে না। সে নিজেরও হিংসা করে পতন ঘটায় এবং অপরেরও পতন ঘটায়। কিন্তু যার মধ্যে সকামভাব নেই, তার দ্বারা হিংসা হয় না। যদি তার দ্বারা কোন হিংসার কাজ হয়েও যায়, তাহলেও তার পাপ হয় না ; কারণ পাপ কামনা বা আসক্তিবশত হয়, কেবলমাত্র ক্রিয়াতে নয়।

মানুষের এমন একটি ধারণা প্রায়শঃই দেখা যায় যে, ঔষধ রূপে মাংসাদি অশুদ্ধ দ্রব্য খাওয়া অনুচিত নয়। কিন্তু যারা এই কথা মানে তারা ধর্ম বা নিজ কল্যাণের পরোয়া করে না, তারা শুধু নিজ শরীরকে ঠিক রাখা এবং সুখ ও আরামই প্রধান লক্ষ্য বলে মনে করে। ঔষধরূপেও যদি অভক্ষ্য ভক্ষিত হয়, তাতেও হিংসা এবং অপবিত্রতা আসেই। সুতরাং ঔষধ রূপেও অভক্ষ্য ভক্ষণ করা উচিত নয়।

প্রশ্ন—যদি শরীর বেঁচে থাকে তবেই তো মানুষ সাধন ভজন করবে ; তাহলে অভক্ষ্য ভক্ষণে যদি শরীর বাঁচে, তাতে ক্ষতি কি ?

উত্তর—অভক্ষ্য ভক্ষণ করলেই যে শরীর বাঁচবে, মৃত্যু পিছিয়ে যাবে এমন কোন নিয়ম নেই। যদি আয়ু শেষ না হয়ে থাকে তো শরীর বাঁচবে এবং আয়ু শেষ হলে শরীর বাঁচবে না। কারণ শরীরের বাঁচা না বাঁচা প্রারব্ধের অধীন, বর্তমান কর্মের অধীন নয়। অভক্ষ্য ভক্ষণ দ্বারা শরীর বাঁচতে পারে না, কেবল শরীরের কিছু পুষ্টি সাধিত হতে পারে। কিন্তু অভক্ষ্য ভক্ষণে যে পাপ অর্জিত হবে, তার ফল তো ভুগতেই হবে।

মানুষ সাধন-ভজনের বাহানা তৈরী করে। বাস্তবে শরীরে রাগ-আসক্তি থাকার জন্যই সে অশুদ্ধ ঔষধ সেবন করে। যার শরীরে রাগ (আসক্তি) নেই, যার উদ্দেশ্য নিজ কল্যাণ করা, সে প্রতিক্ষণ নষ্ট হতে থাকা নশ্বর শরীরের জন্য অশুদ্ধ বস্তু সেবন করে কেন পাপভাগী হবে ?

প্রশ্ন—আজকাল অনেকে জীবরহিত ডিম খাওয়াকে দোষের বলে মনে করেন না। এটা কতটা উচিত কাজ ?

উত্তর—জীবরহিত হলেও এটি শাক-সব্জীর মতো শুদ্ধ নয়, বরং ভয়ানক অশুদ্ধ। কারণ এই ডিম মহা অপবিত্র রজঃ (রক্ত) এবং বীর্য থেকে সৃষ্ট।

মা-ভগিনীগণ রজস্বলা হলে তাদের স্পর্শ করা হয় না, দূর থেকে নমস্কারাদি করা হয়, কেননা তাদের ছুঁলে অপবিত্রতা হয়। রজস্বলা (মাসিক-ধর্মকালে) স্ত্রীলোকের ছায়া পড়লে সাপ অন্ধ হয়ে যায় এবং পাঁপড়ের রং কালো হয়ে যায়। কোন জলাশয় স্পর্শ করলে তাতে কীটাণুর জন্ম হয়। অন্ন, বস্ত্র ইত্যাদিকে স্পর্শ করলে তা অপবিত্র হয়ে যায়। কেননা রজস্বলা স্ত্রীলোকের শরীর থেকে বিষ নির্গত হয়, যা দূরীভূত হলে শরীর শুদ্ধ হয়ে যায়। এইরূপে যে রজঃকে অপবিত্র বলে মনে করা হয়, সেই রজঃ থেকেই ডিম তৈরী হয়, সুতরাং সেই ডিম যারা খায় তারা তো অপবিত্র হবেই।

যে ব্যক্তি জীবরহিত ডিম খেতে আরম্ভ করে, সে পরে সজীব ডিমও খেতে থাকবে। তা ছাড়াও নির্জীব ডিমের সঙ্গে সজীব ডিমের যে ভেজাল নেই—তা কি করে বলা

[১]শতক্রতু ইন্দ্রও (শতযজ্ঞের দ্বারা ইন্দ্রত্বপদ প্রাপ্ত) দুঃখী হন, তাঁরও বিপদ আসে এবং মনে ঈর্ষা, ভয়, অশান্তি আদি হয় এবং চিন্তা আসে কেউ না আমার এই পদ ছিনিয়ে নেয়। এটি বৈদিক হিংসার পাপের ফল।

যাবে ? সুতরাং কোনভাবেই ডিম খাওয়া অনুচিত, এটি পাপকার্য।

প্রশ্ন—জড়ী-বুটির জন্য গাছ তোলাতেও হিংসা হয়, তাহলে তার দ্বারা প্রস্তুত ঔষধ খাওয়া উচিত কি ?

উত্তর—চতুর্থাশ্রমী সন্ন্যাসী এবং ত্যাগী ব্যক্তি যদি গাছ-গাছড়া থেকে তৈরী শুদ্ধ ঔষধও না খান তাহলে ভালো হয়, কারণ ত্যাগই তাঁদের মুখ্য উদ্দেশ্য। ত্যাগ সকলের পক্ষেই ভালো, তবু যদি গৃহস্থ আদি ব্যক্তি জড়ি-বুটির তৈরী ঔষধ সেবন করে, তাতে অত দোষ লাগে না। যেমন, যারা চাষ করে, তাদের দ্বারা অনেক জীবজন্তুর হিংসা হয়, কিন্তু তাতে অত দোষ লাগে না, কারণ চাষের দ্বারা উৎপন্ন অন্ন ইত্যাদির দ্বারা প্রাণীদের জীবন নির্বাহ হয়। সেইরূপই যারা ঔষধের জন্য গাছ-গাছড়া তুলে আনে, তাদের দ্বারা হিংসা কার্য হয় বটে কিন্তু তাতে তাদের ততো দোষ হয় না, কারণ ঐসব ঔষধ দ্বারা জনসাধারণ আরোগ্য লাভ করে।

পদ্মপুরাণে কথিত আছে যে, কোন ব্যক্তি যদি জলাশয় থেকে জল পান করে, তবে সেই জলাশয়ের ধার থেকে সামান্য মাটি তুলে বাইরে ফেলে দিতে হয়। এর তাৎপর্য এই যে, জলাশয়টি কারো দ্বারা খোদিত হয়েছে, সুতরাং তার থেকে খানিকটা মাটি কেটে ফেললে সেই জলাশয়টিতে জল পানকারী ব্যক্তিরও অধিকার বর্তাবে, এরূপ করলে অপরের জলাশয়ের জল পানের দোষ হবে না। এইরূপই, যেসব গাছ থেকে ঔষধাদি প্রস্তুত হয়, সেগুলিকে ভালোভাবে সংরক্ষণ করলে এবং অনাবশ্যক ভাবে না ছিঁড়লে আমাদের পাপ হবে না।

প্রশ্ন—রোগের উৎপত্তি কিভাবে হয় ?

উত্তর—রোগ দু-প্রকারে হয়—প্রারব্ধ থেকে এবং কুপথ্য থেকে। পুরাতন পাপের ফল ভোগ করার জন্য শরীরে যে রোগ হয় তা প্রারব্ধর জন্য হয়ে থাকে। যে রোগ নিষিদ্ধ বস্তু খাওয়াদাওয়া থেকে হয় তা কুপথ্যের জন্য হয়ে থাকে।

প্রশ্ন—আমরা কিভাবে বুঝতে পারব যে এই রোগ প্রারব্ধর ফলে এবং এই রোগ কুপথ্য থেকে হচ্ছে ?

উত্তর—পথ্য সেবন করে, সংযমপূর্বক থেকে এবং ঔষধ খেলেও যে অসুখ সারে না, তাকে প্রারব্ধের জন্য অসুস্থতা মনে করবে। যে অসুখ ঔষধ পথ্যাদি সেবনে ভালো হয়ে যায়, তার কারণ কুপথ্য বলে মনে করবে।

কুপথ্যের জন্য যে অসুখ হয় তা চার প্রকারের—সাধ্য, কৃচ্ছ্র-সাধ্য, যাপ্য এবং অসাধ্য। যে অসুখ ঔষধ খেলে সেরে যায়, তাকে বলে 'সাধ্য'। যে অসুখ অনেক দিন ধরে ঔষধ-পথ্য খেয়ে সাবধানে চললে সারে, তাকে বলে 'কৃচ্ছ্র-সাধ্য'। যে অসুখ ঠিকমতো ঔষধ-পথ্য সেবন করতে থাকলে চাপা থাকে, কিন্তু মূল থেকে সারে না তাকে 'যাপ্য' বলে। যে অসুখ ঔষধ-পথ্য খেলেও কিছুতেই সারে না, তাকে বলে 'অসাধ্য'।

প্রারব্ধ থেকে যে রোগ হয় তা অসাধ্যই হয়ে থাকে। কুপথ্য থেকে যে রোগ উৎপন্ন হয় তাও কখনো কখনো অসাধ্য হয়ে ওঠে। এইরূপ অসাধ্য রোগ প্রায়শঃই ঔষধে সারে না। কোন সাধু-সন্তের আশীর্বাদে, মন্ত্রের দ্বারা অনুষ্ঠিত যাগযজ্ঞে এবং ভগবৎকৃপাতেই এই সমস্ত অসুখ সারতে পারে।

প্রশ্ন—কুপথ্য থেকে যে রোগ হয় তা অসাধ্য হবার কারণ কি ?

উত্তর—এতে কয়েকটি কারণ হতে পারে। যেমন—(১) রোগ খুব পুরানো হলে, (২) প্রলোভনে কুপথ্য সেবন করে, (৩) ঔষধ প্রস্তুতকালে মাত্রা কম বেশী হয়ে গেলে, (৪) যে জড়ী-বুটি দ্বারা ঔষধ প্রস্তুত করা হয়েছে তা হয়ত টাট্‌কা নয়, পুরোনো হয়ে গেছে, (৫) রোগীর চিকিৎসক এবং ঔষধে যদি বিশ্বাস না থাকে, (৬) রোগী খাওয়া-দাওয়াতে যদি সংযম না রাখে, (৭) রোগী যদি ব্রহ্মচর্য পালন না করে—ইত্যাদি কারণের জন্যও কুপথ্য দ্বারা উৎপন্ন রোগ শীঘ্র সারতে চায় না।

যে রোগী বারংবার নানারূপ ঔষধ সেবন করে, অধিক মাত্রায় ঔষধ সেবন করে, তার ঔষধে বিশেষ কোনো উপকার হয় না ; কারণ ঔষধ তার কাছে আহার্য বস্তুরূপে পরিগণিত হয়। গ্রামে যারা থাকে তারা সাধারণতঃ ঔষধ সেবন করে না, তারা যদি কখনো ঔষধ ব্যবহার করে তবে তা শীঘ্র কাজ করে। যে ব্যক্তি মদ, চা ইত্যাদি নেশার বস্তু খায়, তার লিভার খারাপ হয়ে যায়, যার জন্য তার শরীরে ঔষধের কোন প্রভাব পড়ে না। যে ব্যক্তি ধর্মশাস্ত্র এবং আয়ুর্বেদশাস্ত্র বিরুদ্ধ খাওয়া-দাওয়া ও আহার-বিহার করে, তার কুপথ্যজনিত অসুখ ঔষধ সেবন করলেও দূর হয় না।

কুপথ্য ত্যাগ, পথ্যের সেবন এবং সংযতভাবে থাকা এই তিনটি উপায় ঔষধের থেকেও বেশী (রোগ দূর করতে) কাজ করে।

রোগীর সঙ্গে খাওয়া-দাওয়া, রোগীর পাত্রে ভোজন করা, রোগীর বিছানায় বসা, রোগীর বস্ত্রাদি ব্যবহার করা ইত্যাদিতে সংকর বা মিশ্র রোগ উৎপন্ন হয়, যার সঠিক নির্ণয় করা মুস্কিল হয়ে পড়ে। যদি রোগ ঠিকমতো না ধরা যায়, তবে ঔষধ কিভাবে তার ওপর কাজ করবে ?

যুগের প্রভাবে এই সমস্ত জড়ী-বুটির শক্তি ক্ষীণ হয়ে গেছে। কত দিব্য ঔষধ লুপ্ত হয়ে গেছে। যারা ঔষধ তৈরী করে তারা ঠিক মতো ঔষধ তৈরী করে না এবং অর্থের লোভে যে ঔষধে যে পদার্থ মেশাতে হবে, তা না দিয়ে অন্য সস্তার পদার্থ মেশায়, সুতরাং সেই ঔষধের সেরূপ গুণ থাকে না।

গ্রামের মানুষেরা চাষবাস ইত্যাদি পরিশ্রমের কাজ করে এবং মা এবং বোনেরা চাকি পেষণ করে এবং নানা পরিশ্রমের কাজ করে এবং বিশুদ্ধ অন্ন, জল এবং হাওয়া পায়, সেইজন্য কুপথ্যজনিত অসুখ তাদের হয় না। কিন্তু যারা শহরে থাকে তারা শারীরিক পরিশ্রম করে না এবং বিশুদ্ধ অন্ন, জল এবং হাওয়াও পায় না, সেইজন্য কুপথ্যজনিত রোগ তাদের হয়। তবে প্রারব্ধজনিত রোগ সকলেরই সমভাবে হয়, তা গ্রামেই হোক বা শহরে।

মানুষের শাস্ত্রের উপদেশ অনুযায়ী বিশুদ্ধ ঔষধ সেবন করা উচিত। যদি সাধু, সন্ন্যাসী, গৃহস্থ রোগগ্রস্ত হয়েও ঔষধ সেবন না করেন তাহলেও অসুখ সেরে যায় ; কারণ ঔষধ ব্যবহার না করাও একপ্রকার তপস্যা, যার দ্বারা রোগবালাই দূর হয়। যে ব্যক্তি অসুস্থতার জন্য দুঃখী এবং অপ্রসন্ন হয়ে থাকে তার ওপরই রোগের প্রভাব বেশী হয়। কিন্তু যে ব্যক্তি ভগবৎ স্মরণ-কীর্তন করে, সংযতভাবে জীবন যাপন করে এবং প্রসন্ন থাকে, তার ওপর রোগের বেশী প্রভাব পড়তে পারে না। চিত্তের প্রসন্নতায় তার রোগ দূর হয়।

প্রারব্ধজনিত যে রোগ তা সারাতে ঔষধ নিমিত্তের ন্যায় কাজ করে। আসলে তার প্রারব্ধে রোগমুক্তি থাকলে তবেই অসুখ সেরে যায়। যে কর্মের জন্য অসুখ হয়েছে, তার চেয়ে ভালো কোন পুণ্য কাজ, প্রায়শ্চিত্ত বা মন্ত্রাদি পাঠের অনুষ্ঠান যদি প্রবল হয়, তবে অসুখ সেরে যায় আর অনুষ্ঠানের থেকে যদি প্রারব্ধ প্রবল হয় তবে রোগ সারে না, হয়ত কিছুটা কমে।

প্রশ্ন—গলিতকুষ্ঠ, প্লেগ ইত্যাদি রোগীদের সংস্পর্শে এলে যদি সেই রোগ কারো হয়, তার কারণ কি বলা হবে প্রারব্ধ না অন্য কিছু ?

উত্তর—যার প্রারব্ধ ততো দৃঢ় নয় অর্থাৎ প্রারব্ধের কর্ম অনুযায়ী যার অসুখ হওয়ার আছে, তারই এই অসুখ হয়, সকলের নয়। প্রারব্ধে থাকার জন্যই গলিতকুষ্ঠ ইত্যাদি রোগীর সংস্পর্শে আসা তার পক্ষে নিমিত্ত হয়ে ওঠে।

প্রশ্ন—অসুখ সারাবার জন্য কিরূপ চিকিৎসা করা উচিত ?

উত্তর—চিকিৎসা পাঁচ প্রকারের হয়, মানবীয়, প্রাকৃতিক, যৌগিক, দৈবী এবং রাক্ষসী। গাছ-গাছড়ার জড়ী-বুটি থেকে যে ঔষধ হয়, তার দ্বারা চিকিৎসাকে বলা হয় **'মানবীয় চিকিৎসা'**। খাদ্য-জল-হাওয়া-রৌদ্র-মাটি ইত্যাদির দ্বারা যে চিকিৎসা হয়, তাকে বলা হয় **'প্রাকৃতিক চিকিৎসা'**। ব্যায়াম, আসন, প্রাণায়াম, সংযম, ব্রহ্মচর্য ইত্যাদির দ্বারা যে রোগ দূরীকরণের চেষ্টা, তাকে বলে **'যৌগিক চিকিৎসা'**। মন্ত্র-তন্ত্র ইত্যাদি তথা সাধু-সন্তদের আশীর্বাদ দ্বারা যে রোগ দূর করা হয়, তাকে বলে **'দৈবী চিকিৎসা'**। কাটা-ছেঁড়া তথা অপারেশান ইত্যাদির দ্বারা যে চিকিৎসা, তাকে বলা হয় **'রাক্ষসী চিকিৎসা'**। এইসবের মধ্যে শরীরের জন্য রোগ দূর করবার শ্রেষ্ঠ উপায় হল 'যৌগিক চিকিৎসা'। কারণ এতে কোন ব্যয় বাহুল্য নেই, পরাধীনতা নেই, তাছাড়া আসন, প্রাণায়াম, সংযম করলে শরীরে রোগও হয় না।

প্রশ্ন—ব্যায়াম, প্রাণায়াম, সংযম ও ব্রহ্মচর্যপালন করলে কিরূপ অসুখ হয় না—কুপথ্যজনিত অসুখ, না প্রারব্ধজনিত অসুখ ?

উত্তর—আসন, প্রাণায়াম, সংযম, ব্রহ্মচর্যপালন ইত্যাদি করলে কুপথ্যজনিত রোগ তো হয়ই না, প্রারব্ধজনিত রোগও ততো প্রবল হতে পারে না এবং শরীরে রোগের প্রভাব কম পড়ে। কারণ আসন ইত্যাদি করাও একপ্রকার কর্ম এবং তারও ফল আছে।

প্রশ্ন—ব্যায়াম এবং আসনে পার্থক্য কি ?

উত্তর—ব্যায়ামেরই দুটি বিভাগ আছে— (১) (কুস্তি) পেশীর ব্যায়াম ; যেমন ডন-বৈঠক ইত্যাদি এবং

(২) আসন বা যৌগিক ব্যায়াম ; যেমন— শীর্ষাসন, সর্বাঙ্গাসন, মৎস্যাসন ইত্যাদি।

যারা (কুস্তি) পেশীর ব্যায়াম করে, তাদের মাংসপেশীগুলি মজবুত, কঠিন হয়ে যায় আর যারা আসনের ব্যায়াম করে তাদের মাংসপেশী নরম, পেলব হয়। দ্বিতীয়তঃ যারা (কুস্তির) পেশীর ব্যায়াম করে তাদের শরীর যৌবনকালে তো ঠিকই থাকে, কিন্তু বৃদ্ধাবস্থায় ব্যায়াম না করার জন্য তাদের শরীরে অস্থি-সন্ধিতে বেদনা হতে থাকে। কিন্তু যারা আসনের ব্যায়াম করে তাদের শরীর যৌবনকালে তো ঠিক থাকেই এবং বৃদ্ধাবস্থায়ও যদি তারা আসন না করে, তাহলেও কোন অসুখ তাদের হয় না।[1] তাছাড়া আসনের ব্যায়াম করলে রক্ত সঞ্চালন ঠিকমতো হয় যার জন্য শরীর নীরোগ ও সুস্থ থাকে। ধ্যানাদিতেও আসন খুব সাহায্য করে। সুতরাং আসন করাই সব থেকে ভালো বলে মনে হয়।

প্রশ্ন—অনেকে বলে আসন করলে শরীর কৃশ হয়ে যায়, তা কি ঠিক ?

উত্তর—হ্যাঁ, তা ঠিক ; কিন্তু আসন করলে শরীর কৃশ হলেও শরীর দুর্বল হয় না। আসন করলে শরীর নীরোগ থাকে, শরীরে স্ফূর্তি আসে এবং শরীরে হাল্কাভাব থাকে। আসন না করলে শরীর স্থূল হবার সম্ভাবনা থাকে, স্থূল হয়ে শরীর ভারী হয়ে যায়, শিথিলতা আসে, কাজ করার উৎসাহ কমে যায়, চলতে ফিরতে পরিশ্রম হয়, উঠতে বসতে কষ্ট হয়, কেবল শুয়ে থাকতে মন চায় এবং অসুখ-বিসুখও বেশী হয়। সুতরাং শরীর স্থূল হওয়া তো ভালো নয় বরং কৃশ থাকাই শ্রেয়। কারো শরীর যদি কৃশ অথচ নীরোগ থাকে আর যদি কেউ মোটা হয়েও রোগী হয়, তাহলে দুইয়ের মধ্যে কৃশ থাকাই ভালো।

প্রশ্ন—আসন করা কাদের পক্ষে বেশী উপযোগী ?

উত্তর—যারা চাষবাস করে, পরিশ্রমের কাজ করে তাদের স্বাভাবিকভাবে ব্যায়াম হয়ে যায় এবং বিশুদ্ধ হাওয়াও মেলে, সুতরাং তাদের ব্যায়াম করার ততো প্রয়োজন নেই। কিন্তু যারা প্রধানত মস্তিষ্কের কাজ করে, অর্থাৎ দোকান, অফিস ইত্যাদিতে বসে বসে কাজ করে, তাদের জন্য আসন করা খুবই প্রয়োজনীয় ব্যায়াম।

প্রশ্ন—ব্যায়াম কতটা করা উচিত ?

উত্তর—পেশীর (কুস্তি) ব্যায়ামে ডন-বৈঠক দিতে দিতে শরীর যখন অবসন্ন হবে, পরিশ্রান্ত হবে, তখন তা ঠিক হয়েছে বুঝতে হবে। কিন্তু আসনের জন্য যে ব্যায়াম তাতে বেশী জোর দেওয়া চলে না, বরং শরীরে পরিশ্রম হচ্ছে বুঝতে পারলেই আসন করা বন্ধ করতে হবে। আসন করার মাঝে মাঝেই শবাসন করে নিতে হয়।

প্রশ্ন—কোন স্থানে ব্যায়াম করা উচিত ?

উত্তর—যে স্থানে বিশুদ্ধ হাওয়া চলাচল করে এবং গাছপালা আছে, সেইরূপ স্থানে ব্যায়াম করলে বিশেষ উপকার হয়। পেশীর ব্যায়ামে বিশুদ্ধ হাওয়া না হলেও চলে কিন্তু আসন করতে গেলে বিশুদ্ধ হাওয়া থাকা খুবই জরুরী। যারা শহরে থাকে তারা বাড়ীর ছাতে বা ঘরে অল্প পাখা চালিয়ে আসন করতে পারে।

প্রশ্ন—যারা ব্যায়াম করে তাদের কি খাওয়া উচিত ?

উত্তর—যেসব ব্যক্তি পেশীর ব্যায়াম করে তাদের দুধ ও ঘি খুব খাওয়া দরকার। দুধ, ঘি খেলে যদি বমনোদ্রেক হয় তাও গ্রাহ্য করতে নেই। তবে যতটা হজম করতে পারবে ততটা তো অবশ্যই খাওয়া উচিত। কিন্তু আসন যারা করে তাদের শুদ্ধ, সাত্ত্বিক এবং অল্প আহার করলেই হবে (৬।১৭)।

প্রশ্ন—শরীরের শক্তি কমে গেলে অসুখ বেশী হয়—একথা কতটা সত্য ?

উত্তর—এতে দুটি মত আছে—আয়ুর্বেদের মত এবং ধর্মশাস্ত্রের মত। আয়ুর্বেদের দৃষ্টি শরীর নিয়ে, সেইজন্য তাতে বলা হয়েছে যে, 'শরীরে শক্তি কম হলে রোগ বেশী উৎপন্ন হয়।' কিন্তু ধর্মশাস্ত্রের দৃষ্টি শুভ ও অশুভ কর্মের ওপর থাকে ; সুতরাং তাতে রোগের কারণ হিসাবে পাপ কর্মাদিকে বলা হয়েছে।

যখন মানুষের ক্রিয়মাণ (কুপথ্যজনিত)কর্ম অথবা পূর্বের পাপ কর্ম নিজ ফল দেবার জন্য উপস্থিত হয় তখন কফ, বাত, পিত্ত এই তিনটি বিকৃত হয়ে রোগ উৎপন্ন করার হেতু তৈরী হয়। আর তখনই ভূত-প্রেতও শরীরে

[1]বৃদ্ধাবস্থায়ও হাল্কা ব্যায়াম করা উচিত,তাতে শরীরে স্ফূর্তি এবং হাল্কাভাব থাকে।

প্রবিষ্ট হয়ে রোগ উৎপন্ন করে। বলা আছে যে—

বৈদ্যা বদন্তি কফপিত্তমরুদ্বিকারান্
জ্যোতির্বিদো গ্রহগতিং পরিবর্তয়ন্তি।
ভূতা বিশন্তীতি ভূতবিদো বদন্তি
প্রারব্ধকর্ম বলবন্মুনয়ো বদন্তি॥

'বৈদ্যরা কফ, পিত্ত এবং বায়ুকে রোগের কারণ বলে মনে করেন, জ্যোতিষীরা গ্রহের গতিকে কারণ বলে মনে করেন, প্রেতবিদ্‌গণ ভূত-প্রেত প্রবিষ্ট হওয়াকেই রোগের কারণ বলে মনে করেন ; কিন্তু মুনিগণ মনে করেন প্রারব্ধ কর্মই এর আসল কারণ'।

(১০) গীতায় ভগবানের উদারতা (মহানুভবতা)

উদারা যে সৃষ্টৌ সহিতমমতাপাশনিহতা
অতস্তে সংযাতা জনিমরণদুঃখেষু সততম্।
বিনা স্বার্থং কামং স্বসকলজনানাং হিতকরো
ভবানেকঃ কৃষ্ণস্ত্রিভুবনমুদারো বরতমঃ॥

অর্জুন ভগবানের ঐশ্বর্য অর্থাৎ সশস্ত্র এক অক্ষৌহিণী সেনা গ্রহণ না করে কেবল ভগবানকেই আপন করে নিয়েছিলেন, তাই তাঁর ভগবানের প্রাপ্তিও হল, এর সঙ্গে ভগবানের ঐশ্বর্য প্রাপ্তিও হল। ভগবান অর্জুনের জন্য অত্যন্ত সাধারণ কাজও করেছেন, তিনি পাণ্ডবদের সাত অক্ষৌহিণী সেনার মধ্যে অর্জুনের সারথির কাজ করেছেন (১।২১)— এ তাঁর বিশেষ উদারতা। যিনি অনন্ত সৃষ্টি-ধারণকারী, সমস্ত প্রাণিজগতের পালন-পোষণকারী ; তিনি ভক্তদের জন্য মনুষ্যরূপ ধারণ করেন (৪।৬)—এ তাঁর কি বিশেষ উদারতা !

যে ব্যক্তি সমত্বের জিজ্ঞাসু অর্থাৎ সমতা প্রাপ্ত হতে চায়, সেও বেদোক্ত সকাম অনুষ্ঠান এবং বড় বড় ভোগ অতিক্রম করে যায় (৬।৪৪)। সমতাপ্রাপ্ত যোগী বেদে, যজ্ঞে, তপে এবং দানে যত পুণ্যফলের উল্লেখ আছে, সমস্ত অতিক্রম করে যান (৮।২৮) অর্থাৎ স্বর্গাদি ফল অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট ফল লাভ করেন। সমত্ব লাভের উদ্দেশ্য হওয়ামাত্র ভগবান তাঁকে কত শ্রেষ্ঠ পদ দেন, ভগবানের বিধানে কত উদারতা !

বাস্তবে আর্ত এবং অর্থার্থী তো উৎকৃষ্ট ভক্ত নয়, কিন্তু ভগবানের মহানুভবতা এই যে, যে কেহ তাঁকে যে কোন ভাবে ভজনা করুক বা ভগবদ্‌মুখী হোক না কেন, ভগবান তাঁকেই উৎকৃষ্ট ভক্ত বলে মনে করেন—'উদারাঃ সর্ব এবৈতে' (৭।১৮)।

প্রায়শই মানুষ অপরের শ্রদ্ধা পাওয়ার জন্য নানাপ্রকার অভিনয় করে, অন্যদের নিজের অধীন, শিষ্য বানাতে সচেষ্ট থাকে ; কিন্তু ভগবানের বিচিত্র মহানুভবতা এই যে, যে ব্যক্তি নিজ কামনা পূর্তির উদ্দেশ্যে অন্য কোন দেবতাকে শ্রদ্ধাপূর্বক পূজার্চনা করে, ভগবান সেই ব্যক্তির শ্রদ্ধা সেই দেবতার প্রতি দৃঢ় করে দেন এবং সেই উপাসনার সুফলও পাইয়ে দেন (৭।২১-২২)।

মৃত্যুকালে মানুষ যেরূপ চিন্তা করে, শরীর ত্যাগ করার পর সে তাই প্রাপ্ত হয় (৮।৬)। এই বিধানেও ভগবানের উদারতার প্রকাশ ! যেমন অন্তিমকালে হরিণের চিন্তা নিয়ে মৃত্যু হওয়ায় ভরত মুনি হরিণত্ব প্রাপ্ত হয়েছিলেন, তেমনি ভগবৎ চিন্তায় মৃত্যু হলে ভগবৎ প্রাপ্তি হয়। এর তাৎপর্য হচ্ছে অন্তিম সময়ে হরিণের চিন্তায় মানুষ যেমন হরিণত্ব পায়, তেমনি ভগবৎ চিন্তায় ভগবানকে পায়। ভগবানের এই মহানুভবতার কোন সীমা নেই !

ব্রহ্মলোক পর্যন্ত যত লোক আছে, সেখানে গেলে পুনরায় ফিরে আসতে হয়। মানুষকে বারংবার জন্ম-মরণ চক্রেই আবর্তিত হতে হয় । কিন্তু ভগবৎপ্রাপ্তি হলে তাকে আর এই পৃথিবীতে ফিরে আসতে হয় না

(৮।১৬)—এ তাঁর কী বিরাট উদারতা !

যে ব্যক্তি একনিষ্ঠ চিত্তে ভগবানের উপাসনায় লেগে থাকে, ভগবান তার অপ্রাপ্তব্য বস্তু পাইয়ে দেন (৯।২২), তা লৌকিক প্রাপ্তি বা পারলৌকিক প্রাপ্তি, যাই হোক না কেন। লৌকিক প্রাপ্তিতে ভগবান তার দেহ-যাত্রা তথা আত্মীয়-পরিবার নির্বাহের ব্যবস্থা করে দেন, ভক্ত ও তার আত্মীয়গণের রক্ষার ব্যবস্থা করেন। কিন্তু এতে একটি বিশেষ কথা আছে, যা প্রাপ্তি করালে ভক্তের হিত হয় এবং সংসারে তাকে আবদ্ধ করে না, সেই বস্তুর প্রাপ্তি ভগবান করিয়ে দেন । কিন্তু যা প্রাপ্ত হলে ভক্তের অহিত হয় এবং সে সংসারে বদ্ধ হয় তার প্রাপ্তি তিনি করান না। যেমন, নারদের মনে বিবাহের ইচ্ছা হয়েছিল, কিন্তু ভগবান তার বিয়ে হতে দেন নি। কারণ তাতে নারদের উপকার হোত না। যদি লৌকিক প্রাপ্তির দ্বারা ভক্তের পতন না হয়, তাহলে তার লৌকিক চাহিদা না থাকলেও ভগবান লৌকিক প্রাপ্তি ঘটিয়ে দেন। যেমন, ধ্রুব প্রথমে সকামভাবে ভগবানের উপাসনা করেছিলেন। সেই উপাসনাতে তাঁর সকামভাব দূরীভূত হয়েছিল, তবুও ভগবান তাঁর জন্য ধ্রুবলোক সৃষ্টি করে ছত্রিশ হাজার বছরের রাজত্ব দিয়ে দিয়েছিলেন। এর তাৎপর্য এই যে তার অলৌকিক বা পারলৌকিক বিষয় তো তাকে পাইয়ে দেনই এবং লৌকিক বিষয়ে তার যদি কল্যাণ হয়, তাহলে তার প্রাপ্তিও ভগবান ভক্তকে করিয়ে দেন।

ভক্ত ভক্তিভাব দ্বারা যে সব বস্তু অর্থাৎ পত্র, পুষ্প, জল ইত্যাদি ভগবানকে অর্পণ করে, ভগবান তা গ্রহণ করেন, তিনি কখনো বিচার করেন না সেটি ফল না ফুল (৯।২৬)। ভগবান তাঁর উদারতায় ভক্তের ভাবে ভেসে যান । শুধু তাই নয় ভক্তের ভাবে ভেসে তিনি নিজেকে বিলিয়ে দেন—

> **তুলসীদলমাত্রেণ জলস্য চুলুকেন বা।**
> **বিক্রীণীতে স্বমাত্মানং ভক্তেভ্যো ভক্তবৎসলঃ॥**

—ভগবানের এই উদারতার কোন সীমা নেই !

সংসারে পদ, অধিকার ইত্যাদি সকলে সমানভাবে পায় না, যোগ্যতা ইত্যাদি অনুসারেই তা মেলে। কিন্তু ভগবান তাঁর প্রাপ্তির জন্য এতো দরাজ ব্যবস্থা রেখেছেন যে, অত্যন্ত পাপী দুরাচার ব্যক্তিও তাঁর নামগান করতে পারে ; তাঁকে নিজের বলে ভাবতে পারে, তাঁর দিকে অগ্রসর হতে পারে এবং তাঁকে পেতে পারে (৯।৩০-৩১)।

যে কেবল ভগবানের নাম-কীর্তনাদি ভজনে মগ্ন হয়ে থাকে, ভগবানের লীলা আস্বাদন করে, তার ইচ্ছা না থাকলেও যে জ্ঞান জিজ্ঞাসু ব্যক্তিদেরও বহু কষ্টে প্রাপ্তি হয় তাকে সেই জ্ঞান প্রাপ্তি তিনি নিজের থেকে করিয়ে দেন, (১০।১১)। এ তাঁর কি বিশাল উদারতা !

গীতায় অর্জুন ভগবানকে অল্প কিছু জিজ্ঞাসা করলে ভগবান বিস্তারিতভাবে তার উত্তর দেন। অর্থাৎ অর্জুনের প্রশ্নের জবাব দেওয়ার পরও নিজে থেকে আরও ভালো করে বুঝিয়ে দেন। অর্জুন ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানালেন, 'হে ভগবান ! আমি আপনার অবিনাশী রূপ দেখতে ইচ্ছুক (১১।৩)। ভগবান তখন দেবরূপ, উগ্ররূপ, অত্যুগ্ররূপ ইত্যাদি নানাস্তরে নিজের অক্ষয় অবিনাশী রূপ দেখালেন। অর্জুন যদি তাঁর বিশ্বরূপ দেখে ভয় না পেতেন, তাহলে না জানি ভগবান অর্জুনকে তাঁর আরও কতরকম রূপ দেখিয়ে দিতেন। এ যে তাঁর কি বিরাট মহানুভবতা !'

নির্গুণ উপাসনাকারিগণ পরাভক্তিদ্বারা ভগবানের তত্ত্ব অবগত হয়ে ভগবানে প্রবিষ্ট হন (একাত্ম হয়ে যান) (১৮।৫৫)। কিন্তু যারা সগুণ উপাসনাকারী, তাদের ভগবান জ্ঞান দান করেন, দর্শন দেন এবং নিজ প্রাপ্তির ব্যবস্থাও করে দেন (১১।৫৪)। যে সব ভক্ত ভগবানে চিত্ত নিবিষ্ট রাখেন, ভগবান স্বয়ং তাদের সংসার-সাগর থেকে উদ্ধারকারী হন (১২।৭)। ভক্তের প্রতি তাঁর কত দয়া !

যে অবিনাশী শাশ্বত পদ বহু কাল ধরে নির্জনে থেকে ধ্যান-ধারণা-সমাধি দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায়, সেই অবিনাশী পদ তাঁর কৃপাতে সাংসারিক সমস্ত কর্ম করেও অনায়াসে প্রাপ্ত হওয়া যায় (১৮।৫১-৫৬)। যে শুধু ভগবানের শরণ নেয়, ভগবান তাকে সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত করেন (১৮।৬৬)। এ তাঁর বিশাল মহানুভবতা !

যে ব্যক্তি ভগবদ্-ভক্তের মধ্যে গীতার প্রচার করে,

সে ভগবানকেই প্রাপ্ত হয়। তার মত আর কেউ ভগবানের অত প্রিয় হয় না। যদি কেউ প্রচার করতে না পারে, শুধু গীতা অধ্যয়ন ও পঠন-পাঠন করে তার দ্বারা ভগবানের জ্ঞানযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়। যে ব্যক্তি গীতা অধ্যয়ন করে উঠতে পারে না, শুধু দোষ-দৃষ্টিরহিত হয়ে শ্রদ্ধাপূর্বক গীতা শ্রবণ করে, সে শরীর ত্যাগের পর ভগবদ্ধামে গমন করে (১৮।৬৮-৭১)। ভগবানের এই উদারতাকে কি বলা যায়!

কেউ ভগবানকে মানুক বা না মানুক, তাঁকে অভিনন্দিত করুক বা তাঁর মতবাদ খণ্ডন করুক, ভগবানের অস্তিত্ব ত্রিলোকের থেকে মুছে দিতেই চাক না কেন, তাহলেও ভগবানের সৃষ্ট এই পৃথিবী সবাইকেই সমানভাবে আশ্রয় দেয়। এই পৃথিবীতে সকলেই সমানভাবে ওঠা-বসা করে, প্রস্রাব-পায়খানা করে। কিন্তু পৃথিবী তার দোষাদির দিকে নজর দেয় না। ভগবানের সৃষ্ট জলে কেউ স্নান করে, কাপড় কাচে, আচমন করে বা মুখ ধোয় তবুও জল সমানভাবে সকলের পিপাসা মেটায়। ভগবানের সৃষ্ট অগ্নি সকলকে সমানভাবে আলো দেয়, প্রাণিগণের ভক্ষ্য চার প্রকারের খাদ্য হজম করায় এবং জ্যোতিঃপ্রকাশ দ্বারা সকলের ভয় দূর করে। ভগবানের সৃষ্ট বায়ু সকলকে সমানভাবে শ্বাস-প্রশ্বাসের কাজে সাহায্য করে, বাঁচতে সাহায্য করে। সবাইকে সমানভাবে শক্তি যোগায়। ভগবানের সৃষ্ট আকাশ সবাইকে সমান অবকাশ দেয়, দশদিকে বিস্তৃত হবার, বেড়ে ওঠবার জন্য সকলকে সমানভাবে অধিকার দেয়। এইরূপ যাঁর সৃষ্ট বস্তু এতো মহৎ, উদার, তিনি নিজে তাহলে কতো মহান!

কেউ যদি নিজ গৃহে কর্পোরেশনের জল ব্যবহার করে তাহলে তার জন্য কর দিতে হয়, কিন্তু ভগবান কত নদ-নদী সৃষ্টি করেছেন, তার কোন কর ভগবানকে দিতে হয় না। এইরকমই কেউ যদি নিজ গৃহে বিদ্যুতের তার টানে তার জন্য তাকে কর দিতে হয়। কিন্তু ভগবান যে সূর্য, চন্দ্র, অগ্নি ইত্যাদি সৃষ্টি করেছেন তার জন্য তাঁকে কোন কর দিতে হয় না। সবাই বিনামূল্যেই আলো-বাতাস পায়। এ যদি তাঁর অসীম মহানুভবতা না হয়, তাহলে একে কি বলা হবে?

ভগবান মানুষের শরীর ইত্যাদি এত সুন্দরভাবে তৈরী করেছেন, এত সম্পূর্ণতার সঙ্গে সৃষ্টি করেছেন যে মানুষ এসব তার নিজস্ব বলে মনে করে। যদিও এসব নিজের বলে মনে করা বাস্তবে ভগবানের সৃষ্টির মহত্বের প্রতি অবিচার করা।

ভগবান কখনো বলেন না যে, 'মানুষ আমাকে যদি মানে তবেই সে উদ্ধার পাবে।' এ তাঁর মস্ত বড় উদারতা। মানুষ তাঁকে মানল কি না মানল তাতে তাঁর কোন আগ্রহ নেই। কিন্তু মানুষ তাঁর নিয়মগুলি যাতে পালন করে তাতে ভগবানের আগ্রহ আছে, কারণ মানুষ যদি ভগবানের নিয়ম-নীতি পালন না করে, তাহলে তার পতন হবে (৩।৩২)। সুতরাং মানুষ বিধাতা বা ভগবানকে না মেনেও যদি তাঁর বিধানগুলি মেনে চলে তাহলেও তার কল্যাণ হয়। হ্যাঁ, মানুষ যদি বিধাতাকে স্বীকার করে তাঁর বিধানও মেনে চলে, তবে ভগবান তার কাছে নিজেকে বিলিয়ে দেন। কিন্তু যদি বিধাতাকে স্বীকার না করে শুধু তাঁর বিধানটি মেনে চলে, তাহলেও ভগবান তাঁকে উদ্ধার করেন। এর তাৎপর্য এই যে, যারা বিধাতাকে স্বীকার করে, তারা তাঁর প্রেম প্রাপ্ত হয় আর যারা তাঁর বিধানকে স্বীকার করে, তারা মুক্তি প্রাপ্ত হয়।

বাস্তবে দেখতে গেলে বিধানকে মানা অথচ বিধাতাকে বা ভগবানকে স্বীকার না করা কৃতঘ্নতার কাজ। কারণ মানুষ যে কোন সাধন-ভজন করুক না কেন, তার সিদ্ধি ভগবৎকৃপাতেই হয়, যে সাধনাই মানুষ করুক তার সঙ্গে ভগবানের সম্বন্ধ থাকেই। এই পৃথিবী তাঁর সৃষ্টি, জীব তাঁর সৃষ্টি, শাস্ত্র-বিধান সবই তাঁর সৃষ্টি—সবেতেই ভগবানের সম্বন্ধ আছে।

(১১) গীতায় ভগবানের ন্যায়কারিতা এবং দয়ালুতা

সংসারে যো দয়ালুশ্চ ন্যায়কারী ভবেন্ন সঃ।
কৃষ্ণে দয়ালুতা চৈব বর্তেতে ন্যায়কারিতা॥

যেখানে ন্যায় করা হয় সেখানে দয়া হতে পারে না, আর যেখানে দয়া করা হয় সেখানে ন্যায় করা যায় না। কারণ যেখানে ন্যায়ের কাজ হয় সেখানে শুভ-অশুভ কর্ম অনুসারে পুরস্কার অথবা শাস্তি বিধান করা হয় ; আর যেখানে দয়া করা হয়, সেখানে দোষীর অপরাধ ক্ষমা করা হয়, তাকে শাস্তি দেওয়া হয় না। এর তাৎপর্য এই যে, ন্যায় বিধান করা এবং দয়া করা—এই দুইয়ের মধ্যে বিরোধ আছে। এক স্থানে এই দুটি সহাবস্থান করতে পারে না। এই অবস্থায় ভগবানে ন্যায়কারিতা ও দয়ালুতা—এই দুটি কিভাবে একসঙ্গে থাকে ? কিন্তু একথা সেখানেই প্রযোজ্য যেখানে আইন বা বিধান সৃষ্টিকারী নির্দয় হন। যিনি দয়ালু তাঁর সৃষ্ট বিধানে ন্যায় এবং দয়া দুই-ই থাকে। তাঁর সৃষ্ট ন্যায়ে দয়া থাকে এবং তাঁর দয়াতেও ন্যায়কারিতা থাকে। ভগবান সকল প্রাণীর সুহৃদ—**'সুহৃদং সর্বভূতানাম্'** (৫।২৯) ; সুতরাং তাঁর সৃষ্ট বিধানে দয়া এবং ন্যায় - দুই-ই থাকে।

ভগবান গীতায় বলেছেন যে, মানুষ মৃত্যুকালে যে ভাব স্মরণ করতে করতে শরীর ত্যাগ করে, সে সেই ভাবই প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ মৃত্যুকালের স্মরণ অনুসারেই তার গতি হয় (৮।৬)। এ ভগবানের ন্যায়কারিতা, এতে কোন পক্ষপাত নেই। এই ন্যায়বিধানে ভগবানের দয়াই আছে। যদি অন্তিম সময়ে কেউ কুকুরের চিন্তা করতে করতে শরীর ত্যাগ করে, তবে সে কুকুরযোনি প্রাপ্ত হয়। তেমনি যদি কেউ ভগবৎ-চিন্তা করতে করতে শরীর ত্যাগ করে, তবে সে ভগবান্‌কেই প্রাপ্ত হয়। তাৎপর্য এই যে, যে মূল্যে কুকুর যোনি প্রাপ্ত হয়, সেই মূল্যেই ভগবৎপ্রাপ্তি হতে পারে। এইপ্রকার ভগবানের বিধানে ন্যায়কারিতার সঙ্গে মহতী দয়াও থাকে।

অত্যন্ত সদাচারী ব্যক্তি যাঁরা, তাঁরা মৃত্যুকালে ভগবৎ চিন্তায় শরীর ত্যাগ করলে ঈশ্বর লাভ করেন। তেমনি অতি দুরাচার ব্যক্তিও যদি মৃত্যুর সময়ে কোন বিশেষ কারণবশতঃ ভগবানকে স্মরণ করে শরীর ত্যাগ করে তাহলে তারও ঈশ্বর প্রাপ্তি (৮।৫) হয়। এ যে তাঁর কত দয়া এবং ন্যায়কারিতা !

ভগবান বলেছেন, 'অত্যন্ত দুরাচার ব্যক্তিও যদি অনন্যভাবে দৃঢ়সংকল্প হয়ে আমাকে স্মরণ করে তাহলে তাকে সাধু রূপে মান্য করা উচিত। সেই ব্যক্তি অতি শীঘ্র ধর্মাত্মা হয় এবং চির শান্তি লাভ করে (৯।৩০-৩১)। যদি অত্যন্ত দুরাচার ব্যক্তিও ভগবৎভক্ত হতে পারে এবং শাশ্বত শান্তি লাভ করতে পারে, তাহলে ভগবৎভক্তও দুরাচার ও পাপাত্মা হয়ে উঠতে পারে এবং তারও পতন হতে পারে, কিন্তু ভগবানের নিয়ম সেরকম নয়। ভগবানের নিয়মে খুবই দয়া মিশে আছে যাতে দুরাচার ব্যক্তির কল্যাণ হতে পারে। কিন্তু ভক্তের কখনও পতন হতে পারে না—**'ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি'** (৯।৩১)। এতে ভগবানের ন্যায়কারিতা এবং দয়া দুই-ই আছে।

এখানে সংশয় হতে পারে যে, ভক্তের যদি কখনও পতন না হয়, তাহলে ভগবান অর্জুনকে নিজের ভক্ত রূপে স্বীকার করেও কেন বললেন—'যদি তুমি অহংকারবশতঃ আমার কথা মান্য না কর, তাহলে তোমার পতন হবে (১৮।৫৮)?' এর উত্তর হচ্ছে যে, ভক্ত যখন অহংকারবশতঃ ভগবানের আদেশ অমান্য করে, তখন সে আর ভক্ত থাকে না এবং তার পতন হয়। যে প্রকৃতই ভক্ত, সে ভগবানের আদেশ মানবে না এমন হওয়া অসম্ভব। অর্জুনকে ভগবান কেবল ধমক দিয়েছেন, ভয় দেখিয়েছেন, ফলতঃ অর্জুন ভগবানের আদেশ মান্য করেছিলেন এবং তাঁর পতন হয় নি (১৮।৭৩)।

যে ব্যক্তি সকামভাবে শুভকর্ম করে, তাকে শুভকর্ম অনুযায়ী স্বর্গাদিতে পাঠানো—এ ভগবানের ন্যায়-

বিচারের অঙ্গ। আর সেখানে পুণ্যকর্মের ফল ভোগের মধ্য দিয়ে সেই ব্যক্তিকে শুদ্ধ করা, পবিত্র করা—এই হল তাঁর দয়া। এইরূপই যে অশুভ কর্ম করে, তাকে নরকে এবং চুরাশী লক্ষ যোনিতে নিক্ষেপ করা—এ হচ্ছে ন্যায়বিচার ; সেখানে পাপের ফল ভোগ করিয়ে তাকে শুদ্ধ করে নিজের দিকে টেনে আনা, এই হচ্ছে তাঁর দয়া। যেমন, কেউ বহুদিন ধরে অসুখে কষ্ট ভোগার পর যখন সুস্থ হয়ে ওঠে, তখন তার ভগবৎকথা, ভগবৎনাম ভালো লাগে। এইরূপ কর্মের ফল অনুসারে যে অসুখ হয় তা তাঁর ন্যায়কারিতা এবং তার ফলস্বরূপ ভগবানে রুচি বা ভালোবাসা বৃদ্ধি পাওয়া হল তাঁর দয়ালুতা।

মানুষ জেনেশুনে পাপ, অন্যায় ইত্যাদি দুষ্কর্ম করে, কিন্তু সে না চাইলেও তাকে এর শাস্তিস্বরূপ জেল, জরিমানা ইত্যাদি ভোগ করতে হয়। এতে কর্মের অনুসারে শাস্তি ইত্যাদি যে ভোগ করতে হয় তা হল ভগবানের ন্যায়কারিতা এবং কখনও কখনও, 'আমি ভুল করেছি, তারই জন্য আমাকে এই শাস্তি ভোগ করতে হচ্ছে ; আমি যদি এই ভুল না করতাম তাহলে কি আমাকে এই শাস্তি পেতে হত ?'— এইরূপ যে বিচার এবং অনুশোচনা — তা হচ্ছে ভগবানেরই দয়া।

কর্ম অনুযায়ী অনুকূল-প্রতিকূল যে সমস্ত পরিস্থিতি উপস্থিত হয়, সে সকলই ভগবানের ন্যায়বিধান আর যে ব্যক্তি অনুকূল-প্রতিকূল পরিস্থিতিতে বিচলিত হয় না, তার কল্যাণ হয়—এটি হল তাঁর দয়ালুতা।

প্রশ্ন—শ্রুতিতে উল্লিখিত আছে যে ঈশ্বর যাকে উর্ধ্বগতিতে নিয়ে যেতে চান, তাকে দিয়ে শুভ-কর্ম করান আর যাকে অধোগতিতে নিয়ে যেতে চান তাকে দিয়ে অশুভ-কর্ম করান—**এষ হ্যেব সাধু কর্ম কারয়তি তং যমেভ্যো লোকেভ্য উন্নিনীষতে এষ হ্যেবাসাধু কর্ম কারয়তি তং যমধো নিনীষতে** (কৌষীতকি. ৩।৮)। তাহলে এতে ভগবানের ন্যায়কারিতা বা দয়ালুতা কোথায় ? এতো কেবল পক্ষপাত এবং বিষমতাই।

উত্তর—শুভকর্ম করিয়ে উর্ধ্বগতি পাওয়ানো এবং অশুভকর্ম করিয়ে অধোগতি করানো নয় বরং এ হল প্রারব্ধ অনুযায়ী কর্মফল ভোগ করিয়ে তাকে শুদ্ধ করানো অর্থাৎ জীব নিজ শুভ-অশুভ কর্মফল যাতে ভোগ করতে পারে, সেই অবস্থার মধ্য দিয়ে তার বিচারবোধ সৃষ্টি করা। যেমন, শুভকর্ম অনুযায়ী যদি কোন ব্যবসায়ীর লাভ হবার থাকে, তাহলে সেই সময় ভগবান তার সেইরূপ পরিস্থিতি এবং বুদ্ধি প্রদান করেন, যাতে সে সস্তায় জিনিসপত্র কেনে এবং বেশী দামে বেচে এবং তখন তার কেনা এবং বেচা দুইয়েতেই লাভ হয়। সেইরূপই অশুভকর্ম অনুযায়ী যদি কোন ব্যবসায়ীর লোকসান হবার থাকে, তবে ভগবান সেই সময় তাকে সেইরূপ পরিস্থিতি এবং বুদ্ধি প্রদান করেন, যাতে সে বেশী দামে জিনিস কেনে আর দাম পড়ে যায় যখন, তাকে সস্তায় বেচতে হয়। তখন কেনা এবং বেচা তার দুইয়েতেই লোকসান হয়। এইভাবে কর্ম অনুযায়ী লাভ ও লোকসান হওয়া ভগবানের ন্যায়বিচারের স্বরূপ এবং যাতে লাভ ও লোকসান হয়, সেই রূপ পরিস্থিতি ও বুদ্ধিতে প্রেরণা করা, যাতে সকলের শুভ-অশুভ কর্মবন্ধন কেটে যায়—এ ভগবানের দয়ারই নিদর্শন।

যদি শ্রুতির অর্থ এইভাবে করা হয় যে 'শুভ-অশুভ কর্ম করিয়ে মানুষের উর্ধ্ব এবং অধোগতি করানো' — তাহলে ভগবান যে ন্যায়কারী এবং দয়ালু—একথা সিদ্ধ হয় না। ভগবান সমস্ত প্রাণীতে সমভাব রাখেন, কারো ওপর তাঁর পক্ষপাত নেই—একথাও প্রমাণিত হয় না। যদি এরূপ মানা হয় তাহলে '**এই কাজ করা উচিত, ঐ কাজ করা উচিত নয়**'— শাস্ত্রের এইসব বিধি-নিষেধও মানুষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না এবং গুরুর শিক্ষা, সাধু ও মহাপুরুষদের উপদেশাদি সবই ব্যর্থ হয়ে যাবে। মানুষ যে বিবেকের দ্বারা কর্তব্য-অকর্তব্য বিচার করে— তাও ব্যর্থ হবে। মনুষ্যজন্মের যে বিশেষত্ব, স্বাতন্ত্র্য তারও কোন মূল্য থাকবে না এবং মানব পশু-পক্ষীর শ্রেণীতে নেমে আসবে অর্থাৎ নিজ উদ্যোগে কেউ আর কোন নতুন কাজ করতে পারবে না, নিজের উন্নতি এবং উদ্ধারও করতে পারবে না।

(১২) গীতায় ভগবানের বিবিধ রূপের প্রকাশ

স্বভক্তভাবেন পরিপ্লুতেন ভক্তস্য চাজ্ঞাপরিপালকেন।
স্বকং হি কৃষ্ণেন রথস্থিতেন বিভিন্নরূপং প্রকটী কৃতং চ॥

ভগবান যখন অবতাররূপে আসেন, তখন তিনি গুপ্তভাবে থাকেন, সকলের নিকট নিজ স্বরূপ প্রকাশ করেন না (৭।২৫)। কিন্তু অর্জুনের ভাব দেখে ভগবান কৃপাপূর্বক তাঁকে গীতোক্ত তাঁর অনেক প্রকার রূপের প্রকাশ দেখালেন। যেমন—

'ভক্ত আমাকে দিয়ে যে কাজ করাতে চায় আমি সেই কাজই করি এবং যেরূপে দেখতে চায় তার ভাব অনুযায়ী সেই রূপেই তার কাছে প্রকাশিত হই'—এইরূপে নিজেকে ভক্তের অধীন বোঝাবার জন্য ভগবান প্রথম অধ্যায়ে অর্জুনের কাছে **'সারথি'** রূপে প্রকটিত হন (১।২১-২৪)।

'যে ব্যক্তি কর্তব্য-অকর্তব্য, সৎ-অসৎ ইত্যাদি সমস্যায় জর্জরিত, নিজে কোন মীমাংসা করতে অক্ষম হয়, সে যদি আমার শরণাগত হয়ে আমাকে ডাকে তাহলে আমি তাকে পরামর্শ দিই, তার সমস্ত সমস্যার সমাধান করে দিই'—এই কথা জানাবার জন্য ভগবান দ্বিতীয় অধ্যায়ে কিংকর্তব্যবিমূঢ় এবং তাঁর শরণাপন্ন অর্জুনের কাছে **'গুরু'** রূপে প্রকটিত হলেন (২।৭)

'পরিস্থিতি অনুযায়ী যে বর্ণতে প্রকটিত হই বা যে আশ্রমে (ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য ইত্যাদি) থাকি সেই অনুসারে আমি আমার কর্তব্য পালন করি'—এই বার্তা জানাবার উদ্দেশ্যে ভগবান তৃতীয় অধ্যায়ে অর্জুনের নিকট **'আদর্শ'** রূপে প্রকটিত হলেন (৩।২২-২৪)।

'আমি গুণ ও কর্ম অনুসারে প্রাণীদের সৃষ্টিই করি বা সূর্যাদিকে উপদেশ দিই অথবা অবতার রূপে এসে ধর্মের স্থাপনা করি বা দুষ্টের বিনাশ করে ভক্তদের রক্ষা করি বা পুত্ররূপে মাতা-পিতার আজ্ঞা পালনকারী হই বা সমস্ত প্রাণীদের মালিকই হই, এতে আমার ঈশ্বরত্বের কোনো হানি হয় না'—এই কথা জানাবার উদ্দেশ্যে চতুর্থ অধ্যায়ে ভগবান **'ঈশ্বর'**রূপে অর্জুনের সামনে প্রকটিত হলেন (৪।৬)।

'সকল যজ্ঞ এবং তপের ভোক্তা আমিই, আমিই সমস্ত লোকের পালক বা স্বামী এবং সমস্ত প্রাণীর অহৈতুক কল্যাণকারী'—এইরূপ নিজ মহত্ত্ব জানিয়ে অর্জুন তথা সমস্ত মানুষের হিতের উদ্দেশ্যে ভগবান পঞ্চম অধ্যায়ে অর্জুনের কাছে **'সর্বলোক-মহেশ্বর'** রূপে প্রকটিত হলেন (৫।২৯)।

'ধ্যানযোগী সাধকদের সকলের মধ্যে আমাকে এবং আমার মধ্যে সকলকে দর্শন করা অর্থাৎ যে যে স্থানে মন যায়, সেই সেই স্থানে (সর্বত্র) আমাকে অনুভব করা অত্যন্ত প্রয়োজন। এইরূপ অনুভব হলে তবেই মন আমাতে লীন হওয়া সম্ভব'—এই কথা জানাতে ভগবান ষষ্ঠ অধ্যায়ে **'ব্যাপক'** রূপে অর্জুনের সামনে প্রকটিত হলেন (৬।৩০)।

'সূত্রদ্বারা প্রস্তুত মণিসকলের (সূতোর গুটিকা) দ্বারা সূত্রে গ্রথিত মালার ন্যায় আমি সমস্ত জগৎ-সংসারে ওতপ্রোত হয়ে আছি, সকল প্রাণীর আদি ও সনাতন বীজ আমিই ; ব্রহ্ম, অধ্যাত্ম, কর্ম, অধিভূত, অধিদৈব এবং অধিযজ্ঞ রূপে তো আমিই আছি'—এইভাবে **'বাসুদেবঃ সর্বম্'**-এর বোধ করাবার জন্য ভগবান সপ্তম অধ্যায়ে অর্জুনের নিকট **'সমগ্র'** রূপে প্রকটিত হলেন (৭।২৯-৩০)।

'সগুণ-নিরাকার এবং নির্গুণ-নিরাকারের ধ্যানে যোগবলের আবশ্যক হয় বলে ঐ দুইয়ের ধ্যান করা কিছুটা কঠিন ; কিন্তু যে আমার অনন্য ভক্ত সে অতি সহজেই আমাকে প্রাপ্ত হয়'—এই কথা জানাবার জন্য ভগবান অষ্টম অধ্যায়ে অর্জুনের নিকট **'সুলভ'** রূপে প্রকটিত হলেন (৮।১৪)।

'এই পৃথিবীতে সকলের মা, বাবা, ধাতা, পিতামহ, গতি, ভর্তা, নিবাসস্থান, বীজ ইত্যাদি সমস্তই আমি অর্থাৎ কার্য-কারণ, সৎ-অসৎ, নিত্য-অনিত্য ইত্যাদি সবকিছুই আমি'—এই কথা বলার জন্য ভগবান নবম অধ্যায়ে অর্জুনের নিকট **'সৎ-অসৎ'** রূপে প্রকটিত হলেন (৯।১৯)।

'সকল প্রাণীর আদি, মধ্য ও অন্ত আমি ; সৃষ্টির আদি, মধ্য ও অন্ত আমিই ; সমস্ত প্রাণীর মূল বীজও আমি ;

সাধক যে যে স্থানে সৌন্দর্য, মহত্ত্ব, অলৌকিক কিছু দেখে, বাস্তবে সে সবই আমি'—এই কথা জানাতে ভগবান দশম অধ্যায়ে অর্জুনের নিকট **'সর্বৈশ্বর্য'** রূপে প্রকাশ পেলেন (১০।৪১-৪২)।

'আমি আমার মাত্র একাংশের দ্বারা সমস্ত জগৎ-সংসারকে ব্যাপ্ত করে অবস্থিত আছি'—এই কথা জানাবার জন্য ভগবান একাদশ অধ্যায়ে অর্জুনকে দিব্যচক্ষু দিয়ে তার সামনে **'বিশ্বরূপ'** রূপে প্রকটিত হলেন (১১।৫-৮)।

'যে ভক্ত আমার পরায়ণ হয়ে সমস্ত কর্ম আমাতে অর্পণ করে, অনন্য ভক্তিযোগে আমার সগুণ-সাকার পরমেশ্বর রূপের ধ্যান ও আমার উপাসনা করে, তাকে আমি অতি শীঘ্র এই মৃত্যুরূপ জগৎ-সংসার-সমুদ্র থেকে উদ্ধার করি'—এই কথা জানাবার জন্য ভগবান দ্বাদশ অধ্যায়ে অর্জুনের কাছে **'সমুদ্ধর্তা'** রূপে প্রকটিত হলেন (১২।৭)।

জ্ঞাতব্য যে সকল বিষয় আছে তার মধ্যে সবচেয়ে অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় হল পরমাত্ম-তত্ত্ব। এই পরমাত্ম-তত্ত্ব ভিন্ন অপর যে সকল জ্ঞাতব্য বিষয় আছে, মানুষ তা যতই হৃদয়ঙ্গম করুক তবু তাতে সে পূর্ণতা লাভ করে না। কিন্তু যদি পরমাত্ম-তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করে, তাহলে তার আর কোন অপূর্ণতাই থাকে না—এই কথা জানাবার জন্য ভগবান ত্রয়োদশ অধ্যায়ে অর্জুনের নিকট **'জ্ঞেয়তত্ত্ব'** রূপে প্রকটিত হলেন (১৩।১২-১৮)।

'যে প্রকৃতিতে সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ এই তিনটিগুণ উৎপন্ন হয় তার অধিষ্ঠাতা বা স্বামী আমিই, মহাসর্গের শুরুতে আমিই এই জগৎ-সংসার রচনা করি। ব্রহ্ম, অবিনাশী, অমৃত, সনাতন ধর্ম তথা ঐকান্তিক সুখের প্রতিষ্ঠাতাও আমি'—এই কথা জ্ঞাপন করার জন্য চতুর্দশ অধ্যায়ে ভগবান অর্জুনের সামনে **'আদিপুরুষ'**রূপে প্রকটিত হলেন (১৪।২৭)।

'পৃথিবীর মূলে আমি ; সূর্য ও চন্দ্র ইত্যাদিতে আমারই তেজ আছে ; আমি নিজ ওজোবল দ্বারা এই পৃথিবীকে ধারণ করি ; আমি বেদসমূহের জ্ঞাতব্য এবং বেদের তত্ত্ব-নির্ণয়কারী ও বেদের দ্বারা জানার যোগ্য বিষয় ; আমি ক্ষরের বা সংসারের অতীত এবং অক্ষর বা জীবাত্মা থেকেও শ্রেষ্ঠ ; বেদে এবং শাস্ত্রে আমি শ্রেষ্ঠ পুরুষ নামে খ্যাত'—নিজের এই সর্বশ্রেষ্ঠ রূপটি জানাবার জন্য ভগবান পঞ্চদশ অধ্যায়ে অর্জুনের কাছে **'পুরুষোত্তম'** রূপে প্রকটিত হলেন (১৫।১৭-১৯)।

'দম্ভ, দর্প, অভিমান ইত্যাদি যত দুর্গুণ সবই মানুষের নিজের সৃষ্টি, এসব আমার নয় ; কিন্তু অভয়, অহিংসা, সত্য, দয়া, ক্ষমা ইত্যাদি যে সমস্ত উত্তম গুণ আছে তা সকলই আমার এবং যাদের এই গুণগুলি থাকে, তারা আমাকেই পায়'—এই কথা জানাতেই ভগবান ষোড়শ অধ্যায়ে অর্জুনের নিকট **'দৈবী সম্পদ্'** রূপে প্রকটিত হলেন (১৬।১-৩)।

'যদি কেউ পরমাত্মপ্রাপ্তির উদ্দেশ্য নিয়ে যজ্ঞ, তপ, দান ইত্যাদি শুভকর্ম করে এবং তাতে কিছু ত্রুটি হয় বা অঙ্গবৈগুণ্য ঘটে, তাহলে যে ভগবানের উদ্দেশ্যে এই যজ্ঞ করা হচ্ছিল, তাঁর নাম করলে এই হানি বা অঙ্গ-বৈগুণ্য দূরীভূত হয়'—এটি জানাতে ভগবান সপ্তদশ অধ্যায়ে অর্জুনের নিকট **'ওঁ তৎ সৎ'** নামের রূপে প্রকাশিত হলেন (১৭।২৩)।

'সমস্ত গীতা-উপদেশের কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ, ধ্যানযোগ ইত্যাদি সমস্ত সাধনের সার হল আমাতে শরণাগতি'—এটি জানাবার জন্য ভগবান অষ্টাদশ অধ্যায়ে অর্জুনের নিকট **'সর্বশরণ্য'** রূপে প্রকটিত হলেন (১৮।৬৬)।

তাৎপর্য এই যে, সাধকের ভগবানের প্রতি যেমন ভাব বাড়তে থাকে ভগবানও তেমনি তাঁর ভাব অনুযায়ী নিজেকে প্রকটিত করেন, এর ফলে সাধক ভক্তের ভাব, শ্রদ্ধা, বিশ্বাস বাড়তে থাকে। শেষ পর্যন্ত এতেই তাদের ভগবৎপ্রাপ্তি ঘটে। সাধককে কেবল একটি বিষয়ে সাবধান থাকতে হবে, যেন তিনি তাঁর অনন্যভাব থেকে না সরেন অর্থাৎ অনন্যভাব থেকে কখনও বিচলিত না হন।

(১৩) গীতায় ধর্ম

বর্ণে তু যস্মিন্ মনুজঃ প্রজাতস্তত্রতাকার্যং কথিতঃ স্বধর্মঃ।
শাস্ত্রেণ তস্মান্নিয়তং হি কর্ম কর্তব্যমিত্যত্র বিধানমস্তি॥

গীতাতে ধর্মের বর্ণনাই মুখ্য। যদি গীতার আরম্ভ এবং শেষ অক্ষরগুলি ধরা হয় অর্থাৎ আরম্ভের **'ধর্মক্ষেত্রে'** পদ থেকে **'ধর্'** এবং শেষের **'মতির্মম'** পদ থেকে **'ম'** নেওয়া হয় তাহলে **'ধর্ম'** প্রত্যাহার হয়ে যায়, অতএব সমগ্র গীতাই ধর্মের অন্তর্গত হয়ে যায়।

গীতায় **'কুলধর্মাঃ সনাতনাঃ'** (১।৪০), **'জাতিধর্মাঃ'** (১।৪৩) পদগুলির দ্বারা পরম্পরাগত কুলের মর্যাদা, রীতি এবং জাতির রীতিনীতিকেও 'ধর্ম' বলা হয়েছে ; **'ধর্মসম্মূঢ়চেতাঃ'** (২।৭) **'স্বধর্মম্ ধর্ম্যাৎ'** (২।৩১), **'ধর্ম্যম্,স্বধর্মম্'** (২।৩৩) **'স্বধর্মঃ'** (৩।৩৫ ; ১৮।৪৭) ইত্যাদি পদ দ্বারা নিজ নিজ বর্ণ অনুসারে শাস্ত্রবিহিত কর্তব্য কর্মকেও 'ধর্ম' অথবা 'স্বধর্ম' বলা হয়েছে ; আর **'ত্রয়ীধর্মম্'** (৯।২১) পদ দ্বারা বৈদিক অনুষ্ঠানকেও 'ধর্ম' বলা হয়েছে। এই সমস্ত ধর্মগুলি কর্তব্যমাত্র মনে করে নিষ্কামভাবে তৎপরতার সঙ্গে পালন করলে পরমাত্মতত্ত্ব লাভ হয় (১৮।৪৫)।

যে ব্যক্তি যে বর্ণে জন্মগ্রহণ করে, শাস্ত্রে সেই বর্ণের উপযোগী কর্তব্য-কর্ম ইত্যাদি নির্দিষ্ট করা আছে ; সেই কর্মই সেই ব্যক্তির 'স্বধর্ম'। এবং শাস্ত্র যার জন্য যে কর্ম নিষেধ করেছে, তা অন্য বর্ণের ব্যক্তির পক্ষে বিহিতকর্ম হলেও (যার ক্ষেত্রে নিষেধ করা হয়েছে) তার পক্ষে 'পরধর্ম'। যথাযথভাবে অনুষ্ঠিত 'পরধর্ম' অপেক্ষা স্বল্প-গুণসম্পন্ন নিজ ধর্মও শ্রেষ্ঠ। নিজধর্ম পালনকালে মৃত্যু-মুখে পতিত হলেও, তা তার কল্যাণই করে। কিন্তু পরধর্ম আচরণ করলে বিপদকেই ডেকে আনা হয় (৩।৩৫)।

বর্ণাশ্রম কর্ম ব্যতিরেকেও পরিস্থিতি অনুযায়ী যে কর্তব্য-কর্ম উপস্থিত হয়, তা পালন করাও মানুষের স্বধর্ম। যেমন—তৎপরতার সঙ্গে অধ্যয়ন করাই বিদ্যার্থীর স্বধর্ম। অধ্যাপকের স্বধর্ম বিদ্যার্থীকে পড়ানো। কোন গৃহকর্মীর নিজ কাজটি ঠিকমত করাই তার স্বধর্ম। যে নিজ স্বীকৃত কর্ম (স্বধর্ম) নিষ্কামভাবে পালন করে, সে পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হয় (১৮।৪৫)।

শম, দম, তপ, ক্ষমা ইত্যাদি ব্রাহ্মণের 'স্বধর্ম' (১৮।৪২)। এছাড়াও অধ্যয়ন এবং অধ্যাপনা, দান গ্রহণ করা ও দান করা ইত্যাদিও ব্রাহ্মণের 'স্বধর্ম'। শৌর্য, তেজ ইত্যাদি ক্ষত্রিয়ের 'স্বধর্ম' (১৮।৪৩)। এছাড়া পরিস্থিতি অনুযায়ী প্রাপ্ত কর্তব্য ঠিকমতো পালন করাও ক্ষত্রিয়ের 'স্বধর্ম'। চাষ করা, পশুপালন করা এবং ব্যবসা-বাণিজ্য করা বৈশ্যের 'স্বধর্ম' (১৮।৪৪)। তাছাড়া পরিস্থিতি অনুযায়ী কোন কাজ এসে গেলে সুচারুরূপে তা সম্পন্ন করাও বৈশ্যের 'স্বধর্ম'। শূদ্রের 'স্বধর্ম' সকলের সেবা করা (১৮।৪৪)। এছাড়া পরিস্থিতি অনুযায়ী প্রাপ্ত অন্যান্য কর্ম করাও শূদ্রের 'স্বধর্ম'।

ভগবান কৃপাপরবশ হয়ে অর্জুনের মাধ্যমে সমস্ত মানব জাতিকে এক বিশেষ বার্তা জ্ঞাপন করেছেন যে 'তুমি (উপরিউক্ত) সমস্ত ধর্মের আশ্রয় ত্যাগ করে শুধু আমার শরণাগত হও, তাহলে আমি তোমাকে সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত করে দেব, তুমি চিন্তা কোরো না (১৮।৬৬)'। এর তাৎপর্য এই যে, নিজ নিজ বর্ণ ও আশ্রমে মর্যাদার সঙ্গে থাকবার জন্য, নিজ নিজ কর্তব্য পালন করবার জন্য উপরিউক্ত সকল ধর্মের পালন করা অত্যন্ত আবশ্যক। জগৎ-সংসার চক্রের সুষ্ঠুভাবে সঞ্চালনের দৃষ্টিতেও এটি পালন করা অবশ্য কর্তব্য (৩।১৪-১৬)। কিন্তু একেই আশ্রয় করে থাকা উচিত নয়। আশ্রয় কেবল শ্রীভগবানেরই নেওয়া উচিত। কারণ বাস্তবে এটি নিজের ধর্ম নয়, শরীরকে নিয়ে ঘটে বলে এটি পরধর্মই।

ভগবান **'স্বল্পমপ্যস্য ধর্মস্য'** (২।৪০) পদ দ্বারা সমত্বকে, **'ধর্মস্যাস্য'** (৯।৩) পদ দ্বারা জ্ঞান-বিজ্ঞানকে এবং **'ধর্ম্যামৃতম্'** (১২।২০) পদ দ্বারা সিদ্ধ ভক্তদের লক্ষণগুলিকেও 'ধর্ম' বলে অভিহিত করেছেন। 'ধর্ম' বলার তাৎপর্য এই যে পরমাত্মার স্বরূপ হওয়ায় সমতা সকল প্রাণীরই স্বধর্ম (নিজের ধর্ম)। পরমাত্মার প্রাপ্তি করায় বলে জ্ঞান-বিজ্ঞানও সাধকের স্বধর্ম এবং স্বতঃসিদ্ধ হওয়ায় সিদ্ধ ভক্তের লক্ষণও সকলের স্বধর্ম।

(১৪) গীতায় সনাতন ধর্ম

বরিষ্ঠোঽখিলধর্মেষু ধর্ম এব সনাতনঃ।
জায়ন্তে সর্বধর্মাস্তু শাশ্বতো হি সনাতনঃ॥

জগতে মুখ্যভাবে চারপ্রকার ধর্ম প্রচলিত আছে — সনাতন ধর্ম, বৌদ্ধ ধর্ম, খ্রীষ্ট ধর্ম ও ইসলাম ধর্ম। এই চারটি ধর্মের এক একটি ধর্মকে মানে এরূপ কয়েক কোটি করে লোক আছে। এই চারটি ধর্মের অন্তর্গত আরও কিছু উপধর্ম রয়েছে। সনাতন ধর্ম ছাড়া শেষ তিনটি ধর্ম প্রবর্তনার মূলে কোনও একজন ব্যক্তি রয়েছেন ; যেমন—ইসলাম-ধর্মের মূলে পয়গম্বর মোহম্মদ, বৌদ্ধ ধর্মের মূলে গৌতম বুদ্ধ এবং খ্রীষ্ট ধর্মের মূলে যীশুখ্রীষ্ট। কিন্তু সনাতন ধর্মের মূলে কাউকে পাওয়া যায় না। কারণ সনাতন ধর্ম কোন ব্যক্তি বিশেষের দ্বারা প্রবর্তিত ধর্ম নয়, এই ধর্ম অনাদিকাল থেকে চলে আসছে। ভগবান যেমন শাশ্বত, (সনাতন), তেমনি সনাতন ধর্মও শাশ্বত। গীতায় সনাতন ধর্মকে ভগবান নিজের স্বরূপ বলে জানিয়েছেন —**ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহং...........শাশ্বতস্য চ ধর্মস্য** (১৪।২৭)। যখন এবং যেই যেই যুগে এই সনাতন ধর্মের হ্রাস বা হানি হয়ে থাকে, সেই সেই সময় ভগবান অবতার হয়ে এসে এর সংস্থাপনা করেন (৪।৭-৮)। এর তাৎপর্য এই যে, ভগবানও এই ধর্ম সংস্থাপনা ও রক্ষাকল্পে অবতাররূপ গ্রহণ করেন ; একে তৈরী করতে বা সৃষ্টি করতে নয়। অর্জুনও ভগবানকে সনাতন ধর্মের রক্ষকই বলেছেন—'**ত্বমব্যয়ঃ শাশ্বতধর্মগোপ্তা**' (১১।১৮)।

কোন বস্তু উৎপন্ন হয় আবার কোনওটির অনুসন্ধান করা হয়। যে বস্তু আগে থাকে না সেটি উৎপন্ন বা সৃষ্ট হয় এবং যে বস্তু আগে থেকেই থাকে তার কেবল অনুসন্ধান করা যায়। মুসলিম, বৌদ্ধ এবং খ্রীষ্ট—এই তিন ধর্মই কোন এক ব্যক্তির দ্বারা প্রবর্তিত ; কিন্তু সনাতন ধর্ম কোনও এক ব্যক্তির দ্বারা প্রবর্তিত নয়, এটি বিভিন্ন ঋষির দ্বারা অন্বেষণে প্রাপ্ত হয়েছে—'**ঋষয়ো মন্ত্রদ্রষ্টারঃ**'। সেইজন্য সনাতন ধর্মের মূলে কোন ব্যক্তি বিশেষের নাম বলা সম্ভব নয়। এই ধর্ম অনাদি, অনন্ত এবং শাশ্বত। অন্য সব ধর্ম তথা মত-মতান্তরও এই সনাতন ধর্ম থেকে উদ্ভূত। এইজন্য ঐ সকল ধর্মে মানবের কল্যাণের জন্য যেসব সাধনের কথা আছে, তা সব সনাতন ধর্ম থেকেই নেওয়া বলে মানতে হবে। অতএব ঐ সকল ধর্মে বর্ণিত অনুষ্ঠানাদি নিষ্কামভাবে কর্তব্য মনে করে পালন করলে উদ্ধারে কোনও সন্দেহ থাকে না।[১] প্রাণিসকলের কল্যাণের জন্য যে গভীর বিচার-বিবেচনা সনাতন ধর্মে করা হয়েছে, তা অন্য কোন ধর্মে পাওয়া যায় না। সনাতন ধর্মের সমস্ত সিদ্ধান্ত পুরোপুরি বৈজ্ঞানিক ও কল্যাণকারী।

সনাতন ধর্মে যতপ্রকার সাধনপ্রণালী বর্ণিত হয়েছে, বিধি-বিধানের বর্ণনা আছে তা সবই সনাতন, অনাদিকাল থেকে চলে আসছে। যেমন, ভগবান কর্মযোগকে অব্যয় বলেছেন—'**ইমং বিবস্বতে যোগং প্রোক্তবানহমব্যয়ম্**' (৪।১) আবার শুক্ল এবং কৃষ্ণ গতিপথকেও সনাতন বলা হয়েছে—'**শুক্লকৃষ্ণে গতী হ্যেতে জগতঃ শাশ্বতে মতে**' (৮।২৬)। গীতায় পরমাত্মাকেও সনাতন বলা হয়েছে— '**সনাতনস্ত্বম্**' (১১।১৮), জীবাত্মাকেও সনাতন বলা হয়েছে—'**জীবভূতঃ সনাতনঃ**' (১৫।৭), ধর্মকেও সনাতন বলা হয়েছে '**শাশ্বতস্য চ ধর্মস্য**' (১৪।২৭), পরমাত্মার বর্তমানতাকেও সনাতন বলা হয়েছে— '**শাশ্বতং পদমব্যয়ম্**' (১৮।৫৬)। এর তাৎপর্য এই যে, সনাতন ধর্মে সমস্ত কিছুই সনাতন, অনাদিকাল থেকে

---

[১]প্রত্যেক ধর্মে কুধর্ম, অধর্ম এবং পরধর্ম—এই তিনটি থাকে। অপরের প্রতি অনিষ্টের ভাব, কূটনীতি ইত্যাদি হল 'ধর্মে কুধর্ম'। যজ্ঞে পশু বধ করা ইত্যাদি হচ্ছে 'ধর্মে অধর্ম' এবং যা নিজের জন্য নিষিদ্ধ, এইরূপ অপর বর্ণের ধর্ম ইত্যাদি হচ্ছে 'ধর্মে পরধর্ম'। কুধর্ম, অধর্ম এবং পরধর্ম— এই তিনটির দ্বারা কখনও কল্যাণ হয় না। কল্যাণ সেই ধর্মে হয়, যাতে নিজের স্বার্থ এবং অভিমান ত্যাগ হয় ও অপরের বর্তমানে এবং ভবিষ্যতে হিত সাধিত হয়।

বহমান। সমস্ত ধর্মে এবং তার নিয়মে কখনও একভাব থাকতে পারে না, উপর থেকে দেখলে তাতে ভিন্নতা থাকবেই। কিন্তু এসবের দ্বারা প্রাপ্ত যে তত্ত্ব, তাতে কখনও ভিন্নতা থাকতে পারে না।

পহুঁচে পহুঁচে এক মত, অনপহুঁচে মত ঔর।
সন্তদাস ঘড়ী অরঠকী, ঢুরে এক হী ঠৌর॥
জব লগি কাচী খীচড়ী, তব লগি খদবদ হোয়।
সন্তদাস সীর্জ্যা পছে, খদবদ করৈ না কোয়॥

যতক্ষণ সাধনকারীর সংসারের সঙ্গে সম্বন্ধ থাকে, ততক্ষণ মতভেদ, বাদ-বিবাদ থাকে। কিন্তু তত্ত্ব প্রাপ্তি হলে তত্ত্বভেদ আর থাকে না।

যে ব্যক্তি নিজের মতবাদ অনুযায়ী আশ্রম করতে সচেষ্ট থাকে সে সত্যকার তত্ত্ব-জিজ্ঞাসু হয় না, আর আশ্রম দ্বারা সেই ব্যক্তির মহত্ত্ব কোন প্রকার বৃদ্ধি পায় না। আশ্রম তৈরী করে নিজের দল ভারী করার মতো লোক সকল ধর্মেই পাওয়া যায়। তারা ধর্মের নামে নিজের পূজা করে এবং করায়। কিন্তু যার মধ্যে সত্যকার তত্ত্ব জানবার ইচ্ছা থাকে, সে আশ্রম তৈরীতে আগ্রহী হয় না। সে তত্ত্বের অন্বেষণে ব্যাপৃত থাকে। গীতাতেও আশ্রম সৃষ্টি করাকে প্রাধান্য দেওয়া হয় নি, বরং মানবকল্যাণকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। গীতার মত অনুযায়ী যে কোন ধর্মে বিশ্বাসকারী ব্যক্তি যদি নিষ্কামভাবে নিজের কর্তব্য পালন করে, তাহলে তার কল্যাণ হয়। গীতা সনাতন ধর্মকে শ্রদ্ধা দেখালেও কোন ধর্মে আগ্রহ দেখায় না বা কোন ধর্মের প্রতি বিরুদ্ধভাবও দেখায় না। সুতরাং গীতা এক সার্বভৌম গ্রন্থ।

(১৫) গীতায় জ্যোতিষ

মহাপ্রলয়পর্যন্তং কালচক্রং প্রকীর্তিতম্।
কালচক্রবিমোক্ষার্থং শ্রীকৃষ্ণং শরণং ব্রজ॥

জ্যোতিষে কালই প্রধান অর্থাৎ এই কালকে ধরেই জ্যোতিষ চর্চা চলে। ভগবান বলেছেন 'কাল' হচ্ছে তাঁর স্বরূপ, 'গণনাকারীদের মধ্যে আমি কাল'— **'কালঃ কলয়তামহম্'** (১০।৩০)। কালের গণনা সূর্য থেকে হয়। এই সূর্যকে ভগবান **'জ্যোতিষাং রবিরংশুমান্'** (১০।২১) বলে নিজের স্বরূপ হিসাবে দেখিয়েছেন।

সাতাশটি নক্ষত্র আছে। নক্ষত্রের বর্ণনা ভগবান **'নক্ষত্রাণামহং শশী'** (১০।২১) পদগুলির দ্বারা করেছেন। সওয়া দুই নক্ষত্রে এক একটি রাশি হয়। এইরূপ সাতাশটি নক্ষত্রে বারোটি রাশি হয়। ঐ বারো রাশির উপর সূর্য পরিভ্রমণ করে অর্থাৎ এক একটি রাশিতে সূর্য এক এক মাস থাকে। **'মাসানাং মার্গশীর্ষোহম্'** (১০।৩৫) পদসমূহের দ্বারা ভগবান মাসগুলির বর্ণনা করেছেন। দুটি মাসে এক ঋতু হয় যার বর্ণনা **'ঋতূনাং কুসুমাকরঃ'** (১০।৩৫) বাক্যাংশে করা হয়েছে। তিনটি ঋতুতে এক একটি অয়ন হয়। অয়ন দুটি—উত্তরায়ণ এবং দক্ষিণায়ন ; যার বর্ণনা অষ্টম অধ্যায়ের চব্বিশ-পঁচিশ সংখ্যক শ্লোকে আছে। দুই অয়ন মিলে এক বৎসর হয়। কয়েক লাখ বছরে এক একযুগ হয়[১] যার বর্ণনা ভগবান **'সম্ভবামি যুগে যুগে'** (৪।৮) পদে করেছেন। এইরূপ চার যুগ (সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি) নিয়ে এক চতুর্যুগ হয়। এইরূপ এক হাজার চতুর্যুগে ব্রহ্মার একদিন (সর্গ) এবং এই এক হাজার চতুর্যুগেতেই

[১]সতের লাখ আটাশ হাজার বছরে 'সত্যযুগ', বারো লাখ ছিয়ানব্বই হাজার বছরে 'ত্রেতাযুগ', আট লাখ চৌষট্টি হাজার বছরে 'দ্বাপর যুগ' এবং চার লাখ বত্রিশ হাজার বছর হল কলিযুগের সময়কাল।

তাঁর একরাত (প্রলয়) হয়। যার বর্ণনা অষ্টম অধ্যায়ের সতের শ্লোক থেকে উনিশ শ্লোক পর্যন্ত করা হয়েছে। এইভাবে ব্রহ্মার একশত বছর আয়ু হয়। ব্রহ্মার আয়ু পূর্ণ হলে মহাপ্রলয় হয়, যাতে সব কিছু পরমাত্মায় লীন হয়ে যায়—**'কল্পক্ষয়ে'** (৯।৭) পদে ভগবান এর বর্ণনা করেছেন। এই মহাপ্রলয়ে কেবল 'অক্ষয়কাল' রূপ এক পরমাত্মা শেষ পর্যন্ত থাকেন, যার বর্ণনা ভগবান **'অহমেবাক্ষয়ঃ কালঃ'** (১০।৩৩) পদে করেছেন।

এর তাৎপর্য এই যে মহাপ্রলয় পর্যন্তই জ্যোতিষ গণনা চলতে পারে অর্থাৎ প্রকৃতির রাজ্য পর্যন্তই জ্যোতিষ শাস্ত্রের অধিকার।[১] সুতরাং সাধারণ মানুষের উচিত এই প্রাকৃত কালচক্র থেকে মুক্তি পাওয়া। এর অতীত হওয়ার জন্য অক্ষয়কালরূপ পরমাত্মার শরণ নেওয়া।

(১৬) গীতা এবং গুরুতত্ত্ব

গ্রন্থস্য কৃষ্ণস্য কৃপা সতাং চ সর্বত্র সর্বেষু চ বিদ্যমানা।
যাবন্ন তাঙ্ক্ষুদ্ধতে মনুষ্যস্তাবন্ন সাক্ষাৎ কুরুতে স্ববোধম্॥

অর্জুন সকল সময় ভগবানের সঙ্গেই থাকতেন, ভগবানের সঙ্গেই তাঁর খাওয়া-দাওয়া, ওঠা-বসা, শয়ন-জাগরণ ; তবুও ভগবান অর্জুনকে গীতার উপদেশ তখনি দিলেন, যখন তাঁর মধ্যে নিজের শ্রেয়ের, কল্যাণের এবং উদ্ধারের ইচ্ছা জাগ্রত হল—'যচ্ছ্রেয়ঃ স্যান্নিশ্চিতং ব্রূহি তন্মে' (২।৭)। এইরূপ ইচ্ছা জাগ্রত হওয়ার পরই তিনি নিজেকে ভগবানের শিষ্য বলে মেনে নিলেন এবং ভগবানের শরণাগত হয়ে তাঁকে শিক্ষা দেবার জন্য প্রার্থনা জানালেন—**'শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্'** (২।৭)। এইভাবে কল্যাণের ইচ্ছা জাগ্রত হওয়ার পরই অর্জুন নিজেকে ভগবানের শিষ্যত্ব স্বীকার করে তাঁর কাছে শিক্ষা প্রার্থনা করলেন ; গুরু-শিষ্য পরম্পরার রীতি অনুযায়ী ভগবানকে তিনি গুরু করেন নি। ভগবানও যে, শাস্ত্রপদ্ধতি মেনে, অর্জুনকে শিষ্য করে, গুরুমন্ত্র দিয়ে, মাথায় হাত রেখে উপদেশ দিয়েছেন, তাও নয়। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, পারমার্থিক উন্নতিতে গুরু-শিষ্য রূপ সম্বন্ধ তৈরি করা অপরিহার্য নয়। বরং নিজের তীব্র জিজ্ঞাসা ও নিজ কল্যাণের তীব্র আগ্রহ হওয়াই অত্যন্ত আবশ্যক। নিজের উদ্ধারের তীব্র ইচ্ছা হলে সাধকের ভগবৎকৃপায়, সাধু-মহাপুরুষের অমৃতময় বচনে, শাস্ত্র দ্বারা, গ্রন্থ দ্বারা বা কোন ঘটনা, পরিস্থিতি বা সেই পরিবেশেই আপনা হতেই পারমার্থিক কথা, সাধন-সামগ্রী পাওয়া যায় এবং সাধকও তা গ্রহণ করেন।

গীতা বাহ্যিক বিধি, বাহ্যিক পরিবর্তনের তত সম্মান দেয় না যতটা সম্মান দেয় অন্তরের ভাব, বিবেক-বোধ, জিজ্ঞাসা এবং ত্যাগকে। গীতা যদি বাহ্য বিধিসমূহ, পরিবর্তন অথবা গুরু-শিষ্য সম্পর্ককে অধিক গুরুত্ব দিত, তবে এটি সকল সম্প্রদায়ের জন্য এত উপযোগী বা সম্মাননীয় গ্রন্থ হোত না, অর্থাৎ কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের বিধিসকল আলোচিত হলে সেই বিশেষ সম্প্রদায়ই এটি পালন করত এবং গীতা সমস্ত সম্প্রদায়ের উপযোগী হয়ে উঠত না বা এর পঠন-পাঠন, মনন-চিন্তন ইত্যাদিতে সকল সম্প্রদায়ের লোকের ইচ্ছা জাগত না। আসলে গীতার উপদেশ হচ্ছে সার্বভৌম, এটি বিশেষ কোন সম্প্রদায় বা ব্যক্তির জন্য নয়, বরং মনুষ্যমাত্রেরই জন্য।

গীতায় জ্ঞানের প্রকরণে **'প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন'** (৪।৩৪) এবং **'আচার্যোপাসনম্'** (১৩।৭) পদগুলির দ্বারা আচার্যের সেবা এবং উপাসনা করার কথা বলা হয়েছে। এর তাৎপর্য এই যে জ্ঞানমার্গী সাধকদের মধ্যে **'আমিই ব্রহ্ম'** এইরূপ আত্মাভিমান থাকার সম্ভাবনা থাকে। অতএব সাধকের চৈতন্য সম্পাদনের জন্য তত্ত্বজ্ঞ, জীবন্মুক্ত আচার্য বা গুরুর অধিক প্রয়োজন থাকে। এই আবশ্যকতাও তখন থাকে যখন সাধকের তত তীব্র জিজ্ঞাসা থাকে না বা সে মনে করে নেয় যে গুরু উপদেশ

[১]প্রকৃতির অতীত যে পরমাত্মাতত্ত্ব রয়েছে সেখানে জ্যোতিষ পৌঁছতে পারে না।

দিলে তবেই জ্ঞান লাভ হবে। সাধকের মনে যখন তীব্র জিজ্ঞাসা জাগে তখন সে তত্ত্ব অনুভব না করা পর্যন্ত শান্তি পায় না, কোন এক বিশেষ সম্প্রদায়ে আটকে থাকে না এবং নিজের কোন বৈশিষ্ট্যের অহংকারও তার থাকে না। এইরূপ সাধকের জিজ্ঞাসা ভগবৎকৃপায় পূর্ণ হয় অর্থাৎ তিনি তত্ত্ব লাভ করেন।

গুরু-শিষ্য সম্পর্ক হলেই জ্ঞান হবে, তেমন কথা নয়। কারণ যারা গুরুকরণ করেছে, গুরু-শিষ্য সম্বন্ধ স্বীকার করেছে, তাদের সকলেরই যে জ্ঞান হয়েছে—তা নয়। কিন্তু জানবার তীব্র আকাঙ্ক্ষা থাকলে যে, জ্ঞান হয় এরূপ দেখা যায়— শোনাও যায়। জানবার তীব্র আকাঙ্ক্ষা যার থাকে তার গুরু-শিষ্য সম্পর্ক স্বীকার করা আবশ্যক হয় না। এর তাৎপর্য এই যে যতক্ষণ কোন ব্যক্তির মধ্যে তীব্র জিজ্ঞাসা না জাগে গুরু-শিষ্য সম্বন্ধ স্বীকার করলেও তার জ্ঞান হয় না, আর জিজ্ঞাসা তীব্ররূপ ধারণ করলে সাধক গুরু-শিষ্য সম্পর্ক ছাড়াই যে কোন ব্যক্তির কাছ থেকে জ্ঞান আহরণ করতে পারেন। তীব্র জিজ্ঞাসু সাধককে ভগবান স্বপ্নে (শুকদেবাদি যাঁরা পূর্বে গুরু ছিলেন) সাধুদের দ্বারা মন্ত্র পাইয়ে দেন।

শিষ্য হলেই যে গুরুর উপদেশে জ্ঞান হবে এমন কোন নিয়ম নেই। কারণ উপদেশ শুনলেও শিষ্যের যদি নিজের জিজ্ঞাসা, আগ্রহ না থাকে তাহলে সে সেই উপদেশ ধারণ করতে পারে না। কিন্তু তীব্র জিজ্ঞাসা, শ্রদ্ধা-বিশ্বাস হলে মানুষ কোন সম্পর্ক ব্যতীতই উপদেশ ধারণ করতে পারে—**'শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানম্'**, (৪।৩৯)। এর তাৎপর্য হচ্ছে যে, জ্ঞান নিজ জিজ্ঞাসা এবং আগ্রহ দ্বারাই লাভ হয়, কেবলমাত্র গুরু করলেই হয় না।

যদি কারোর সত্যকার গুরু লাভ হয় এবং শিষ্য তাকে গুরু বলে, মহাত্মা বলে মানে, তাঁর ওপর শ্রদ্ধা-বিশ্বাস রাখে, তবেই তার লাভ হবে। কিন্তু শিষ্যের যদি শ্রদ্ধা বা বিশ্বাস না থাকে, তাহলে সাক্ষাৎ ভগবানের দেখা পেলেও তার কোন লাভ হয় না। দুর্যোধনকে ভগবান উপদেশ দিয়ে পাণ্ডবদের সঙ্গে সন্ধি করার জন্য অনেক বলেছেন, কিন্তু এ কথার কোন প্রভাবই দুর্যোধনের ওপর পড়েনি। সে না মানায়, ভগবানও কিছু করতে পারেন নি। এর তাৎপর্য হচ্ছে যে নিজে মানলে, স্বীকার করলে তবেই কল্যাণ হবে। অতএব গীতা নিজেই নিজের উদ্ধার করার প্রেরণা জোগায়—**'উদ্ধরেদাত্মনাত্মানম্'** (৬।৫)।

গীতায় জ্ঞানমার্গে আচার্যাদির উপাসনার কথা বলা হয়েছে, কিন্তু কর্মযোগে এবং ভক্তিযোগে গুরুর আবশ্যকতার কথা বলা হয়নি। কারণ যখন কোন ঘটনা বা পরিস্থিতিতে মনে এই চিন্তা আসে যে, 'স্বার্থ দ্বারা কাজ করলে কখনও অভাব পূরণ হয় না, স্বার্থপরতা হচ্ছে পশুত্ব, এতে কোন মানবতা নেই', তখন মানুষ স্বার্থভাব পরিত্যাগ করে, কামনা পরিত্যাগ করে সেবাপরায়ণ হয়ে ওঠে। সেবাপরায়ণ হলে কর্মযোগীর মধ্যে স্বতঃই তত্ত্বজ্ঞান উদিত হয়—**'তৎ স্বয়ং যোগসংসিদ্ধঃ কালেনাত্মনি বিন্দতি'** (৪।৩৮)।

একটি বিশেষ শক্তি আছে যার দ্বারা সমস্ত জগৎ-সংসার চালিত হয়। মানুষ যখন সেই শক্তিতে বিশ্বাস করে, তখনই ভগবদ্‌মুখী হয়। ভগবৎ-ভজনরত এইসব ব্যক্তির অজ্ঞান অন্ধকার স্বয়ং ভগবান দূর করে দেন (১০।১১) এবং তাকে মৃত্যুরূপ-সংসার-সাগর থেকে পরিত্রাণ করেন (১২।৭)।

ভগবানের এক বিশেষ উদারতা ও দয়ালুতা এই যে, যে ব্যক্তি তাঁকে মানে না, তাঁর মতবাদ খণ্ডন করে অর্থাৎ নাস্তিক, তার ভিতরও যদি গূঢ়-তত্ত্ব এবং নিজ স্বরূপকে জানবার তীব্র আকাঙ্ক্ষা হয়, তাহলে তাকেও ভগবান কৃপাপূর্বক জ্ঞানপ্রাপ্ত করিয়ে দেন।

যার দ্বারা অজ্ঞান দূরীভূত হয়, জ্ঞান প্রাপ্ত হওয়া যায়, সঠিক পথ চেনা যায়, নিজ কর্তব্য জানা যায়, নিজ ধ্যেয়কে দেখা যায়, তাকেই গুরু-তত্ত্ব বলা হয়। এই গুরু-তত্ত্ব প্রত্যেকের মধ্যেই বিরাজমান। এই গুরু-তত্ত্ব যে ব্যক্তি, শাস্ত্র ইত্যাদিতে প্রকটিত থাকে, তাকেই নিজ গুরু বলে মানা উচিত।

বাস্তবে ভগবানই সবার গুরু, কারণ জগৎ-সংসারে যে যে স্থানে জ্ঞান-দীপ্তি প্রকাশিত হয়, তা ভগবান হতেই পাওয়া যায়। এই জ্ঞান যে যে স্থানে যে যে ব্যক্তিতে প্রকটিত হয় অর্থাৎ যে ব্যক্তি, শাস্ত্র ইত্যাদিতে প্রকটিত হয় তাকেই গুরু বলা হয়। আসলে ভগবানই মূলে সকলের গুরু। ভগবান গীতায় বলেছেন, 'আমিই সমস্ত দেবতা এবং মহর্ষিদের আদি অর্থাৎ তাঁদের উৎপাদক, সংরক্ষক, শিক্ষক'—**'অহমাদির্হি দেবানাং মহর্ষীণাং চ সর্বশঃ'** (১০।২)। অর্জুনও ভগবানের বিরাট রূপের স্তুতি করে

বলেছিলেন, 'ভগবান ! আপনিই সকলের গুরু'—'গরীয়সে' (১১।৩৭) ; 'গুরুগরীয়ান্' (১১।৪৩)। সুতরাং সাধকের গুরু খোঁজার কোন প্রয়োজন নেই। তাঁর 'কৃষ্ণং বন্দে জগদ্গুরুম্' বাক্য অনুযায়ী ভগবান শ্রীকৃষ্ণকেই গুরু এবং তাঁর বাণী গীতাকে মন্ত্র, উপদেশ মনে করে তাঁর আজ্ঞানুসারে সাধনায় লেগে থাকা উচিত। যদি সাধকের লৌকিক দৃষ্টিতে গুরুর আবশ্যকতা হয়, তাহলে জগদ্গুরু নিজেই তাঁকে গুরু পাইয়ে দেন, কারণ তিনি ভক্তের যোগক্ষেম বহনকারী—'যোগক্ষেমং বহাম্যহম্' (৯।২২)।

(১৭) গীতা এবং বেদ

যস্য নিঃশ্বসিতা বেদা যস্য বৈ মার্গদর্শকাঃ।
স কৃষ্ণঃ স্বস্বরূপাংস্তান্ স্বয়ং খণ্ডয়তে কথম্॥

বেদ নামটি জ্ঞানের বাচক[১]। সেই জ্ঞান দ্বারাই সব ব্যবহারাদি হয় এবং সকলের মঙ্গল হয় অর্থাৎ সাধারণ ব্যবহার থেকে শুরু করে মোক্ষ পর্যন্ত এই জ্ঞান দ্বারাই সবকিছু সিদ্ধ হয়। এই জ্ঞানই পৃথিবীতে ঋগ্বেদ, সামবেদ, যজুর্বেদ এবং অথর্ববেদ—এই চার সংহিতা রূপে প্রসিদ্ধ। পুরাণ, স্মৃতি, ইতিহাস ইত্যাদিতে তথা পৃথক্ পৃথক্ সম্প্রদায়ের মধ্যে নানারূপে যা কিছু জ্ঞান প্রাপ্ত হয়, তা সমস্তই মূলে বেদ থেকে প্রাপ্ত জ্ঞান। সেই জ্ঞানকে কারো পক্ষে খণ্ডন বা অনাদর করা সম্ভবই নয়। যদি কেউ এটি খণ্ডন করে তাহলে বাস্তবে সেই ব্যক্তি নিজেরই হীনতা প্রকাশ করে, নিজেকেই খণ্ডন করে।

ভগবান গীতায় বেদকে অত্যন্ত সম্মান করেছেন। তিনি বলেছেন যে, 'যার দ্বারা লৌকিক এবং পারমার্থিক সিদ্ধি হয়, সেই সকল কর্ম-বিধানের জ্ঞান বেদ থেকেই জানা যায়'—'**কর্ম ব্রহ্মোদ্ভবম্**' (৩।১৫) ; বহুপ্রকার যজ্ঞ অর্থাৎ পরমাত্মপ্রাপ্তির সাধন প্রণালী বেদের বাণীতেই বিস্তারিতভাবে জানানো আছে—'**এবং বহুবিধা যজ্ঞা বিততা ব্রহ্মণো মুখে**' (৪।৩২)। ভগবান নিজের সম্বন্ধেও বলেছেন যে, 'আমিই ঋক্, সাম এবং যজুঃ'—'**ঋক্ সাম যজুরেব চ**' (৯।১৭) ; 'বেদের মধ্যে সামবেদ আমার স্বরূপ'—'**বেদানাং সামবেদোঽস্মি**' (১০।২২) 'বেদমাতা গায়ত্রী আমারই স্বরূপ'—'**গায়ত্রী ছন্দসামহম্**' (১০।৩৫) ; 'সমস্ত বেদে আমিই একমাত্র জানবার বস্তু অর্থাৎ চার বেদে আমার স্বরূপই প্রতিপাদিত হয়েছে তথা বেদের তত্ত্ব নির্ণয়কারী এবং বুদ্ধিতে অধিষ্ঠিত হয়ে বেদার্থ পরিজ্ঞাত আমিই করাই,' '**বেদৈশ্চ সর্বৈরহমেব বেদ্যো বেদান্তকৃদ্ বেদবিদেব চাহম্**' (১৫।১৫) ; 'শাস্ত্রে এবং বেদে আমিই পুরুষোত্তম নামে প্রসিদ্ধ'—'**অতোঽস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ**' (১৫।১৮)।

গীতায় '**যামিমাং পুষ্পিতাং বাচম্**' (২।৪২)—'লোকদেখানো প্রীতিকর বাক্য', '**বেদবাদরতাঃ**' (২।৪২)—'বেদের বাদ-প্রতিবাদে রত ব্যক্তিগণ' ; '**ক্রিয়াবিশেষবহুলাং ভোগৈশ্বর্যগতিং প্রতি**' (২।৪৩)—'ভোগৈশ্বর্য লাভের উপায়স্বরূপ বিবিধ ক্রিয়াকলাপের বর্ণনাসূচক বাক্য', '**ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদাঃ**' (২।৪৫)—'বেদ তিনগুণের কার্যরূপ সংসারের প্রতিপাদনকারী', '**জিজ্ঞাসুরপি যোগস্য শব্দব্রহ্মাতিবর্ততে**' (৬।৪৪)—'সমতার জিজ্ঞাসুও বেদে কথিত সকাম অনুষ্ঠান অতিক্রম করে যায়', '**বেদেষু----যৎ পুণ্যফলং প্রদিষ্টম্**'। **অত্যেতি তৎসর্বমিদং**---' (৮।২৮)—'বেদাদিতে যে সকল পুণ্যফল কথিত আছে, যোগী সে সমস্ত অতিক্রম করে যান', '**এবং ত্রয়ীধর্মমনুপ্রপন্না গতাগতং কামকামা**

---

[১]'বেদ' শব্দটি 'বিদ্ (জ্ঞানে)' ধাতু থেকে জাত।

লভন্তে' (৯।২১)—'এইভাবে তিনটি বেদে কথিত সকাম ধর্মের আশ্রিত ভোগকামনাকারী মানুষ সংসারে গমনা-গমন করে থাকেন' ইত্যাদি পদগুলির দ্বারা বেদের যে নিন্দা বা অসম্মান হয় বাস্তবে সেটি বেদের নয়, বরং তা সকাম ভাবেরই নিন্দা। কারণ সকামভাবের জন্যই মানুষকে বারংবার জন্ম মরণ চক্রে আবর্তিত হতে হয়, বন্ধন দশায় পড়তে হয়। সুতরাং ভগবান সকামভাবেরই নিন্দা করেছেন, বেদের নয়।

গীতায় বেদপাঠ, অধ্যয়ন ইত্যাদি দ্বারা ভগবানের বিশ্বরূপ ও চতুর্ভুজরূপ দর্শনের যে নিষেধ আছে (১১।৪৮, ৫৩), তার তাৎপর্য এই যে, কেবলমাত্র বেদসমূহ পাঠ ও অধ্যয়ন দ্বারাই ভগবানের দর্শন লাভ হয় না, তাঁর দর্শন কেবলমাত্র অনন্য প্রেম দ্বারাই হয়। যদি বেদ পাঠ, অধ্যয়ন ইত্যাদি ভগবানের আদেশ বলে মনে করা যায়, নিষ্কামভাবে শুধুমাত্র তাঁর প্রসন্নতার জন্যই করা যায়, তবে ভগবৎকৃপায় তাঁর দর্শন লাভ সম্ভব হয়। কারণ ভগবান ভাবগ্রাহী, ক্রিয়াগ্রাহী নন।

বেদ শ্রুতিমাতা, মা সমস্ত বালকের কাছেই সমান। তার জন্য বেদমাতা নিজের সন্তানদের জন্য ভিন্ন ভিন্ন রুচি অনুযায়ী সর্বপ্রকার লৌকিক এবং পারমার্থিক সিদ্ধির সাধন উপায় দেখিয়েছেন। নিজ মাতার অসম্মান এবং নিন্দা কোন্ সন্তান করতে পারে ? আর করবেই বা কেন ? ভগবানও গীতায় বেদসমূহকে নিজ স্বরূপ বলে জানিয়েছেন ; সুতরাং তিনি নিজের স্বরূপের অসম্মান করবেন কীভাবে ? এবং তাঁর দ্বারা তাঁর নিজ স্বরূপের অসম্মান হবেই বা কিরূপে ?

(১৮) গীতায় জাতি বর্ণনা

জন্মনা মন্যতে জাতিঃ কর্মণা মন্যতে কৃতিঃ।
তস্মাৎ স্বকীয়কর্তব্যং পালনীয়ং প্রযত্নতঃ॥

উচ্চ-নীচ যোনিতে যে শরীর প্রাপ্ত হওয়া যায়, তা সমস্তই গুণ এবং কর্ম অনুযায়ী পাওয়া যায় (১৩।২১), (১৪।১৬, ১৮)। গুণ এবং কর্ম অনুযায়ীই মানুষের জন্ম হয় অর্থাৎ পূর্বজন্মে মানুষের যেমন গুণ ছিল এবং যে যেমন কর্ম করেছিল, সেই অনুযায়ী তার জন্ম হয়। ভগবান গীতায় বলেছেন যে, 'প্রাণিসকলের গুণ ও কর্ম অনুযায়ী আমি চারটি বর্ণ (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র) সৃষ্টি করেছি'—'**চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্মবিভাগশঃ**' (৪।১৩)। সুতরাং গীতা জন্ম (উৎপত্তি) থেকেই জাতিপ্রথা স্বীকার করে। অর্থাৎ যে ব্যক্তি যে বর্ণ এবং যে জাতির মাতা-পিতা হতে জন্ম লাভ করে, তার দ্বারাই তার জাতি নিরূপিত হয়।

'জাতি' শব্দটি '**জনি প্রাদুর্ভাবে**' এই সূত্রানুসারে জন্ ধাতুর থেকে উৎপন্ন। এই জন্য জাতি জন্ম থেকেই মানা হয়, কর্ম থেকে নয়। কর্মের দ্বারা 'কৃতি' হয়, যা '**কৃ**' ধাতু থেকে উদ্ভূত, তাই জাতির মর্যাদারক্ষা সেই অনুযায়ী কর্তব্য-কর্ম করলে তবেই হয়।

ভগবান (১৮।৪১-৪৪) জন্ম-অনুযায়ীই কর্ম বিভাগ করেছেন। মানুষ যে বর্ণ বা জাতিতে জন্ম নেয় এবং শাস্ত্রে সেই বর্ণের জন্য যে কর্মের বিধান আছে, সেই কর্মই ঐ বর্ণভুক্ত ব্যক্তির '**স্বধর্ম**' এবং যে কর্ম তাদের জন্য নিষিদ্ধ ঐ বর্ণের কাছে তা হচ্ছে 'পরধর্ম'। যেমন যজ্ঞ করা, দান গ্রহণ করা ইত্যাদি শাস্ত্রমতে ব্রাহ্মণদের নির্দিষ্ট কর্ম হওয়ায় এটি তাদের 'স্বধর্ম'। আবার এই কর্মগুলি ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্রদের শাস্ত্রানুসারে নিষিদ্ধ হওয়ায় তাদের কাছে 'পরধর্ম'। স্বধর্ম পালনকালে মানুষ যদি মৃত্যুপ্রাপ্তও হয়, তথাপি তার কল্যাণ হয় ; কিন্তু পরধর্ম বা অপরের জন্য নির্দিষ্ট কর্তব্য-কর্ম আচরণ জন্ম-মৃত্যুরূপ ভীতি প্রদান করে (৩।৩৫)। অর্জুন ক্ষত্রিয় ছিলেন, সুতরাং যুদ্ধ করাই তাঁর স্বধর্ম। সেইজন্য ভগবান তাঁকে অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিলেন যে, 'ক্ষত্রিয়ের জন্য যুদ্ধ ভিন্ন আর কিছুই কল্যাণকারী কাজ নেই' (২।৩১) ; 'যদি তুমি এই

ধর্মযুদ্ধ না করো, তবে স্বধর্ম ও কীর্তি পরিত্যাগের জন্য তুমি পাপভাগী হবে' (২।৩৩)।

ভগবান গীতায় নিজ নিজ বর্ণ অনুসারে কর্তব্য-কর্ম করার ওপর খুব জোর দিয়ে বলেছেন যে, নিষ্কামভাবে তৎপরতার সঙ্গে নিজ নিজ কর্তব্য-কর্মে নিয়োজিত ব্যক্তি পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হয় (৩।১৯ ; ১৮।৪৫), বিধি দ্বারা পরমাত্মার পূজা করে মানুষ সিদ্ধি প্রাপ্ত হয় (১৮।৪৬)। পরমাত্মার পূজা পবিত্র বস্তু দ্বারা হয়, অপবিত্র বস্তুর দ্বারা নয়। নিজ কর্মই হচ্ছে সেই পবিত্র বস্তু, অপরের কর্ম নিজের জন্য (নিষিদ্ধ হওয়ায়) অপবিত্র বস্তু। সুতরাং নিজ কর্মের দ্বারা পরমাত্মার পূজা করলে কল্যাণ হয় এবং অপরের কর্ম করলে তাতে পাতকী হতে হয়। নিজ কর্মকে (স্বকর্ম) ভগবান 'সহজ কর্ম' বলে বর্ণনা করেছেন। সহজ কর্মের অর্থ হচ্ছে—সঙ্গে নিয়ে জন্মানো কর্ম। যেমন কেউ ক্ষত্রিয় বংশে জন্মালে, ক্ষত্রিয় কর্মও তার সঙ্গে জন্ম নেয়—অতএব ক্ষত্রিয়-কর্ম তার জন্য সহজ কর্ম। ভগবানও চার বর্ণের জন্য সহজ, স্বভাবজ কর্মের বিধান করেছেন (১৮।৪২-৪৪)। এই স্বভাবজ কর্ম করলে মানুষ পাপভাগী হয় না (১৮।৪৭)। যেমন স্বতঃ-প্রাপ্ত ন্যায়যুদ্ধেও মনুষ্য হত্যা হয়, কিন্তু এটি শাস্ত্রবিহিত সহজ কর্ম হওয়ায় ক্ষত্রিয়ে পাপ বর্তায় না।

মানুষ যে জাতিতে জন্মগ্রহণ করে, সেই অনুযায়ী শাস্ত্রবিহিত কর্তব্য-কর্ম করলে সেই জাতি রক্ষা পায় আর বিপরীত কর্ম করলে সেই জাতিতে কর্মসংকর বশতঃ বর্ণসংকর ঘটে যায়। ভগবান নিজের সম্বন্ধেও বলেছেন যে, 'যদি আমি নিজবর্ণ অনুযায়ী কর্তব্য পালন না করি, তাহলে আমি বর্ণসংকর সৃষ্টিকারী তথা সমস্ত প্রজার নাশ বা পতনকারী হই' (৩।২৩-২৪)। সুতরাং যে ব্যক্তি নিজ বর্ণ অনুযায়ী কর্তব্যের পালন করে না, সেই ইন্দ্রিয় ভোগ পরায়ণ এবং পাপময় জীবন যাপনকারী মানুষের সংসারে বাঁচাই বৃথা (৩।১৬)।

সকল মানুষেরই নিজ নিজ কর্তব্য-কর্ম দ্বারা নিজ জাতির রক্ষা করা উচিত। এর জন্য পাঁচটি কথা মনে রাখা খুবই প্রয়োজন—

১) **বিবাহ**— কন্যার বিবাহ দেওয়া বা পুত্রবধূ আনা নিজ নিজ জাতির মধ্যে হওয়া ভালো। কারণ অপর জাতির কন্যা নিয়ে এলে রজোবীর্য জনিত বিকৃতি ঘটার সম্ভাবনা থাকায় সন্তান বর্ণসংকর জন্মাবে। এরূপ সন্তানের আপন পূর্বপুরুষগণের প্রতি শ্রদ্ধা হয় না। শ্রদ্ধা না থাকলে সে তো পূর্বপুরুষগণের শ্রাদ্ধ-তর্পণ করবে না, পিণ্ড-জল প্রদান করবে না। কখনো লোক-লজ্জায় যদি সে প্রদান করেও, তাহলে সেই শ্রাদ্ধ-তর্পণ, পিণ্ড-জল তাঁদের প্রাপ্তি হবে না। এর দ্বারা পিতৃপুরুষেরা নিজ নিজ স্থান থেকে পতিত হন (১।৪২)। গীতায় বলা আছে, যে ব্যক্তি শাস্ত্র-বিধি ত্যাগ করে নিজের ইচ্ছামত কাজ করে, তার কখনো অন্তঃকরণের শুদ্ধিরূপ সিদ্ধি মেলে না, সুখও মেলে না আর তার পরমগতিও লাভ হয় না (১৬।২৩)। অতএব কর্তব্য-অকর্তব্য বিষয় স্থির করতে শাস্ত্রকেই অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত (১৬।২৪)।

২) **ভোজন**—আহারও নিজ নিজ জাতি অনুযায়ী হওয়া উচিত। যেমন ব্রাহ্মণদিগের রসুন, পেঁয়াজ খাওয়া দূষণীয় ; কিন্তু শূদ্রের তাতে দোষ হয় না। আমরা যদি ভিন্ন জাতির লোকের সঙ্গে ভোজন করি, তাহলে আমাদের শুদ্ধি তাদের ওপর কোন প্রভাব ফেলে না, কিন্তু তাদের অশুদ্ধি আমাদের ওপর নিশ্চয়ই প্রভাব বিস্তার করে। সুতরাং মানুষের নিজ নিজ জাতি অনুসারেই খাওয়া-দাওয়া করা কর্তব্য।

৩) **বেশভূষা**—পাশ্চাত্য দেশের অনুকরণে আজকাল নিজ জাতির পোশাকআশাকও প্রায়শঃ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। প্রায় সকল জাতির বেশভূষার মধ্যেই বিকৃতি এসে গেছে, যার দ্বারা 'কোন ব্যক্তি কি জাতির'—তা বুঝতে পারা যায় না। অতএব মানুষের নিজ জাতি অনুযায়ী বেশভূষা ধারণ করা কর্তব্য।

৪) **ভাষা**— অপর ভাষা বা লিপি শেখায় দোষ নেই, কিন্তু সেই অনুযায়ী নিজেকেও পাল্টে ফেলা অত্যন্ত দোষ। যেমন ইংরাজী শিখে নিজ বেশভূষা, খাওয়া-দাওয়া, চালচলন ইত্যাদিতে নিজেকে ইংরেজ বানিয়ে ফেলা, সেই ভাষাকে নিজের ভাষা করে নেওয়া তো নয়, বরং নিজেকেই হারিয়ে ফেলা। নিজের বেশভূষা, খাওয়া-থাকা ইত্যাদি যথাযথ রেখেই ইংরাজী শেখা ইংরাজী ভাষা ও অক্ষরকে নিজের করে নিতে হবে। সুতরাং অন্য ভাষার জ্ঞান থাকলেও কথাবার্তা নিজ ভাষাতেই হওয়া উচিত।

৫) **ব্যবসায়**—ব্যবসায় (কাজকর্ম)ও নিজ জাতি অনুসারে হওয়া উচিত। গীতায় ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্রদের জন্য পৃথক পৃথক কর্মের বিধান করা আছে (১৮।৪২-৪৪)।

(১৯) গীতায় চারটি আশ্রমের বর্ণনা

যথা সর্বেষু শাস্ত্রেষু প্রোক্তাশ্চত্বার আশ্রমাঃ।
গীতয়া ন তথা প্রোক্তাঃ সংকেতেনৈব দর্শিতাঃ ॥

গীতায় ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র— এই চারটি বর্ণের স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা আছে ; যেমন-'**চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টম্**' (৪।১৩) ; '**ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং শূদ্রাণাঞ্চ পরন্তপ**' (১৮।৪১) ইত্যাদি ; কিন্তু ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস এই চার আশ্রমের বর্ণনা স্পষ্টভাবে করা হয় নি। এই চারটি আশ্রমের বর্ণনা গীতায় সংকেতরূপে গৌণভাবে পাওয়া যেতে পারে ; যেমন—

(১) যে পরমাত্মতত্ত্ব পাবার আশায় ব্রহ্মচারিগণ ব্রহ্মচর্য পালন করেন—'**যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্যং চরন্তি**' (৮।১১) পদটিতে ব্রহ্মচর্য আশ্রমের সংকেত বলে মানা যায়।

(২) যে ব্যক্তি অপরের প্রাপ্য না দিয়ে নিজে সব একাকী ভোগ করে, সে চোর—'**তৈর্দত্তানপ্রদায়ৈভ্যো যো ভুঙ্‌ক্তে স্তেন এব সঃ**' (৩।১২) ; যে ব্যক্তি কেবল নিজের শরীর পোষণের জন্য রন্ধন করে ; সেই পাপী পাপ ভক্ষণ করে—'**ভুঞ্জতে তে ত্বঘং পাপা যে পচন্ত্যাত্ম-কারণাৎ**' (৩।১৩) ইত্যাদি পদকে গার্হস্থ্য আশ্রমের সংকেত বলা যেতে পারে।

(৩) কিছু ব্যক্তি আছে যারা তপস্যারূপ যজ্ঞ করে থাকে—'**তপোযজ্ঞাঃ**' পদটিতে বানপ্রস্থ আশ্রমের সংকেত রয়েছে।

(৪) যিনি সর্বপ্রকার ভোগোপকরণ সর্বতোভাবে পরিত্যাগ করেছেন—'**ত্যক্তসর্বপরিগ্রহঃ**' (৪।২১) পদটিতে সন্ন্যাস আশ্রমের সংকেত পাওয়া যায়।

গীতায় বর্ণগুলির বিষয়ে স্পষ্টরূপে এবং আশ্রমগুলির সংকেতে বর্ণনা করার কারণ এই যে, সেই সময় কর্তব্য-কর্মরূপ যুদ্ধের প্রসঙ্গ ছিল, আশ্রমের নয়। তাই ভগবান গীতায় বর্ণগত কর্তব্য-কর্মের বর্ণনাই বেশী করেছেন। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে এতেও ক্ষত্রিয়ের কর্তব্য কর্ম নিয়ে যত আলোচনা করা হয়েছে, ব্রাহ্মণ, বৈশ্য, শূদ্রদের নিয়ে তত আলোচনা করা হয় নি।

আশ্রম নিয়ে স্পষ্টভাবে বর্ণনা না করার অন্য কারণ এই যে, অন্যান্য শাস্ত্রে যেখানে আশ্রমগুলির বর্ণনা করা হয়েছে সেখানে ক্রমশঃ আশ্রম বদল করার কথাই বলা হয়েছে। আশ্রম বদল করার কথাও মানুষের কল্যাণের জন্যই বলা হয়েছে। কিন্তু গীতার উপদেশ এই যে, নিজ কল্যাণ করার জন্য আশ্রম বদলানোর কোন প্রয়োজন নেই, বরং ব্যক্তি যে পরিস্থিতিতে যে বর্ণে, আশ্রম ইত্যাদিতে থাকে, তাতেই সে নিজ কর্তব্য যদি সঠিকভাবে পালন করে তাহলে নিজ কল্যাণ সাধন করতে পারে। শুধু তাই নয়, যুদ্ধের মত ঘোরতর কর্মে লিপ্ত থাকা মানুষও নিজের কল্যাণ করতে পারে। এর তাৎপর্য এই যে, আশ্রম ভেদে জীবের কল্যাণে কোন ভেদ আসে না। বর্ণের ভেদও কর্তব্য-কর্মের দৃষ্টিতেই করা হয় অর্থাৎ যে কর্তব্য-কর্মই করা হোক না কেন তা বর্ণ ভেদের দৃষ্টিতেই করা হয়ে থাকে। সেইজন্য ভগবান চারটি বর্ণের সুস্পষ্ট আলোচনা করেছেন। বর্ণগুলি নিয়ে আলোচনা করার কালে আশ্রমের আলোচনাও তার মধ্যে এসে পড়ে। এইভাবে দেখতে গেলে পৃথক্‌ভাবে আশ্রমের বর্ণনা করার আর প্রয়োজন হয় না।

(২০) গীতায় সৈনিকদের জন্য শিক্ষা

পালনীয়ং স্বকর্তব্যং ধৃত্যুৎসাহসমন্বিতৈঃ।
নিত্যত্বাদাত্মনো মৃত্যোর্ভেতব্যং নৈব সৈনিকৈঃ॥

ভারতীয় শিক্ষা এই যে, কোন সময়, কোন পরিস্থিতিতেই যেন মানুষের মধ্যে কাপুরুষতা, ভীরুতা, এবং কর্তব্য-বিমুখতা ইত্যাদি কিঞ্চিন্মাত্র না আসে। বরং সর্বপ্রকার পরিস্থিতিতেই উৎসাহ বজায় রাখা উচিত। অষ্টাদশ অধ্যায়ের ছব্বিশ সংখ্যক শ্লোকে, 'সাত্ত্বিক ব্যক্তি'র লক্ষণ বলার সময় ভগবান দুটি কথা বলেছেন—আসক্তি এবং অহংকার—এই দুটির ত্যাগ, ধৈর্য এবং উৎসাহ—এই দুটির ধারণ করা তথা সিদ্ধি এবং অসিদ্ধি এই দুটিতে নির্বিকার থাকা। এই ছটির মধ্যে মানুষের ক্ষেত্রে দুটি প্রধান— ধৈর্য এবং উৎসাহ। কর্তব্যরূপে যে কাজকে স্বীকার করা হয়েছে, তাতে লেগে থাকার নাম 'ধৈর্য' এবং সেই লক্ষ্যে কর্মপ্রবণতা, তৎপরতা ইত্যাদির নামই 'উৎসাহ'।

পর্বত যেমন অচল, অটল, সৈনিকদেরও তেমনি নিজ কর্তব্যে অচল, অটল থাকতে হয়। কোনও বিপরীত অবস্থা বা পরিস্থিতি এলেও কিঞ্চিন্মাত্র বিচলিত না হওয়া। কারণ শরীর তো প্রতিক্ষণই মরছে, মৃত্যুর দিকে এগোচ্ছে এবং স্বয়ং (আত্মা) তো অমর, তাঁর কখনও মৃত্যু হয় না (২।২৩-২৫)। সুতরাং মৃত্যুর জন্য কখনও ভীতি থাকা উচিত নয়। দ্বিতীয়তঃ নিজ কর্তব্যপালন কালে যদি মৃত্যুও হয়, তাহলেও তাতে কল্যাণ হয়—**'স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ'** (৩।৩৫)। কিন্তু নিজ কর্তব্য-কর্ম থেকে চ্যুত হলে ভয় আসে অর্থাৎ ইহলোকে অপমান, তিরস্কার, হানি ইত্যাদির ভয় থাকে এবং পরলোকে দুর্গতিপ্রাপ্তি হয়—**'পরধর্মো ভয়াবহঃ'** (৩।৩৫)। অতএব যে যুদ্ধ কর্তব্যরূপে স্বাভাবিকভাবে প্রাপ্ত তা করতে বিশেষভাবে উৎসাহী হওয়া উচিত। সৈনিকদের পক্ষে যুদ্ধের মত কল্যাণকারী অন্য কোন ধর্ম নেই। সেই সৈনিকেরা অত্যন্ত ভাগ্যবান যাদের অনায়াসে ধর্মযুদ্ধে যোগ দেওয়ার আহ্বান আসে (২।৩১-৩২)।

নিজ কর্তব্য পালনে খুবই উৎসাহী হওয়া উচিত। কোন কাজে যদি সফলতা পাওয়া যায়, তাহলে তাতে যেরূপ উৎসাহ থাকে—এইরূপ উৎসাহ, বিফলতা এলেও নিজের কর্তব্য পালনে বজায় রাখা উচিত। নিজ কর্তব্যসাধনের ক্ষেত্রে সিদ্ধি-অসিদ্ধি বা সফলতা-বিফলতার কোনই স্থান নেই। কারণ লৌকিক সফলতাও বিফলতা আর বিফলতাও বিফলতা। নিজ কর্তব্যপালনে যদি সফলতা আসে, তবে সেটিও সফলতা এবং বিফলতা এলে তাও সফলতা (২।৩৭)। ক্ষুদিরাম বসুর ফাঁসীর হুকুম দেওয়ার পর কারাগারে তাঁর শরীরের ওজন বেড়ে গিয়েছিল, কেননা তাঁর মনে নিজের কর্তব্য সম্বন্ধেই বিচার ছিল, সফলতা বা বিফলতা নিয়ে নয়।

আমাদের ভারতবর্ষের সৈনিকদের যুদ্ধে এতো উৎসাহ ছিল যে, শরীর থেকে মাথা আলাদা হয়ে গেলেও তাঁরা শত্রুসংহারে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ থাকতেন। যুদ্ধবীর সৈনিকের দেহ ক্ষতবিক্ষত হতে থাকলেও তাঁর উৎসাহ বাড়ত বৈ কমত না। ক্ষত-জনিত কষ্ট হলেও তাঁর দুঃখ হয় না, বরং নিজ কর্তব্য পালন করতে একরকমের সুখ অনুভব করেন, যা তাঁর উৎসাহকে বাড়িয়ে তোলে। এইরূপ যুদ্ধবীর সৈনিকদের উৎসাহ অন্য সৈনিকদের ওপর প্রভাব জাগায়। ঐসব উৎসাহী সৈনিকদের কথা শুনে কাপুরুষেরাও উৎসাহিত হয়।

(২০) গীতায় ভগবানের শক্তিসমূহ

আদ্যা গুণময়ী দৈবী তথান্যা দিব্যচিন্ময়ী।
যোগমায়েতি চ প্রোক্তা গীতায়াং পঞ্চ শক্তয়ঃ॥

গীতায় ভগবানের পাঁচ প্রকার শক্তির বর্ণনা আছে ; যেমন—

১) **মূল প্রকৃতি**—মহাপ্রলয়ের সময় সমস্ত প্রাণী এই মূল প্রকৃতিকে প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ এই মূল প্রকৃতিতে লীন হয় —**'সর্বভূতানি কৌন্তেয় প্রকৃতিং যান্তি মামিকাম্। কল্পক্ষয়ে**------(৯।৭)'। মহাসর্গের সময় ভগবান এই মূল প্রকৃতিকে বশ করে নিজ নিজ স্বভাবের বশীভূত প্রাণিকুলের সৃষ্টি করেন—**'প্রকৃতিং স্বামবষ্টভ্য**-----' (৯।৮) ; এবং এই প্রকৃতি ভগবানের অধিষ্ঠানবশতঃ সমস্ত জগৎ-সংসার সৃষ্টি করে (৯।১০)। এই মূল প্রকৃতিকে ভগবান **'মম যোনির্মহদ্ ব্রহ্ম তস্মিন্ গর্ভং দধাম্যহম্'** (১৪।৩) এবং **'তাসাং ব্রহ্ম মহদ্ যোনিরহং বীজপ্রদঃ পিতা'** (১৪।৪) —এই পদগুলির দ্বারা সমস্ত প্রাণীর উৎপত্তি স্থান এবং নিজেকে বীজ প্রদানকারী পিতা বলে জানিয়েছেন।

২) **দিব্য চিন্ময় শক্তি**—ভগবান নিজে যখন অবতার রূপ ধারণ করেন, তখন এই দিব্য চিন্ময় শক্তির আশ্রয় নিয়েই করেন। এই শক্তির দ্বারাই ভগবান ভক্তদের আনন্দদানকারী প্রেমলীলা করেন। এই শক্তি দিব্য ও চিন্ময় গুণসম্পন্ন হয়। সুতরাং ভগবানের অবতারদেহও দিব্য ও চিন্ময় হয়। এই দিব্য-চিন্ময় শক্তিকে ভগবান **'প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবামি'** (৪।৬) পদে উল্লেখ করেছেন।

৩) **যোগমায়া শক্তি**—এই শক্তিদ্বারা মোহিত হয়েই সাধারণ প্রাণিসকল ভগবানকে মানুষ মনে করে তাঁর স্বরূপ চিনতে অপারগ হয়। এই শক্তিতে স্বয়ং ব্রহ্মাও মোহিত হয়ে যান। এই যোগমায়া শক্তিকে ভগবান **'আত্মমায়য়া'** (৪।৬) এবং **'যোগমায়াসমাবৃতঃ'** (৭।২৫) পদে ব্যাখ্যা করেছেন।

৪) **দৈবী প্রকৃতি**—ভগবানের নাম 'দেব'। ভগবানের প্রকৃতি বা স্বভাব হওয়ায় একে 'দৈবী' প্রকৃতি বলা হয়। এতে দয়া, ক্ষমা, অহিংসা ইত্যাদি দৈবগুণ থাকে। সাধক ভক্তগণ এই দৈবী প্রকৃতির আশ্রয় গ্রহণ করে ভগবানের দিকে অগ্রসর হন—**'মহাত্মানস্তু মাং পার্থ----ভূতাদিমব্যয়ম্'** (৯।১৩)। একেই 'দৈবী সম্পদ' নামে বলা হয়েছে। (১৬।৩, ৫)। সাক্ষাৎ ভগবানের অংশ হওয়ায় জীবের মধ্যে এই দৈবী সম্পদ্‌জাত গুণ স্বতঃস্বাভাবিকভাবে থাকে। কিন্তু যতক্ষণ জীব ভগবানের প্রতি বিমুখ থাকে, ততক্ষণ এই গুণ তার মধ্যে প্রকটিত হয় না, বিকশিত হয় না, সুপ্তভাবে থাকে। যখন সে ভগবদ্‌মুখী হয় তখন এই সমস্ত গুণ তার মধ্যে স্বতঃ-স্বাভাবিকভাবে প্রকাশ পেতে থাকে, বিকশিত হতে থাকে।

৫) **গুণময়ী মায়া**—এই মায়া লৌকিক সত্ত্ব, রজঃ এবং তমঃ—এই তিন গুণসম্পন্ন। এই মায়ার সঙ্গে জীব যত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক করে, নিজেকে এর অধিপতি বলে মনে করে, এর থেকে সুখ পেতে চায়—ততই সে নিজে এর দ্বারা মোহগ্রস্ত হয়ে পড়ে, এর অধীন হয় এবং এতে বদ্ধ হয়ে পড়ে। এই গুণময়ী মায়াকে ভগবান প্রকৃতি (৩।২৭, ২৯ ; ১৩।১৯-২১ ; ২৩, ২৯, ৩৪ ; ১৪।৫), অপরা প্রকৃতি (৭।৪-৫), দৈবী গুণময়ী মায়া, (৭।১৪-১৫) মায়া (১৮।৬১) এবং অব্যক্ত (১৩।৫) নামে উল্লেখ করেছেন। এই গুণময়ী মায়াতে অত্যধিক তাদাত্ম্য, মমতা এবং আসক্তি থাকায় এই মায়াই আসুরী, রাক্ষসী এবং মোহিনী রূপ ধারণ করে (৯।১২)।

বাস্তবে ভগবানের একক শক্তিই বিদ্যমান, যা ভগবৎস্বরূপা। সেই শক্তির দ্বারাই ভগবান সৃষ্টি রচনা ইত্যাদি বিভিন্ন কার্য এবং বিভিন্ন প্রকার লীলা করে থাকেন। সুতরাং ঐ এক শক্তিরই কার্য বা লীলা অনুসারে উপরিউক্ত পাঁচটি ভেদ হয়।

(২২) গীতায় বিভূতি বর্ণনা

প্রোক্তাঃ কারণরূপাশ্চ সপ্তমে তু বিভূতয়ঃ।
কার্যকারণরূপাশ্চ কৃষ্ণেন নবমে স্বয়ম্॥
দশমে ব্যক্তিভাবাভ্যাং সারমুখ্যাদিভিশ্চ বৈ।
স্বীয়াঃ প্রভাবরূপেণ প্রোক্তাঃ পঞ্চদশে তথা॥

ভগবান সাধকের অপর ভাব (পরমাত্মা ছাড়া অন্য কিছুর চিন্তা এই ভাব) দূর করার জন্য গীতার সপ্তম, নবম, দশম এবং পঞ্চদশ— এই চারটি অধ্যায়ে নিজের বিভূতি বর্ণনা করেছেন।

সপ্তম অধ্যায়ের সপ্তম শ্লোকে ভগবান '**মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি**'—আমার থেকে শ্রেষ্ঠ এই জগতে দ্বিতীয় কোন কিঞ্চিম্মাত্র কারণ নেই বলেছেন এবং এর পরে অষ্টম শ্লোক থেকে দ্বাদশ শ্লোক পর্যন্ত কারণরূপে নিজের সতেরটি বিভূতি বর্ণনা করেছেন। কারণরূপে বিভূতি বর্ণনা করার তাৎপর্য এই যে, কার্যদ্বারা গুণের ভিন্ন ভাব হতে পারে, কিন্তু কারণ রূপে কেউ ভিন্ন নয়। যেমন আকাশের কাজ শব্দ এবং শব্দ বর্ণাত্মক এবং ধ্বন্যাত্মক যে কোন প্রকারে হতে পারে। কিন্তু কারণরূপে আকাশ একই থাকে। এইরূপ পরমাত্মার কার্য হচ্ছে এই জগৎ সংসার এবং পরমাত্মা স্বয়ং এর কারণ। গুণের বিভিন্নতা অনুযায়ী জগৎ বিচিত্র প্রকারের হয়, কিন্তু কারণরূপে তার মধ্যে এক পরমাত্মাই বিরাজমান। যে ব্যক্তি কার্যে (সংসার) আসক্ত হয় সে বদ্ধ হয়ে পড়ে। আবার যে ব্যক্তি কারণরূপে জগতে এক পরমাত্মাকেই দেখতে পায় সে কখনও বদ্ধ হয় না, বরং কার্যে অসঙ্গ হয়ে '**বাসুদেবঃ সর্বম্**'—সমস্ত পরমাত্মারই রূপ— এরূপ অনুভব করে।

নবম অধ্যায়ের ষোড়শ শ্লোক থেকে উনবিংশ শ্লোক পর্যন্ত ভগবান কার্য-কারণরূপে নিজের সাঁইত্রিশটি বিভূতির বর্ণনা করেছেন। এর তাৎপর্য এই যে, কার্য-কারণ, সৎ-অসৎ, নিত্য-অনিত্য, সার-অসার ইত্যাদি যা কিছু আছে, সে সকলই পরমাত্মা। পরমাত্মা ছাড়া দ্বিতীয় আর কিছু নেই।

দশম অধ্যায়ের চতুর্থ ও পঞ্চম শ্লোকে ভগবান প্রাণীদের ভাবরূপে নিজের কুড়ি প্রকার বিভূতি এবং ষষ্ঠ শ্লোকে ব্যক্তিরূপে নিজের পঁচিশটি বিভূতির বর্ণনা করেছেন। আবার অর্জুনের 'আমি আপনাকে কিসের মধ্যে চিন্তা করব ?' এই প্রশ্নের উত্তরে ভগবান কুড়ি শ্লোক থেকে আটত্রিশ শ্লোক পর্যন্ত মুখ্যরূপে তথা অধিপতিরূপে নিজের একাশিটি বিভূতির বর্ণনা করেছেন। পুনরায় উনচল্লিশ শ্লোকে নিজের সাররূপ বিভূতির কথা বলেছেন। এইসবের তাৎপর্য এই যে, জগৎ-সংসারে ভাব, ব্যক্তি, মুখ্য, অধিপতি এবং সাররূপে যা কিছু আছে, তা সমস্ত এক ভগবানই।

পঞ্চদশ অধ্যায়ের দ্বাদশ শ্লোক থেকে পঞ্চদশ শ্লোক পর্যন্ত ভগবান প্রভাবরূপে নিজের তেরটি বিভূতির বর্ণনা করেছেন। তাৎপর্যস্বরূপ বলা যায় বস্তু বা ব্যক্তিতে যা কিছু প্রভাব, মহত্ত্ব, তেজ ইত্যাদি আছে, সে সকল ভগবানেরই, কোন বস্তু বা ব্যক্তির নয়।

এইভাবে ভগবান এই চারটি অধ্যায়ে সর্বসমেত নিজ একশত চুরানব্বইটি বিভূতির কথা বলেছেন। এইসব বিভূতির তাৎপর্যস্বরূপ বলা যায় যে, বাস্তবে এক ভগবানই সব কিছু হয়ে রয়েছেন। অতঃপর কোন বস্তু বা ব্যক্তি ইত্যাদির মধ্যে অধিক ভাব বা আকর্ষণ বোধ হলে তাতে ভগবানেরই চিন্তন হয়।

বিভূতি বর্ণনা করার উদ্দেশ্য

মানুষের স্বভাব এই যে, সে কোন বস্তু, ব্যক্তি,পরিস্থিতি, ঘটনা ইত্যাদির মধ্যে কোন বিশেষত্ব,

মহত্ত্ব, প্রভাব, সৌন্দর্য ইত্যাদি দেখলে তাতে আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। বাস্তব জগতে যে সমস্ত বিশেষ জিনিস দেখা যায়, তা জগতেরই নয়। কারণ যে জগৎ-সংসার এক মুহূর্ত স্থির থাকে না, সেই ক্ষণস্থায়ী সংসারে বিশেষ জিনিস হবেই বা কীভাবে ? যা কিছু বিশেষত্ব দেখা যায়, তা আসলে এই জগতের আশ্রয়, আধার এবং প্রকাশক সেই ভগবানেরই। কিন্তু ভগবানের দিকে দৃষ্টি না দিয়ে সংসারের উপরিভাগের সৌন্দর্য দেখে মানুষ সেদিকে আকৃষ্ট হয়। কেবল উপরের রূপ দেখে সেই বস্তুতে আকৃষ্ট হওয়া এবং তার মূল কারণকে অনুসন্ধান না করা পশুদের বৃত্তি, মানুষের নয়। মানুষ বিবেক-প্রধান প্রাণী ; সুতরাং তার জগতের তাৎকালিক বিশেষত্বকে গুরুত্ব দিয়ে তাতে আকৃষ্ট হওয়া উচিত নয়। মানুষ যদি বিনাবিচারে এতে আকৃষ্ট হয়, তাহলে তার বিচার-বিবেচনার প্রাধান্য কোথায় থাকল ? সেইজন্য মানুষের জগতের মহত্ত্ব থেকে নিজের মন সরিয়ে ভগবানের যে বাস্তবিক মহত্ত্ব তাতে দৃষ্টি দেওয়া উচিত। সমস্ত মানুষের মন নিজের প্রতি আকৃষ্ট করার নিমিত্ত ভগবান নিজ বিভূতির বর্ণনা করেছেন।

গীতায় ভগবান নিজের যে সমস্ত মুখ্য বিভূতির বর্ণনা করেছেন, তার যা কিছু বিশেষত্ব দেখা যায় সব ভগবানকে নিয়েই। অতএব জগৎসংসারে যে কোন স্থানে সামান্যতম বিশেষত্বও যদি দেখা যায়, সেখানে ভগবানেরই প্রকাশ, সাধকের যেন স্বতঃই এই চিন্তন হয়। জগতের বিশেষত্ব মনে করে যেখানে জগতের কথা চিন্তায় উদিত হয়, সেখানে সেই বিশেষত্বটিকে ভগবানের বলে চিন্তা করলে ঐ চিন্তা ভগবৎচিন্তায় রূপান্তরিত হয় অর্থাৎ সেইস্থানে আপনা হতে ভগবানের চিন্তা এসে যায়।

সাধকের উচিত, যেসকল বিভূতি বর্ণিত হয়েছে সেগুলি কি কি কারণে মুখ্য, এতে কি কি বিলক্ষণতা আছে, এই বিষয়ে কোন্ কোন্ গ্রন্থে কি কি লেখা আছে, এদিকে নজর না দিয়ে এর মূল কোথায় আলোচনা করা ? কোথা থেকে এটি প্রকটিত হল ? এইরূপে লক্ষ্য বিভূতির দিকে না রেখে এর মূল ভগবানের দিকে প্রবাহিত করা উচিত। মানুষের অন্তঃকরণের ভাবসমূহের প্রবাহ নিজের দিকে ফেরাবার জন্যই ভগবান বিভূতিসকল বর্ণনা করেছেন (১০।৪১) ; কেননা অর্জুন তাই জিজ্ঞাসা করেছিলেন (১০।১৭)। অতএব এই সমস্ত বিভূতি তাঁকে চিন্তা করবার জন্যই। এই বিভূতির মধ্যে বিলক্ষণতা দেখা যাক বা না যাক, একে জানা যাক বা না যাক, তাহলেও এতে ভগবানেরই স্মরণ হওয়া উচিত। এর তাৎপর্য হল যে, ভগবানের উদ্দেশ্য বিভূতি বর্ণনা করা নয়, তা হল তাঁকে চিন্তা করানো। চিন্তা করানোর উদ্দেশ্য এই যে— 'সাধক আমাকে তত্ত্বতঃ জানুক এবং আমাতে তার অবিচলিত ভক্তি হোক'।

এতাং বিভূতিং যোগঞ্চ মম যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
সোঽবিকম্পেন যোগেন যুজ্যতে নাত্র সংশয়ঃ॥

(গীতা ১০।৭)

বিভূতিসকলের দিব্যভাব

অর্জুন দশম অধ্যায়ে ষোড়শ শ্লোকে এবং ভগবান ঊনবিংশ তথা চল্লিশ সংখ্যক শ্লোকে নিজের বিভূতিকে 'দিব্য' বলে অভিহিত করেছেন। কারণ ভগবান দিব্যাতিদিব্য। সুতরাং যত বিভূতি আছে, সবই তত্ত্বতঃ দিব্য। কিন্তু সাধকের কাছে সেই বিভূতির দিব্যতা তখনই প্রকাশিত হয়, যখন সে সর্বতোভাবে ভোগবুদ্ধি পরিহার-পূর্বক ঐ বিভূতির দ্বারা শুধুমাত্র ভগবানকেই স্মরণ করে।

(২৩) গীতায় বিশ্বরূপ দর্শন

বিশ্বরূপং প্রভোর্দ্রষ্টুং কৃপাপাত্রৈর্হি শক্যতে।
যজ্ঞাদিসাধনৈঃ কোঽপি দ্রষ্টুং শক্তো ন তং ক্বচিৎ॥

ভগবান অর্জুনকে যে নিজ বিশ্বরূপ (বিরাটরূপ) দেখালেন, তা অর্জুনের কোন সাধনার ফল নয়। ভগবান নিজে বলেছেন যে, 'এইপ্রকার আমার বিশ্বরূপ বেদাধ্যয়ন, যজ্ঞানুষ্ঠান, দান, উগ্র-তপস্যা, তীর্থ, ব্রত ইত্যাদির দ্বারা দেখা যায় না' (১১।৪৮)। এই বিশ্বরূপ কেবল ভগবানই কৃপাপূর্বক নিজ সামর্থ্যে দিব্য দৃষ্টি দিয়ে দর্শন করাতে পারেন—'ময়া প্রসন্নেন---আত্মযোগাৎ' (১১।৪৭)। চতুর্ভুজ বিষ্ণুরূপ তো অনন্যভক্তির দ্বারা দর্শন করা যায় বলে ভগবান জানিয়েছেন (১১।৫৪), কিন্তু বিশ্বরূপ দর্শনের জন্য কোন সাধনের কথা তিনি বলেন নি, বলেছেন তাঁর কৃপাই একমাত্র সাধন। অর্জুনও নম্রভাবে ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানালেন, 'হে ভগবন্! যদি আপনি মনে করেন যে, আমার দ্বারা আপনার বিশ্বরূপ দেখা সম্ভব, তাহলে আপনি আপনার সেই রূপ দেখান' (১১।৪)। অর্জুনের এইরূপ আগ্রহ হওয়ায় ভগবান কৃপাপূর্বক অর্জুনকে তাঁর বিশ্বরূপ দেখালেন ; কারণ তিনি ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু।

ভগবান এর আগে কৃপা করে কৌশল্যা, যশোদা, উত্তঙ্ক, ভীষ্ম এদের যে বিশ্বরূপ দেখিয়েছিলেন তা অর্জুনের সম্মুখে প্রদর্শিত রূপের ন্যায় অত ভয়ঙ্কররূপ ছিল না। কারণ এই বিশ্বরূপ দেখে যুদ্ধবীর অর্জুনও ভীত হয়ে পড়েছিলেন এবং ভগবানও একথা স্বীকার করেছিলেন যে, 'অর্জুন, আমি তোমাকে যে বিশ্বরূপ দেখিয়েছি, এইরূপ আর কেউ কখনও দেখেনি' (১১।৪৭)। ভগবান অর্জুনকে যে বিশ্বরূপ দেখিয়েছেন তা এই দৃশ্যমান জগৎ নয়। এই বিশ্বসংসার ঐ বিশ্বরূপের আভাসমাত্র, একটি ঝলক। কারণ এই জগৎ নশ্বর ও জড়, দিব্য নয়। অপর পক্ষে বিশ্বরূপ দিব্য, অবিনাশী ও অনন্ত। ভগবান অর্জুনকে তাঁর বিশ্বরূপ দেখাতে থাকলে, কয়েকটি স্তর দেখার পর অর্জুন ভীত হয়ে প্রার্থনা করতে শুরু করলেন, আপনার এই অদৃষ্টপূর্ব বিশ্বরূপ দেখে আমি অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছি, কিন্তু আপনার অত্যন্ত উগ্র, এই ভয়ংকররূপ দেখে আমার মন ব্যথিত হয়েছে অর্থাৎ আমি অত্যন্ত ভীত হয়ে পড়েছি। সুতরাং আপনি চতুর্ভুজ রূপ ধারণ করুন (১১।৪৫-৪৬)। অর্জুন যদি ভীত হয়ে ভগবানকে চতুর্ভুজরূপ দেখাবার প্রার্থনা না জানাতেন, তাহলে না জানি তিনি আরও কি কি দেখাতেন, কী রূপ দেখাতেন এবং আরও কোন্‌রূপে অর্জুনের সামনে নিজেকে প্রকাশ করতেন!

সঞ্জয়ও বিশ্বরূপের প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে বলেছিলেন যে, 'হে রাজন্! ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেই অত্যন্ত অদ্ভুত বিশ্বরূপ স্মরণ করে আমি বার বার রোমাঞ্চিত হচ্ছি এবং অত্যন্ত বিস্মিত হচ্ছি (১৮।৭৭)'।

ভগবানের বিশ্বরূপ জ্ঞানদৃষ্টির বিষয় নয়, বরং দিব্যদৃষ্টির বিষয়। তত্ত্বজ্ঞ জীবন্মুক্ত মহাপুরুষও সাধককে জ্ঞানদৃষ্টি দিয়ে এই জগৎকে 'বাসুদেবঃ সর্বম্' রূপে দেখাতে সক্ষম হন, বোধ করাতে সক্ষম হন, কিন্তু ভগবানের বিশ্বরূপ দেখাতে সক্ষম হন না। অর্থাৎ কোন সাধু-মহাত্মাই সেই বিশ্বরূপ দেখতে বা দেখাতে সক্ষম নন। এই বিশ্বরূপ কেবলমাত্র ভগবান এবং ভগবানের দ্বারা অধিকারপ্রাপ্ত, ভগবৎকৃপাপ্রাপ্ত কারক-পুরুষই দিব্যদৃষ্টি সহায়ে দেখাতে পারেন। ভগবান যে জ্ঞানদৃষ্টির দ্বারা এই জগৎ সংসারকেই বিশ্বরূপ বলে অর্জুনকে দেখিয়েছিলেন—তা নয়। বরং তিনি অর্জুনকে দিব্যদৃষ্টি দিয়ে সাক্ষাৎ চক্ষু দ্বারাই এই রূপ দেখিয়েছিলেন। অর্জুন বিশ্বরূপ দেখাবার জন্য ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানালে ভগবান অর্জুনকে তাঁর বিশ্বরূপ দেখবার আদেশ দিলেন (১১।৫-৭)। কিন্তু অর্জুন কিছুই দেখতে না পাওয়ায় ভগবান বললেন, 'ভাই, তুমি তোমার এই চর্মচক্ষুদ্বারা আমার বিশ্বরূপ দর্শন করতে পারবে না, এজন্য তোমাকে দিব্যদৃষ্টি দিচ্ছি তার দ্বারা তুমি আমার এই রূপ দেখে নাও' (১১।৮)। দিব্যদৃষ্টি প্রাপ্ত হয়ে অর্জুন বিশ্বরূপ দর্শন করতে লাগলেন। অর্জুন বললেন, 'হে ভগবন্! আমি আপনার শরীরে সমস্ত দেবতাদের দেখতে পাচ্ছি'—

'পশ্যামি দেবাংস্তব দেব দেহে----' (১১।১৫)[১]। সঞ্জয়ও বলেছেন যে, অর্জুন 'দেবাদিদেব ভগবানের শরীরে বিশ্বরূপ দর্শন করেছেন'—'অপশ্যদ্দেবদেবস্য শরীরে পাণ্ডবস্তদা' (১১।১৩)। ভগবানও তাঁর শরীরে বিশ্বরূপ দেখবার আদেশ দিয়েছিলেন।

এর তাৎপর্য এই যে এইরূপ ঐশ্বর্যপূর্ণ দিব্য বিশ্বরূপ কোন সাধনবলে বা নিজ সামর্থ্যে মানুষ দেখতে পায় না অথবা কোন তত্ত্বজ্ঞ জীবন্মুক্ত মহাপুরুষও জ্ঞানদৃষ্টির দ্বারা দেখাতে পারেন না। কেবল ভগবৎকৃপা বলেই এরূপ দর্শন হওয়া সম্ভব।

(২৪) গীতায় সৃষ্টি-রচনা

সৃষ্টিশ্চতুর্বিধা প্রোক্তা স্বাদিসংকল্পজা প্রভোঃ।
ব্রহ্মজা চান্নজা তুর্যা ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞযোগজা॥

গীতায় সৃষ্টি রচনার বর্ণনা নিম্নোক্ত চার প্রকারে করা হয়েছে, যেমন—

১) **মহাসর্গ**—ব্রহ্মা এবং সমস্ত প্রাণিজগতের উৎপত্তি মহাসর্গেই হয়। এই মহাসর্গ ভগবানের সংকল্পে সৃষ্ট হয়। ভগবানের সংকল্প কেন হয় ? মহাপ্রলয়ে সমস্ত জীব নিজ নিজ কর্মের সংস্কারগুলি-সহ কারণ শরীর নিয়ে প্রকৃতিতে লীন হয়ে যায় এবং প্রকৃতি ঐ সমস্ত প্রাণী সহ ভগবানে লীন হয়ে যায়। প্রকৃতিতে লীন হওয়া এই প্রাণীদের কর্ম যখন পরিপক্ব হয়ে ফল দানের উপযুক্ত এবং উন্মুখ হয়ে ওঠে, তখন ভগবানের মধ্যে '**বহু স্যাং প্রজায়েয়**' (তৈত্তিরীয়োপনিষদ্ ২।৬) 'আমি একাকী বহু হয়ে যাব'—এই সংকল্প হয়। এরূপ সংকল্প হলেই ভগবান নিজ প্রকৃতিকে স্বীকার করে ব্রহ্মার[২] এবং সমস্ত জীবের শরীর এবং সকল লোকের সৃষ্টি করেন। এই রূপ রচনার পরিণতি প্রকৃতিতেই হয় অর্থাৎ সকল জীব-শরীর এই প্রকৃতি থেকেই নির্মিত হয়। এইজন্য ভগবান গীতায় দুটি কথা বলেছেন, 'আমি মহাসর্গের প্রারম্ভে প্রাণিসকলের শরীর প্রকৃতিকে স্বীকার করেই রচনা করি (৯।৭-৮) এবং প্রকৃতি যে প্রাণিসকলকে সৃষ্টি করে তা আমার অধীনেই অর্থাৎ আমার সত্তা থেকেই স্ফুরিত হয় (৯।১০)'।

মহাসর্গের বর্ণনা গীতায় অন্যস্থানে এইভাবে আছে—

চতুর্থ অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকে 'এই অবিনাশী যোগ প্রথমে (মহাসর্গের আদিতে) আমি সূর্যকে বলেছিলাম' এবং তৃতীয় শ্লোকে 'এই সেই পুরাতন (মহাসর্গের আদিতে বর্ণিত) যোগ আমি আজ তোমাকে জানালাম' এই বলে তিনি মহাসর্গের বর্ণনা করলেন।

চতুর্থ অধ্যায়েরই ত্রয়োদশ শ্লোকে ভগবানকর্তৃক গুণ ও কর্ম অনুযায়ী চারি বর্ণের রচনার কথা এসেছে, যেটি মহাসর্গের সময়।

অষ্টম অধ্যায়ের তৃতীয় শ্লোকে '**বিসর্গঃ কর্মসংজ্ঞিতঃ**' পদ দ্বারা ভগবানের সৃষ্টি রচনার জন্য সংকল্পকে 'বিসর্গঃ' বলা হয়েছে। যা মহাসর্গের সূচনাকারী।

দশম অধ্যায়ের ষষ্ঠ শ্লোকে 'চার সনকাদি, সাত মহর্ষি এবং চতুর্দশ মনু আমার মন থেকে উৎপন্ন, জগতের সকল প্রজা এঁদের থেকে উৎপন্ন'—এইপ্রকারে তিনি মহাসর্গের বর্ণনা করেছেন।

চতুর্দশ অধ্যায়ের তৃতীয়-চতুর্থ শ্লোকে প্রকৃতি বীজ ধারণ করার স্থান এবং ভগবান নিজে বীজ প্রদানকারী

---

[১]অর্জুন অন্যত্রও নিজ চক্ষু দ্বারা বিশ্বরূপ দর্শনের কথা বলেছেন ; যেমন—'পশ্যামি' (১১।১৬-১৭,১৯) ; 'দৃষ্ট্বা' (১১।২০, ২৩-২৪, ৪৫) ; 'দৃষ্ট্বৈব' (১১।২৫) ; 'সংদৃশ্যন্তে' (১১।২৭) ইত্যাদি।

[২]ভগবান কখনও স্বয়ং ব্রহ্মারূপে প্রকটিত হন আবার কখনও জীব নিজ পুণ্যকর্মের দ্বারা ব্রহ্মা-পদ প্রাপ্ত হন।

পিতা বলে মহাসর্গের বর্ণনা করেছেন।

সপ্তদশ অধ্যায়ের তেইশ সংখ্যক শ্লোকে যে পরমাত্মার ওঁ, তৎ এবং সৎ—এই তিনটি নাম সেই পরমাত্মাই সৃষ্টির আদিতে বেদ-ব্রাহ্মণ এবং যজ্ঞের রচনা করেছেন—এইরূপে মহাসর্গের বর্ণনা করা হয়েছে।

অষ্টাদশ অধ্যায়ের একচল্লিশ সংখ্যক শ্লোকে 'স্বভাবজাত গুণ অনুসারে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্রদিগের কর্মসকল পৃথকভাবে বিভক্ত করা হয়েছে'—এই বলে ভগবান মহাসর্গের বর্ণনা করেছেন।

২) **সর্গ**—ব্রহ্মার নিদ্রাকালে প্রলয়কাল হয় এবং জাগরণের সময় কল্প শুরু হয়। সর্গের সময় (কল্পের সময়) ব্রহ্মার সূক্ষ্ম-শরীর থেকে সমস্ত প্রাণীর উৎপত্তি হয়। তাৎপর্য এই যে প্রলয়কালে সমস্ত প্রাণী নিজ নিজ সূক্ষ্ম ও কারণ-শরীর সহ ব্রহ্মার সূক্ষ্ম-শরীরে লীন হয় এবং সর্গের শুরুতে পুনরায় ঐসকল সূক্ষ্ম এবং কারণ শরীর সহ ব্রহ্মার শরীর হতে উৎপন্ন হয় (৮।১৮-১৯)।

তৃতীয় অধ্যায়ের দশম শ্লোকে সর্গের বর্ণনা করা হয়েছে এইভাবে যে—'প্রজাপতি ব্রহ্মা সৃষ্টির আদিতে যজ্ঞের (কর্তব্য-কর্ম) সঙ্গে সঙ্গে প্রজাদি রচনা করেছিলেন।'

(মহাসর্গে ভগবান জীবকে কারণ শরীরের সহিত বিশেষ সম্বন্ধ করিয়ে দেন—এটিই ভগবানের দ্বারা প্রাণী সকলের রচনা এবং সর্গকালে ব্রহ্মা জীবকে সূক্ষ্ম-শরীরের সঙ্গে বিশেষ সম্বন্ধ ঘটিয়ে দেন—এটিই হল ব্রহ্মার দ্বারা প্রাণীদের সৃষ্টিকার্য করা।)

৩) **সৃষ্টিচক্র**—প্রথমে ব্রহ্মার মানস সৃষ্টি হয়। তারপর ব্রহ্মা হতে স্থূলরূপে স্ত্রী ও পুরুষের শরীর উৎপন্ন হয়। তারপর স্ত্রী-পুরুষ সংযোগে এই সৃষ্টি চলতে থাকে, তাই এর নাম সৃষ্টিচক্র। এই কথা গীতায় বলা হয়েছে যে অন্ন হতে অর্থাৎ স্ত্রী-পুরুষের রজ ও বীর্য থেকে সমস্ত প্রাণী জন্মগ্রহণ করে ; অন্ন বৃষ্টি হতে জন্মায় ; বৃষ্টি কর্তব্য-কর্মরূপ যজ্ঞ থেকে সৃষ্টি হয়। কর্তব্য-কর্মরূপ যজ্ঞের বিধান বেদ এবং বেদানুকূল শাস্ত্র থেকে পাওয়া যায় ; বেদ পরমাত্মা হতে প্রকটিত ; অতএব পরমাত্মাই সর্বগত অর্থাৎ সবের মূলে সেই পরমাত্মাই বিদ্যমান (গীতা ৩।১৪-১৫)। সৃষ্টি ভগবান থেকেই হোক বা ব্রহ্মা থেকে হোক বা অন্ন (রজ-বীর্য) থেকেই হোক অর্থাৎ সৃষ্টি মহাসর্গ, সর্গ বা সৃষ্টিচক্র থেকে যেভাবেই হোক না কেন—সকলেরই মূলে সেই এক পরমাত্মাই বিরাজিত। সুতরাং এই তিন সৃষ্টির তাৎপর্য সবের মূল সেই এক পরমাত্মাকেই লক্ষ্য করা।

৪) **ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ সংযোগ**—জীবের নিজ নিজ শরীরের সঙ্গে যে তাদাত্ম্য বোধ থাকে, তাকে 'ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞের সংযোগ' বলা হয়। একেই 'প্রকৃতি-পুরুষের সংযোগ' 'জড়-চেতনের সংযোগ' এবং 'অপরা-পরা প্রকৃতির সংযোগ' বলা হয়। জীবের স্থূল, সূক্ষ্ম এবং কারণ-শরীরের প্রতি যে 'আসক্তি' থাকে, তাকেই সংযোগ বলা হয়। এই সংযোগের জন্যই জীবের উৎপত্তি হয়, জন্ম-মরণ হয় (১৩।২১)। এর তাৎপর্য এই যে, এই সংযোগেই (আসক্তিই) জীবের মহাসর্গে কারণ-শরীরের সঙ্গে, সর্গে (কল্পের প্রারম্ভে) সূক্ষ্ম-শরীরের সঙ্গে এবং সৃষ্টিচক্রে মাতাপিতার শরীরের (রজ-বীর্যের) সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন হয়।

জীবের শরীরের সঙ্গে যে তাদাত্ম্য, রাগ (আসক্তি) থাকে তার বর্ণনা গীতার সপ্তম অধ্যায়ের ষষ্ঠ শ্লোকে এবং ত্রয়োদশ অধ্যায়ের একুশ সংখ্যক তথা ছাব্বিশ সংখ্যক শ্লোকে করা হয়েছে।

উপরিউক্ত মহাসর্গ, সর্গ, সৃষ্টিচক্র এবং ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ সংযোগ যাই হোক না কেন এই সবেতেই পরমাত্মার জীবের সঙ্গে এবং জীবের পরমাত্মার সঙ্গে অটুট অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক বর্তমান থাকে। শুধু শরীরের পরবশতার জন্য জীব বারংবার জন্ম-মৃত্যু চক্রে আবর্তিত হয়। এই পরবশতার জন্য সে নিজেই দায়ী। যদি এই পরবশবতা দূর করে সে পরমাত্মার সম্মুখীন হয়, তাহলে সে যে কোন পরিস্থিতিতেই পরমাত্মাকে লাভ করতে পারে।

(২৫) গীতায় জীবের গতি-বর্ণনা

জীবানাং গতয়ো বহ্ব্যো গীতয়া তু ত্রিধা মতা।
দ্বিধোর্ধ্বা হি দ্বিধা চাধো মধ্যমৈকেতি পঞ্চধা॥

ভগবান গীতায় মুখ্যভাবে জীবের তিনটি গতির বর্ণনা করেছেন—ঊর্ধ্বগতি, অধোগতি ও মধ্যগতি। যেমন—সত্ত্বগুণের তাৎকালিক বৃত্তি বৃদ্ধির সময়ে মৃত এবং সত্ত্বগুণে স্থিত মানুষ ঊর্ধ্বমার্গে গমন করে (১৪।১৪, ১৮)। তমোগুণের তাৎকালিক বৃত্তি বৃদ্ধির সময়ে মৃত এবং তমোগুণে স্থিত মানুষ অধোগতি প্রাপ্ত হয় (১৪।১৫, ১৮)। রজোগুণের তাৎকালিক বৃত্তি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত সময়ে মৃত এবং রজোগুণে স্থিত মানুষ মধ্যগতি লাভ করে (১৪।১৫, ১৮)। এই তিনের বিস্তারিত বর্ণনা এইপ্রকার—

ঊর্ধ্বগতি

দুই প্রকারের জীব ঊর্ধ্বগতি প্রাপ্ত হয়—

১) **ফিরে না আসা ব্যক্তি**—ক) যে জীব শুক্লমার্গে ব্রহ্মলোকে গমন করে, সে সেখানেই থাকে এবং মহাপ্রলয়কালে ব্রহ্মার সঙ্গে ভগবানে লীন হয় অর্থাৎ মুক্ত হয়ে যায় (৮।২৪)।

খ) যে তত্ত্বজ্ঞ জীবন্মুক্ত হয়ে যায়, সে এখানেই তত্ত্বে লীন হয়ে যায়, তার প্রাণের উৎক্রমণ হয় না (৫।১৯, ২৪-২৬)।

গ) যে ভগবানের ভক্ত, সে ভগবানের পরমধামে গমন করে। (৮।২১, ১৫।৬)।

ঘ) ভগবান দুষ্টের দমনের জন্য অবতাররূপ গ্রহণ করেন (৪।৮)। এইসব দুর্বৃত্ত যখন ভগবানের হাতে হত হয়, সেখানেই তারা ভগবানে লীন হয়ে যান ; কারণ, তাঁদের সম্মুখে ভগবান থাকেন এবং পাপী ব্যক্তি তাঁকে চিন্তা করতে করতেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ভগবানের এই নিয়ম যে, যে ব্যক্তি মৃত্যুকালে তাঁকে স্মরণ করে শরীর ত্যাগ করবে, সে নিঃসন্দেহে তাঁকেই প্রাপ্ত হবে (৮।৫)।

২) **যারা ফিরে আসে**—(ক) যারা স্বর্গাদি সুখপ্রাপ্তির উদ্দেশ্যে সকাম কর্ম করে, তারা নিজ পুণ্যফলস্বরূপ কৃষ্ণমার্গ দ্বারা স্বর্গাদিলোকে গমন করে এবং নিজ নিজ পুণ্য অনুসারে সুখভোগ করে। পুণ্যভোগ সমাপ্ত হলে তারা পুনরায় মৃত্যুলোকে জন্মগ্রহণ করে (৮।২৫, ৯।২১)।

খ) যে পরমাত্ম-প্রাপ্তির সাধনায় রত, অথচ যার সাংসারিক বাসনা এখনো পুরোপুরি মেটেনি, সে অন্তিম সময়ে কোন বাসনার কারণে নিজের সাধনা থেকে বিচলিত হওয়ায় স্বর্গাদি উচ্চলোকে গমন করে। এইরূপ যোগভ্রষ্ট ব্যক্তি বহুদিন পর্যন্ত স্বর্গাদিলোকে বসবাস করে। যখন সেখানকার ভোগে তার অরুচি জন্মায়, তখন সে আবার জগৎ-সংসারে ফিরে আসে এবং শুদ্ধ শ্রীমান ধনীর গৃহে জন্মগ্রহণ করে (৬।৪১)।

অধোগতি

দুই প্রকারের জীব অধোগতি প্রাপ্ত হয়—

১) **যারা চুরাশী লক্ষ যোনি প্রাপ্ত হয়**—জীব নিজ পাপ কর্ম অনুযায়ী পশু-পক্ষী, কীট-পতঙ্গাদি নীচ জন্ম প্রাপ্ত হয় এবং সেখানে নিরন্তর সেই জন্ম-জনিত যন্ত্রণা ভোগ করে (১৬।১৯)[1]।

২) **নরকে গমনকারী**—জীব নিজ পাপকর্ম অনুযায়ী রৌরব, কুম্ভীপাক ইত্যাদি ভয়ঙ্কর নরকে গমন করে এবং সেখানে ভয়ঙ্কর নরক যন্ত্রণা ভুগতে থাকে (১৬।১৬)।

---

[1]ভগবান যোগভ্রষ্টের কথায় বলেছেন, এরা বহুদিন স্বর্গে বাস করে—'শাশ্বতীঃ সমাঃ' (৬।৪১) আর পাপীদের জন্য জানিয়েছেন, 'আমি তাদের নিরন্তর নীচ জন্মে অর্থাৎ (আসুরী যোনিতে) নিক্ষেপ করি' অর্থাৎ এরা নীচ জন্মেই নিরন্তর থাকে—'অজস্রম্' (১৬।১৯)। এর তাৎপর্য এই যে যোগভ্রষ্ট ব্যক্তি একই স্থানে বহুদিন অবস্থান করে, কিন্তু পাপকর্মকারিগণের জন্ম-জন্মান্তর ধরে আসুরী জন্ম হতে থাকে।

মধ্যগতি[১]

ছয় প্রকারের জীব মধ্যগতিতে গমন করে—

১) **স্বর্গাদি লোক হতে ফিরে আসা প্রাণী**—যারা সুখভোগের উদ্দেশ্যে স্বর্গাদি লোকে গমন করে, তারা স্বর্গ-প্রাপক পুণ্য ক্ষীণ হলে এই মধ্যলোকে বা মনুষ্যলোকে জন্মগ্রহণ করে। এই সব ব্যক্তির প্রবৃত্তি (আচরণ) প্রায়শঃই শুদ্ধ হয়, তারই জন্য তারা পুনরায় শুভকর্ম করে স্বর্গাদি লোকে গমন করে এবং সেখানে সুখ ভোগ করে পুণ্য ক্ষয় হলে পুনরায় এই মর্ত্যলোকে জন্ম নেয় ; এইরূপ এরা বারংবার আসা যাওয়া করতে থাকে (৯।২১)। এদের মধ্যে যদি কারো সংসারে বৈরাগ্য হয়, তবে সে তত্ত্বজ্ঞান প্রাপ্ত হয়ে মুক্ত হয়ে যায় এবং কারো যদি ভগবানে ভক্তি জন্মায়, তবে সেও সংসার-বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে ভগবদ্ধামে গমন করে।

২) **যোগভ্রষ্ট**—সাংসারিক বাসনাযুক্ত যোগভ্রষ্ট মানুষ স্বর্গাদি লোকে গিয়ে মর্ত্যলোকে শুদ্ধ শ্রীমানের ঘরে জন্ম নেন এবং সাংসারিক বাসনা থেকে মুক্ত যোগভ্রষ্ট মানুষ স্বর্গাদিতে না গিয়ে সোজা যোগিকুলে জন্মগ্রহণ করেন। যে যোগভ্রষ্ট মানুষ শ্রীমানের ঘরে জন্মগ্রহণ করেন, তিনি ভোগের সূক্ষ্ম বাসনার জন্য এবং শুদ্ধ-সম্পন্ন ঘরে ভোগ-বাহুল্যের জন্য ভোগে আসক্ত হয়ে পড়েন। আসক্ত হলেও তাঁর পূর্বের মনুষ্যজন্মের সাধনা তাঁকে পুনরায় পারমার্থিক পথে আকর্ষিত করে এবং তিনি আবার তৎপরতার সঙ্গে পুনঃ নিজ সাধনে নিয়োজিত হয়ে পরমগতি প্রাপ্ত হন (৬।৪৪-৪৫)। যে যোগভ্রষ্ট ব্যক্তি যোগী (তত্ত্বজ্ঞ জীবন্মুক্ত) ভক্তের ঘরে জন্মগ্রহণ করেন, সেই স্থানের পারমার্থিক পরিবেশ, শিক্ষা ইত্যাদির দ্বারা অতি বাল্যকাল থেকেই তিনি সাধনা শুরু করে দেন তথা তাঁর পূর্বজন্মের সাধনার সুফলও স্বাভাবিকভাবে প্রাপ্ত হয়ে তিনি পুনরায় সাধনায় তৎপর হয়ে পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হন (৬।৪৩)।

৩) **পশু-পক্ষী ইত্যাদি প্রাণী এবং ৪) নরক হতে আসা প্রাণী**—

পশু-পক্ষীর যোনিপ্রাপ্ত তথা নরকের প্রাণীরাও কখনও ভগবানের অহৈতুকী কৃপায় আবার মনুষ্য-জন্ম প্রাপ্ত হয়। তাদের ভগবান সমস্ত জন্মের শেষ জন্ম এই মনুষ্য-শরীর প্রদান করে পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য দেন যাতে তারা তাদের ইচ্ছানুযায়ী কর্ম করতে পারে এবং যেখানে খুশী যেতে পারে। তাৎপর্য এই যে, তারা সকামভাবে শুভকর্ম করে স্বর্গাদিলোকে যেতে পারে (২।৪২-৪৩ ; ৭।২০-২২ ; ৯।২০) অথবা অশুভ (পাপ) কর্ম করে চুরাশী লক্ষ জন্ম তথা নরকে যেতে পারে (১৬।১৬, ১৯-২০) অথবা বিচার বিবেচনা দ্বারা জড়তা থেকে সম্পর্ক বিচ্ছেদ করে মুক্ত হতে পারে (১৩।৩৪) অথবা নিষ্কামভাবে নিজ কর্তব্যপালন করে পরমাত্মতত্ত্ব প্রাপ্ত হতে পারে (২।৫১ ; ৫।১২) অথবা ভগবানের শরণাগত হয়ে ভগবানকে প্রাপ্ত হতে পারে (১৮।৫৬)। কেবল তাই নয়, ভগবান স্বয়ং তাদের সংসার-সাগর উদ্ধারকারী হয়ে থাকেন (১২।৭)।[২] এর তাৎপর্য এই যে সেখানে

---

[১]এখানে মধ্যগতিকে শেষে দেওয়ার তাৎপর্য এই যে, সকল গতির মূল কারণ হল মধ্যগতি। কারণ ঊর্ধ্বগতি ও অধোগতি প্রাপ্ত মানুষকে মধ্যগতিতে আসতে হয় এবং সে মধ্যগতি থেকে ঊর্ধ্ব বা অধোগতিতে যাত্রা করে। এখানে প্রথমেই মধ্যগতির বর্ণনা করা হলে (ঊর্ধ্বগতি ও অধোগতির বর্ণনা না থাকায়) তার স্পষ্ট বোধ হত না।

[২](ক) ভগবান কৃপা করে জীবকে শুভকর্মের ফল ভোগ করিয়ে, শুদ্ধ করে কোলে তুলে নেবার জন্য স্বর্গাদি রচনা করেছেন ; অশুভ-কর্মের ফল ভোগ করিয়ে শুদ্ধ করে নিজ ক্রোড়ে নেবার জন্য চুরাশী লক্ষ জন্ম এবং নরক সৃষ্টি করেছেন ও অনুকূল ও প্রতিকূলতার দ্বারা শুভ-অশুভ কর্মের অবসানে নিজের কোলে তুলে নেওয়ার জন্য মনুষ্যজন্ম সৃষ্টি করেছেন। মনুষ্য-জন্মে ভগবান জীবকে তাঁকে প্রাপ্তির ও জন্ম-মরণ চক্র থেকে মুক্ত হবার পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছেন। মনুষ্যজন্মে মানুষ জীবদ্দশায় ভগবানকে প্রাপ্ত হতে পারে। তাতেও না হলে মৃত্যু সময়েও যদি স্মরণ করে, তাহলেও তাঁকে পায় (৮।৫)।

(খ) এই মনুষ্যলোকে জীব যেখানেই জন্মগ্রহণ করুক তা প্রায়শই 'ঋণানুবন্ধ' (নেওয়া-দেওয়া সম্পর্ক) থেকেই হয়। তাৎপর্য এই যে, কারুর কাছ থেকে নেওয়ার এবং কাউকে দেওয়ার জন্য, পরস্পরের এই সম্পর্কের জন্যই জীবের জন্ম। মানুষ কেবল অপরের হিতের জন্য কর্তব্য-কর্ম করে শুভ-অশুভ থেকে অর্থাৎ ঋণানুবন্ধ থেকে মুক্ত হতে পারে (৪।২৩) অথবা সৎ-অসতের বিবেকবোধ দ্বারা নিজ স্বরূপে স্থিত হয়ে সমস্ত পাপ থেকে অর্থাৎ ঋণানুবন্ধ থেকে মুক্ত হতে পারে (৪।৩৬) অথবা ভগবানের শরণাগত হয়ে সমস্ত পাপ থেকে বা ঋণানুবন্ধ থেকে মুক্ত হতে পারে (১৮।৬৬)। একমাত্র মানুষই পারে এই ঋণানুবন্ধ থেকে মুক্ত হতে ; অন্য প্রাণী নয়। কারণ তাদের এই যোগ্যতা বা অধিকার থাকে না ; মানুষ এদের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা, কারণ সে স্বাধীন ও সমর্থ।

সুখ ভোগ করে পুণ্য ক্ষয় হলে পুনরায় তারা সকলেই নিজের উদ্ধার বা পতন ঘটাতে স্বতন্ত্র, তারা কারো অধীন নয়।

৫) **ভগবৎপ্রাপ্ত মহাপুরুষ**—যেসব জীবের ভগবৎ-প্রাপ্তি ঘটেছে বা যাঁদের ভগবানের ধামে প্রবেশ হয়েছে, তাঁরাও ভগবদ্ ইচ্ছায় অন্যান্য জীবের উদ্ধারের জন্য কারক-পুরুষের রূপ পরিগ্রহ করে মনুষ্যজন্ম গ্রহণ করেন। তাঁদের মনুষ্যজন্ম কর্ম-পরবশ নয়। তাঁরা শ্রেষ্ঠ আচরণের দ্বারা মানুষকে সেই কর্মে অনুপ্রেরিত করেন অথবা নিজ অমৃতময় বচন দ্বারা লোককে সঠিক পথ দেখিয়ে দেন (৩।২১)। এই প্রকারে নিজেদের কার্য সম্পূর্ণ করে তাঁরা পুনরায় ভগবানের কাছে ফিরে যান।

৬) **ভগবানের নিত্য পরিকর (পার্ষদ)**—ভগবান যেসব যখন সাধুদের রক্ষা, দুষ্টের বিনাশ এবং ধর্মের স্থাপনা করার জন্য মনুষ্যলোকে আসেন (৪।৮), তখন ভগবদ্ভাবে থাকা ভগবানের নিত্য পরিকর (পার্ষদ)ও ভগবানের সঙ্গে সখা ইত্যাদিরূপে মনুষ্যলোকে আসেন। তাঁরা এখানে ভগবানের সঙ্গেই বাস করেন, খাওয়া-দাওয়া, ক্রীড়া ইত্যাদিতে তাঁকে সুখ-আনন্দ দেন। ভগবান যখন নিজ অবতারলীলা সমাপ্ত করে অন্তর্ধান করেন, তখন তাঁর পার্ষদগণও একে একে শরীর ত্যাগ করে তাঁর সঙ্গেই ভগবদ্ধামে চলে যান।

(২৬) গীতায় মানুষের শ্রেণী বিভাগ

স্থিতিভাবানুসারেণ বিভিন্নাঃ সন্তি মানবাঃ।
তেষু ভবন্তি তে ধন্যাঃ প্রাপ্তিং কুর্বন্তি যে হরেঃ॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা পাঠ ও মনন করলে দেখা যায় যে, মানুষের যেমন স্থিতি, ভাব, মান্যতা, আচরণ ইত্যাদি থাকে, সেই অনুসারে তাদের পৃথক পৃথক শ্রেণী হয় অর্থাৎ মনুষ্যজাতিরূপে এক হলেও স্থিতি, ভাব, সাধন-পদ্ধতি ইত্যাদি অনুযায়ী তাদের মধ্যে বিভিন্ন ভাগ হয়ে যায়; যেমন—

ভগবান পূর্বজন্মের গুণ ও কর্ম অনুসারে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র—এই চার বর্ণের রচনা করেছেন এবং সমস্ত মনুষ্যজাতিকে এই চার বর্ণের অন্তর্গত বলে মানা হয়েছে (৪।১৩) তথা স্বভাব হতে উৎপন্ন গুণানুসারে চারি বর্ণের লোকের জন্য কর্মের বিভাগ করেছেন (১৮।৪১-৪৪)। ঐসব ব্যক্তির মধ্যে যারা নিজ কল্যাণের জন্য ভগবানের আশ্রয় গ্রহণ করে, তাদের আচরণ অনুযায়ী ভগবান নিজ ভক্তির সাত প্রকার অধিকারীর কথা বলেছেন,—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, স্ত্রী, পাপযোনি এবং দুরাচারী (৯।৩০-৩৩)। এই সাত প্রকার অধিকারীই যে যে ভাবে ভগবানের ভজনা করেন, সেই ভাবগুলিকে চার ভাগে বিভক্ত করে ভগবান ভক্তদের চারটি শ্রেণীর কথা বলেছেন—অর্থার্থী, আর্ত, জিজ্ঞাসু ও জ্ঞানী অর্থাৎ প্রেমী (৭।১৬)। ধন-সম্পত্তি, পদ-অধিকার, জমি-জায়গা, ইত্যাদি সাংসারিক বৈভবের জন্য যারা ভগবানের ভজনা করে, তারা হল 'অর্থার্থী' ভক্ত। সাংসারিক দুঃখ দূর করার নিমিত্ত যারা আর্তভাবে ভগবানকে ডাকে, তারা হচ্ছে 'আর্ত' ভক্ত। যারা নিজ স্বরূপকে, পরমাত্মাকে জানবার জন্য ভগবানের ভজনা করে তারা 'জিজ্ঞাসু' ভক্ত। যারা কেবল ভগবানে প্রেম করতে চায়, তাঁকে সুখ দিতে চায়, তাঁর সেবা করতে চায়, তারা হচ্ছে জ্ঞানী (প্রেমী) ভক্ত। এই চারপ্রকার ভক্তকে ভগবান উদার বলেছেন; কারণ এরা যা কিছু চায় তা ভগবানের কাছ থেকেই চায়, জগতের অন্য কারো থেকে নয়। জ্ঞানী অর্থাৎ প্রেমী ভক্তদের ভগবান নিজ আত্মা-স্বরূপ বলে জানিয়েছেন। কারণ তাঁদের ভগবানের

কাছে কোন চাহিদা থাকে না (৭।১৮)। এই প্রেমী ভক্তকে ভগবান দুর্লভ বলে বর্ণনা করেছেন—'স মহাত্মা সুদুর্লভঃ' (৭।১৯) এবং সর্বশ্রেষ্ঠ বলে বর্ণনা করেছেন—'স মে যুক্ততমো মতঃ' (৬।৪৭)। এরূপ সিদ্ধ-ভক্ত রাগ-দ্বেষ, হর্ষ-শোক ইত্যাদি বিকার-রহিত, অহংকার ও মমতা-বর্জিত এবং শত্রু-মিত্র, মান-অপমান, সুখ-দুঃখ ইত্যাদিতে সমাহিতচিত্ত হয় (১২।১৩-১৯)।

জ্ঞানযোগী সাধক সৎ-অসৎ জ্ঞান (বিবেক) দ্বারা আত্মজ্ঞান প্রার্থনা করেন (২।১১-৩০ ; ১৩।১৯-৩৪) এবং একেই নিজ পুরুষার্থ বলে মনে করেন।

সিদ্ধ জ্ঞানযোগী সত্ত্ব, রজঃ এবং তমঃ এই তিনগুণের বৃত্তি বৃদ্ধি পেলেও রাগ বা দ্বেষ করেন না। গুণই নিজের নিজের গুণে বর্তিত হচ্ছে অর্থাৎ সম্পূর্ণ ক্রিয়া গুণের দ্বারাই হয়—এইরূপ মনে করে তিনি নিজ স্বরূপে স্থিত থাকেন। তিনি সর্বক্ষণই সুখে অথবা দুঃখে সমভাবে বিরাজ করেন। তথা তাঁর ওপর নিন্দা-স্তুতি বা মান-অপমানের কোন প্রভাব পড়ে না (১৪।২২-২৫)।

কর্মযোগী সাধক কেবল লোকসংগ্রহের জন্য, কর্তব্য পরম্পরা সুরক্ষিত রাখবার জন্য নিষ্কামভাবে তৎপরতার সঙ্গে নিজ কর্তব্য পালন করেন। অর্থাৎ নিজের জন্য কর্ম না করে অপরের হিতের জন্যই সমস্ত কর্ম করেন (৩।৯)।

সিদ্ধ কর্মযোগী নিজ স্বরূপেই আনন্দিত, তৃপ্ত ও সন্তুষ্ট থাকেন। তাঁর কর্মেও আসক্তি থাকে না, অকর্মেও আসক্তি থাকে না। তাঁর কোন প্রাণীর সঙ্গে স্বার্থের সম্বন্ধ থাকে না (৩।১৭-১৮) এবং সমস্ত পদার্থ, প্রাণী ইত্যাদির ওপর সমবুদ্ধি থাকে (৬।৮-৯)।

ধ্যানযোগী সাধক ইন্দ্রিয় সংযম করে একান্তে বাস করে সগুণ-সাকার, নিজ স্বরূপ অথবা নির্গুণ-নিরাকারের ধ্যানে নিরত থাকেন (৬।১০-২৮)।

সগুণ-সাকারের ধ্যানে সিদ্ধ যোগী 'সবকিছুই' ভগবান এবং ভগবানই সবেতে এইরূপ অনুভব করেন। কাজেই তিনি কর্ম করলেও সর্বক্ষণ ভগবানেই স্থিত থাকেন (৬।৩০-৩১)। নিজ স্বরূপের ধ্যানে সিদ্ধ হওয়া ধ্যানযোগী নিজেকে সমস্ত প্রাণীতে এবং সমস্ত প্রাণীকে নিজের মধ্যে দেখেন, অতএব তিনি সর্বত্র সমবুদ্ধিসম্পন্ন হন (৬।২৯)। নির্গুণ-নিরাকারের ধ্যানে সিদ্ধ হওয়া ধ্যানযোগী নিজ শরীরের উপমাতে সমস্ত প্রাণী তথা তাদের সুখ-দুঃখকে নিজের বলে বোধ করেন (৬।৩২)। এর তাৎপর্য এই যে, সাধারণ মানুষ যেমন স্বভাবতঃ নিজ শারীরিক কষ্ট দূর করে সুখী থাকার স্বাভাবিক চেষ্টা করে, তেমনি ঐ সমস্ত জ্ঞানী মহাপুরুষদের অপরের দুঃখ দূর করে তাদের সুখী করার স্বাভাবিক চেষ্টা হয়ে থাকে।

জ্ঞানযোগী, কর্মযোগী, ধ্যানযোগী প্রমুখ সাধকদের অন্তিমকালে যদি কোন কারণবশতঃ নিজ সাধনে মন স্থিত না থাকে, তাঁরা নিজ সাধন পথ থেকে বিচলিত হয়ে পড়েন, তবে তাঁরা যোগভ্রষ্ট হন। এইরূপ যোগভ্রষ্ট দুই প্রকারের হয়—সাংসারিক বাসনামুক্ত এবং সাংসারিক বাসনাযুক্ত। সাধন করার সময় যাঁর সাংসারিক বাসনা দূর হয়, সেই সাধক অন্তিম সময়ে কোন বিশেষ কারণে নিজ সাধন থেকে যদি বিচলিত হয়ে পড়েন, তাহলে তিনি স্বর্গাদি উচ্চলোকে না গিয়ে সরাসরি জ্ঞানবান যোগিকুলে জন্মগ্রহণ করেন এবং সেখানে পুনরায় তৎপরতার সঙ্গে সাধন-ভজন করে সিদ্ধিলাভ করেন (৬।৪২-৪৩)। কিন্তু সাধনাবস্থাতেও যাঁর সাংসারিক ভোগ-বাসনা একেবারে মেটে না, সেই সাধক যদি অন্তিম সময়ে কোন বাসনাদির কারণে নিজ সাধন পথ হতে বিচলিত হন, তবে তাঁর স্বর্গাদি প্রাপ্তি ঘটে। সেখানে বহু বছর থাকার পর পুনরায় তিনি শুদ্ধ শ্রীমৎকুলে জন্মগ্রহণ করেন। সেখানে ভোগবহুলতা থাকায় ভোগ পরবশ হওয়া সত্ত্বেও পূর্ব জন্মের করা সাধন তাঁকে পারমার্থিক পথে আকর্ষিত করে এবং তিনি একাগ্র চিত্তে সাধনায় পরম গতি প্রাপ্ত হন (৬।৪১, ৪৪-৪৫)।

যাঁদের ভগবানের ওপর, পারমার্থিক সাধনের ওপর শ্রদ্ধা বা বিশ্বাস নেই কিন্তু শাস্ত্রোক্ত, বেদোক্ত সকাম অনুষ্ঠানের ওপর শ্রদ্ধা-বিশ্বাস আছে, তাঁরা দেবতাদের পূজা করেন এবং মৃত্যুর পর নিজ নিজ শুভকর্ম অনুযায়ী

স্বর্গাদিলোকে গিয়ে সেখানকার সুখাদি ভোগ করে পুণ্য সমাপ্ত হলে পুনরায় মৃত্যুলোকে ফিরে আসেন (৮।২৫ ; ৯।২০-২১)।

যারা কেবলমাত্র সাংসারিক কাজে লেগে থাকে এবং পশুদের মতো নির্বোধ জীবনযাপন করে সেইসব মানুষদের ভগবান 'পশু' বলে অভিহিত করেছেন (৫।১৫)।

যাদের ভগবানে শ্রদ্ধা নেই, শাস্ত্রে শ্রদ্ধা নেই, ধর্মে শ্রদ্ধা নেই, সকাম অনুষ্ঠানগুলিতে শ্রদ্ধা নেই, বা পরলোকেও শ্রদ্ধা নেই, এইরূপ ব্যক্তিরা কেবল নিজ ভোগসুখ নিয়েই লিপ্ত থাকে, তারা মিথ্যা, কপটাচরণ, কপটতা, চুরি-ডাকাতি, অন্যায়-অত্যাচার, ইত্যাদি দ্বারা জীবন নির্বাহ করে ; ফলে এরা চুরাশী লক্ষযোনি এবং নরকভোগ করে (১৬।৭-২০)। স্বভাবের ভিন্নতার জন্য এইসব মানুষ তিন শ্রেণীর হয়—আসুরী, রাক্ষসী এবং মোহিনী (৯।১২)। যারা কেবল খাওয়া-দাওয়া, সুখ-আরাম, খেলাধূলা, সংগ্রহ করা, ভোগ-বিলাস ইত্যাদিতে লেগে থাকে, তাদের 'আসুরী' শ্রেণীর বলা হয়। যারা নিজ স্বার্থের জন্য ক্রোধপূর্বক অন্যকে দুঃখ দেয়, খুন ডাকাতি করে, পশু-পক্ষী হত্যা করে খায়, তারা 'রাক্ষসী' শ্রেণীভুক্ত। যারা বিনা কারণে অপরকে দুঃখ দেয়, শায়িত কুকুরকে পাথর বা লাঠির আঘাতে প্রহার করে আনন্দ পায়, নদীতে পাথর ফেলে আনন্দ পায়, পশুদের মত চিৎকার করে, তাদের 'মোহিনী' শ্রেণীভুক্ত বলা যায়। এই তিন শ্রেণীতেই এক একটি বিষয় প্রাধান্য পায় ; যেমন আসুরী শ্রেণীতে স্বার্থের প্রাধান্য থাকে এবং তার সঙ্গে ক্রোধ ও মূঢ়তাও থাকে। রাক্ষসী শ্রেণীতে ক্রোধের প্রাধান্য দেখা যায় কিন্তু তার সঙ্গে স্বার্থ ও মূঢ়তাও থাকে। মোহিনী শ্রেণীতে মূঢ়তার প্রাধান্য থাকে এবং সঙ্গে স্বার্থ, ক্রোধও থাকে। এইরূপ তিনটি শ্রেণীতে তিনপ্রকার বিষয় থাকলেও এক একটি বিষয়ের প্রাধান্য থেকে যায়। যেমন—

ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য লোভে পড়ে সরকারী কর্মচারী দেশের, চাকর মালিকের এবং সমাজের অনেক ক্ষতি করে থাকে—এইগুলি হল 'আসুরীতে রাক্ষসী'। সমাজ-কুটুম্বাদির কত ক্ষতি হচ্ছে, সেদিকে যাদের খেয়াল যায় না—তাদের 'আসুরীতে মোহিনী' বলা হয়।

ভোগ-বিলাস এবং টাকা পয়সা জমানো—একে বলা হয় 'রাক্ষসীতে আসুরী'। ভোগে, সংগ্রহে, রাজকীয় আরামে মানুষ এত তন্ময় হয়ে যায় যে, তার দেশের কি অবস্থা হবে, মৃত্যুর পরই বা গতি কি হবে সেদিকে তার দৃষ্টি থাকে না—এরা হল 'রাক্ষসীতে মোহিনী-বৃত্তি'।

রাজকীয় আরাম, ভোগ সংগ্রহ করার ইচ্ছা পোষণ করা—এগুলিকে 'মোহিনীতে আসুরী' বলা হয়, এবং নির্দয়ভাবে অপরের ক্ষতি করা—একে মোহিনীতে রাক্ষসী বলা হয়।

ভগবান মানুষকে এত অধিকার দিয়েছেন, বিবেক দিয়েছেন যার দ্বারা সে প্রাণী মাত্রেরই সেবা করতে পারে, নিজের ও অপরের কল্যাণ করতে পারে, সকলকে শান্তি দান করতে পারে, সবার পূজনীয় হতে পারে আবার ভগবানকেও নিজের সেবকে পরিণত করতে পারে ; কিন্তু সে কামনা পরবশ জন্ম-মৃত্যু চক্রে আবর্তিত হয়, মিথ্যা, কপটতা, বিশ্বাসঘাতকতা, প্রতারণা, অন্যায় ইত্যাদি করে পশু-পক্ষী ইত্যাদি নীচ জন্ম পায় ও নরক গমন করে—এ অত্যন্ত দুঃখের কথা। সুতরাং মনুষ্যজন্ম পেয়ে পরমাত্মতত্ত্ব অনুভব করে নেওয়া উচিত, ভগবৎপ্রেম ও ভগবদ্ দর্শন করে নেওয়া কর্তব্য, এতেই মনুষ্যজন্মের সার্থকতা।

(২৭) গীতায় শ্রদ্ধা

শ্রদ্ধা দ্বিধা শ্রীহরিগীতগীতে দৈবী প্রসঙ্গেন মতাঽসুরী চ।
দৈবী সদা সত্ত্বগুণেন যুক্তা রজস্তমোভ্যামপরা নিবোধ্যা॥

ভগবান গীতায় শ্রদ্ধাকে মানুষমাত্রেরই সাক্ষাৎ স্বরূপ বলে জানিয়েছেন—'যো যচ্ছ্রদ্ধঃ স এব সঃ' (১৭।৩) অর্থাৎ যে যেরূপ শ্রদ্ধাযুক্ত সে সেইরূপই হয়।

ইন্দ্রিয় দ্বারা, অন্তঃকরণ দ্বারা যে বিষয়ের জ্ঞান হয় না, সেই বিষয়ে সাদরভাবযুক্ত যে দৃঢ় বিশ্বাস থাকে তাকে 'শ্রদ্ধা' বলা হয়। শ্রদ্ধার দুটি ভাগ আছে—দৈবী এবং আসুরী। যে শ্রদ্ধা দ্বারা অর্থাৎ যাতে শ্রদ্ধা করলে মানুষের কল্যাণ হয়, তত্ত্ব প্রাপ্তি হয়, ভগবদ্ দর্শন হয়, তাকে 'দৈবী' শ্রদ্ধা বলা হয় এবং যে শ্রদ্ধায় অর্থাৎ যাতে শ্রদ্ধা করলে বন্ধন হয়, অধোগতি হয়, সেই শ্রদ্ধাকে 'আসুরী' বলে অভিহিত করা হয়। এই দুই বিভাগকে সাত্ত্বিক এবং রাজসিক-তামসিক রূপেও বলা হয়েছে অর্থাৎ দৈবী শ্রদ্ধাকে সাত্ত্বিক এবং আসুরী শ্রদ্ধাকে রাজসিক-তামসিক রূপে বর্ণনা করা হয়েছে।

ভগবান এবং তাঁর নির্দেশে, মহাপুরুষ এবং তাঁদের বচনে, গ্রন্থে এবং শাস্ত্রীয় শুভকর্মে এবং সাত্ত্বিক তপাদি কর্মে শ্রদ্ধা করাকে দৈবী বা সাত্ত্বিক শ্রদ্ধা বলা হয়। দেবতাগণে, সকাম অনুষ্ঠানে, যক্ষ-রাক্ষসে, ভূত-প্রেতাদিতে শ্রদ্ধাকে আসুরী (রাজসিক-তামসিক) শ্রদ্ধা বলা হয়েছে। গীতায় এসবের বর্ণনা এইপ্রকারে করা হয়েছে—

দৈবী শ্রদ্ধা

১) **ভগবান এবং তাঁর মতে শ্রদ্ধা**—'সমস্ত যোগীর মধ্যে যে ভক্ত শ্রদ্ধাবান হয়ে আমার ভজনা করে, আমার মতে সেই সর্বশ্রেষ্ঠ যোগী' (৬।৪৭)। 'নিত্য নিরন্তর আমাতে নিবিষ্টচিত্ত হয়ে যে ভক্ত পরম শ্রদ্ধা সহকারে আমার উপাসনা করে, আমার মতে সেই সর্বশ্রেষ্ঠ' (১২।২)। 'আমাতে শ্রদ্ধাবান হয়ে ও মৎপরায়ণ হয়ে যে ভক্ত এই অমৃততুল্য ধর্মের অনুষ্ঠান রুচিপূর্বক করে, সে আমার অতীব প্রিয়' (১২।২০)। 'যে ব্যক্তি দোষদৃষ্টিরহিত হয়ে শ্রদ্ধাপূর্বক আমার এই মতের সর্বদা অনুষ্ঠান করে, সে সম্পূর্ণ কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হয়' (৩।৩১)।

২) **মহাপুরুষ এবং তাঁর বচনে শ্রদ্ধা**—মহাপুরুষেরা যে যে আচরণ করেন, অন্যান্য ব্যক্তিগণও সেইরূপ আচরণ করে এবং মহাপুরুষ নিজ বাণীতে যে বিধান দেন, অপরে তার অনুসরণ করে (৩।২১)। যারা কর্মযোগ, সাংখ্যযোগ ধ্যানযোগাদি সাধনের কথা জানে না, কিন্তু মহাপুরুষদিগের বচনানুসারেই চলে তারাও মৃত্যুকে অতিক্রম করে (১৩।২৫)।

৩) **গ্রন্থে ও শাস্ত্রীয় শুভকর্মে শ্রদ্ধা**—যে ব্যক্তি দোষদৃষ্টিরহিত হয়ে শ্রদ্ধাপূর্বক এই গীতাগ্রন্থ পাঠ শোনে, সে সমস্ত পাপ হতে মুক্ত হয়ে পুণ্য-কর্মকারীদের প্রাপ্য উচ্চলোক প্রাপ্ত হয় (১৮।৭১)। কর্তব্য এবং অকর্তব্যের বিষয়ে শাস্ত্রই প্রমাণ ; সুতরাং শাস্ত্রোক্ত ব্যবস্থা মেনেই কর্তব্য-কর্ম করা উচিত (১৬।২৪)। যে ব্যক্তি শাস্ত্রবিধি জানে না অর্থাৎ কোন কাজ কি বিধিতে করতে হবে তা জানে না, কিন্তু শাস্ত্রীয় শুভকর্মে যার শ্রদ্ধা আছে এবং যে ব্যক্তি শ্রদ্ধাপূর্বক যজন-পূজন (১৭।১) করে, তাকে সাত্ত্বিক (দৈবী সম্পদ্‌সম্পন্ন) মানুষ বলা হয়—'**যজন্তে সাত্ত্বিকা দেবান্**' (১৭।৪)।

৪) **সাত্ত্বিক তপে শ্রদ্ধা**—পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে ফলেচ্ছারহিত হয়ে শরীর, বাক্য ও মন দ্বারা যে তপ করা হয়, তাকে সাত্ত্বিক তপ বলা হয় (১৭।১৭)।

—এই সবগুলিকে 'দৈবী' শ্রদ্ধার বিভাগ বলা হয়।

আসুরী শ্রদ্ধা

১) **দেবতা এবং সকাম অনুষ্ঠানে শ্রদ্ধা**—'যে ব্যক্তি যে দেবতাকে শ্রদ্ধাপূর্বক ভজন-পূজন করতে চায়, আমি

সেই দেবতার প্রতি তার শ্রদ্ধা দৃঢ় করে দিই (৭।২১)। মানুষ শ্রদ্ধাপূর্বক যে কোন দেবতাকেই পূজা করুক না কেন, বাস্তবে তাতে আমারই পূজা করা হয়, কিন্তু তা হয় অবিধিপূর্বক' (৯।২৩)।

২) **যক্ষ-রক্ষ ও ভূত-প্রেতাদিতে শ্রদ্ধা**—রাজসিক ব্যক্তি যক্ষ এবং রক্ষের পূজা করে এবং তামসিক ব্যক্তি ভূত-প্রেতাদির পূজা করে—**'যক্ষরক্ষাংসি রাজসাঃ', 'প্রেতান্ ভূতগণাংশ্চান্যে যজন্তে তামসা জনাঃ'** (১৭।৪)।

—এই সমস্ত আসুরী শ্রদ্ধার বিভাগ।

শ্রদ্ধার সঙ্গে যতক্ষণ দোষদৃষ্টি থাকে, ততক্ষণ শ্রদ্ধা পূর্ণরূপে ফলবতী হয় না। সুতরাং ভগবান শ্রদ্ধার সঙ্গে **'অনসূয়ন্তঃ'** এবং **'অনসূয়ঃ'** পদও দিয়েছেন—**'শ্রদ্ধাবন্তঃ অনসূয়ন্তঃ'**(৩।৩১) এবং **'শ্রদ্ধাবান্ অনসূয়ঃ'** (১৮।৭১)। এর তাৎপর্য এই যে শ্রদ্ধা যেন দোষদৃষ্টিরহিত হয়।

গীতায় দৈবী শ্রদ্ধার প্রয়োগ সাধকদের জন্যই করা হয়েছে, সিদ্ধদের জন্য নয়। কারণ সাধকদের সিদ্ধি লাভ করতে হবে, অতএব তাদের জন্য দৈবী শ্রদ্ধার প্রয়োজনীয়তা আছে। কিন্তু সিদ্ধ তো সিদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছেনই অর্থাৎ তাঁর পরমাত্মতত্ত্বের প্রত্যক্ষ অনুভব হয়েছে, অতএব তাঁর জন্য দৈবী শ্রদ্ধার প্রয়োজনীয়তা নেই।

গীতা দৈবী শ্রদ্ধাকে খুবই প্রাধান্য দেয় এবং তাঁর ঘোষণা— যে শ্রদ্ধাহীন হয়ে যজ্ঞ, তপস্যা, দান ইত্যাদি করে তার সব নিষ্ফল হবে (১৭।২৮)।

নিষ্কামভাবে ভগবানে শ্রদ্ধা করলে মুক্তিলাভ হয়, মানুষের সংসার বন্ধন কেটে যায় আর সকামভাবে দেবতাদিতে শ্রদ্ধা করলে মানুষ বন্ধনপ্রাপ্ত হয়। নিষ্কামভাবে শ্রদ্ধাপূর্বক দেবতাদির পূজা করায় দোষ হয় না, বন্ধনও হয় না, বরং তাতে কল্যাণই হয়। কিন্তু ভূত-প্রেতাদিতে শ্রদ্ধা করলে অধোগতি প্রাপ্তি হয় (৯।২৫ ; ১৪।১৮)। কারণ ভূত-প্রেতের উপাসনাতে নিষ্কামভাব থাকতেই পারে না। ভূত-প্রেতকে ইষ্ট মেনে পূজা-উপাসনা করলে পতন অনিবার্য। তবে যদি তাদের উদ্ধারের জন্য, তাদের তৃপ্তির জন্য পিণ্ড-জল দেওয়া হয়, গয়াতে শ্রাদ্ধ ইত্যাদি করা হয়, তাহলে তাতে দোষ হয় না ; কারণ, এতে কেবল সেই প্রেতের উদ্ধারের ভাবটিই প্রধান থাকে।

(২৮) গীতায় দেবগণের উপাসনা

যে নরাঃ কামনাযুক্তা যজন্ত ইহ দেবতাঃ।
দুঃখং হি যান্তি তে সর্বে জন্মমৃত্যুজরাত্মকম্॥

দেবতা দুই প্রকারের—'আজান দেবতা' এবং 'মর্ত্যদেবতা'। 'আজান দেবতা' তাঁদের বলা হয়, যাঁরা কল্পের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেবতারূপে থাকেন এবং 'মর্ত্যদেবতা' তাঁদের বলে, যাঁরা মনুষ্যদেহে পুণ্যকর্ম করে স্বর্গাদি লোক প্রাপ্ত হন এবং পুণ্যকর্ম অনুযায়ী স্বল্পসময়ের জন্যও স্বর্গে বাস করেন।

মানুষ অপেক্ষা দেবতাদের জন্ম (অর্থাৎ যোনিরূপে) উঁচু বলে মানা হয়, দেবলোককেও উঁচু বলে মানা হয়, তাঁদের ভোগ, শরীর, সুখ-সামগ্রী সমস্তকেই উচ্চরূপে ধারণা করা হয়। দেবলোক, তাঁদের ভোগ, শরীর ইত্যাদি সমস্তই দিব্য, **'দিব্যান্ দিবি দেবভোগান্'** (৯।২০) ; এবং তাঁর লোক, ভোগ, ইন্দ্রিয়ের শক্তি, আয়ু ইত্যাদি সবই বিশাল হয়ে থাকে—**'স্বর্গলোকং বিশালম্'** (৯।২১) ; কিন্তু তাঁর লোক, ভোগ, শরীর, ইন্দ্রিয়

ইত্যাদিতে যা কিছু দিব্যতা[১] বিলক্ষণতা বা বিশালতা থাকে, তা পুণ্যকর্মের কারণেই হয়ে থাকে।

যে ব্যক্তি সংসারে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িত হয়ে আছে, উচ্ছৃঙ্খল আচরণ করে, তার চেয়ে শ্রদ্ধা-ভক্তি-যুক্ত দেবতাদের উপাসনাকারী ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ। কারণ সে বেদ, শাস্ত্র তথা বৈদিক মন্ত্র, যাগ-যজ্ঞাদি অনুষ্ঠানে শ্রদ্ধা রাখে এবং সকামভাবে তৎপরতাপূর্বক যজ্ঞ এবং আনুষ্ঠানিক শুভকর্ম যথাযথভাবে পালন করে। এইজন্য এখানকার ভোগে সে কিছু সংযম পালন করে এবং তার অন্তঃকরণও কিছুটা শুদ্ধ হয়। এইরূপ ব্যক্তি শুভকর্মের প্রভাবে দেবলোকে গমন করে এবং সেখানে দিব্য সুখভোগ করে, সেই পুণ্যের ফল সমাপ্ত হলে পুনরায় মৃত্যুলোকে এসে জন্মগ্রহণ করে। এইরূপ স্বর্গ থেকে প্রত্যাগত ব্যক্তিগণের স্বভাব স্বাভাবিকভাবে শুদ্ধ হয়, দান করা ইত্যাদির দিকে তাদের স্বাভাবিকভাবে প্রবৃত্তি দেখা যায়। কিন্তু যারা নিষ্কামভাবে নিজ কর্তব্যপালন করে তথা ভগবদ্‌বুদ্ধিতে দেবতার পূজা করে, তাদের যেরূপ শুদ্ধি হয় ঐরূপ শুদ্ধি সকামভাবে যারা দেবতাদের পূজা বা আরাধনা করে, তাদের হয় না ; কেননা তাদের স্বর্গাদি লোকের এবং তথাকার সুখভোগের প্রবল কামনা থাকে।

যদিও মনুষ্যলোকে কোন কর্মের সিদ্ধির আকাঙ্ক্ষা করে দেবতাদের পূজা করলে সেই কর্মের সিদ্ধি খুব শীঘ্র পাওয়া যায় (৪।১২), তবু সেই উপাসনার ফল অসীম, অবিনাশী হয় না (৭।২৩)। কারণ দেবতাগণ তাঁদের উপাসনাকারী ব্যক্তিদের উপর প্রসন্ন হলে সর্বাধিক দেবলোকে তাদের নিয়ে যেতে পারেন, কিন্তু তাদের প্রকৃত কল্যাণ করতে পারেন না। যতক্ষণ পর্যন্ত উপাসনাকারী ব্যক্তিদের পুণ্য অবশিষ্ট থাকে, ততক্ষণ তাঁরা দেবলোকে থাকতে পারেন। পুণ্য সমাপ্ত হলেই তাঁদের সেখান থেকে চলে আসতে হয়। টিকিট যে স্থান পর্যন্ত কাটা আছে সেইস্থান পর্যন্ত যেমন যাওয়া যায়, তেমনি পুণ্য যতটা থাকে সেই সময়টুকু পর্যন্তই স্বর্গে থাকতে পারা যায়। পুণ্য শেষ হলেই তাঁদের বাধ্য হয়ে সেখান থেকে মৃত্যুলোকে চলে আসতে হয় (৯।২১)।

প্রকৃতির সঙ্গে, গুণাবলীর সঙ্গে সম্বন্ধগত যে সুখভোগ হয়, উচ্চলোক প্রাপ্তি হয়, তা সমস্তই বিনাশশীল, সীমিত এবং জন্ম-মৃত্যু চক্রে আনয়নকারী। যে প্রকৃতির সঙ্গে সম্বন্ধ রাখতে চায় না, শুধু নিজের কল্যাণ চায় এবং পরমার্থ পথে চলে, এমন মানুষ যদি কোন কারণ বিশেষে মৃত্যুকালে সাধনপথ থেকে বিচলিত হয়ে স্বর্গাদি লোকে যেতে বাধ্য হয়, তাহলেও সে সেই ভোগে আবদ্ধ হয় না ; কারণ, ভোগবন্ধনে আবদ্ধ হওয়া তার উদ্দেশ্য নয়। স্বর্গাদি ভোগ তার পক্ষে বিঘ্নস্বরূপ। সেখানে বহুকাল থাকার পর সে পুনরায় শুদ্ধ শ্রীমানের ঘরে জন্মগ্রহণ করে ও পুনরায় সাধন ভজন শুরু করে (৬।৪১, ৪৪)।

দেবতাকে যারা পূজা করে তাদের পতনই হয়, কারণ তাদের বার বার জন্ম-মরণরূপ দুঃখ ভোগ করতে হয়। কিন্তু যারা কোন প্রকারে নিজ কল্যাণসাধনে লেগে আছে, তাদের কখনো পতন হয় না (৬।৪০) ; কারণ তাদের উদ্দেশ্য বিশুদ্ধ কল্যাণ হওয়ায় ভগবান তাদের শুদ্ধ শ্রীমানের ঘরে সাধন করার উদ্দেশ্যে জন্ম পরিগ্রহ করান।

বাস্তবে দেখতে গেলে স্বর্গাদির সুখ কোন উচ্চ জিনিস নয়। সেই সুখও মর্তের ধনী ব্যক্তিদের সুখেরই শ্রেণীভুক্ত, শুধুমাত্র সুখের তারতম্য আছে। কারণ সেই সুখও সংস্পর্শজনিত ইন্দ্রিয়ের পাঁচটি বিষয়ের এবং তা আদি ও অন্তবিশিষ্ট এবং দুঃখের হেতু (৫।২২)। কিন্তু পারমার্থিক সুখ নির্বিকার, অক্ষয় অর্থাৎ তা কখনো নষ্ট হয় না কারণ তা স্বয়ং থেকে উদ্ভূত, প্রত্যেক প্রাণীর স্বধর্ম, সম্পর্কজনিত নয় (৫।২১)।

তাৎপর্য এই যে, দেবগণের উপাসনাকারী ব্যক্তি অতি

---

[১]দেবগণের দিব্যতা ভগবানের দিব্যতার সমান নয়। ভগবানের দিব্যতা অলৌকিক, চিন্ময় ; অপরপক্ষে দেবগণের দিব্যতা লৌকিক, প্রাকৃত এবং বিনাশশীল।

উচ্চলোকে গেলেও কামনার কারণে তাকে জন্ম-মৃত্যু চক্রে আসতেই হয় এবং তার কল্যাণ হয় না (৯।২১)। কিন্তু যে ব্যক্তি কোনভাবে ভগবানে মন নিবিষ্ট করে, সে উদ্ধার প্রাপ্ত হয়,[১] তার কখনো পতন হয় না (৬।৪০)। ভগবান নিজের চারপ্রকার ভক্ত—অর্থার্থী, আর্ত, জিজ্ঞাসু এবং জ্ঞানী (প্রেমী)—এদের সুকৃতিশালী বলে বর্ণনা করেছেন (৭।১৬), উদার বা মহান বলেছেন (৭।১৮), কেননা তারা ভগবানকেই আশ্রয় করে আছে। ভগবানকে আশ্রয় করে থাকায় তারা ভগবানকেই প্রাপ্ত হয়। সুতরাং মানুষের উচিত—কামনা ও সুখেচ্ছার বশীভূত হয়ে মনুষ্যজন্মের অমূল্য সময়কে জন্ম-মৃত্যুচক্রে না লাগিয়ে তারা যেন ভগবানকেই আশ্রয় করে থাকে।

(২৯) গীতায় প্রাণিমাত্রের প্রতি হিতসাধনের ভাব

জগতি যোঽখিলজীবহিতে রতো ব্রজতি স সুখদুঃখবিনাশতাম্।
নিজহিতং চ য ইচ্ছতি কেবলং ঝটিতি নশ্যতি নো অবিবেকতা॥

জীব অনাদিকাল থেকে তার ব্যক্তিগত সুখ ও হিতে তৎপর রয়েছে। 'আমার সুখ হোক, আমার সম্মান হোক, আমার মান বাড়ুক, আমার যশ হোক, আমি যেমন চাই তেমন হোক, আমার কল্যাণ হোক, আমার মুক্তি হোক'—এইপ্রকারে তার সবকিছু নিজ অধিকারে নেওয়ার স্বভাব রয়েছে। এই স্বভাবের জন্য তার মধ্যে কামনা, বাসনা, মমতা, আসক্তি ইত্যাদির বৃদ্ধি এবং দৃঢ়তা আসে ; কিন্তু কল্যাণ—কামনা, মমতা ইত্যাদি রহিত হলে তবেই হয় (গীতা ২-৭১)। সুতরাং জগতের সবকিছু নিজের অধিকারে আনার স্বভাব দূর করার জন্য মানুষের সমস্ত প্রাণীর হিতে অনুরাগ ও প্রীতি হওয়া অত্যন্ত আবশ্যক। অর্থাৎ 'প্রাণিমাত্রই যেন সুখ পায়, কেউ দুঃখ না পায়, সকলের সম্মান ও সৎকার যেন হয়, সকলের মান বাড়ুক, সকলের কল্যাণ হোক, সবাই পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হোক'—এইরূপ মনোভাব থাকা খুবই প্রয়োজন। এইরূপ সর্বহিতকারী ভাব হলে সংসারের আসক্তি কমে যায়, অর্থাৎ সংসারকে নিজের প্রতি আকর্ষণ করার যে মনোভাব তা দূর হয়ে যায়। নিজের যা কিছু ধন-সম্পত্তি, বৈভব, স্থূল-সূক্ষ্ম-কারণ-শরীর আছে, যা এই সংসার থেকেই পাওয়া এবং সংসারেরই অভিন্ন, তাকে যদি প্রাণীদের হিতে নিয়োজিত করার চিন্তা জাগ্রত হয় এবং প্রাণীদের সেবা করতে, তাদের সম্মান-সৎকার করতে, সুখ ও আনন্দ দিতে, তাদের উপকার করতে তার সব সামগ্রী স্বতঃই সৎভাবে ব্যয় হয় তবে বিনাশশীল বস্তুর কামনা, মমতা, আসক্তি দূর হতে থাকে এবং নিজের পরিচ্ছিন্নতাবোধ মিটতে থাকে। সার্বিকভাবে পরিচ্ছিন্নতা-বোধ দূর হলে পরমাত্ম-প্রাপ্তি ঘটে—'**তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্বভূতহিতে রতাঃ**' (১২।৪)।

স্বয়ং জীবাত্মা যেমন পরমাত্মার সঙ্গে অভিন্ন, সেইরূপ শরীরাদি সামগ্রীও সংসার থেকে অভিন্ন। কিন্তু যতক্ষণ সকলের হিতের চিন্তা দৃঢ় না হয়, ততক্ষণ নিজের বলতে যা কিছু সামগ্রী তা সংসারের বলে মনে হয় না। ফলে নিজের সুখ ও আরামের জন্য কামনা বৃদ্ধি পেয়ে দৃঢ় হতে

---

[১]ভগবানের এমনই মহিমা যে, যদি কোন ব্যক্তি যে কোন ভাবেই হোক ভগবানে মন নিবিষ্ট করে, তাহলে তার মধ্যে আপনিই নিষ্কামভাব এসে যায় এবং সে উদ্ধার পেয়ে যায়। অতএব সকামভাবের তাৎপর্য কেবল ভগবানে মন-নিবিষ্ট হওয়াতেই নিহিত, সকামভাবে লিপ্ত হওয়ায় নয়।

থাকে। যতক্ষণ কামনা, মমতা ইত্যাদি থাকে, ততক্ষণ জড়ত্বের সঙ্গে তাদাত্ম্য-ভাব থাকে, যা জন্ম-মৃত্যু-চক্রে আবর্তনের প্রধান কারণ হয়ে দাঁড়ায় (১৩।২১)। কিন্তু যদি সমস্ত প্রাণীর হিতে অনুরক্তি হয় তাহলে তাদাত্ম্য-ভাব সহজেই নষ্ট হয়। কারণ প্রাণীমাত্রেরই হিতে অনুরক্তি হলে সাংসারিক বিষয়াদি আর নিজের সুখ-আরামের জন্য নয়, প্রাণীদের মঙ্গলের জন্যই খরচ হতে থাকে।

ভগবান গীতায় দু'বার বলেছেন—'সর্বভূতহিতে রতাঃ' (৫।২৫ ; ১২।৪)। পঞ্চম অধ্যায়ের পঁচিশ সংখ্যক শ্লোকে ভগবান বলেছেন, সমস্ত প্রাণীর হিতে যদি সাধকের অনুরাগ হয়, তবে সে নির্গুণ ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয় এবং দ্বাদশ অধ্যায়ের চতুর্থ শ্লোকে বলেছেন—'সমস্ত প্রাণীর হিতে যার অনুরাগ হয়, সেই সাধক আমাকে (সগুণকে) প্রাপ্ত হয়।' এর তাৎপর্য এই যে, অপরের হিতে প্রীতি হলে জড়ত্ব এবং নিজ সুখ-বিলাস ত্যাগ আপনা হতেই সহজভাবে হয়ে যায়। জড়ত্ব ত্যাগ হলে সাধক যদি নির্গুণ ব্রহ্মের প্রাপ্তি চায়, তবে সে নির্গুণ ব্রহ্ম প্রাপ্ত হতে পারে আর যদি সগুণ প্রাপ্তি চায়, তাহলে সগুণ লাভ করে। অর্থাৎ প্রভুর প্রতি যে স্বাভাবিক প্রেম তা জাগরিত হয়।

'সর্বভূতহিতে রতাঃ'—পদটি দু'বারই জ্ঞানযোগের প্রকরণে দেওয়ার তাৎপর্য এই যে, জ্ঞানযোগের সাধকদের মধ্যে 'অহং ব্রহ্মাস্মি'র উপাসনা প্রধানভাবে থাকে। যে অহং-ভাব অনাদিকাল থেকে শরীরের সম্বন্ধের ফলে চলে আসছে সেই অহংভাব ত্যাগ করার জন্য প্রাণীর হিতে অনুরাগ হওয়া খুবই প্রয়োজন। প্রাণীদের হিতে অনুরাগ হলে অহংভাব খুব সহজেই চলে যায়। অহংভাব দূরীভূত হলে নিজ স্বরূপের অনুভব করা যায়, তখন বন্ধনের কোন কারণ থাকে না।

প্রাণীদের হিত পরিমাপের এমন মানদণ্ড নেই যার দ্বারা দেখা যায় সাধক প্রাণীদের জন্য কতটা কাজ করছে, কত জিনিস দান করছে। কেননা ক্রিয়া ও পদার্থ সীমিত। ক্রিয়ার যেমন আরম্ভ ও শেষ থাকে, তেমনি পদার্থেরও সংযোগ ও বিয়োগ হয়। কিন্তু প্রাণীদের হিতের জন্য যে ভাব, তা অসীম। অসীম ভাবের দ্বারাই অসীম তত্ত্ব (পরমাত্মা) প্রাপ্তি হয়।

সাধক যা কিছু সাধন-ভজন করে তাতে স্বাভাবিক-ভাবে সকলেরই হিত হয়। যদি সাধকের মধ্যে, 'আমার যেন কল্যাণ হয়'—এরূপ ব্যক্তিগত হিতের চিন্তা থাকেও, এর দ্বারা জীবের হিত হয়। ভগবৎপ্রাপ্ত মহাপুরুষের ব্যক্তিগত হিতের চিন্তা থাকে না, সুতরাং তাঁর দ্বারা যা কিছু সাধন-ভজন হয় তাতে স্বতঃই লোকের কল্যাণ করে। মহাপুরুষকে দর্শন করলে, তাঁর শরীর স্পর্শকারী বায়ুতে, তাঁর সঙ্গ ও অমৃতময় বাক্যে অন্য লোকের ওপর প্রভাব পড়ে, যার ফলে তাদের মধ্যে সাধন-ভজন করার রুচি জাগ্রত হয় এবং তারাও ভগবন্মুখী হয়ে ওঠে।

ধূমপানকারীদের দ্বারা যেমন স্বাভাবিকভাবে ধূমপানের প্রচার হয়, তেমনি সাধকদের দ্বারাও স্বাভাবিকভাবে সাধন-ভজনের প্রচার হয়। এইরূপ নির্মল হৃদয়ের সাধকেরা যেখানে বাস করেন, সেই স্থানটি অত্যন্ত পবিত্র হয়ে ওঠে। ভোগী ব্যক্তিদের ভোগস্পৃহা এবং সংগ্রহের লালসা যেমন সাধারণ লোকের ওপর স্বাভাবিকভাবে প্রভাব ফেলে, তেমনি সাধকগণের ত্যাগ, ও সাধন-ভজন সাধারণ মানুষের ওপর প্রভাব বিস্তার করে। তাঁদের সাধন-ভজনের প্রভাব কেবল মানুষের ওপরই নয়, পশু-পক্ষী ইত্যাদি ইতর জীবের ওপর, এমনকি ঘরের দেওয়াল প্রভৃতি নানা জড় বস্তুর ওপরও পড়ে।

যে সকল সিদ্ধ মহাপুরুষ কেবল নিজের মধ্যেই মগ্ন থাকেন, লোক-সংস্পর্শে আসেন না, তাঁদের দ্বারাও অদৃশ্যরূপে স্বতঃই চিন্ময় তত্ত্বের, জড়ত্ব ত্যাগের প্রচার হয়। তাঁদের এই অদৃশ্য প্রভাব জড়ত্ব ত্যাগে ও চিন্ময় তত্ত্বে স্থিত হতে সাহায্য করে। বরফ থেকে যেমন স্বাভাবিকভাবে ঠাণ্ডা বিকিরণ হয়, সূর্য থেকে যেমন স্বতঃই জ্যোতি বিচ্ছুরিত হয়, তেমনি এইসব মহাপুরুষ হতে সাধারণ মানুষের স্বতঃই হিত হয়, তারা শান্তি লাভ করে। সুতরাং এই জগৎ-সংসারে যে শান্তি পাওয়া যায়, সুখ পাওয়া যায়, আনন্দ পাওয়া যায়, সেই সমস্তই এইসব

সিদ্ধ মহাপুরুষগণের কৃপা-কণামাত্রে হয়।

অপরের হিতে প্রীত হওয়া এবং নিজ কল্যাণ কামনা করা এই দুটিতে আপাতদৃষ্টিতে পার্থক্য থাকলেও, বাস্তবে একই। কারণ যাঁদের প্রাণীর প্রতি হিত করার চিন্তা থাকে, তাঁরা জড়ত্ব ত্যাগ করে কল্যাণ প্রাপ্ত হন, আর যাঁরা নিজ কল্যাণে উৎসাহী, তাঁদের জড়ত্ব স্বতঃই ত্যাগ হয়, ফলে তাঁদের দ্বারা স্বতঃই প্রাণীদের হিত সাধিত হয়।

লোভী ব্যক্তিদের দ্বারা স্বাভাবিকভাবে লোভের এবং উদার ব্যক্তিদের দ্বারা স্বতঃই উদারতার প্রচার হয়। যার মনে অর্থের, মান-সম্মানের গুরুত্ব থাকে, তার দ্বারা স্বাভাবিকভাবে ঐসবেরই প্রচার হয়, আর যাঁর হৃদয়ে অর্থাদির কোন গুরুত্ব নেই, তাঁর দ্বারা ত্যাগের প্রচার হয়। যে ব্যক্তি সর্বদা ভগবানের গুণ, লীলা, প্রভাব, মহত্ত্ব ইত্যাদির কথা বলে, অপর ব্যক্তিদের শোনায়, তার দান এই পৃথিবীতে অপরিমেয় (মহাদানী)—**'ভূরিদা জনাঃ'** (শ্রীমদ্ভাগবত ১০।৩১।৯)। যে ব্যক্তি অর্থ ও অন্ন জল ইত্যাদি দান করে সে **'ভূরিদা'** (মহাদানী) নয়, বরং তাকে **'অন্নদা'** (অন্নদানী) বলা হয়। কারণ প্রাকৃত বস্তু শুধুমাত্র প্রাণীদের শরীর পর্যন্ত পৌঁছায়। কিন্তু যে ব্যক্তি প্রেমপূর্ণ ভগবদ্‌বচন বলে, সে সকলকে জড়ত্ব থেকে চিন্ময়-তত্ত্বে আকর্ষণ করে।

সমস্ত জগৎ চাইলেও একটি প্রাণীকে সুখী করতে পারে না, তাহলে একজন মানুষ কী প্রকারে সকল প্রাণীকে সুখী করতে পারে ? বস্তুতঃ সমস্ত প্রাণীর হিতের তাৎপর্য এই যে, সকলের হিতে রুচি হোক, প্রীতি হোক ; সবাইকে সুখী করার চিন্তা হোক। সকল প্রাণীর হিতে অনুরাগ জন্মালে নিজের সুখবুদ্ধি, ভোগ এবং সংগ্রহবুদ্ধি, স্বার্থবুদ্ধি স্বাভাবিকভাবে ত্যাগ হয়ে যায় এবং পরমাত্মতত্ত্ব-প্রাপ্তি ঘটে। তার কারণ নিজের সুখবুদ্ধি হল পরমাত্ম তত্ত্ব-প্রাপ্তির প্রধান অন্তরায়।

(৩০) গীতায় এক প্রত্যয়ের মহিমা

সাধকানাং ভবত্যেব বুদ্ধিশ্চ নিশ্চয়াত্মিকা।
ভোগৈশ্বর্যপ্রসক্তানাং বুদ্ধয়োঽনিশ্চয়াত্মিকাঃ॥

জীবাত্মায় এক অংশে পরমাত্মা অপর অংশে প্রকৃতির অধিষ্ঠান। জীবাত্মা যখন পরমাত্মার দিকে অগ্রসর হয়, তখন তার মধ্যে নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি আসে আর যখন সে প্রকৃতির অংশ শরীর ও সংসারের দিকে চালিত হয়, তখন তার বুদ্ধি বহু দিকে ধাবিত হয়, তার অব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি হয় (২।৪১)। তাৎপর্য এই যে, পারমার্থিক সাধকের এইপ্রকার নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি হয় যে, 'পরমাত্মাকে পেতে হবে, তাতে যাই হোক না কেন।' কিন্তু যে ব্যক্তি সাংসারিক ধন-সম্পত্তি সংগ্রহ করতে ও জাগতিক সুখভোগ করতে চায়, তার পরমাত্মপ্রাপ্তির উপায়স্বরূপ নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি হয় না। অপরপক্ষে জাগতিক ভোগ প্রাপ্তির জন্য তার মনে বিচারের শেষ থাকে না। এর কারণ হচ্ছে যে, পরমাত্মা এক এবং তাঁকে পাবার নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিও একই হয়। সাংসারিক ভোগ অসংখ্য এবং তা ভোগ করবার (ধন-সম্পত্তি প্রভৃতি) সাধনও অনেক, তাই সেইসব প্রাপ্তির একনিষ্ঠ বুদ্ধিও হয় না।

পরমাত্মার সগুণ, নির্গুণ ইত্যাদি স্বরূপের ভেদ থাকলেও এইসকল স্বরূপ তত্ত্বতঃ এক এবং নিত্য। সুতরাং পরমাত্মার কোন একটি স্বরূপের প্রাপ্তির নিশ্চয়তাও একই হয়। পরমাত্মপ্রাপ্তির লক্ষ্য যদি এক নিশ্চয় হয়, তাহলে সমস্ত সাধনই সহজ সরল হয়ে যায় এবং উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য তৎপরতাও স্বতঃই হয়ে যায়। যেমন কেউ যদি নিজেকে ঈশ্বরের ভক্ত বলে মেনে নেয়,

তাহলে ঈশ্বরকে ভক্তি করা তার পক্ষে স্বাভাবিক হয়ে যায় অর্থাৎ ভক্তি সম্বন্ধীয় কথা সে তখন গ্রহণ করে এবং ভক্তি-বিরোধী কথা সে তৎক্ষণাৎ ত্যাগ করে। কারণ সে তখন এই কথাই ভাবে যে, 'আমি ভক্ত, কাজেই ভক্তি-বিরুদ্ধ কাজ আমার করা উচিত নয়।' কিন্তু যাদের লক্ষ্য থাকে সংসার-ভোগের, তাদের কখনও এদিকে কখনও ওদিকে, এইরূপ নানারকম বাসনা মনে জন্মাতে থাকে। সেই বাসনার কখনও অন্ত হয় না, কেননা এক বাসনা পূরিত হবার সঙ্গে সঙ্গে নতুন বাসনা উৎপন্ন হতে থাকে।

এই ব্যবসায়াত্মিকা (নিশ্চয়াত্মিকা) বুদ্ধির এমনই মহিমা যে অতি দুরাচার বা অতি পাপী ব্যক্তিও যদি, 'আমি পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হব'—এইরূপ সিদ্ধান্ত করে, তাহলে সে খুব শীঘ্র ধর্মাত্মা হয়ে যায়। শুধু ধর্মাত্মাই নয়, তার নিত্য শান্তি লাভ হয় অর্থাৎ তার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় (৯।৩০-৩১)।

অব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিযুক্ত মানুষ যতবার জন্ম নেয় ততবারই সে নানা উদ্যোগ, পরিশ্রম করতে থাকে, কিন্তু তার বাসনার পরিপূর্তি হয় না। আসলে, নতুন নতুন বাসনা জন্মাতে থাকে, যার কখনো শেষ হয় না। যদি কখনও কোনও বাসনার পূর্তি হয়, তাহলে সেটিও ভবিষ্যতে নতুন-নতুন কামনা সৃষ্টির কারণে পরিণত হবে।

এর তাৎপর্য এই যে, ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি হলে অব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি চলে যায়, কিন্তু অব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি থাকাতে কখনো ব্যবসায়াত্মিকা (নিশ্চয়াত্মিকা) বুদ্ধি হয় না। সুতরাং মানুষের উচিত যে, সে যেন শীঘ্র পরমাত্ম-প্রাপ্তিকেই স্থির লক্ষ্য করে নেয়। কারণ পরমাত্ম-প্রাপ্তির জন্য প্রাপ্ত শরীর পাত হয়ে গেলে আমরা ভগবৎপ্রাপ্তি থেকে বঞ্চিতই রয়ে যাব।

(৩১) গীতায় দ্বিবিধ সত্তার বর্ণনা

দ্বিবিধা দৃশ্যতে সত্তা বিকারিণ্যবিকারিণী।
ভূত্বাঽসতো ভবিত্রী চ সতো নিত্যা সনাতনী॥

সত্তা দুই প্রকারের—বিকারী এবং অবিকারী। উৎপন্ন হবার পর যে সত্তা হয়, তাকে বিকারী সত্তা বলে ; কারণ তাতে নিরন্তর পরিবর্তন হতে থাকে। যে সত্তা স্বতঃসিদ্ধ, তাকে 'অবিকারী সত্তা' বলা হয় ; কারণ তাতে কখনো কিছুমাত্র পরিবর্তন হয় না। তাই গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের ষোল সংখ্যক শ্লোকে ভগবান বলেছেন যে, যার কখনো ভাব (সত্তা) হয় না, সে অসৎ, বিকারী সত্তা এবং যার কখনো অ-ভাব হয় না, সে সৎ এবং অবিকারী সত্তা—**'নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ।'**

উৎপন্ন হওয়া, উৎপন্ন হওয়ার পর শরীর সম্পন্ন হওয়া, বেড়ে ওঠা, অবস্থান্তর হওয়া বা বদল হওয়া, ক্ষীণ হওয়া এবং নষ্ট হওয়া—এই ছয় প্রকারের বিকার জগতে হয়। যেমন শিশু জন্মায়, জন্মানোর পরে 'শিশু-কলেবর' বেড়ে ওঠে, অবস্থার পরিবর্তন হয়, পরে ক্ষীণ হতে থাকে এবং শেষে মৃত্যু হয়। এই ছয় প্রকার বিকার জগৎ-সংসারেই হয়, আত্মাতে নয়। কারণ আত্মা জন্মায় না, জন্মে শরীর সম্পন্ন হয় না, বাড়ে না বা বদলায় না, ক্ষীণও হয় না বা তার মৃত্যুও হয় না (২।২০)।

গীতায় যে যে স্থানে শরীর এবং জগৎ-সংসারের বর্ণনা আছে তা সবই 'বিকারী সত্তার' এবং যে যে স্থানে পরমাত্মা এবং আত্মার বর্ণনা আছে তা সবই 'অবিকারী সত্তার'।

জ্ঞাতব্য

উৎপন্ন হওয়া বিকারী সত্তা অনুৎপন্ন অবিকারী সত্তার অধীনেই থাকে । কারণ বিকারী সত্তার কোন স্বাতন্ত্র্য থাকে না। বিকারী সত্তা যত সত্তা বলেই প্রতিভাত হোক না কেন তা আসলে অবিকারী সত্তারই অন্তর্গত। কিন্তু অবিকারী সত্তা বিকারী সত্তার অধীন নয় । কারণ তা স্বতঃসিদ্ধ। যে স্থানে বিকারী সত্তা নেই অর্থাৎ যে স্থানে

দেশ, কাল, বস্তু, ব্যক্তি, ঘটনা, পরিস্থিতি এবং ক্রিয়াদি নেই, সে স্থানেও অবিকারী সত্তা যথাবৎ ও পরিপূর্ণরূপে থাকে। এই অবিকারী সত্তা দেশ, কাল, বস্তু ইত্যাদির ভিতর এবং বাহির সর্বত্র পরিপূর্ণ। অবিকারী সত্তাকে যারা জানে, যারা জানে না, যারা মানে, যারা মানে না, তাদের মধ্যেও এই অবিকারী সত্তা সমানভাবে বর্তমান। অবিকারী সত্তাকে কেউ জানুক বা না জানুক, মানুক বা না মানুক, স্বীকার করুক বা না করুক, অনুভবে আসুক বা না আসুক এ সদা বিরাজমান। তা জানবার বা মানবার বা স্বীকার করবার অপেক্ষা রাখে না। অবিকারী সত্তা বিকারী সত্তা ব্যতীতই বিদ্যমান থাকে ; কিন্তু বিকারী সত্তা অবিকারী সত্তা ব্যতীত থাকতেই পারে না। কারণ তার আধার এবং আশ্রয় হল এই অবিকারী সত্তা।

জিজ্ঞাসা—শরীর বিকারী সত্তাসম্পন্ন, ইন্দ্রিয় ইত্যাদির দ্বারাই তো অবিকারী সত্তার জ্ঞান হয়, অনুভব হয় ; তাহলে তো অবিকারী সত্তা বিকারী সত্তার অধীন হল ?

সমাধান—কথা তা নয়। বিকারী সত্তা দ্বারা অবিকারী সত্তার অনুভূতি হয় না, বরং বিকারী সত্তা ত্যাগ করলেই অবিকারী সত্তার অনুভূতি হয়। যতক্ষণ 'বিকারী সত্তার দ্বারা অবিকারী সত্তার অনুভূতি হয়'—এই ভাব থাকবে, ততক্ষণ হৃদয়ে বিকারী সত্তার গুরুত্ব থাকবে। যতক্ষণ বিকারী সত্তার গুরুত্ব থাকবে ততক্ষণ মানুষ অবিকারী সত্তার কথা শিখতে পারে, পড়তে পারে, ব্যাখ্যা করতে পারে, গ্রন্থ রচনা করতে পারে, কিন্তু তাকে অনুভব করতে পারে না। তাৎপর্য এই যে, যতক্ষণ অন্তরে উৎপন্ন সত্তার গুরুত্ব থাকে, ততক্ষণ সর্বত্র পরিপূর্ণ থাকা সত্ত্বেও অনুৎপন্ন সত্তার অনুভব হতে পারে না।

জিজ্ঞাসা—চরম বা অন্তিম বৃত্তিই তো অনুৎপন্ন সত্তার বোধ হওয়ার কারণ হয়, তাহলে উৎপন্ন সত্তার দ্বারাই অনুৎপন্ন সত্তার বোধ হয়—এই তো প্রমাণিত হয় ?

সমাধান—না। চরম বৃত্তির সঙ্গে সম্বন্ধ বিচ্ছেদ হলে তবেই অনুৎপন্ন সত্তার, শুদ্ধ-স্বরূপের যথার্থ অনুভব হয়। উৎপন্ন সত্তার সঙ্গে সম্বন্ধ থাকাকালীন শুদ্ধ-স্বরূপের বোধ হয় না, বরং বৃত্তিসংশ্লিষ্ট তত্ত্বেরই বোধ হয়। বৃত্তি থাকা পর্যন্ত সমাধি এবং ব্যুত্থান—এই দুই অবস্থা হয় ; কিন্তু বাস্তবিক বোধে এই অবস্থা হয় না। বাস্তবিক বোধ বৃত্তিরহিত হলেই হয়, কেননা বৃত্তি উৎপন্ন ও নষ্ট হয়, কিন্তু স্বরূপের উৎপত্তি বা নাশ কিছুই হয় না। এর তাৎপর্য এই যে, বৃত্তি থেকে বোধ হয় না, বরং বৃত্তি থেকে সম্বন্ধবিচ্ছেদ হলে তবেই বোধ হয়।

যারা ক্রমানুসারে সাধনা করে অর্থাৎ শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন, ধ্যান, সমাধি, সবীজ, নির্বীজ এইরূপ ক্রম অনুযায়ী সাধনা করে, তাদের পক্ষে বৃত্তি কিছু সময়ের জন্য উপযোগী হতে পারে, কিন্তু বাস্তবিক বোধ বৃত্তিরহিত হলেই হয়। সাধারণভাবে এই স্থূল-শরীর, স্থূল-পদার্থ এবং স্থূল-ক্রিয়াদির দ্বারাও জগৎ-সংসারের সেবা-কাজ চলে, যার দ্বারা অন্তঃকরণ শুদ্ধ, পবিত্র হয়। শুদ্ধ অন্তঃকরণ ভগবানে মন নিবিষ্ট করতে সাহায্য করে। শুদ্ধ অন্তঃকরণ করণ-সাপেক্ষ সাধনে অর্থাৎ ক্রম অনুযায়ী সাধনায় সহায়ক হয়, কিন্তু সেই সাধনায় অন্তঃকরণের প্রতি যে গুরুত্ব থাকে, তা তত্ত্ব-প্রাপ্তির বাধক হয়। করণ-নিরপেক্ষ সাধনা দ্বারা শরীর, ইন্দ্রিয়, অন্তঃকরণ থেকে সম্বন্ধ-বিচ্ছেদ করা যায়। কারণ স্বতঃসিদ্ধ সত্তা করণ-সাপেক্ষ নয় অর্থাৎ তা কোন করণের (অর্থাৎ মন-বুদ্ধি-আমিত্ব-আদির) অপেক্ষা করে না। কোন কিছুই চিন্তা না করে, সমাধিরও চিন্তা-ভাবনা না করে, অন্তরে-বাহিরে নীরব থাকলে স্বরূপ-স্থিতি স্বাভাবিক হয়, কারণ তা তো প্রথম থেকেই বিদ্যমান।

সাধক যতক্ষণ পর্যন্ত তার বিকারী সত্তা উপভোগ করে এবং তার দ্বারা সুখাস্বাদন করে, সমাধিস্থ হয়েও এইরূপ ভাব পোষণ করে, ততক্ষণ তার বিকারী সত্তার গুরুত্ব দূর হয় না ; এবং গুরুত্ব দূর না হলে অবিকারী সত্তার স্বতঃসিদ্ধ অনুভূতি হয় না। মনুষ্য দেহ বিকারী সত্তার গুরুত্ব দূর করারই হেতুস্বরূপ হয়, অবিকারী সত্তা প্রাপ্তির জন্য নয়। অতএব বিকারী সত্তা অবিকারী সত্তার প্রাপ্তির কারণ হতে পারে না এবং অবিকারী সত্তা বিকারী সত্তার কার্য হতে পারে না—**'নাসতঃ সজ্জায়েত'**।

মানুষ কেবলমাত্র অবিকারী সত্তা (পরমাত্মা)-কেই প্রাপ্ত হতে পারে, বিকারী সত্তা (জাগতিক পদার্থের)-প্রাপ্ত হতেই পারে না ; কারণ মানুষ বিকারী সত্তা বা জাগতিক পদার্থ যতই সংগ্রহ করুক, তাকে চিরস্থায়িভাবে

রাখা সম্ভবই নয়। হয় মানুষ জীবিত থাকাকালীন এই পদার্থ নষ্ট হয়ে যায় অথবা পদার্থ থেকে যায় ; মানুষ চলে যায় অর্থাৎ তার মৃত্যু হয়। মানুষ জাগতিক পদার্থ নিজের করে রাখতে পারে না অথবা নিজে তার সঙ্গে থাকতে পারে না ; সুতরাং পদার্থপ্রাপ্তি প্রকৃত অর্থে অপ্রাপ্তিই।

অবিকারী সত্তার বিকারী সত্তা থেকে আজ পর্যন্ত কিছু প্রাপ্তি ঘটে নি, ঘটা সম্ভবও নয়। এর তাৎপর্য এই যে শরীর, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি ইত্যাদি থেকে স্বয়ং কিছুই পান নি, পাবেন না এবং পাওয়া সম্ভবও নয়। বিকারী সত্তা হচ্ছে অ-ভাবরূপী—'নাসতো বিদ্যতে ভাবঃ' (২।১৬)। অতএব বিকারী সত্তা (জগৎ) প্রাপ্ত হয়েছে দেখালেও তা অপ্রাপ্তই থাকে এবং অবিকারী সত্তা (পরমাত্মা) অপ্রাপ্ত দেখালেও তার প্রাপ্তি হয়েই আছে। অবিকারী সত্তাকে প্রাপ্ত হতে মানুষ সক্ষম এবং তাকে প্রাপ্ত হওয়ার সমস্ত প্রকার সামগ্রীও মানুষের অধিকারে রয়েছে।

জিজ্ঞাসা— বিকারী সত্তার কাছ থেকে অবিকারী সত্তা কিছুই লাভ করে না — একথা সত্য, তবুও বিকারী সত্তার কাছ থেকে কিছু পাওয়া যাবে, এইরকম মৃগতৃষ্ণা থেকে যায়। এ কীভাবে দূর হবে ?

উত্তর— সাধক নিজ বিবেককে যেমন সম্মান করবে, গুরুত্ব দেবে, তেমনই এই ভ্রম দূর হতে থাকবে। শেষে এই ভ্রম সম্পূর্ণরূপে দূর হয়ে যাবে এবং বিবেক অবিকারী সত্তার প্রাপ্তি করিয়ে তাতেই একাত্ম হয়ে যাবে।

(৩২) গীতায় দ্বিবিধ বাসনা

ইচ্ছা তু দ্বিবিধা প্রোক্তা জগতঃ পরমাত্মনঃ।
অপূর্তির্জগদিচ্ছায়াঃ পূর্তিশ্চ পরমাত্মনঃ॥

গীতায় সৎ এবং অসৎ—এই দুইয়েরই বর্ণনা আছে। এইরূপ বাসনাও দুই প্রকারের হয়। 'সৎ' প্রাপ্তির বাসনা এবং 'অসৎ' বা সাংসারিক ভোগ প্রাপ্তির বাসনা। সৎ-এর বাসনা হল ভাবরূপ অর্থাৎ তা সদা স্থিতিশীল এবং অসতের বাসনা অ-ভাবরূপ অর্থাৎ যা কখনো পূর্ণ হওয়ার নয় (২।১৬)। অতএব সৎ বাসনার পূরণ হয় এবং অসৎ বাসনার নিবৃত্তি হয়, অভাব হয়।

বাস্তবে দেখতে গেলে জীব সাক্ষাৎ পরমাত্মা (সৎ)-এর অংশ এবং সে প্রকৃতির অংশ (অসৎ)কে আকর্ষণ করে থাকে, তার সঙ্গে তাদাত্ম্য করে নেয় (১৫।৭)। এইজন্য তার মধ্যে দুইপ্রকার বাসনা সৃষ্টি হয়। যদি সে প্রকৃতিগত অংশকে আকর্ষণ না করে, তাহলে অসৎ বাসনার নিবৃত্তি হয় এবং সৎ বাসনা পূর্ণ হয়। কারণ পরমাত্মার অংশ হওয়ায় পরমাত্ম-প্রাপ্তি তার স্বতঃসিদ্ধভাবে হয়ে রয়েছে, কেবলমাত্র অসৎকে আকর্ষণ করার জন্যই তার অপূর্তি বা অভাব অনুভূত হয়।

কর্মযোগের প্রকরণে এই দুই বাসনাকেই ব্যবসায়াত্মিকা এবং অব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি নামে বলা হয়েছে (২।৪১)। পরমাত্ম-প্রাপ্তির বাসনাকেই 'ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি' এবং ভোগের বাসনাকে 'অব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি' বলা হয়। ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি এক হয়, কারণ পরমাত্ম-তত্ত্ব একই। মার্গভেদে, পদ্ধতি ভেদে, রুচি এবং শ্রদ্ধা-বিশ্বাস ভেদে এই পরমাত্ম-তত্ত্বের বাসনাকে মুমুক্ষা, প্রেম-পিপাসা, ভগবদ্দিদৃক্ষা ইত্যাদি নামে বলা হয়। অপরপক্ষে অব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি বহু হয়। কারণ সংসারে ভোগ্য-পদার্থ বহু প্রকারের। সাংসারিক ভোগ এবং সংগ্রহের বাসনার কখনো অন্ত হয় না। অতএব তার পূরণ হওয়া কখনই সম্ভব নয়, তার ত্যাগই হতে পারে। এইজন্য ভগবান গীতায় অসৎ বাসনার ত্যাগের ওপর খুব জোর দিয়েছেন (২।৪৭, ৫৫, ৭১ ; ৩।৪৩ ; ৫।১১-১২ ; ৬।২৪ ; ১৬।২১-১১ ইত্যাদি)।

একটি হল আবশ্যকতা, অপরটি হল বাসনা। আবশ্যক হচ্ছে সৎ-এর এবং বাসনা অসৎ-কেন্দ্রিক। মানুষের মধ্যে কেবল সৎ (পরমাত্মার)-এর বাসনা হওয়া উচিত, যা অনিবার্য । মানুষের জন্ম অসৎ-কে ইচ্ছা বা

কামনা করার জন্য হয়নি। কারণ অসৎ নিজস্ব নয় এবং কখনো সঙ্গে থাকে না। কিন্তু সৎ নিজস্ব বস্তু এবং সর্বদা সঙ্গেই থাকে, কখনো পৃথক হতেই পারে না।

জ্ঞাতব্য

সাংসারিক বস্তু ইত্যাদির এক 'আবশ্যকতা' হয় এবং আর এক হয় 'বাসনা'। আবশ্যকতা পূর্ণ হয় কিন্তু ইচ্ছা কখনও পূর্ণ হয় না, কারণ এর শেষ নেই। যেমন ক্ষুধা পেলে উদরপূর্তির ইচ্ছা হয় আর স্বাদ গ্রহণের ইচ্ছা হয়। উদরপূর্তির ইচ্ছা শরীরের আবশ্যকতা (ক্ষুধা) যা ভোজন করলে মিটানো যায়। কিন্তু স্বাদ গ্রহণের ইচ্ছা ভোজনের দ্বারা মিটানো যায় না। এর তাৎপর্য এই যে শরীরের আবশ্যকতা ক্ষুধার পূর্তিতে পূর্ণ করা যায়, তাকে যুক্তি-বিচারে ত্যাগ করা যায় না। কিন্তু স্বাদের ইচ্ছার পূর্তি করা যায় না বরং তাকে ত্যাগ করা সম্ভব।

উদর পূর্তির ইচ্ছা (ক্ষুধা) একই হয় আর তার পূরণ করার ব্যবস্থা ভগবানের তরফে প্রারব্ধ অনুযায়ী হয়ে থাকে। কিন্তু স্বাদ গ্রহণের ইচ্ছা বিভিন্ন প্রকারের হয় এবং তার পূরণের ব্যবস্থা ভগবানকৃত প্রারব্ধ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়। কারণ উদরপূর্তির ইচ্ছা শরীরের স্বাভাবিক প্রয়োজন, কিন্তু স্বাদ-গ্রণের ইচ্ছা আমাদের নিজস্ব, তা স্বাভাবিক নয়, সুতরাং তা পরিত্যাগ করার দায়িত্বও আমাদের।

পারমার্থিক ইচ্ছা হল স্বয়ং-এর আবশ্যকতা (প্রয়োজনীয়তা)। সে ইচ্ছা হতে পারে ভগবদ্দর্শনের বা ভগবৎপ্রেমের বা মুক্তির কিন্তু সে সবই হল প্রয়োজনীয়তা। এর পূরণ ক্রিয়া, পদার্থ, পরিস্থিতি, শরীর, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি ইত্যাদির অধীন নয় অর্থাৎ ক্রিয়া, পদার্থ ইত্যাদির সহায়তায় ভগবৎপ্রেম, মুক্তি প্রভৃতি লাভ হয় না। কারণ সৎ-এর প্রাপ্তি অসৎ দ্বারা হয় না, বরং অসৎ-এর সম্বন্ধ ত্যাগ করলেই তাঁর প্রাপ্তি হয়।

বাস্তবে অসতের ইচ্ছা থেকেই সতের ইচ্ছা হয়। যদি অসৎ-এর আকাঙ্ক্ষা সর্বতোভাবে ত্যাগ করা যায় তাহলে সৎ-এর আকাঙ্ক্ষা স্বতঃই পূর্ণ হয়। কারণ সৎ সর্বস্থানে, সর্বসময় এবং সকল পরিস্থিতি আদিতে সমানভাবে পরিপূর্ণ। তবে অসৎ-এর ইচ্ছা থাকা অবস্থায় সৎ-এর প্রকাশ ঘটে না।

জাগতিক এবং পারমার্থিক—দুই (অসৎ এবং সৎ) ইচ্ছাই বাস্তবে সংসারের ইচ্ছার ওপর টিকে আছে। যদি মানুষ এই নশ্বর জগৎ-সংসারকে গুরুত্ব না দেয়, এর আশ্রয় গ্রহণ না করে, এটির ইচ্ছা না রাখে, নিজেকে সংসারের অধীন বলে মনে না করে, তাহলে পারমার্থিক ইচ্ছা স্বতঃই পূর্ণ হয়। কারণ পারমার্থিক (সৎ-এর) ইচ্ছার প্রয়োজন আছে এবং সেই প্রয়োজন অবশ্যই পূরণ হয়। শারীরিক প্রয়োজনীয়তার পূরণ প্রারব্ধ অনুযায়ী হয় অর্থাৎ তা কখনও পূরণ হয়, কখনও হয় না ; কারণ, এর বিষয় অসৎ (অনিত্য)। কিন্তু অসৎ ইচ্ছা সর্বতোভাবে ত্যাগ করলে সৎ-এর প্রয়োজনীয়তা স্বতঃই পূর্ণ হয়। কারণ সৎ তো প্রথম থেকেই বিদ্যমান। সৎ-এর প্রয়োজনীয়তা পূর্ণ হলে কোন কিছু করার, জানার এবং পাওয়ার বাকী থাকে না। জগৎ সংসারের কাজ যতই করা হোক তা বাকী থেকে যায়, জগৎ সম্বন্ধে যতই জ্ঞান প্রাপ্ত হওয়া যাক, তা অসমাপ্ত থেকে যায় ; সাংসারিক ভোগ্য বস্তুর যতই প্রাপ্তি হোক, তার শেষ হয় না। এর তাৎপর্য এই যে, সাংসারিক কিছু করার, জানার এবং পাওয়ার কখনও পূর্তি হয় না।

(৩৩) গীতায় ত্রিবিধ দৃষ্টি

চক্ষুস্ত্রিধাঽমন্যত কৃষ্ণগীতা দিব্যং তু চক্ষুঃ প্রভুণা চ দত্তম্।
বিবেকিনাং জ্ঞানময়ং হি চক্ষুরজ্ঞানিনাং.চর্মময়ং চ চক্ষুঃ॥

গীতায় ভগবান তিন প্রকার চক্ষু অর্থাৎ চোখের দ্বারা দেখার শক্তির বর্ণনা করেছেন—স্বচক্ষু (চর্ম চক্ষু), দিব্যচক্ষু এবং জ্ঞানচক্ষু। প্রাণীর নিজ নিজ চোখে যে দেখার শক্তি, তা তাদের 'স্বচক্ষু'। এই বিষয়ে ভগবান

অর্জুনকে বলেছেন যে, 'তুমি তোমার স্বচক্ষুর দ্বারা আমার দিব্য বিশ্বরূপ দেখতে পাবে না'—'ন তু মাং শক্যসে দ্রষ্টুমনেনৈব স্বচক্ষুষা' (১১।৮)। এর তাৎপর্য হচ্ছে যে, এই চর্মচক্ষু দ্বারা কেবল জাগতিক বস্তুসমূহই দেখা যায়, ভগবানের বিরাট রূপ এবং শরীর ও সংসার থেকে নিজের পৃথক্ (ভেদ) ভাবকে দেখা সম্ভব নয়।

যার দ্বারা ভগবানের অলৌকিক, দিব্য, ঐশ্বর্যযুক্ত বিরাটরূপ দেখার শক্তি হয় তথা যার দ্বারা ভূত, বর্তমান এবং ভবিষ্যতের কথা জানবার এবং প্রাণীদের মনে উদ্ভূত ভাব দেখার সামর্থ্য হয়, তাকে দিব্যচক্ষু বলা হয়। গীতায় অর্জুন ভগবানের কোন এক অংশে স্থিত বিশ্বরূপ দেখার বাসনা প্রকাশ করেন, তখন ভগবান তাঁর বিশ্বরূপ দেখাবার সময় চার বার, 'দেখ ! দেখ ! দেখ ! দেখ !' বলেছেন, কিন্তু অর্জুনের বিশ্বরূপ দর্শন হয় নি। তখন ভগবান অর্জুনকে বললেন, 'ভাই ! তুমি চর্মচক্ষুতে আমার এই রূপ দেখতে পাবে না ; তাই আমি তোমাকে দিব্যচক্ষু দিচ্ছি, তার দ্বারা তুমি আমার বিরাটরূপ দর্শন করো'— 'দিব্যং দদামি তে চক্ষুঃ পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্' (১১।৮)। এই বলে ভগবান অর্জুনকে দিব্যচক্ষু দিলেন এবং অর্জুন ভগবানের অলৌকিক, দিব্য বিশ্বরূপ দর্শন করলেন, যা সাধারণ মানুষের পক্ষে অত্যন্ত দুর্লভ। তাঁর মহিমা বর্ণনা করতে গিয়ে ভগবান বলেছেন যে, 'আমি কৃপা করে এই তেজোময় দিব্যরূপ দেখিয়েছি, তোমার আগে এইরূপ আর কেউ দেখেনি (১১।৪৭)।' এর তাৎপর্য এই যে, এইপ্রকার বিশ্বরূপ দর্শন কেবল দিব্য চক্ষু দ্বারাই সম্ভব, চর্মচক্ষু বা জ্ঞানচক্ষু দ্বারা নয়।

একমাত্র স্বয়ং ভগবান অথবা ভগবানের অধিকারলব্ধ ভগবৎস্বরূপ কারক মহাপুরুষই কৃপা করে কোন কৃপাপ্রার্থীকে দিব্যচক্ষু দিতে পারেন। দিব্যচক্ষু দানের ক্ষমতা যে কোন সন্ত বা মহাত্মার নেই। শ্রীবেদব্যাস মহাভারত যুদ্ধের প্রারম্ভে নিজ কৃপাপাত্র সঞ্জয়কে দিব্যচক্ষু দান করেছিলেন ; ফলে সঞ্জয়েরও বিশ্বরূপ দর্শন হয়েছিল (১৮।৭৭)।

যার দ্বারা নিত্য-অনিত্য, সৎ-অসৎ, জড়-চেতন, যথাযথ বোধ হয় এবং যার দ্বারা নিজ-স্বরূপের অনুভব হয়, তাকে 'জ্ঞানচক্ষু' (বিবেক-দৃষ্টি) বলা হয়। গীতায় ভগবান দুই স্থানে জ্ঞানচক্ষুর বর্ণনা করেছেন— ১) যে ব্যক্তি জ্ঞানচক্ষু দ্বারা ক্ষেত্র এবং ক্ষেত্রজ্ঞের বিভেদকে ঠিক বুঝতে পারে তথা কার্য-কারণ সহিত সমস্ত প্রকৃতি থেকে নিজেকে পৃথক্ অনুভব করতে পারে, সে পরমাত্মাকে প্রাপ্ত করে (১৩।৩৪) ; এবং ২) জন্ম-মৃত্যু এবং ভোগ-বিলাসের সময়ও এই জীবাত্মা স্বরূপতঃ নির্লিপ্তই থাকে—এই কথা অনুরাগলিপ্ত বিষয় ভোগকারী মূঢ় মনুষ্য অবগত নয়, জ্ঞানচক্ষুসম্পন্ন জ্ঞানী ব্যক্তিরাই জানেন (১৫।১০)। এইপ্রকার বোধ জ্ঞানচক্ষু দ্বারাই হয়, চর্মচক্ষুতে নয়।

ভগবান এবং তত্ত্বজ্ঞ জীবন্মুক্ত মহাপুরুষই শুধু জ্ঞানচক্ষু দিতে সক্ষম, সাধারণ মানুষ নয়। কারণ সাধারণ মানুষের নিজেরই এরূপ জ্ঞানচক্ষু নেই, তবে সে অপরকে কীভাবে দেবে ? শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত সৎ-অসৎ বিবেচনা করতে পারেন, কিন্তু কারো জ্ঞানচক্ষু উন্মীলন করতে সক্ষম নন ; কেননা তাঁর নিজেরই সেই অনুভূতি নেই। এর অর্থ এই নয় যে, কোন মানুষই জ্ঞানচক্ষু প্রাপ্ত হতে পারবে না, বরং বলা যায় কেবল মানুষই জ্ঞানচক্ষু লাভের অধিকারী। শুধু তাই নয় অত্যন্ত পাপী ব্যক্তিও তা প্রাপ্ত হওয়ার অধিকারী (৪।৩৬)। এই মনুষ্য শরীর কেবল মুক্তি লাভের জন্যই সৃষ্ট হয়েছে। সুতরাং মানুষ নিজ ভক্তি দ্বারা ভগবানের কাছ থেকে জ্ঞানচক্ষু প্রাপ্ত হতে সক্ষম (১০।১১), অথবা তত্ত্বজ্ঞ জীবন্মুক্ত মানুষের আনুকূল্যে প্রাপ্ত হতে সক্ষম হয় (৪।৩৪) অথবা তৎপরতার সঙ্গে শ্রদ্ধাপূর্বক সাধন ভজনে রত থাকলেও পেতে পারে (৪।৩৯)। জ্ঞানচক্ষু প্রাপ্ত হলে মোহ চিরদিনের মতো দূরীভূত হয় (৪।৩৫)।

(৩৪) গীতায় ত্রিবিধ অনুরক্তি (প্রীতি)

সাধ্যসাধনরূপাভ্যাং প্রসিদ্ধা রতয়স্ত্রিধা।
আদৌ সাধনরূপাস্তা অন্ততো যান্তি সাধ্যতাম্॥

একটির নাম 'আসক্তি', অপরটির নাম 'রতি' বা প্রীতি। এই দুইটি সর্বতোভাবে পৃথক্। আসক্তিতে নিজ সুখের ইচ্ছা থাকে আর রতিতে নিজ সুখ (স্বার্থ) ত্যাগ করে অপরের হিতের ইচ্ছা থাকে। আসক্তি জড়ত্ব থেকে আসে এবং রতি চিন্ময় তত্ত্ব থেকে হয়। আসক্তি থেকে পতন হয়, রতিতে কল্যাণ হয়। আসক্তিতে বিনাশশীল বস্তুর গুরুত্ব থাকে, রতিতে অবিনাশী তত্ত্বের গুরুত্ব থাকে। আসক্তি থেকে অবনতি, রতি থেকে উন্নতি হয়। আসক্তি থেকে অনুরাগের সুখ হয়, রতিতে আগেই সুখ। সাত্ত্বিক সুখও যদি আসক্তিগত হয় তাও বন্ধনের কারণ হয়। অতএব মানুষের আসক্ত হওয়া উচিত নয়, বরং রতি রাখা উচিত। গীতায় কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ এবং ভক্তিযোগ—এই তিন যোগেই আসক্তি ত্যাগ করার কথা বলা হয়েছে। যেমন—কর্মযোগে **'মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্মণি'** (২।৪৭), **সংঙ্গং ত্যক্ত্বাত্মশুদ্ধয়ে** (৫।১১) ইত্যাদি, জ্ঞানযোগে **'অসক্তিরনভিষ্বঙ্গঃ'** (১৩।৯), **'অসক্তবুদ্ধিঃ সর্বত্র'** (১৮।৪৯) ইত্যাদি এবং ভক্তিযোগে **'সঙ্গং ত্যক্ত্বা'** (৫।১০) **'সঙ্গবর্জিতঃ'** (১১।৫৫) **'সঙ্গবিবর্জিতঃ'** (১২।১৮) ইত্যাদি।

এই তিন যোগেই প্রথমে সাধনে প্রীতি হয় পরে সেই প্রীতি নিজ লক্ষ্য ধ্যেয়তে পরিণত হয় ; যেমন—

কর্মযোগীর নিজ কর্তব্য-কর্ম করার রতি (প্রীতি) হয়— **স্বে স্বে কর্মণ্যভিরতঃ** (১৮।৪৫), পরে ঐ রতি নিজের স্বরূপে হয় **'যস্ত্বাত্মরতিঃ'** (৩।১৭)।

জ্ঞানযোগী সকলকে নিজ স্বরূপ বলে মনে করেন। তাই তাঁর প্রথমে সমস্ত প্রাণীর হিতে প্রীতি জন্মে—**'সর্বভূতহিতে রতাঃ'** (৫।২৫ ; ১২।৪) এবং পরে ঐ রতি বা প্রীতি নিজ স্বরূপে হয়— **'যোঽন্তঃসুখোঽন্তরারামঃ'** (৫।২৪)।

ভক্তিযোগীর রতি প্রথমে ভগবানের নামজপ, কীর্তন-কথকতা, গুণগান ইত্যাদিতে হয়—**'রমন্তি'** (১০।৯), পরে সেই রতি ভগবানে হয়—**'প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোঽত্যর্থমহং স চ মম প্রিয়ঃ'** (৭।১৭)।

আকর্ষণ বা টান দুইপ্রকারের হয়— একপ্রকার আকর্ষণ পরমাত্মার দিকে হয় আর একটি সংসারের দিকে হয়। পরমাত্মার দিকে যে আকর্ষণ হয় তাতে স্বয়ং চেতনেরই প্রাধান্য এবং সংসারের দিকে যে আকর্ষণ, তাতে ইন্দ্রিয় এবং অন্তঃকরণের প্রাধান্য থাকে। বাস্তবে উভয়ক্ষেত্রেই স্বয়ং (চেতনের)-এরই আকর্ষণ হয় ; কিন্তু শরীরের সঙ্গে নিজ সম্বন্ধ মেনে নেওয়ায় মানুষ এই দুই আকর্ষণের পার্থক্য করতে পারে না। তবে হ্যাঁ, জড় ও চেতনের ভেদ বোধ হলে দুই আকর্ষণের পার্থক্য বোঝা যায় অর্থাৎ সংসারের আকর্ষণ দূর হয় এবং স্বয়ং যথাবৎ অনুভূত হয়।

যে আকর্ষণ পরমাত্মার দিকে হয়, তাকে রতি, প্রেম, আত্মীয়তা বলে এবং যে আকর্ষণ সংসারের দিকে হয়, তাকে আসক্তি, কাম, মমতা বলে।

সপ্তম অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকে **'ময্যাসক্তমনাঃ'** পদে ভগবানে মন আসক্ত হওয়ার কথা বলা হয়েছে। মনের এই আসক্তিকে বাস্তবে রতিই বলা হয়। সংসারে আসক্ত হলে মন সংসারে লিপ্ত হয়ে যায়, কিন্তু ভগবানে আসক্ত হলে মন ভগবানে লীন হয়ে যায়, অর্থাৎ মনের তখন আর স্বতন্ত্র সত্তা (অস্তিত্ব) থাকে না—

বিষয়ান্ ধ্যায়তশ্চিত্তং বিষয়েষু বিষজ্জতে।
মামনুস্মরতশ্চিত্তং মষ্যেব প্রবিলীয়তে॥

(শ্রীমদ্ভাগবত ১১।১৪।২৭)

(৩৫) গীতায় বিবিধ বিদ্যা

বাসুদেবেন গীতায়াং মনুষ্যাণাং হিতায় হি।
কথিতা বিবিধা বিদ্যা দর্পণে তু প্রধানতঃ॥

১) শোক-নিবৃত্তির বিদ্যা—জগতে দুই প্রকারের শোক হয়, মৃতের জন্য এবং যে জীবিত তার জন্য। এই শোক দূর করার জন্য ভগবান সৎ-অসৎ এবং শরীরী ও শারীরিক বিবেকের বর্ণনা করেছেন। যা সৎ, অবিনাশী এবং অপরিবর্তনশীল তার কখনো অ-ভাব হয় না আর যা অসৎ, বিনাশশীল এবং পরিবর্তনশীল তার ভাব হয় না অর্থাৎ তার অ-ভাব হয়। তাৎপর্য এই যে, এই শরীরস্থিত জীবাত্মার কখনো অ-ভাব হয় না। এই শরীরে কৌমার্য, যৌবন ও বৃদ্ধাবস্থা আসে, কিন্তু শরীরস্থিত জীবাত্মা যেমন তেমনি থাকে। আবার এক শরীর নষ্ট হলে অপর শরীরের প্রাপ্তিতেও জীবাত্মা একই থাকে, তার কোন পরিবর্তন হয় না। সকল শরীরই জন্ম নেয় এবং ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, কিন্তু এই শরীরে যিনি স্থিত, তাঁকে কেউ কখনো নাশ করতে পারে না। শরীরাদি অসৎ বস্তুর জন্য শোক হতেই পারে না ; কারণ এ কখনো স্থায়ী নয় এবং শরীরস্থিত সৎ-এর জন্যও শোক হতে পারে না ; কারণ এর কখনও মৃত্যু হয় না (২।১১-৩০)—এভাবে ভগবান শোক নিবৃত্তির উপায় জানিয়েছেন।

যে সাধক ভগবদ্মুখী, যে কেবল তাঁকেই চায়, পরমাত্মার কৃপায় তার মধ্যে দৈবী সম্পত্তি অর্থাৎ সদ্গুণ, সদাচার স্বাভাবিকভাবে প্রকাশিত হয়। কিন্তু সাধক নিজের মধ্যে দৈবী সম্পত্তির ন্যূনতা মনে করে বিমর্ষ ও চিন্তিত হয়। তাই ভগবান বলেছেন যে, সাধকের নিজের মধ্যে দৈবী গুণ কম আছে ভেবে দুঃখিত ও চিন্তিত হওয়া উচিত নয় (১৬।৫)। এর তাৎপর্য এই যে, সাধক ভগবদাশ্রয়ে থেকে দুর্গুণ-দুরাচার যেন ত্যাগ করে এবং ভগবানকে স্মরণ করে, কিন্তু তার শোক বা চিন্তা করা উচিত নয়।

ভগবান ব্যতীত অন্য কারো আশ্রয় গ্রহণ করলেই দুঃখ আসে। কারণ অপর কিছুই চিরস্থায়ী নয়, তবু মানুষ এগুলি রাখতে চায় ; অতএব অপরের বিয়োগে বা বিয়োগের আশঙ্কায় মানুষ শোকগ্রস্ত হয়। এইজন্য ভগবান বলেছেন যে, 'তুমি সমস্ত আশ্রয় ত্যাগ করে কেবল আমার শরণাগত হও ; আমি তোমাকে সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত করে দেব, তুমি শোক-চিন্তা কোরো না (১৮।৬৬)।'

২) কর্তব্য-কর্ম করার বিদ্যা—মানুষের কর্তব্য-কর্ম করারই অধিকার রয়েছে, ফলের প্রাপ্তিতে নয় (২।৪৭)। কারণ ফল প্রাপ্তি মানুষের অধীনে নয় বরং ভগবানের বিধানের অধীন। ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করতে মানুষ সর্বদা স্বাধীন, সমর্থ। অতএব ভগবান বলেন যে, সাধক কর্মফল ত্যাগ করলে নৈষ্ঠিক শান্তি প্রাপ্ত হন (৫।১২)। সেইজন্য মানুষের ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করে নিজ কর্তব্য পালন করা উচিত ; কারণ, ফলাসক্তিরহিত হয়ে নিজ কর্তব্য পালন করলে পরমাত্মাকে লাভ করা যায় (৩।১৯)।

৩) ত্যাগের বিদ্যা—প্রত্যেক কর্মের আরম্ভ এবং শেষ আছে তথা তার সঙ্গে ফলেরও সংযোগ ও বিয়োগ আছে। অতএব যে কর্ম এবং কর্মফল আমাদের সঙ্গে থাকে না এবং আমরাও যার সঙ্গে থাকতে পারি না এইরূপ কর্মের সঙ্গে সম্পর্ক বা তার ফলপ্রাপ্তির আশা ত্যাগ করে তৎপরতার সঙ্গে শাস্ত্রবিহিত কর্তব্য-কর্ম পালন করা উচিত (১৮।৯)।

৪) পাপভাগী না হওয়ার বিদ্যা—জয়-পরাজয়, লাভ-ক্ষতি, সুখ-দুঃখ ইত্যাদিতে সমভাব রেখে নিজ কর্তব্য পালন করলে, তাতে পাপ হয় না (২।৩৮)। এর তাৎপর্য হচ্ছে যে, সমভাব এলে পুরানো পাপ নষ্ট হয়ে যায় এবং নতুন করে কোন পাপ আর হয় না (৪।২৩)। যে ব্যক্তি সর্বপ্রকার আশা ত্যাগ করে শুধু শরীর নির্বাহের জন্য কর্ম করেন, তাঁরও পাপ হয় না (৪।২১), কারণ তাঁর মধ্যে সুখসম্পর্কিত বুদ্ধি বা ভোগবদ্ধি বুদ্ধি থাকে না। স্বভাবসম্মত কর্ম অর্থাৎ শাস্ত্রসম্মত কর্ম করলে মানুষ পাপভাগী হয় না (১৮।৪৭)। যার মধ্যে, 'আমি কর্ম করি'—এই অহংকার নেই এবং যার মধ্যে, 'আমি যেন কর্মের ফল লাভ করি'—এইরূপ ফলেচ্ছা নেই, সেই ব্যক্তি সমস্ত প্রাণিকুলকে ধ্বংস করলেও, ধ্বংস করেন না

বা তার জন্য পাপভাগীও হন না (১৮।১৭)।

৫) ভোজন করার বিদ্যা—ভোজন করার পর উদরের কথা চিন্তায় না আসাই উচিত। উদরের চিন্তা আসে— অধিক ভোজন হলে অথবা অল্প ভোজন হলে। সুতরাং ভোজন যেন বেশী না হয় বা কমও না হয়, বরং পরিমিত যেন হয় (৬।১৬-১৭)। ভোজ্যপদার্থ যেন সাত্ত্বিক হয় (১৭।৮)।

চতুর্থ অধ্যায়ের চব্বিশ সংখ্যক শ্লোকটি ধর্মনিষ্ঠ ব্যক্তিরা খাদ্যগ্রহণের সময় উচ্চারণ করেন, যার দ্বারা ভোজন কর্মটিও যজ্ঞে পর্যবসিত হয়।

৬) বিষয়-সেবনের বিদ্যা—অনুরাগের সঙ্গে বিষয়ের চিন্তা করা মাত্র মানুষের পতন হয় (২।৬২-৬৩)। কিন্তু বশীভূত ইন্দ্রিয় দ্বারা রাগ-দ্বেষরহিত হয়ে যদি বিষয় সেবন করা হয়, তাতে প্রসন্নতা প্রাপ্তি হয় অর্থাৎ হৃদয় নির্মল ও স্বচ্ছ হয় এবং সমস্ত দুঃখ নাশ হয়। স্বচ্ছ হৃদয়সম্পন্ন মানুষের বুদ্ধি শীঘ্রই পরমাত্মায় স্থিত হয় (২।৬৪-৬৫)।

৭) ভগবানের প্রতি অর্পণ করার বিদ্যা—অর্পণ করার বিভাগ দুটি—পদার্থ অর্পণ এবং ক্রিয়া অর্পণ। যে ব্যক্তি শ্রদ্ধা ও ভক্তিপূর্বক পত্র, পুষ্প, ফল, জল ইত্যাদি ভগবানের নিকট অর্পণ করে,তার সেই ভক্তিপূর্বক দেওয়া উপহার ভগবান গ্রহণ করেন (৯।২৬)। যদি কারো কাছে ভগবানকে অর্পণ করার মত পত্র-পুষ্পাদিও কিছু না থাকে, তাহলে সে যা কিছু করে, যা কিছু খায়, যে যজ্ঞ করে, যা কিছু দান করে এবং যে জপ-তপাদি করে, সবই ভগবানকে যেন অর্পণ করে দেয়। এরূপ করলে সে সমস্ত শুভাশুভ কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে যায় (৯।২৭-২৮)।

৮) দান করার বিদ্যা—দান প্রায় সকলেই করে কিন্তু তা বিধিপূর্বক হয় না। ভগবান দান করার কথায় বলেছেন যে, দেশ, কাল, পাত্র বিচার করে 'দান করা কর্তব্য' — এই বাক্য স্মরণে রেখে প্রত্যুপকারের ভাবনা না রেখে দান করা উচিত। এই দানকে সাত্ত্বিক দান বলা হয় এবং এই দান বন্ধন থেকে মুক্তিকারী হয় (১৭।২০)।

৯) যজ্ঞ করার বিদ্যা—যে যজ্ঞই করা হোক না কেন, তার ফলের কামনা ত্যাগ করে করা উচিত অর্থাৎ 'যজ্ঞ করা কর্তব্য'—এইভাবে যজ্ঞ করলে, তা সাত্ত্বিক যজ্ঞ হয় এবং তা যজ্ঞকারীকে গুণাতীত করে (১৭।১১)।

১০) কর্মকে সৎ-এ পরিণত করার বিদ্যা—যদি সমস্ত কর্ম ভগবানের প্রতি অর্পণ করা যায়, তাহলে তা সৎ কর্মরূপে বিবেচিত হয়, নির্গুণ কর্ম হয় (১৭।২৭)।

১১) পূজা করার বিদ্যা—মানুষ নিজ বর্ণ ও আশ্রম অনুযায়ী যে শাস্ত্রবিধিসম্মত কর্ম করে, সেই কর্মকে তার পরমাত্মার পূজন সামগ্রীরূপে করা উচিত। অর্থাৎ সেই কর্ম দ্বারা সর্বব্যাপী পরমাত্মার পূজা করা এবং সেই কর্ম পরমাত্মার প্রীত্যর্থে করা এবং সেই কর্মে নিজের কোন স্বার্থ না রাখা উচিত (১৮।৪৬)।

১২) সমতা লাভ করার বিদ্যা—রাগ-দ্বেষের বশবর্তী হয়ে কোন কার্য করা উচিত নয় (৩।৩৪)। যে কাজই কর, শাস্ত্রবিধি মেনে করা উচিত। কারণ কর্তব্য-অকর্তব্য নির্ধারণে শাস্ত্রই প্রমাণ (১৬।২৪)। মহাপুরুষদের আচরণ এবং বচন অনুসারেই সকল কর্ম করা উচিত (৩।২১)। কর্মের সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে সমভাব থাকা উচিত (২।৩৮, ৪৮)। এইরূপ করলে নিজের মধ্যে সমত্বভাব আসে। এর তাৎপর্য এই যে, কোন কাজ করতে রাগ-দ্বেষ করা উচিত নয় এবং তার ফলে (পরিণামে) আহ্লাদিত বা বিমর্ষ হওয়া উচিত নয়। প্রতিটি মানুষ এরূপ করতে অর্থাৎ রাগ-দ্বেষ পরিত্যাগ করতে সর্বতোভাবে স্বাধীন এবং সক্ষম।

♠ ♠ ♠

(৩৬) গীতা এবং সংসারে থাকার বিদ্যা

পরিস্থিতিষু সর্বাসু স্থিতা মুচ্যন্ত বন্ধনাৎ।
এষা বিদ্যা নবা প্রোক্তা গীতায়াং হরিণা স্বয়ম্॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা একটি অতি অসামান্য গ্রন্থ। এটি অধ্যয়ন করলে, এর গভীরে প্রবেশ করলে মনে হয় যে, যাকে তত্ত্বজ্ঞান, ভগবদ্দর্শন, ভগবৎপ্রেম, কল্যাণ, মুক্তি বা উদ্ধার বলা হয়, গীতা অনুসারে সাংসারিক ছোট বড়

সকল কাজ করেও তা প্রাপ্ত হওয়া যায় (২।৩৮ ; ৩।১৯ ; ৪।২০ ; ১৮।৫৬)। আশ্রম পরিবর্তন তথা ভজন, ধ্যান, জপ-কীর্তন ইত্যাদি কর্ম পরিবর্তনের যে কথা বলা হয়েছে, গীতা অনুসারে তা অপরিহার্য নয়। মানুষ যে বর্ণে, যে আশ্রমে, যে স্থানে থাকে, সে অবস্থাতে থেকেই নিষ্কামভাবে তৎপরতাপূর্বক নিজ কর্তব্য পালন করে পরমাত্মা-প্রাপ্ত হতে পারে (১৮।৪৫)। তার জন্য নতুন করে কোন আশ্রম পরিবর্তন করার প্রয়োজন নেই। তাৎপর্য এই যে, গীতায় প্রাপ্ত পরিস্থিতির সদুপযোগ দ্বারা কল্যাণের কথা বলা হয়েছে অর্থাৎ ব্যবহারে পরমার্থ সিদ্ধির কলা বা বিদ্যা বলা হয়েছে। এই বিদ্যাতে দুটি বিষয় প্রধান—নিজ কর্তব্য পালন করা এবং অপরের অধিকার রক্ষা করা (২।৪৭ ; ৩।১০-১২)।

আত্মীয়-কুটুম্বদের আমাদের ওপর যে অধিকার আছে, কোন প্রত্যুপকারের আশা না করে, লোভের ইচ্ছা না রেখে, কোনও পরিস্থিতিতে নতিস্বীকার না করে, তা রক্ষা করা উচিত। যাতে তারা সুখী থাকে, তাদের কল্যাণ হয়, মঙ্গল হয় সেই কাজে নিজ বুদ্ধি, বল, যোগ্যতা শেষ বিন্দু পর্যন্ত অর্পণ করা উচিত। ভগবানের আদেশ মনে করে অত্যন্ত তৎপরতার সঙ্গে তাদের সেবা করা উচিত। যেমন মা-বাবার যা আকাঙ্ক্ষা, যা প্রয়োজন, তা যদি ন্যায়যুক্ত হয় এবং তা পূরণ করার সামর্থ্য থাকে, তবে তা পূর্ণ করা উচিত। কিন্তু তারা আমাদের অনুকূল হবে—এই ইচ্ছা কিছুমাত্র পোষণ করা উচিত নয়। এইভাবে ভাই-ভাজ, স্ত্রী, পুত্র, চাকর, প্রতিবেশী ইত্যাদি সকলেরই মঙ্গল করা উচিত। এমনকি গৃহপালিত গরু, মোষ, মেষ, ছাগল প্রভৃতিরও মঙ্গল চিন্তা করা উচিত। নিজ গৃহের ইঁদুর, মশা, ছারপোকা ইত্যাদি বিরক্ত করলে এদের হাত থেকে নিজেদের রক্ষা করার অধিকার আমাদের আছে। কিন্তু তাদের মারবার অধিকার আমাদের নেই। এরূপ সাপ, বিছা, ইত্যাদি বিষযুক্ত জীব ঘরে ঢুকে পড়লে তাদের বন্দি করে অন্য কোন স্থানে ছেড়ে দেওয়ায় কোন দোষ নেই। কিন্তু তাদের মারার কোন অধিকার আমাদের নেই। বাড়ী-ঘর ইত্যাদি বস্তুর সদ্ব্যবহার করে তার শ্রীবৃদ্ধি করা উচিত কিন্তু মনোভাব এমন হবে যেন আমি এখানে অতিথি, একদিন চলে যেতে হবে, কিন্তু আমার পুত্র-পৌত্রাদি থাকবে, তাদের সুবিধার্থে বাড়ী ঘর সুরক্ষিত রাখতে হবে ; যদিও পুত্র-পৌত্রাদিও একদিন চলে যাবে তবুও আমায় তাদের সুখ-আনন্দ দিতে হবে, সেবা করতে হবে, মঙ্গল করতে হবে। এইভাবেই নিজ পল্লী, গ্রাম, প্রান্ত, দেশ ইত্যাদিরও সেবা করা উচিত।

স্বয়ং পরমাত্মার অংশ হওয়ায় নিত্য, কিন্তু সে এই অনিত্য শরীরকে 'আমি' এবং 'আমার' মনে করে তার অধীন হয়ে পড়ে (১৫।৭)। তাৎপর্য হলো, মানুষ সংসারে কিভাবে থাকতে হয় তা জানে না। যদি সে জগৎ-সংসারে থাকার বিদ্যা হৃদয়ঙ্গম করতে পারে, তাহলে শরীরাদিতে আমিত্ব ভাব করে লিপ্ত হয়ে পরাধীন হয়ে পড়তে হয় না।

জগতে হাজার হাজার বাড়ী আছে, যদি এ সমস্ত ভেঙে পড়ে যায়, তাহলে আমাদের তেমন দুঃখ হয় না, আমরা এ থেকে মুক্ত থাকি। কিন্তু যে বাড়ীটিকে আমরা নিজের বলে মনে করি, তার জন্য আমরা মায়াবদ্ধ হয়ে পড়ি। তাই বাড়ী ইত্যাদিকে শুধু ব্যবহারের জন্য নিজের বলে মনে করতে হবে। যেমন কেউ যখন অফিসে যায় তখন সেখানকার চেয়ার, টেবিল ইত্যাদি ব্যবহারের জন্য নিজের বলে মনে করে, কিন্তু মনে মনে জানে যে সেটি তার নয়। তেমনি সাংসারিক বস্তুগুলিও ব্যবহারের জন্য নিজের বলে মানা উচিত, মনে মনে কখনোই নিজের বলে মনে করা উচিত নয়। এইরূপ পিতামাতাকেও সেবা করার জন্যই নিজের বলে মনে করা উচিত। সেবার জন্য নিজের বলে মনে করলে স্বয়ং তাতে লিপ্ত হয় না।

যেমন কোন পথিক রাত্রে যদি কোন ভদ্রলোকের বাড়ীতে আশ্রয় নেয়, তাহলে সে আন্তরিকভাবে চাইবে যে, 'এই বাড়ীতে যারা থাকে তাদের যেন আমার দ্বারা কোন অসুবিধা না হয়, তাদের অবশিষ্ট ভোজ্য পদার্থ আমি ভোজন করব, রাত্রে যদি চোর-ডাকাত আসে বা অন্য কোন বিপদ আসে, তাহলে সেই বিপদ নিজের উপরে নিয়ে তাদের সহায়তা করব, কারণ আমি আগন্তুক আর এরা সব এই গৃহের মালিক।' আমরাও এইরূপ এই জগতে পথিকরূপে এসেছি। সুতরাং আমাদের জীবননির্বাহের জন্য কাউকে বিন্দু মাত্র কষ্ট দেওয়া উচিত নয়, বরং কায়-মন-বাক্য, অর্থ, বিদ্যা, বুদ্ধি, যোগ্যতা, পদ অধিকার ইত্যাদি অপরের সেবায় লাগানো প্রয়োজন। কারণ এই সমস্ত জিনিসই আমরা এখানে অর্থাৎ জগৎ-

সংসার থেকেই পেয়েছি। পাওয়া জিনিস নিজের হয় না, অপরের কাজে লাগানোর জন্যই হয়, সুতরাং তা অপরের জন্যই খরচ করা উচিত।

তাৎপর্য এই যে, এই জগতে নিজের স্বার্থের জন্য নয়, সংসারের অপর ব্যক্তিদের জন্যই থাকতে হয়—এটিই হলো সংসারে থাকার আসল বিদ্যা।

(৩৭) গীতায় বিবিধ আদেশ

দুর্যোধনেন কৃষ্ণেন ব্রহ্মণা ফাল্গুনেন চ।
যা যা আজ্ঞাশ্চ সংদত্তাস্তত্তাৎপর্যং চ কথ্যতে॥

গীতায় দুর্যোধন দ্রোণাচার্যকে দক্ষতার সঙ্গে যুদ্ধ করবার জন্য এবং সেনানায়কদের ভীষ্মকে রক্ষা করার জন্য বিশেষভাবে আদেশ দিয়েছিলেন, রথীরূপী অর্জুন সারথিরূপী ভগবানকে আদেশ দিয়েছিলেন, ব্রহ্মা কল্পের প্রারম্ভে দেবতা এবং মনুষ্যগণকে নিজ নিজ কর্তব্য-কর্মরূপ যজ্ঞ পালন করার জন্য আদেশ দিয়েছিলেন। ভগবান জ্ঞানীদের কর্তব্য-কর্মগুলিকে উপেক্ষা না করার আদেশ দিয়েছেন এবং যখন অর্জুন যুদ্ধ করতে অস্বীকার করেছিলেন, তখন ভগবান অর্জুনকে আশ্বাসপূর্বক অনেক প্রকার আদেশ দিয়েছিলেন।

দুর্যোধন দ্রোণাচার্যকে পাণ্ডবদের বিশাল সৈন্য সমারোহের প্রতি লক্ষ্য করার জন্য বললেন—'পশ্য' (১।৩)। এর তাৎপর্য এই যে, আপনি এই সেনা-সমারোহকে বিশেষভাবে লক্ষ্য করুন। এদের সাধারণ মনে করে উপেক্ষা করবেন না, এটি যুদ্ধের ব্যাপার। এই সেনাদলে মস্ত সব শূরবীর আছেন। সুতরাং আপনি সতর্ক থাকুন।

পাণ্ডবদের সেনা সামনেই দণ্ডায়মান ছিল ; সুতরাং দুর্যোধন বলেছিলেন 'দেখুন' (**পশ্য**)। কিন্তু নিজ সৈন্য-সামন্ত দ্রোণাচার্যের পশ্চাৎদিকে দণ্ডায়মান ছিল, তাই দুর্যোধন '**নিবোধ**' (১।৭) ক্রিয়া প্রয়োগ করে বলেন যে, 'আপনি আমাদের সেনাদের সম্বন্ধে অবহিত হোন এবং অবগত হন যে, আমাদের সেনাও বল ইত্যাদিতে কোন প্রকারে কম নয়।' আবার দুর্যোধন নিজ নিজ স্থানে অবস্থিত সমগ্র সেনানায়কদের আদেশ দিয়েছিলেন পিতামহ ভীষ্মকে সর্বতোভাবে রক্ষা করার জন্য—'**অভিরক্ষন্তু**' (১।১১) বলে। কারণ ভীষ্মকে রক্ষা করলে আমরা সবাই রক্ষা পাব এবং তিনি সেনাপতি থাকলে আমরা বিজয়ী হব। এইভাবে দুর্যোধন দ্রোণাচার্যকে '**পশ্য**' এবং '**নিবোধ**' পদ দ্বারা যে আদেশ দিয়েছিলেন তা সম্মানপূর্বকই দিয়েছিলেন, রাজা হলেও দুর্যোধন নিজে দ্রোণাচার্যের কাছে গিয়ে 'আচার্য' বলে অত্যন্ত সম্মান সহকারে আদেশ দেন। এই আদেশেও একপ্রকার প্রার্থনা নিহিত ছিল।

অর্জুন '**রথং স্থাপয়**' (১।২১) পদটিতে ভগবানকে দুই পক্ষের সেনার মধ্যে রথ স্থাপন করতে বললেন। অর্জুনের মধ্যে যদিও ভগবানের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাভাব ছিল, তবুও রথীর কর্তব্য করতে গিয়ে সারথিরূপী ভগবানকে এই আদেশরূপ বাক্য অর্জুন বলেছিলেন। এইপ্রকার '**ব্রূহি**' (২।৭ ; ৫।১), '**শাধি**' (২।৭) ; '**বদ**' (৩।২) ; '**কথয়**' (১০।১৮) ; '**দর্শয়**' (১১।৪, ৪৫) ; '**প্রসীদ**' (১১।২৫ ; ৩১ ; ৪৫) ; এবং '**ভব**' (১১।৪৬) পদেও মনে হয় যে, অর্জুন ভগবানকে আদেশ করছেন, কিন্তু বাস্তবিক তা নয়, বরং এগুলি সবই প্রার্থনা ; কারণ ব্যাকরণে '**লোট্**'-লকার 'প্রার্থনা' অর্থেও ব্যবহার হয়।

ব্রহ্মা হলেন সৃষ্টির রচয়িতা। সুতরাং তাঁর ইচ্ছা যে সৃষ্টি কার্য সুচারুরূপে সঞ্চালিত হোক, যা কেবল মানুষ এবং দেবতার মধ্যে স্নেহ-ভালবাসা থাকলেই হতে পারে। তাই ব্রহ্মা '**প্রসবিষ্যধ্বম্**', '**ভাবয়ত**' (৩।১০-১১) পদে মানুষকে আদেশ দিয়েছেন যে, 'তোমরা কর্তব্য-কর্মরূপ যজ্ঞ দ্বারা নিজেদের উন্নতি করো এবং এই যজ্ঞ দ্বারা

দেবতাদেরও সংবর্ধিত করো।' আবার 'ভাবয়ন্তু' (৩।১১) পদদ্বারা দেবতাদের আদেশ দিয়েছেন যে, 'তোমরা নিজ নিজ অধিকার অনুযায়ী মানুষদের উন্নত করো। এইভাবে একে অপরকে সংবর্ধিত করতে থাকলে তোমরা পরম শ্রেয়কে প্রাপ্ত হবে।'

জ্ঞানী মহাপুরুষদের ভগবান আদেশ দেন যে, আমি যেমন কর্তব্য-কর্ম উপেক্ষা করি না (৩।২২-২৪), সেইরূপ তাদেরও কর্ম উপেক্ষা করা উচিত নয় ; বরং কর্মে আসক্ত অজ্ঞান ব্যক্তিগণ যে তৎপরতায় কাজ করে, সেই তৎপরতার সঙ্গেই তাঁরা যেন আসক্তি-বর্জিত হয়ে লোকসংগ্রহকে উদ্দেশ্য রেখে কর্তব্য-কর্ম পালন করেন'—'**কুর্যাৎ**' (৩।২৫)। তাঁরা যেন কর্মে আসক্ত ব্যক্তিদের 'জ্ঞানের তুলনায় কর্ম তুচ্ছ, যারা কর্ম করে তারা অযোগ্য ও নিম্নস্তরের, জ্ঞানের অধিকারীরা উচ্চস্তরের' এইরূপ বুদ্ধিভেদ জন্মাবার চেষ্টা না করেন, '**ন বুদ্ধিভেদং জনয়েৎ**' (৩।২৬)। বরং কর্মে আসক্ত সাধারণ মানুষদেরও আসক্তি বর্জিত ভাবে কর্ম করাতে সচেষ্ট হবেন 'যোজয়েৎ' (৩।২৬)। জ্ঞানী যদি কর্ম না করেন তাতেও কিছু যায় আসে না কিন্তু তিনি যেন নিজ বচন দ্বারা, ভাব দ্বারা, অজ্ঞান ব্যক্তিগণকে কর্ম থেকে বিচলিত না করেন '**ন বিচালয়েৎ**' (৩।২৯)। এর তাৎপর্য এই যে, কর্মে আসক্ত ব্যক্তিগণ কর্তব্য-কর্ম থেকে যেন বিচলিত না হয়, জ্ঞানী ব্যক্তিদের সেই দিকে বিশেষ সতর্ক দৃষ্টি রাখা উচিত।

গীতায় ভগবান অর্জুনকে কয়েকটি আদেশ দিয়েছিলেন, যেমন—অর্জুন যুদ্ধ করতে ইচ্ছুক ছিলেন না ; অতএব ভগবান '**উত্তিষ্ঠ**' (২।৩৭ ; ৪।৪২), 'যুদ্ধায় যুজ্যস্ব' (২।৩৮), 'যুধ্যস্ব' (৩।৩০ ; ১১।৩৪) এবং 'যুধ্য' (৮।৭) পদগুলির দ্বারা অর্জুনকে যুদ্ধ করার নির্দেশ দিলেন। অর্জুন আজ্ঞাপালনকারী ছিলেন। যেখানে ভগবানের কথা অর্জুনের পছন্দ হয় নি সেখানে তিনি বলেছেন, 'ভগবান ! আপনি কেন আমাকে এই ঘোর কর্মে প্রবৃত্ত করছেন (৩।১)'? এতে প্রমাণিত হয় যে ভগবানের কথায় অর্জুন নিজ কল্যাণ বিধায় যুদ্ধের মত ঘোর কর্মেও প্রবৃত্ত হতে পারেন অর্থাৎ ভগবান আদেশ দিলে তিনি তা অগ্রাহ্য করবেন না, বরং সেইরূপই করবেন।

ভগবান অর্জুনকে কর্মযোগের বিষয়ে এই সমস্ত আদেশ দিয়েছিলেন—'**বিদ্ধি**' (৩।৩৭ ; ৪।১৩ ; ৩২ ; ৬।২), '**মা কর্মফলহেতুর্ভূঃ**' (২।৪৭), '**যোগস্থঃ কুরু কর্মাণি**' (২।৪৮), '**যোগায় যুজ্যস্ব**' (২।৫০), '**নিয়তং কুরু কর্ম**' (৩।৮), '**সমাচর**' (৩।৯, ১৯), '**কুরু কর্মৈব**' (৪।১৫) ইত্যাদি। জ্ঞানযোগের বিষয়ে এই সমস্ত আদেশ দিয়েছিলেন—'**বিদ্ধি**' (২।১৭; ৪।৩৪ ; ১৩।২ ; ১৯ ; ২৬) '**শৃণু**' (১৩।৩) প্রভৃতি। ভক্তিযোগের বিষয়ে এই আদেশ দিয়েছিলেন— '**বিদ্ধি**' (৭।৫, ১০, ১২ ; ১০।২৪ ; ২৭), '**শৃণু**' (৭।১ ; ১০।১), '**মামনুস্মর**' (৮।৭), '**পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্**' (৯।৫ ; ১১।৮), '**উপধারয়**' (৭।৬ ; ৯।৬), '**কুরুষ**' (৯।২৭), '**প্রতিজানীহি**' (৯।৩১), '**ভজস্ব মাম্**' (৯।৩৩), '**নিবেশয়**' (১২।৮), '**ইচ্ছ**' (১২।৯), '**মা শুচঃ**' (১৬।৫ ; ১৮।৬৬) ইত্যাদি। সাম্যভাবে স্থিত থাকার জন্য আজ্ঞা দিয়েছিলেন—'**তস্মাদ্যোগী ভবার্জুন**' (৬।৪৬), '**যোগযুক্তো ভবার্জুন**' (৮।২৭)। এছাড়া অন্য বিষয়েও ভগবান কয়েকটি আদেশ দিয়েছিলেন ; যেমন '**কুরূন্ পশ্য**' (১।২৫), '**ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ**' (২।৩), '**তিতিক্ষস্ব**' (২।১৪), '**যশো লভস্ব**' (১১।৩৩) ইত্যাদি।

উপরিউক্ত আদেশগুলি লক্ষ্যণীয় যে, যেখানে অর্জুন প্রশ্ন করেছেন, সেখানে ভগবান প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে সেই অনুযায়ী আদেশ দিয়েছেন। কিন্তু ভগবান যে স্থানে নিজে থেকে উপদেশ দিয়েছেন, সেস্থানে অর্জুনকে ভক্তিযোগের আদেশই দিয়েছেন।

ভগবান যেখানে আদেশ দেন, সেখানে তাঁর প্রতি সংলগ্ন হবার কথাও বলেন এবং জগৎ-সংসার থেকে আকর্ষণ দূর করার কথাও বলেন। যেখানে ভগবান শুধু সংসার থেকে মমত্ব দূর করার আদেশ দেন, সেখানেও তাঁর উদ্দেশ্য সাংসারিক আসক্তি ত্যাগ করিয়ে নিজের প্রতি নিয়ে আসা। অন্যভাবে দেখলে বলা যায় যে, ভগবান যেখানে ভক্তির (নিজের প্রতি অনুরাগের) উপদেশ দেন, সেখানে ভক্তি তো আছেই, যেখানে কর্মযোগের (সংসারে আসক্তি দূর করার) আদেশ দেন,

সেখানেও ভগবানের আদেশ হওয়ায় তা ভক্তিই হয়।

ভগবান যেখানে জ্ঞানের উপদেশ দেন, সেখানেও সংসার থেকে আসক্তি দূর করার এবং নিজের প্রতি আকর্ষণের ভাব থাকে। এই ভাবই গীতায় কখনো আদেশরূপে, কখনো বিবেকরূপে আবার কখনও ভাবরূপে দেখতে পাওয়া যায়।

(৩৮) গীতায় বিভিন্ন মান্যতা

কৃষ্ণস্য ফাল্গুনস্যাপি সিদ্ধস্য সঞ্জয়স্য চ।
ভক্তসাধকয়োশ্চৈবাভক্তাসাধকয়োর্মতম্॥

১. ভগবানের মান্যতা

ভগবানের মতে ভক্তির মহত্ত্বই বেশী অর্থাৎ ভগবান ভক্তিকে বিশেষ শ্রদ্ধা করেন এবং তাকেই প্রাধান্য দিয়ে থাকেন। তিনি জ্ঞানযোগ, কর্মযোগ, ধ্যানযোগ, গীতাধ্যয়ন ইত্যাদিতে নিজের সমর্থন জানিয়েছেন, কিন্তু ভক্তির মতো প্রাধান্য দিয়ে নয়।

তৃতীয় অধ্যায়ের ত্রিশ সংখ্যক শ্লোকে ভগবান নিজ ভক্তির কথা বলেছেন এবং সেই একই কথা তিনি একত্রিশ-বত্রিশ সংখ্যক শ্লোকে অন্বয়-ব্যতিরেকে সমর্থন করে বলেছেন, 'যে মানুষ দোষ-দৃষ্টিরহিত হয়ে শ্রদ্ধাপূর্বক আমার এই মতের অনুসরণ করে, সে কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে যায়। কিন্তু দোষদৃষ্টি এবং অশ্রদ্ধাকারী যে ব্যক্তি আমার এই মত অনুসরণ করে না, তার পতন হয়।'

ধ্যানযোগীর দৃষ্টি বর্ণনা করতে গিয়ে ভগবান বলেছেন, যে ধ্যানযোগী নিজ সাদৃশ্যে সকলকে সমানরূপে দেখে এবং সুখ ও দুঃখকেও সমভাবে দেখে, তাকে যোগীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলে বিবেচনা করা হয় (৬।৩২)।

ধ্যানযোগের বর্ণনা শুনে অর্জুন যখন জানালেন যে, মনের চঞ্চলতা দূর করা বড় কঠিন, ভগবান তখন তাঁকে মনের চঞ্চলতা দূর করার জন্য দুটি উপায় বললেন। অভ্যাস ও বৈরাগ্য—এই দুটি উপায় বলে তিনি নিজের মতও এই বিষয়ে জানালেন, 'যার মন (স্ববশে) সংযত নয়, তার দ্বারা ধ্যানযোগে সিদ্ধিলাভ করা কঠিন এবং যার মন সংযত বা 'বশীভূত' সে ধ্যানযোগ দ্বারা সিদ্ধি লাভ করে—এই আমার মত (৬।৩৬)।'

যোগভ্রষ্টের বিষয়ে অর্জুনের সন্দেহ দূর করে ভগবান বলেছেন, 'যে ব্যক্তি মদ্গতচিত্তে শ্রদ্ধা ও প্রেমপূর্বক হৃদয়ে আমার ভজনা করে, সেই ভক্ত জ্ঞানযোগী, কর্মযোগী ইত্যাদি সমস্ত যোগীদের থেকেও শ্রেষ্ঠ—এই আমার মত (৬।৪৭)।'

অর্থার্থী, আর্ত, জিজ্ঞাসু এবং জ্ঞানী (প্রেমী)—এই চারপ্রকার ভক্তদের সুকৃতি এবং মহানরূপে বর্ণনা করে ভগবান বলছেন যে, জ্ঞানিভক্ত হল আমারই আত্মা স্বরূপ—এই আমার মত। কারণ তার অন্য কোন কামনা নেই, সে কেবল আমাকেই আশ্রয় করে থাকে (৭।১৮)।

দ্বাদশ অধ্যায়ের প্রারম্ভে অর্জুন প্রশ্ন করেন, ভক্তিযোগী এবং জ্ঞানযোগী এদের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ ? ভগবান তখন উত্তর দেন যে, যে ব্যক্তি আমাতে মন নিবিষ্ট করে পরম শ্রদ্ধাযুক্ত হয়ে আমার উপাসনা করে, সেই ভক্ত সর্বশ্রেষ্ঠ—এই আমার মত। (১২।২)

এই জগতে সাংসারিক যত জ্ঞান আছে, তার মধ্যে ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ, দেহ-দেহী, শরীর-শরীরী, অনিত্য-নিত্য, অসৎ-সৎ-এর জ্ঞান (বিবেক) শ্রেষ্ঠ। এরূপ জ্ঞান সমস্ত সাধনার আধার, মূল। কারণ সাধক যে কোন সাধনই করুক তাতে এই বিবেক-বোধ থাকবেই। সেইজন্য ভগবান বলেছেন, 'ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞের জ্ঞানই আমার মতে যথার্থ জ্ঞান' (১৩।২)।

অষ্টাদশ অধ্যায়ের আরম্ভে ভগবান সাংখ্যযোগ ও কর্মযোগের বিষয়ে অন্য দার্শনিকদের চারটি মত বলেছেন। এই মতগুলির তুলনা করে ভগবান বলেছেন, 'কর্ম এবং তার ফলকামনার আসক্তি ত্যাগ করে কর্তব্য-

কর্ম করা উচিত—এই আমার নিশ্চিত ও উত্তম মত (১৮।৬)।'

গীতা অধ্যয়ন ও পঠন-পাঠনের মহিমা বর্ণনা করতে গিয়ে ভগবান বলেছেন, 'যে ব্যক্তি এই গীতগ্রন্থ কেবলমাত্র অধ্যয়ন করবে, পাঠ করবে, তার দ্বারা আমি জ্ঞান যজ্ঞের মাধ্যমে পূজিত হব—এই আমার মত (১৮।৭০)।'

এইরূপে ভক্তির বিষয়ে চারটি, ধ্যানযোগের বিষয়ে দুটি, জ্ঞানযোগের বিষয়ে একটি, কর্মযোগের বিষয়ে একটি এবং গীতাধ্যয়নের বিষয়ে একটি—এই সবকটি মান্যতা বা অভিমতের তাৎপর্য এই যে, ভগবান ভক্তিকেই বেশী গুরুত্ব দিয়েছেন, শ্রদ্ধা দেখিয়েছেন।

২. অর্জুনের মান্যতা

অর্জুন ধ্যানযোগের অসিদ্ধিতে চিত্তগত চঞ্চলতাকেই কারণ মনে করে বলেছেন, 'মন বড় চঞ্চল, ইন্দ্রিয় বিক্ষোভকারী, শক্তিশালী এবং জেদী। আমি মনে করি এই মনকে নিরোধ করা বায়ুকে আবদ্ধ করার মত কঠিন (৬।৩৪)।'

ভগবানের প্রভাবের কথা শুনে এবং তাতে প্রভাবিত হয়ে অর্জুন ভগবানকে বললেন, 'হে ভগবান ! আপনি আমাকে যা কিছু বলছেন আমি তা সমস্তই সত্য বলে মানি (১০।১৪)।'

ভগবানের বিশ্বরূপ দর্শনকালে অর্জুনের ভগবানের নির্গুণ-নিরাকার, সগুণ-নিরাকার এবং সগুণ-সাকার রূপের বিশেষ বোধ জন্মেছিল। অতএব অর্জুন নিজ মত বলতে গিয়ে বলেছেন, 'আপনিই জ্ঞাতব্য অক্ষরব্রহ্ম, আপনিই এই বিশ্বের পরম আশ্রয়, আপনিই এই সনাতন ধর্মের রক্ষক এবং আপনিই সনাতন পুরুষ—এই আমার মত (১১।১৮)।'

বিশ্বরূপ দর্শন করে অর্জুনের ভগবানের প্রভাব ও মহিমা সম্বন্ধে এই জ্ঞান হয় যে, ভগবান কত প্রভাবশালী ! তখন ভগবানের প্রতি তাঁর পূর্বের আচরণের কথা স্মরণে এলে তিনি ভগবানকে বললেন, 'আমি আপনাকে আমার সখা মনে করে ধৃষ্টতার সঙ্গে হে কৃষ্ণ ! হে যাদব ! হে সখা ! এইরূপ বলেছি, তার জন্য আমি আপনার কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করছি (১১।৪১)।'

অর্জুনের কথার তাৎপর্য এই যে, তিনি তাঁর ত্রুটি বুঝতে পেরেছিলেন এবং দ্বিতীয়তঃ তিনি ভগবানের মাহাত্ম্য অনুধাবন করেছিলেন। এই দুটি কথা যদি সাধক বুঝতে পারে তাহলে তার উদ্ধার হয়।

৩. সঞ্জয়ের মান্যতা

সঞ্জয় ভগবানের প্রভাব প্রথম থেকেই অবগত ছিলেন। কিন্তু অর্জুনের ওপর ভগবানের অপার কৃপা দেখে তিনি বিশেষভাবে প্রভাবিত হলেন। অতঃপর তিনি নিজ সিদ্ধান্ত জানাচ্ছেন, 'যেখানে যোগেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং গাণ্ডীবধারী অর্জুন, সেখানেই ঐশ্বর্য, বিজয়, বিভূতি ও অখণ্ড নীতি বিরাজ করে— এই আমার মত (১৮।৭৮)।'

সঞ্জয়ের মান্যতার তাৎপর্য এই যে যুদ্ধে পাণ্ডুপুত্রগণেরই বিজয় হবে, এতে কোন সন্দেহ নেই।

৪. সিদ্ধের মান্যতা

ভগবান ধ্যানযোগের ফলের কথা জানাতে গিয়ে বলেছেন যে, আত্যন্তিক সুখ প্রাপ্ত হয়ে সিদ্ধ মহাপুরুষ আর কোন প্রাপ্তিকে তার চেয়ে বড় বলে মানেন না (৬।২২)।

যে ব্যক্তি তত্ত্বকে জানেন, তাঁর যথার্থ মতবাদ এই যে, গুণই গুণসকলের মধ্যে কার্যাদি করে অর্থাৎ প্রকৃতিজাত গুণের মধ্যেই সমস্ত ক্রিয়া হয়। এইরূপ মেনে নিয়ে তিনি ক্রিয়া ও পদার্থ দ্বারা আসক্ত হন না (৩।২৮)। সিদ্ধ ব্যক্তির এই মতবাদের তাৎপর্য হল যে তার মধ্যে কর্তৃত্ব বা ভোক্তৃত্ব থাকে না।

৫. সাধক ও অসাধকগণের মান্যতা

সাংখ্যযোগী সাধকের মত এইরূপ যে, ইন্দ্রিয়সকলই ইন্দ্রিয়ের বিষয়ে কার্যাদি করে অর্থাৎ ইন্দ্রিয় দ্বারাই সমস্ত ক্রিয়াসকল হচ্ছে, আমি কিছুই করি না (৫।৮-৯)। এর তাৎপর্য এই যে—তাঁর মধ্যে কর্তৃত্ব-ভোক্তৃত্ব থাকে না।

সংসারে আবদ্ধ, তত্ত্বকে জানে না এইরূপ অহংকারে মূঢ় চিত্ত মানুষের মতবাদ এই যে, 'আমি কর্তা (৩।২৭)।' নিজেকে কর্তা বলে মানলে ভোক্তা হতেই হয় এবং সেই ভোগের জন্য পুনরায় জন্মগ্রহণ করতে হয়। অসাধকের মতের তাৎপর্য এই যে, সে নিজেকে কর্তা বলে মনে করে এবং কর্মের ফলরূপে সুখভোগ করতে চায়।

৬. ভক্ত এবং অভক্তের মান্যতা

'ভগবান সব কিছুর মূল কারণ এবং ভগবানের থেকে সত্তার স্ফূরণ পেয়েই সংসারের সমস্ত ক্রিয়াদি সম্পন্ন হয়'—এই মনে করে ভক্তগণ শ্রদ্ধা ও প্রেমপূর্বক ভগবানের ভজনা করেন (১০।৮)। কিন্তু যারা অভক্ত, তারা ভগবানকে সাধারণ মানুষের মত শরীর-ধারণকারী, জন্ম-মৃত্যু চক্রে আবর্তনকারী বলে মনে করে (৭।২৪) থাকে।

৭. দৈবী এবং আসুরী প্রকৃতিসম্পন্নদের মান্যতা

দৈবীগুণসম্পন্ন মানুষ ভগবানকে সমস্ত প্রাণীর আদি এবং অবিনাশী জেনে অনন্যমনে ইহলোক এবং পরলোকের ভোগের কামনা ত্যাগ করে ভজনা করে (৯।১৩) থাকে।

আসুরী প্রকৃতিসম্পন্ন মানুষ মনে করে সুখভোগ এবং বিষয়-সংগ্রহ ভিন্ন আর কিছুই নেই (১৬।১১)।

এর তাৎপর্য এই যে, যে ব্যক্তি সাংসারিক ভোগ ও বিষয়সংগ্রহে প্রবৃত্ত হয়, তার মনে সংসারের প্রাধান্য এসে যায়। কিন্তু যে ব্যক্তি ভগবানে মন নিবিষ্ট করে, তার মধ্যে সংসারের গুরুত্ব দূর হয়ে ভগবানের গুরুত্ব এসে যায়। সংসারের গুরুত্ব পর-ধর্ম, কারণ সংসার নিজের নয় এবং ভগবানের গুরুত্ব স্ব-ধর্ম, কারণ ভগবান একান্ত আপনার।

(দ্বিতীয় অধ্যায়ের ছাব্বিশ সংখ্যক শ্লোকে তথা অষ্টাদশ অধ্যায়ের ঊনষাট সংখ্যক শ্লোকে উদ্ধৃত '**মন্যসে**' পদটি ভগবান মান্যতা আরোপ করার অর্থে বলেছেন, মান্যতাতে নয়। তৃতীয় অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকে আগত '**মতা**' পদও অর্জুন মান্যতার আরোপ বোঝাতেই বলেছেন, মান্যতা অর্থে নয়। এইরূপ দ্বিতীয় অধ্যায়ের পঁয়ত্রিশ সংখ্যক শ্লোকে '**মংস্যন্তে**' পদ ভগবানের দ্বারা এবং একাদশ অধ্যায়ের চতুর্থ শ্লোকে '**মন্যসে**' পদ অর্জুনের দ্বারা সম্ভাবনার অর্থে বলা হয়েছে, মান্যতার অর্থে নয়।)

(৩৯) গীতায় স্বাভাবিক ও নতুন পরিবর্তনের বর্ণনা

প্রকৃতৌ জায়তে যত্তৎ সহজং পরিবর্তনম্।
মনুষ্যঃ কুরুতে যত্তন্নূতনং পরিবর্তনম্॥

প্রকৃতি এবং প্রকৃতির কার্যরূপ সংসারে বৃদ্ধি বা ক্ষয় যা কিছু পরিবর্তন হতে থাকে, তাকে বলা হয়—'স্বাভাবিক পরিবর্তন', আর মানুষ যে নতুন কর্ম করে, তা হল—'নতুন পরিবর্তন'।

স্বাভাবিক পরিবর্তন নিরন্তর হতেই থাকে। এই পরিবর্তন মানুষ, দেবতা, ভূত-প্রেত, গন্ধর্ব, যক্ষ ইত্যাদির শরীরে তথা সূর্য, চন্দ্র, তারা, নক্ষত্র, বৃক্ষ, লতা, জন্তু ইত্যাদিতে এবং পৃথিবী, সমুদ্র, পাহাড় ইত্যাদিতেও হতে থাকে। এই স্বাভাবিক পরিবর্তনকে কোথাও প্রকৃতির দ্বারা সম্পন্ন বলা হয়েছে (১৩।২৯) আবার কোথাও গুণের দ্বারা বলা হয়েছে (৩।৩৭)। তাৎপর্য এই যে, ত্রিলোকে স্থাবর-জঙ্গম প্রাণীদের শরীরে তথা জড় পদার্থে যা কিছু পরিবর্তন হয়, তা স্বাভাবিক পরিবর্তন।

মানুষের শরীর জন্মায়, শিশু থেকে যুবক হয়, যুবক থেকে বৃদ্ধ হয় এবং পরে মারা যায় (২।১৩)—এই স্বাভাবিক পরিবর্তনের মধ্যে মানুষের নতুন পরিবর্তনও হতে থাকে। যেমন, মানুষ সাত্ত্বিক সঙ্গ, স্বাধ্যায়, জপ, ধ্যান ইত্যাদি করলে তার গতি সাত্ত্বিকতা অভিমুখে যায় ; রাজসিক সঙ্গ, স্বাধ্যায় ইত্যাদিতে তার গতি রাজসিকতার অভিমুখে যায় এবং তামসিক সঙ্গ, স্বাধ্যায় ইত্যাদির দ্বারা তার গতি তামসিকতার অভিমুখে যায়। মৃত্যুর পর সাত্ত্বিক ব্যক্তি ঊর্ধ্বগতিতে, রাজসিক ব্যক্তি মধ্যগতিতে এবং তামসিক ব্যক্তি অধোগতিতে গমন করে (১৪।১৮)।

নতুন পরিবর্তন পশু-পক্ষী ইত্যাদির মধ্যেও দেখা যায়; যেমন—শিক্ষা দিলে বাঁদরও সৈনিকের কাজ করতে পারে, সাইকেল চালাতে পারে ইত্যাদি, ইত্যাদি। কিন্তু যার দ্বারা পারমার্থিক কল্যাণ হতে পারে, সেইরূপ পরিবর্তন তার হয় না। কারণ ইতরপ্রাণী হচ্ছে ভোগযোনি এবং তাদের দ্বারা যা কিছু করা হয়, সবই হলো ফলভোগ। যদি সিংহ কোন পশুকে হত্যা করে খায় তবে তার পাপ হয় না; কারণ তা ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্যই। তাই পশু-পক্ষীদের নতুন কোন কর্ম সৃষ্ট হয় না। কিন্তু মনুষ্যজীবন কর্মযোনি। সুতরাং সে নতুন কর্ম (নতুন পরিবর্তন) করতে সক্ষম।

মানুষের জন্মসূত্রে নির্দিষ্ট যে সকল কর্ম আছে, সে সমস্তই তার পুরানো কর্ম। সেই কর্ম দ্বারা যে পরিবর্তন হয়, তার থেকেও বিশেষ রকম পরিবর্তন নতুন কর্ম দ্বারা হয়। এরূপ দেখা যায় যে, উত্তম জাতিতে জন্ম হলেও যদি উত্তম সঙ্গ, শিক্ষা না পায়, তবে সে ব্যক্তি দুরাচারী হয়ে ওঠে। সুতরাং জন্মজাত (পুরানো) কর্ম ভাল হলেও নতুন কর্ম ভাল না হলে মানুষের পতন হয়। আবার নীচ জাতিতে জন্ম নিলেও উত্তম সঙ্গ, শিক্ষা ইত্যাদি পেলে মানুষ সদাচারী হয়, সাধু-মহাপুরুষ হয়ে ওঠে, অপরের কাছে আদর্শ হয়ে ওঠে। সুতরাং জন্মজাত কর্ম ভাল না হলেও নতুন কর্ম ভাল হলে মানুষের মধ্যে বিশেষত্ব আসে।

গীতায় স্থিতপ্রজ্ঞ, গুণাতীত এবং ভক্তদের লক্ষণের বর্ণনায় নতুন পরিবর্তনের কথাই বলা হয়েছে। এই নতুন পরিবর্তন সাধনের কোন শেষ-সীমানা নেই অর্থাৎ মানুষ যেমন চাইবে নিজের মধ্যে এই নতুন পরিবর্তন আনতে পারবে। নতুন পরিবর্তনের দ্বারা মানুষ ভগবানেরও আদরণীয় হতে পারে। এই নতুন পরিবর্তনে ভক্তের শরীর চিন্ময় হয়ে যায়—যেমন ভক্তশ্রেষ্ঠ তুকারামজী সশরীরে বৈকুণ্ঠে চলে গিয়েছিলেন ; মহামানব কবীরের শরীর ফুলে পরিণত হয়েছিল, ভক্তিমতী মীরার শরীর ভগবানের শ্রীবিগ্রহতে লীন হয়ে গিয়েছিল। ভক্তিমতী জনাবাঈ এবং ফুলীবাঈ-এর দেহ থেকে নামধ্বনি শোনা যেত। তুকারামের চরণচিহ্নে বিট্‌ঠল নামের ধ্বনি বার হত। দেহরক্ষার পরেও চোখামেলার হাড়ে বিট্‌ঠল নামের ধ্বনি শোনা যেত।

ভগবান গীতায় চার প্রকার ভক্তের কথা বলেছেন—অর্থার্থী, আর্ত, জিজ্ঞাসু এবং প্রেমী (৭।১৬)। এই চারপ্রকার ভক্ত জন্ম দ্বারা নয়, বরং কর্ম দ্বারা নির্ণীত হয়। এদের এই উদ্যোগ প্রারব্ধজনিত নয়, বরং নতুন কর্মের পরিবর্তন। এই নতুন পরিবর্তনের সুযোগ মনুষ্য শরীরেই রয়েছে, অন্য শরীরে নয়। কোন কোন স্থলে (ব্যতিক্রমরূপে) অবশ্য পশু-পক্ষী ইত্যাদির মধ্যেও এই নতুন পরিবর্তন দেখা যায়।

শিশুর রক্ষণাবেক্ষণ ও পালন-পোষণ এসব হচ্ছে মায়ের দ্বারা সম্পাদিত নতুন পরিবর্তন বা কর্ম। কিন্তু শিশুর বৃদ্ধিপ্রাপ্তি নতুন কর্ম নয়, কারণ মা শিশুকে বড় করে না, সে স্বাভাবিকভাবেই বড় হতে থাকে। আহার গ্রহণ করা নতুন কর্ম, কিন্তু ভোজ্যপদার্থ হজম হওয়া স্বাভাবিক কর্ম (পরিবর্তন)। ঔষধ সেবন করা নতুন কর্ম, কিন্তু আরোগ্য লাভ স্বাভাবিক কর্ম। এইরূপ শরীরের জন্ম, বৃদ্ধি ইত্যাদি স্বতঃ স্বাভাবিক হয়। কিন্তু মনুষ্যজীবনে শুভাশুভ কর্ম করে স্বর্গ-নরক অথবা চুরাশী লক্ষ জন্ম ভোগ করা, ভগবদ্-ভজনা করা, প্রাণীদের সেবা করা, নিজ কর্তব্য-কর্ম পালন করা, নিজ বিবেককে শ্রদ্ধা জানানো ইত্যাদি হল নতুন কর্ম (পরিবর্তন)। এই নতুন কর্মের কারণেই অত্যন্ত পাপী ও দুরাচারী ব্যক্তিও জ্ঞান প্রাপ্ত হয়ে নিজেকে উদ্ধার করতে পারে (৪।৩৬), ভগবৎপ্রাপ্তিকে দৃঢ় নিশ্চয় করে অনন্য ভক্ত হতে পারে তথা চির শান্তি লাভ করতে পারে (৯।৩০-৩১) এবং কেবলমাত্র লোকসংগ্রহের উদ্দেশ্যে কর্তব্য-কর্মের পরম্পরাকে সুরক্ষিত রাখার জন্য এবং অপরের হিতের জন্য কর্তব্য-কর্মের পালন করে সমস্ত পাপের বিনাশ করতে পারে (৪।২৩)।

(৪০) গীতায় স্বভাবের বর্ণনা

চতুর্বিধঃ স্বভাবশ্চ প্রাকৃতো বর্ণগস্তথা।
উৎপাদিতশ্চ সঙ্গেন শুদ্ধশ্চ জ্ঞানিনাং স্মৃতঃ॥

গীতায় চার প্রকারের স্বভাবের বর্ণনা করা আছে, যা এইরূপ—

১. সমষ্টি প্রকৃতিগত স্বভাব

গাছপালার জন্ম, বড় হওয়া, ফল-ফুল উৎপন্ন হওয়া ইত্যাদি এবং ঠিক এইরূপই মানুষ, পশু-পক্ষী ইত্যাদির জন্ম, শিশু থেকে যুবা এবং যুবা থেকে বৃদ্ধে পরিণত হওয়া তথা শরীরের বল হ্রাস, বৃদ্ধি যা কিছু পরিবর্তন এই জগৎ সংসারে হচ্ছে তা সমস্তই সমষ্টি প্রকৃতির স্বভাব।

সমষ্টি প্রকৃতিগত স্বভাব কারো পক্ষে দোষযুক্ত বা অহিতকর নয়, বরং শুদ্ধ ও পবিত্রকারী হয়ে থাকে। শিশু থেকে যুবা এবং যুবা থেকে বৃদ্ধ হওয়া এবং রোগী থেকে নীরোগ এবং নীরোগ থেকে রোগীতে[১] পরিণত হওয়া কি দোষের ? না, তা নয়, এটি তো পাপ-পুণ্যের ফল ভোগ করিয়ে শুদ্ধ করে দেয়। কিন্তু প্রকৃতির এই স্বভাবে (স্বাভাবিক পরিবর্তনে) মানুষ স্বেচ্ছাচার করতে থাকে অর্থাৎ রাগ-দ্বেষপূর্বক শাস্ত্র আদেশের বিরুদ্ধে স্বেচ্ছাচারী হয়ে কর্ম করতে থাকে, যার দ্বারা সে বদ্ধ হয়ে পড়ে।

এই স্বভাবের বর্ণনা গীতায় কয়েকটি স্থানে আছে ; যেমন—প্রকৃতির গুণগুলির দ্বারাই সমস্ত ক্রিয়া সম্পন্ন হয় (৩।২৭) ; গুণই গুণসকলের ওপর ক্রিয়া করছে (৩।২৮, ১৪।২৩) ; ইন্দ্রিয়ই ইন্দ্রিয়বিষয়ে প্রবৃত্ত হচ্ছে (৫।৮-৯) ; প্রকৃতিই সমস্ত কর্ম করে (১৩।২৯)। এর তাৎপর্য এই যে, সমষ্টি প্রকৃতির দ্বারা সম্পন্ন ক্রিয়াগুলিতে মানুষের স্বেচ্ছাচারী হওয়া বা তার দ্বারা সুখী বা দুঃখী হওয়া উচিত নয়।

২. বর্ণগত স্বভাব

এটি ব্যক্তিগত স্বভাব, কারণ এটি পূর্বকর্ম অনুসারে এবং ইহ জন্মের মাতা-পিতার রজঃবীর্য অনুযায়ী সৃষ্ট হয়। সুতরাং এই স্বভাবও কোন ব্যক্তির জন্য দোষের ও পাপের হয় না। যেমন—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র—এই চার বর্ণের যে পৃথক্ পৃথক্ কর্ম হয়, সেই কর্মের বিভিন্নতার কারণেই এই বর্ণগত স্বভাব তৈরী হয়।

ব্রাহ্মণের খাওয়া-দাওয়া ইত্যাদি কর্মে স্বাভাবিক এক পবিত্রতা থাকে ; ক্ষত্রিয়দের যুদ্ধ করা, দান করা ইত্যাদি কর্মে স্বাভাবিকভাবেই নির্ভয়তা, শৌর্য, উদারতা থাকে। বৈশ্যদের মধ্যে চাষ করা, গো-পালন, ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি কর্মে স্বাভাবিক প্রবৃত্তি থাকে এবং শূদ্রদের মধ্যে সমস্ত বর্ণের মানুষকে সেবা করার এক স্বাভাবিক প্রবৃত্তি দেখা যায়। বর্তমান সময়ে এই চার বর্ণের মধ্যে যদি এইরূপ স্বভাব না দেখতে পাওয়া যায়, তাহলে সঙ্গ-দোষই তার কারণ। এইজন্যই মানুষের ভাল সঙ্গ গ্রহণ এবং খারাপ সঙ্গ ত্যাগ করা উচিত।

এই বর্ণগত (জাতিগত) স্বভাবের বর্ণনা গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ে বিস্তারিতভাবে করা হয়েছে (১৮।৪২-৪৮, ৫৯-৬০)। এর তাৎপর্য এই যে, মানুষের নিজ বর্ণগত স্বভাব অনুযায়ী নিজ নিজ শাস্ত্রবিহিত কর্তব্য তৎপরতার সঙ্গে নিষ্কামভাবে পালন করা উচিত এবং কুসঙ্গ সর্বতোভাবে ত্যাগ করা উচিত। এইরূপ করলে মানুষের স্বাভাবিকভাবে কল্যাণ হতে পারে।[২]

---

[১]রোগ দুই প্রকারে হয়—প্রারব্ধজনিত এবং কুপথ্য জনিত। প্রারব্ধের জন্য যে অসুখ হয় তা ওষুধে সারে না। যতক্ষণ প্রারব্ধের বেগ থাকে, ততক্ষণ রোগ থাকে। কুপথ্যজনিত অসুখ পথ্য সেবন ও ঔষধ গ্রহণে সারে। এখানে (সমষ্টি প্রকৃতিগত স্বভাবে) প্রারব্ধ জনিত রোগের কথা বলা হয়েছে।

[২]যে মানুষ নিজ কল্যাণ চায়, তার শাস্ত্রসম্মত ভোগসমূহও ত্যাগ করতে হয় এবং পরম্পরাগত স্বাভাবিক দোষযুক্ত আচরণ ত্যাগ করে শুদ্ধ, পবিত্র আচরণ গ্রহণ করতে হয়।

৩. উৎপাদিত স্বভাব

এই স্বভাব মানুষের নিজের সৃষ্ট এবং তা প্রত্যেকের ভিন্ন ভিন্ন হয়। মানুষ যেমন শাস্ত্রাদি পাঠ করে, যেমন লোকজনের সঙ্গ করে, যেমন পরিবেশে থাকে, তেমনি তার স্বভাব সৃষ্টি হয়। এর তাৎপর্যরূপে বলা যায় যে, বিধিসম্মত কর্ম, সৎসঙ্গ তথা পবিত্র আচরণ দ্বারা স্বভাব শুধরে যায় এবং নিষিদ্ধ কর্ম, কুসঙ্গ তথা অপবিত্র আচরণ দ্বারা স্বভাব দূষিত হয়ে যায় (১৬।১-১৮)। এই স্বভাব শোধরাবার জন্য গীতায় ভগবান স্থানে স্থানে নানাপ্রকার উপদেশ দিয়েছেন (৩।৩০, ৩৪ ; ১৬।২১, ২৪ ইত্যাদি)। এর তাৎপর্য হল, নিজের স্বভাবকে শুদ্ধ, পবিত্র করে তুলতে মানুষ স্বতন্ত্র এবং সক্ষম, এতে কেউই পরাধীন বা হীনবল নয়। সুতরাং মানুষকে খুব সাবধানে থেকে নিজ স্বভাবকে শুদ্ধ করে তুলতে হবে। স্বভাব খারাপ হবার কোন সুযোগই দেওয়া উচিত নয়। এতেই মনুষ্যজন্মের সাফল্য নিহিত।

৪. জ্ঞানীর স্বভাব

জ্ঞানীর স্বভাব খুবই শুদ্ধ হয়। সকল জ্ঞানী (তত্ত্বজ্ঞ জীবন্মুক্ত) মহাপুরুষদের স্বভাবে শুদ্ধি, নির্মলতা, ত্যাগ, বৈরাগ্য ইত্যাদি সমানভাবেই থাকে। কিন্তু বর্ণ, আশ্রম, সাধনা-পদ্ধতি ইত্যাদির জন্য তাঁদের স্বভাব এবং আচরণ একরকম হয় না, কিছু ভিন্নতা থাকে (৩।৩৩)। তাঁদের এ ভিন্নতা দোষের নয়, কারণ তাঁদের মধ্যে রাগ-দ্বেষ, অহং-অভিমান এই দোষগুলি থাকে না। এর তাৎপর্য এই যে তত্ত্বজ্ঞান লাভের পরেও জ্ঞানী মহাপুরুষগণ নিজ নিজ বর্ণ, আশ্রম, সাধন-পদ্ধতি অনুযায়ীই আচার-আচরণ এবং কর্তব্য-কর্ম করেন।

উপরিউক্ত স্বভাবগুলির বর্ণনা করার তাৎপর্য এই যে, মানুষ নিজের স্বভাব সংশোধন করবে, তাকে নষ্ট হতে দেবে না এবং কারো স্বভাব নিয়ে দোষারোপ করবে না। নিজে সাবধান হয়ে দুষ্কর্ম পরিত্যাগ করে সৎকর্ম গ্রহণ করবে। এইরূপ করায় সে সম্পূর্ণ স্বাধীন। সৎ-শাস্ত্র, সৎপুরুষের সঙ্গ এবং নিজের উৎসাহ ও ধৈর্য —এগুলি তার সহায়ক হয়।

জ্ঞাতব্য

মনুষ্যলোকে স্বভাবই প্রধান। এই ব্যক্তি সজ্জন, এ বড় ভাল, এ দুষ্ট, এ দ্বেষপরায়ণ, এ খুব খারাপ, এ চোর বা ডাকাত, এ বড় ঠগ, এ বড় প্রতারক—ইত্যাদি যতপ্রকার সংজ্ঞা আছে তা সবই স্বভাবকে নিয়ে বলা হয়। স্বভাব অনুযায়ীই পরলোকে গতি হয়। মানুষ নিজ স্বভাব যেরূপ তৈরী করে, সেই অনুযায়ী ভগবান তাকে পরের জন্ম দেন।

মনুষ্যজন্ম শুধুমাত্র স্বভাবকে শুদ্ধ করার জন্যই লাভ হয়, কাজেই খারাপ স্বভাব ত্যাগ করে ভালো স্বভাব গ্রহণ করাই মানুষের প্রধান কর্তব্য। নিজ স্বভাব বদলাতে প্রত্যেক মানুষই স্বাধীন। ধনী হওয়া, উচ্চপদ প্রাপ্ত করা ইত্যাদিতে তার সেরূপ স্বাধীনতা নেই—যেরূপ নিজ স্বভাবকে শুদ্ধ করাতে রয়েছে। যদি মানুষ ভালো সঙ্গ করে, ভালো বই পড়ে, স্বভাব সংশোধনের চেষ্টা করে তবে সে নিজ স্বভাবকে খুব শীঘ্রই এবং সহজে শুদ্ধ করতে পারে। কিন্তু যদি সে কুসঙ্গ করে, খারাপ মানের বই পড়ে, খারাপ চিন্তাধারায় উৎসাহিত হয়, তাহলে সে মন্দ স্বভাবসম্পন্ন হয়।

মনুষ্যজন্ম পেয়েও নিজ স্বভাবকে শুদ্ধ না করার চেষ্টা একটা বড় ক্ষতি ; কারণ এই মনুষ্য-জন্মেই নিজ স্বভাবকে পরিশুদ্ধ করে মানুষ উন্নত হতে পারে, জীবন্মুক্ত হতে পারে ; তত্ত্বজ্ঞ হতে পারে, ভগবদ্‌ভক্ত হতে পারে। অন্য যোনিতে এরূপ সুযোগ পাওয়া কঠিন ; কারণ সেইসব জন্মে এরূপ হয় না, সেই সামগ্রীও থাকে না বা এরূপ সামর্থ্যও থাকে না, যাতে সে নিজ স্বভাব শুদ্ধ করতে পারে, নিজেকে উদ্ধার করতে পারে।

মানুষের যা কিছু সম্মান বা প্রতিষ্ঠা সমস্তই স্বভাবের কারণেই হয়। কোন ব্যক্তি যদি বর্ণ, আশ্রম ইত্যাদিতে উচ্চ হয়, উচ্চপদে আসীন হয়, কিন্তু তার স্বভাব যদি খারাপ হয় তাহলে, লোকে স্বার্থসিদ্ধির জন্য তার সামনে চুপ করে থাকতে পারে, ভয় পেয়ে তার প্রশংসা করতে পারে, তাকে সম্মান দেখাতে পারে কিন্তু অন্তর থেকে তাকে শ্রদ্ধা করবে না। তাদের মনের মধ্যে এই অভিযোগ থাকবে, 'কী করা যায়, এই লোকটি তো বদ্‌স্বভাব, কিন্তু কাজের জন্যই আমাকে এর তোষামোদ করতে হচ্ছে।' মানুষের মনে যুধিষ্ঠিরের প্রতি যে সম্মান এবং দুর্যোধনের প্রতি যে ঘৃণা তা তাদের স্বভাবেরই জন্য।

মানুষ স্বার্থ ও অভিমান ত্যাগ করে যদি অপরের সেবা

করে, অপরের মঙ্গল কামনা করে, তাহলে তার স্বভাব খুব শীঘ্র সংশোধিত হতে পারে। স্বভাবের সংশোধন হলে সে নিজের তথা বিশ্বের উদ্ধারকর্তা হতে সক্ষম হয়। বটবৃক্ষ ইত্যাদি যেমন খুব বেড়ে ওঠে, কিন্তু দুর্বা ছোটই থেকে যায়, যদিও আকাশের তরফ থেকে কোন বাধা নেই, তেমনি মানুষ নিজ স্বভাব সংশোধন করে অনেক উন্নত হতে পারে, তারজন্য ভগবানের তরফ থেকে কোন বাধা নেই। এর অর্থ হল যেমন বৃক্ষাদির আকাশের দিকে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হবার কোন সীমা নেই, তেমনি মানুষেরও উন্নত হবার কোন সীমা নেই।

স্বভাব প্রধানতঃ দুই প্রকারের হয়—সমষ্টি স্বভাব এবং ব্যষ্টি স্বভাব। যাতে কোনপ্রকার উদ্যোগ, পরিশ্রম করতে হয় না এবং যার দ্বারা স্বাভাবিকভাবে পরিবর্তনরূপ ক্রিয়া হয়, তা হচ্ছে 'সমষ্টি (প্রাকৃত) স্বভাব'। যেমন গ্রীষ্মকালে কখনও বেশী গরম পড়ে কখনও কম পড়ে ; কখনও হাওয়া বয়, কখনও বয় না, শীতকালে কখনও খুব ঠাণ্ডা পড়ে, কখনও কম পড়ে। বর্ষাকালে কখনও বেশী বৃষ্টি হয়, কখনও আবার কম আবার কখনও একেবারে বৃষ্টি হয় না, শিশু জন্মায়, বড় হয়ে যুবক হয়, শেষে বৃদ্ধ হয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হয়, গাছপালা জন্মায়, বেড়ে ওঠে, পড়ে যায়, শুকিয়ে যায়, নতুন বাড়ী পুরানো হয়ে যায়—এই সবই সমষ্টি প্রকৃতির স্বভাব। এই প্রাকৃত স্বভাব পরিবর্তন করা যায় ; যেমন পরমাণু বোমা ইত্যাদির বিস্ফোরণে সমষ্টি প্রকৃতিতে বিকৃতি আসে।

ব্যষ্টি-স্বভাব সকলের একপ্রকার হয় না। কারোর স্বভাব শান্ত, কারো বা ভয়ানক আবার কারো বা মূঢ় (তমোগুণী) স্বভাব হয়। যার স্বভাব শান্ত, সে সৎসঙ্গ, সৎশাস্ত্র, সৎবিচার ইত্যাদির দ্বারা নিজ শান্ত স্বভাবের বিশেষভাবে শ্রীবৃদ্ধি ঘটাতে পারে। যার ভয়ানক স্বভাব, সে যদি ঠিক করে যে, 'আমার নিজের স্বভাব বদলাতে হবে, নম্র করতে হবে', তবে সে সৎসঙ্গ, সদ্বিচার ইত্যাদির দ্বারা নিজ স্বভাবকে শান্ত, সৌম্য করে তুলতে পারে। যার মূঢ় স্বভাব, সেও যদি সৎসঙ্গ করে, সৎশাস্ত্র পড়ে, সু-অভ্যাস করে, তাহলে নিজ স্বভাবকে সুন্দর করে গড়ে তুলতে পারে। তবে এতে তাকে কিছুটা কষ্ট স্বীকার করতে হবে। কিন্তু যত কঠিনই হোক সেই ব্যক্তি তার স্বভাব বদলাতে, সুন্দর করে গড়ে তুলতে সম্পূর্ণ স্বাধীন ও সক্ষম।

(৪১) গীতায় দৈবী এবং আসুরী সম্পদ্

অভয়াদিগুণৈর্যুক্তা সম্পদ্ দৈবীতি কথ্যতে।
দম্ভদর্পাভিমানাদিরাসুরী সম্পদা মতা॥

দৈবী এবং আসুরী—এই দুটি শব্দের মধ্যে 'দেব' নাম দেবতাদের নয়, তা হলো পরমাত্মার ; এবং 'অসুর' নাম রাক্ষসদের নয়, তা আসলে প্রাণে রমণকারীদের নাম। গীতায় 'দেবদেব' (১০।১৫) ; 'দেবম্' (১১।১১ ; ১৪) ; 'দেবদেবস্য' (১১।১৩) ; 'দেব' (১১।১৫) ইত্যাদি পদে পরমাত্মার উদ্দেশ্যেই 'দেব' শব্দ প্রয়োগ করা হয়েছে। 'আসুরং ভাবম্' (৭।১৫) ; 'আসুরঃ' (১৬।৬) ; 'আসুরনিশ্চয়ান্' (১৭।৬) ইত্যাদি পদ প্রাণে আসক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য 'অসুর' শব্দের প্রয়োগ হয়েছে।

'দেব' অর্থাৎ পরমাত্মার যত গুণ আছে সেগুলিকে 'দৈবী গুণ' বলে। এই দৈবীগুণ পরমাত্মাকে প্রাপ্ত করার পুঁজি হওয়ায় একে 'দৈবী সম্পদ্' বলা হয়—'দৈবী সম্পদ্বিমোক্ষায়' (১৬।৫)। সাধকেরা এই দৈবী সম্পদের আশ্রয় নিয়ে ভগবানের ভজনা করেন (৯।১৩)।

'অসু' প্রাণের নাম। সেই প্রাণে যে রমণ করে, প্রাণের ভরণ-পোষণ-রক্ষণ করতে চায়, তাকে অসুর বলে ;

এবং ঐসব অসুরদের যে স্বভাব, যে গুণ থাকে তাকেই 'আসুরী গুণ' বলে। এই আসুরীগুণ মানুষকে বারংবার জন্ম-মৃত্যু চক্র, চুরাশী লক্ষ যোনি এবং নরকে নিয়ে যাওয়ার কারণ হওয়ায় তাকে আসুরী সম্পদ্ বলে—**'নিবন্ধায়াসুরী মতা'** (১৬।৫)। মূঢ় ব্যক্তিগণই আসুরী সম্পদের আশ্রয় নেয় (৯।১২)।

সংসার থেকে বিমুখ হয়ে এবং দৈবী সম্পদের আশ্রয় নিয়ে পরমাত্মার প্রাপ্তি লাভ করতে ইচ্ছুক ব্যক্তি দুই প্রকারের হয়—

১) সগুণোপাসক (ভক্ত)—সগুণোপাসকদের মধ্যে শ্রদ্ধা, বিশ্বাস এবং ভাবের প্রাধান্য হয় ; অতএব সে **'অভয়ং সত্ত্বসংশুদ্ধিঃ------নাতিমানিতা'** (১৬।১-৩)—এই ছাব্বিশটি গুণ ধারণ করে। এই সাধক সর্বত্র ভগবানকে দেখে এবং সর্বপ্রথম অভয় হয়ে যায়, তখন তার মধ্যে অমানিত্ব স্বাভাবিকভাবে এসে যায়।

২) নির্গুণোপাসক (জ্ঞানী)—নির্গুণ উপাসকদের শরীর-শরীরীর বিবেক-বিচারের প্রাধান্য থাকে, সুতরাং সে **'অমানিত্বমদম্ভিত্ব-----তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনম্'** (১৩। ৭-১১)—এই কুড়ি প্রকার গুণ ধারণ করে। এইরূপ সাধকে প্রথমে অমানিত্ব ভাব আসে এবং তারপর সে সর্বত্র পরমাত্মাকে অনুভব করে অভয় হয়ে যায়।

উপরিউক্ত দুই প্রকারের সাধকদের মধ্যে দৈবী সম্পদ্ সাধন রূপে থাকে। সিদ্ধ মহাপুরুষদের মধ্যে এই দৈবী সম্পদ্ স্বতঃ স্বাভাবিকভাবে থাকে। বাস্তবে সিদ্ধ মহাপুরুষ গুণাতীত ; কিন্তু তিনি সাধন অবস্থার প্রথমদিকে দৈবী সম্পদের সহায়েই সাধনা করেছেন। সুতরাং সিদ্ধ হওয়ার পরও তাঁর দৈবী-স্বভাব বজায় থাকে। ঐ সিদ্ধপুরুষদের মধ্যে সিদ্ধভক্তদের স্বাভাবিক দৈবী সম্পদের গুণের বর্ণনা দ্বাদশ অধ্যায়ের ত্রয়োদশ শ্লোক থেকে ঊনবিংশ শ্লোক পর্যন্ত করা হয়েছে এবং সিদ্ধ-জ্ঞানীদের স্বাভাবিক দৈবী সম্পদের গুণের বর্ণনা চতুর্দশ অধ্যায়ের বাইশ থেকে পঁচিশ সংখ্যক শ্লোক পর্যন্ত করা হয়েছে।

আসুরী সম্পদ ধারণকারীও দুই প্রকারের হয়—

১) সকামভাবে দেবতাদের উপাসনাকারী—সকামভাবে দেবতাদির পূজা-উপাসনা করে ব্রহ্মলোক পর্যন্ত গমনকারী সমস্ত মানুষই আসুরী সম্পদের অধিকারী। কারণ তাদের উদ্দেশ্য ভোগ উপভোগ করা, তাই তারা ভোগেতেই আসক্ত ও তন্ময় থাকে (২।৪২-৪৪ ; ৭।২০-২৩ ; ৯।২০-২১)। এরূপ মানুষেরা যে ফল লাভ করে তা বিনাশশীল, অন্তহীন নয়—**'অন্তবত্তু ফলং তেষাম্'** (৭।২৩) এবং তারা পুনঃপুনঃ জন্ম-মৃত্যু চক্রে আবর্তিত হয়—**'গতাগতং কামকামা লভন্তে'** (৯।২১)।

তাৎপর্য এই যে, যাদের উদ্দেশ্য সুখ, আরাম, ভোগ-বিলাস ও বিনাশশীল পদার্থ, তারা সকলেই আসুরী সম্পদ্‌যুক্ত এবং যাদের উদ্দেশ্য ভগবানের প্রসন্নতা, লোকসংগ্রহ এবং জগতের কল্যাণে কর্ম করা, তারা সকলে দৈবী সম্পদ্‌সম্পন্ন হয়।

২) কাম-ক্রোধাদির আশ্রয় নিয়ে দুর্গুণ-দুরাচারে প্রবৃত্ত ব্যক্তি—যেসব মানুষ কাম, ক্রোধ, অহংকার ইত্যাদির আশ্রয় গ্রহণ করে তারা মিথ্যা, কপটতা, ছলনা, বিশ্বাসঘাতকতা, শঠতা, হিংসা ইত্যাদির দ্বারা অপরকে দুঃখ দেয়। এইসব ব্যক্তি পাপের তারতম্য অনুযায়ী পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, বৃক্ষ, লতা আদি আসুরী জন্ম লাভ করে (১৬।১৯) এবং কুম্ভীপাক, রৌরব ইত্যাদি নরকে গমন করে (১৬।১৬)।

এর তাৎপর্য এই যে, ভগবৎপরায়ণ হলে দৈবী সম্পদ্ প্রকট হয়, যা মানুষকে সংসারবন্ধন থেকে মুক্ত করে। পিণ্ডপোষণপরায়ণ, ভোগপরায়ণ হলে এবং নতুন নতুন বস্তু আশা করা ও প্রাপ্ত বস্তু ধরে রাখা—এই ভাব হলে আসুরী সম্পত্তি আসে, যা মানুষের বন্ধন ও পতনের কারণ। সুতরাং সাধকের উচিত যে, সে যেন দৈবী সম্পদ্‌কে গুরুত্ব দেয় এবং আসুরী ভাবকে সদা পরিত্যাগ করে। তাহলে তার উদ্দেশ্য শেষ পর্যন্ত সিদ্ধ হবেই।

(৪২) গীতার যোগ

যোগশব্দস্য গীতায়ামর্থস্তু ত্রিবিধো মতঃ।
সামর্থ্যে চৈব সম্বন্ধে সমাধৌ হরিণা স্বয়ম্॥

যুক্ত করাই হল 'যোগ'। যখন দুই স্বজাতীয় তত্ত্বের মিল হয়ে যায়, তখন তার নাম হয় 'যোগ'। আয়ুর্বেদে দুটি ওষুধ পরস্পর মিলে যাওয়াকে 'যোগ' বলা হয়। ব্যাকরণে শব্দের সন্ধিকে যোগ (প্রয়োগ) বলা হয়। পাতঞ্জল যোগদর্শনে চিত্তবৃত্তির নিরোধকেই 'যোগ' বলা হয়েছে। এইভাবে 'যোগ' শব্দের অনেক অর্থ হয়। কিন্তু গীতায় 'যোগ'-এর তাৎপর্য খুবই অসাধারণ।

গীতায় যোগ শব্দের অনেক বিচিত্র অর্থ আছে। তাকে আমরা তিনটি ভাগে ভাগ করতে পারি।

১) **'যুজির্ যোগে'**—অর্থাৎ যুজ্ ধাতু থেকে সৃষ্ট 'যোগ' শব্দ, যার অর্থ হচ্ছে—সমরূপ পরমাত্মার সঙ্গে নিত্য সম্বন্ধ ; যেমন—**'সমত্বং যোগ উচ্যতে'** (২।৪৮) ইত্যাদি। এই অর্থই গীতায় মুখ্যভাবে এসেছে।

২) **'যুজ্ সমাধৌ'**—অর্থাৎ যুজ্ ধাতু থেকে উৎপন্ন 'যোগ' শব্দ, যার অর্থ চিত্তের স্থিরতা অর্থাৎ সমাধিতে স্থিতি ; যেমন **'যত্রোপরমতে চিত্তং নিরুদ্ধং যোগসেবয়া'** (৬।২০) ইত্যাদি।

৩) **'যুজ্ সংযমনে'**—অর্থাৎ যুজ্ ধাতু থেকে সৃষ্ট 'যোগ' শব্দটির অর্থ হচ্ছে সামর্থ্য, প্রভাব ; যেমন **'পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্'** (৯।৫)।

পাতঞ্জল যোগদর্শনে চিত্তবৃত্তির নিরোধকে 'যোগ' নামে আখ্যা দেওয়া হয়েছে—**'যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ'** (১।২) এবং সেই যোগের পরিণাম বলা হয়েছে দ্রষ্টার স্বরূপে স্থিতিলাভ করা। **'তদা দ্রষ্টুঃ স্বরূপেঽবস্থানম্ বৃত্তিসারূপ্যমিতরত্র'** (১।৩-৪)। এইপ্রকার পাতঞ্জল যোগদর্শনে যোগের যে পরিণাম বলা হয়েছে, তাকেই গীতাতে 'যোগ' নামে বলা হয়েছে (২।৪৮ ; ৬।২৩)। সঠিকভাবে বলা যায় যে, গীতায় চিত্তবৃত্তি থেকে সর্বথা সম্বন্ধ-বিচ্ছেদ পূর্বক স্বাভাবিকভাবে সম-স্বরূপে স্থিতিলাভ করাকেই 'যোগ' বলা হয়েছে। সেই সমতায় স্থিতি (নিত্যযোগ) হলে আর কখনও তার থেকে বিয়োগ হয় না, কখনো বৃত্তিরূপতা হয় না, কখনো ব্যুত্থান হয় না। বৃত্তিসকল নিরোধ হলেই 'নির্বিকল্প অবস্থা' হয়, কিন্তু সমতাতে স্থিতি হলে 'নির্বিকল্প বোধ' হয়। 'নির্বিকল্প বোধ' অবস্থার অতীত এবং সম্পূর্ণ অবস্থার প্রকাশক তথা সমস্ত যোগের ফল।

জীবের পরমাত্মার সঙ্গে নিত্য সম্বন্ধ (যোগ) রয়েছে, কোন অবস্থায় বা পরিস্থিতিতেই যার বিয়োগ হয় না। কারণ, পরমাত্মারই অংশসম্ভূত হওয়ায় জীবের পরমাত্মার সঙ্গে সম্বন্ধ যেমন তেমনি থাকে। শরীর-সংসারের সঙ্গে সংযোগ হওয়ায় অর্থাৎ সম্বন্ধ মেনে নেওয়ায় সেই সম্বন্ধের (নিত্যযোগের) অনুভব হয় না। শরীর-সংসারের সঙ্গে এই মেনে নেওয়া সংযোগের বিয়োগ (সম্বন্ধ-বিচ্ছেদ, বিমুখতা) হওয়া মাত্রই ঐ নিত্যযোগের অনুভব হয়—**'তং বিদ্যাদ্ দুঃখসংযোগবিয়োগং যোগসংজ্ঞিতম্'** (৬।২৩) অর্থাৎ দুঃখের সঙ্গে সংযুক্তির বিয়োগ হওয়ার নামই 'যোগ'[১]। এর তাৎপর্য বলা হল যে, ভুলবশতঃ শরীর-সংসারের সঙ্গে মেনে নেওয়া সংযোগের বিয়োগ হয়ে যাওয়া এবং সমরূপ পরমাত্মার সঙ্গে সম্বন্ধের স্থির নিশ্চয় হয়ে যাওয়া, তাঁর অনুভব হয়ে যাওয়ার নামই 'যোগ'। এই যোগ সবসময় আছে, সর্বদেশে আছে, সমস্ত বস্তুতে আছে, সম্পূর্ণ শরীরে আছে, সমস্ত ঘটনাবলীতে আছে, সকল ক্রিয়াতে আছে। আরও বলা যায় যে, এই নিত্যযোগের বিয়োগ বলে কিছু নেই, কখনও ছিল না, কখনও হবে না, হওয়া সম্ভব নয়। গীতার এই হচ্ছে মুখ্য যোগ। এই যোগপ্রাপ্তির জন্যই গীতায় কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ, ধ্যানযোগ, অষ্টাঙ্গযোগ, প্রাণায়াম, হঠযোগ ইত্যাদি সাধনের বর্ণনা

---

[১]গীতায় 'যোগঃ কর্মসু কৌশলম্' (২।৫০) এরূপ বাক্যও আছে, কিন্তু এই বাক্য যোগের পরিভাষা নয়, বরং এর দ্বারা যোগের মহিমা বলা হয়েছে যে, কর্মে যোগই কুশলতা। যোগ ভিন্ন কর্মের আর কোন মহত্ত্ব নেই।

করা হয়েছে। কিন্তু এইসব সাধনকে যোগ তখনই বলা সম্ভব, যখন অসৎ-এর সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ হয়ে পরমাত্মার সঙ্গে নিত্য-সম্বন্ধের অনুভূতি হবে।

এই নিত্যযোগ অনুভূত না হওয়ার প্রধান কারণ হচ্ছে অসৎ সঙ্গ অর্থাৎ অসতের প্রতি আসক্তি। কারণ অসৎ-এর প্রতি আসক্তি থাকার জন্যই রাগ-দ্বেষ, অনুকূলতা-প্রতিকূলতা, ভালো-মন্দ ইত্যাদি দ্বন্দ্ব সৃষ্ট হয়। অসৎ থেকে অসঙ্গ হলেই, অসৎ-এর সম্বন্ধ-বিচ্ছেদ হলেই যোগপ্রাপ্তি হয়।

যোগপ্রাপ্তির জন্য ভগবান মুখ্যতঃ দুই প্রকার নিষ্ঠার কথা বলেছেন—(১) কর্মযোগ এবং (২) সাংখ্যযোগ (৩।৩)। অসৎ থেকে সম্বন্ধ-বিচ্ছেদ করা হল 'কর্মযোগ' এবং সৎ-এর সঙ্গে যুক্ত হওয়াকে বলে 'সাংখ্যযোগ'। কিন্তু এই দুই প্রকার নিষ্ঠাই সাধনের একান্ত নিজস্ব। ভক্তিযোগে সাধকের নিজের নিষ্ঠা নেই, বরং ভগবন্নিষ্ঠা আছে।[1] ভক্ত ভগবানের শরণাগত হলে তার ওপর সাংসারিক সিদ্ধি-অসিদ্ধির কোন প্রভাব পড়ে না। ফলে স্বাভাবিক ভাবে ভক্তের মধ্যে সমত্ব এসে যায়।

তিন যোগের দ্বারা কর্ম (পাপ) নাশ

কর্মজ্ঞানভক্তিযোগাঃ[2] সর্বেঽপি কর্মনাশকাঃ।
তস্মাৎ কেনাপি যুক্তঃ সান্নির্ঘর্মা মনুজো ভবেৎ॥

গীতায় ভগবান কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ এবং ভক্তিযোগ—তিন যোগের দ্বারাই সম্পূর্ণরূপে কর্ম (পাপ) নাশ হওয়ার কথা বলছেন ; যেমন—

১) কর্মযোগ—যে সাধক কেবল যজ্ঞ (কর্তব্য-কর্ম)-এর পরম্পরা সুরক্ষিত রাখার জন্য, লোকসংগ্রহের জন্য, সৃষ্টি-চক্রের পরম্পরা প্রবাহিত রাখার উদ্দেশ্যে কর্তব্য-কর্ম পালন করেন, অর্থাৎ অপরের জন্যই কেবল কর্ম করেন, নিজের জন্য নয়, তিনি সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হয়ে যান (৩।১৩)।

২) জ্ঞানযোগ—দেখা, শোনা এবং বোঝাতে যে সমস্ত দৃশ্য আসে তা সমস্তই অদৃশ্যতায় পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে। ইন্দ্রিয় এবং অন্তঃকরণের যত বিষয় আছে, সে সমস্তই প্রথমে ছিল না এবং পরেও থাকবে না এবং বর্তমান সময়েও প্রতিক্ষণে অভাবের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু বিষয় তথা অভাবকে জানে যে তত্ত্ব সেটি সর্বদা যেমন ছিল তেমনি থাকে। ওই তত্ত্বের কখনো অভাব হয় নি, হয় না, হবে না এবং হতেও পারে না। সেই তত্ত্ব দ্বারাই আমি-আমার, তুমি-তোমার, এটি-তার, ওটি-তাদের প্রকাশিত হয়। এই তত্ত্ব (প্রকাশ) এসবে যেমন তেমনি পরিপূর্ণভাবে থাকে। জ্বলন্ত অগ্নি যেমন কাঠকে ভস্মে পরিণত করে, তেমনি জ্ঞানরূপী অগ্নি সব কর্ম ও পাপকে ভস্ম করে দেয় (৪।৩৭)। এর অর্থ হল যে সেই জ্ঞানরূপী অগ্নিতে আমি-আমার, তুমি-তোমার, এটি-তার, ওটি-তাদের ইত্যাদি সমস্তই লীন হয়ে যায়।

৩) ভক্তিযোগ—যে সংসার-বিমুখ হয়ে শুধু ভগবানের শরণাগত হয়, ভগবান তাকে সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত করে দেন। ভগবান অর্জুনকে বলেছেন যে, তুমি সমস্ত ধর্মের আশ্রয় ছেড়ে একমাত্র আমার শরণাপন্ন হও, আমি তোমাকে সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত করে দেব, তুমি চিন্তা করো না (১৮।৬৬)।

তিন যোগের আশ্রয়ে নির্বাণ-পদ প্রাপ্তি

কর্মজ্ঞানভক্তিযোগৈর্নির্বাণব্রহ্ম গম্যতে।
উক্তমেতল্লক্ষ্যসাম্যং সাধকানাং তু গীতয়া॥

সমস্ত সাধকেরই প্রাপণীয় তত্ত্ব এক। কেবলমাত্র সাধকের শ্রদ্ধা, বিশ্বাস, স্বভাব, রুচি ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন

[1]গীতায় যেখানে কর্মযোগ ও সাংখ্যযোগ—এই দুটিকেই নিষ্ঠা বলে মানা হয়েছে, সেখানে ভক্তিযোগকে আলাদা করে না মেনে উপরিউক্ত দুই নিষ্ঠার অন্তর্গত মানা হয়েছে। তাই সেখানে সাংখ্যযোগের দুটি ভাগ হয়ে যাচ্ছে—বিচারপ্রধান সাংখ্যযোগ (১৩।১৯-৩৪) এবং ভক্তিমিশ্রিত সাংখ্যযোগ (১৩।১-১৮)। এইরূপে কর্মযোগেরও তিনটি ভাগ হয়ে যায়। যেমন, কর্মপ্রধান কর্মযোগ (১৮।৪-১২), ভক্তিমিশ্রিত কর্মযোগ (১৮।৪১-৪৮) এবং ভক্তিপ্রধান কর্মযোগ (১৮।৫৬-৬৬)। কিন্তু যেখানে ভক্তিযোগকে দুই নিষ্ঠার অন্তর্গত না মেনে পৃথক মানা হয়, সেখানে সাংখ্যযোগ এবং কর্মযোগ—দুটি নিষ্ঠা সাধকদের নিজস্ব এবং ভক্তিযোগ হচ্ছে ভগবন্নিষ্ঠা। সেক্ষেত্রে তিনটি যোগকেই পৃথক বলে মনে করা হয়, তাতে কোনো সংমিশ্রণ থাকে না।

[2]এখানে (এই শ্লোকে) 'র-বিপুলার' প্রয়োগ হয়েছে। এইরূপে প্রত্যেক লিখনের শুরুতে দেওয়া অন্য শ্লোকে কোথাও কোথাও 'র-বিপুলা'র প্রয়োগ হয়েছে। এইরূপ প্রয়োগকে 'পিঙ্গলচ্ছন্দঃ' সূত্রম্ গ্রন্থের অনুসারে 'পথ্যাবক্ত্র' নামক ছন্দের অন্তর্গত বলে মানা হয়।

হওয়ায় তাঁদের উপাসনা (সাধন) পদ্ধতিতে বিভিন্নতা থাকে। মানুষের মধ্যে যেমন ভাষা, বেশ, বিভিন্ন সম্প্রদায় ইত্যাদিতে অনেক প্রকারের ভেদ আছে, কিন্তু সুখ-দুঃখের অনুভব সবারই সমান হয় অর্থাৎ অনুকূল পরিস্থিতিতে সুখী এবং প্রতিকূল অবস্থায় দুঃখী হওয়াতে সকলেই সমান, তেমনি সংসারে বিমুখ হয়ে পরমাত্মার শরণাগত হওয়ার সাধনা পৃথক্‌, কিন্তু পরমাত্মার প্রাপ্তিতে সকলেই এক হয়ে যায় অর্থাৎ পরমাত্মপ্রাপ্তি, সুখ-শান্তি সকলের একইরকম প্রাপ্তি ঘটে।

ভগবান গীতায় কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ এবং ভক্তিযোগ —এই তিনটি যোগ দ্বারা নির্বাণ-পদ প্রাপ্তির কথা বলেছেন ; যেমন—

(১) কর্মযোগ—যে ব্যক্তি কামনা, স্পৃহা (আসক্তি), মমতা ও অহং ভাববর্জিত হয়, তার শান্তিপ্রাপ্তি ঘটে। একে ব্রাহ্মী স্থিতি বলে। এই ব্রাহ্মী স্থিতিতে যদি কেউ অন্তিমকালে (মৃত্যুকালেও) স্থিত হয়, তাহলেও তার নির্বাণ-ব্রহ্ম প্রাপ্তি হয় (২।৭১-৭২)।

(২) জ্ঞানযোগ—যে ব্যক্তির জাগতিক বাহ্য-পদার্থ অর্থাৎ সুখভোগের (সম্বন্ধজনিত) আসক্তি মিটে গেছে, যাঁর কেবল পরমাত্ম-তত্ত্বতেই সুখ-বুদ্ধি, যে ব্যক্তি পরমাত্ম-তত্ত্বতেই রমণ করেন, এইরূপ ব্রহ্মভূত সাধকগণ নির্বাণ ব্রহ্ম প্রাপ্ত হন। যাঁর সমস্ত পাপ নাশ হয়েছে, যাঁর দ্বিধা দ্বন্দ্ব মিটে গেছে, যে ব্যক্তি সমস্ত প্রাণীদের হিতে রত, তিনি নির্বাণ-ব্রহ্ম প্রাপ্ত হন। যে ব্যক্তি কাম-ক্রোধরহিত হয়েছেন, যাঁর মন নিজ বশে আছে, যে ব্যক্তি তত্ত্ব জেনেছেন—এইরূপ সাধকেরা জীবিত অবস্থায় এবং মৃত্যুর পর নির্বাণ-ব্রহ্ম লাভ করেন (৫।২৪-২৬)।

(৩) ভক্তিযোগ—শান্ত অন্তঃকরণসম্পন্ন, ভয়হীন এবং ব্রহ্মচর্যব্রতে স্থিত সাধক মন সংযম করে চিত্ত আমাতে স্থির রেখে মৎ-পরায়ণ হলে, আমাতে স্থিত যে পরমনির্বাণ (শান্তি) তা প্রাপ্ত করে (৬।১৪-১৫)।

তিন যোগের একতা

বস্তুতস্তু ত্রয়ো যোগা অভিন্নাস্তে পরস্পরম্।
সাধকানাং রুচের্ভেদাৎ ত্রিবিধা যোগসংজ্ঞিতাঃ॥

গীতায় তিনটি যোগেই তিন যোগের উল্লেখ হয়েছে ; যেমন—

(১) কর্মযোগ—এতে **'যুক্ত আসীত মৎপরঃ'** (২।৬১), **'ময়ি সর্বাণি কর্মাণি সন্ন্যস্যাধ্যাত্মচেতসা'** (৩।৩০), **'ব্রহ্মণ্যাধায় কর্মাণি'** (৫।১০)—এই ভক্তিযোগের কথাগুলি এসেছে। **'সর্বভূতাত্ম-ভূতাত্মা'** (৫।৭)—এটি জ্ঞানযোগের কথা, কারণ জ্ঞানযোগে পরমাত্মতত্ত্বের সঙ্গে অভিন্নতার কথা মুখ্যরূপে থাকে।

(২) জ্ঞানযোগ—এতে **'সর্বভূতহিতে রতাঃ'** (৫। ২৫ ; ১২।৪)—এই কর্মযোগের কথা এসেছে ; কারণ সকল প্রাণীর হিতে রতিই কর্মযোগের প্রধান কথা। **'ময়ি চানন্যযোগেন ভক্তিরব্যভিচারিণী'** (১৩।১০), **'মাং চ যোঽব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে'** (১৪।২৬)—এগুলি ভক্তিযোগের কথা ; কারণ ভক্তিযোগে ভগবানের অনন্যতাই মুখ্য।

(৩) ভক্তিযোগ—এতে **'সর্বকর্মফলত্যাগম্'** (১২।১১), এবং **'স্বকর্মণা তমভ্যর্চ্য'** (১৮।৪৬)—এগুলি কর্মযোগের কথা, কেননা কর্মযোগে কর্মফল ত্যাগ এবং নিজ কর্মের দ্বারা জনগণের সেবা (পূজা) করাই প্রধান হয়ে থাকে। **'অধ্যাত্মনিত্যাঃ'** (১৫।৫)—এটি জ্ঞানযোগের কথা ; কারণ জ্ঞানযোগে চিন্ময় তত্ত্বে স্থিত থাকাই মুখ্য উদ্দেশ্য। **'তে ব্রহ্ম তদ্বিদুঃ'** (৭।২৯)—এটিও জ্ঞানযোগের কথা ; কারণ জ্ঞানযোগের মুখ্যভাব জানা।

এইভাবে তিনটি যোগেরই তিনটি যোগে আসার তাৎপর্য এই যে, কোন ব্যক্তি এই তিনটি যোগকে সর্বতোভাবে যেন পরস্পর থেকে আলাদা না মনে করেন ; কারণ যোগ তিনটি প্রকৃতপক্ষে ভিন্ন নয়, বরং একই। এতে শুধু প্রণালীর বিভিন্নতা থাকে।

একভাবে দেখতে গেলে কর্মযোগ এবং ভক্তিযোগ কাছাকাছি হয় ; কারণ কর্মযোগী তার সবকিছু (পদার্থ এবং ক্রিয়া) সংসারকে দিতে চায় এবং ভক্তিযোগী সবকিছু ভগবানকে দিতে চায় (৯।২৬-২৭)।

আবার একদৃষ্টিতে কর্মযোগ এবং জ্ঞানযোগ

কাছাকাছি হয় ; কেননা কর্মযোগী পদার্থ এবং ক্রিয়ার আসক্তি ত্যাগ করে সংসার থেকে পৃথক্ হয় (৬।৪) ; আর জ্ঞানযোগী পদার্থ এবং ক্রিয়াকে প্রকৃতিমাত্র মনে করে এবং নিজেকে অসঙ্গ অনুভব করে সংসার থেকে পৃথক্ হয়। এর তাৎপর্য এই যে, কর্মযোগী 'ক্রিয়া' দ্বারা সংসার থেকে পৃথক্ হন এবং জ্ঞানযোগী 'বিচার' দ্বারা সংসার থেকে পৃথক্ হন।

আর এক দৃষ্টিতে ভক্তিযোগ আর জ্ঞানযোগ কাছাকাছি হয়, ভক্তিযোগী সমস্তই ভগবান হতে সৃষ্ট বলে মনে করেন (৭।১২ ; ১০।৫ ; ৬, ৮, ৩৯) এবং সবকিছুই ভগবানের বলে মানেন (৬।৩০ ; ৭।৭ ; ৮।২২) আর জ্ঞানযোগী সবকিছু প্রকৃতি থেকে উৎপন্ন হয়েছে বলে মনে করেন (১৪।১৯ ; ১৮।৪০) এবং সবকিছু প্রকৃতিতেই বর্তমান বলে মানেন (১৩।৩০)।

তিন যোগেই কর্মে হেতু হওয়ার নিষেধ

হেতোঃ কথনতাৎপর্যং সম্বন্ধঃ স্যান্ন কুত্রচিৎ।
তস্মান্নিমিত্তমাত্রং বৈ ভবেয়ুঃ সাধকাঃ সদা॥

গীতায় ভগবান কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ এবং ভক্তিযোগ —এই তিন যোগে হেতুগুলির বর্ণনা করেছেন। যেমন—

(১) **কর্মযোগ**—যখন মানুষ কর্মফলের সঙ্গে, কর্ম সম্পাদনের করণগুলির সঙ্গে অর্থাৎ মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়াদি কর্ম করার বস্তুর সঙ্গে নিজ সম্বন্ধ যোগ করে, তখন সে কর্মের হেতুতে পরিণত হয়। যদিও পৃথিবীতে অনেক প্রকার কর্ম হয়ে থাকে, যেসব কর্মের আমরা হেতু হই না, সেসব কর্মের ফলও আমরা পাই না ; কারণ সে সকল কর্মের সঙ্গে আমরা কোন সম্পর্ক স্থাপন করিনি। কর্মের ফল সেই ভোগ করে, যে কর্মের সঙ্গে সম্বন্ধ পাতায়। সুতরাং কর্মযোগের প্রকরণে ভগবান অর্জুনকে মানুষের প্রতিনিধিরূপে বলেছেন যে, 'তুমি কর্মফলের হেতু হয়ো না'—'**মা কর্মফলহেতুর্ভূঃ**' (২।৪৭) অর্থাৎ 'নিজ কর্তব্য অবশ্যই তৎপরতার সঙ্গে পালন করো, কিন্তু কর্ম, কর্মফল, করণ[১] ইত্যাদির সঙ্গে নিজ সম্পর্ক পাতিয়ো না'। এর তাৎপর্য এই যেন কর্মযোগী সাধক কর্ম, কর্মফল, শরীর ইত্যাদি করণগুলির সঙ্গে নিজ সম্পর্ক মানেন না, তাই তিনি কর্মের হেতু হন না।

(২) **জ্ঞানযোগ**—প্রকৃতির রাজ্যে, এই জগতে, শরীরে যা কিছু ক্রিয়াদি হয়, সাংখ্যযোগী তা সবই প্রকৃতিতে, গুণসমূহে এবং ইন্দ্রিয়সমূহেই হয় বলে মনে করেন, নিজের দ্বারা নয়। ভগবান বলেছেন যে, 'প্রকৃতির দ্বারাই সমস্ত কর্ম সংগঠিত হয়—এরূপ যিনি অনুভব করেন, তিনি নিজের মধ্যে অকর্তৃত্ব অনুভব করেন (১৩।২৯)। গুণই গুণের মধ্যে প্রবর্তিত অর্থাৎ ক্রিয়াগুলি গুণের মাধ্যমে সংগঠিত হয়—এরূপ মেনে নিয়ে তত্ত্ববিৎ পুরুষ তাতে আসক্ত হন না (৩।২৮)। দেখা, শোনা, স্পর্শ করা ইত্যাদি সমস্ত ক্রিয়া ইন্দ্রিয় দ্বারা হচ্ছে, স্বরূপতঃ আমি কিছুই করি না—এইরকম তিনি মনে করেন' (৫।৮-৯)। অতএব সাংখ্যযোগের প্রকরণে ভগবান কার্য এবং করণের দ্বারা ঘটিত ক্রিয়াগুলি উৎপন্ন করায় প্রকৃতিকে হেতু হিসাবে বলেছেন —'**কার্যকরণকর্তৃত্বে হেতুঃ প্রকৃতিরুচ্যতে**' (১৩।২০)। সমস্ত কর্ম সম্পাদনে শরীর, কর্তা, করণ, চেষ্টা এবং সংস্কার—এই পাঁচটি হেতু বলা হয়েছে (১৮।১৪)।

ত্রয়োদশ অধ্যায়ের বিংশতিতম শ্লোকের উত্তরার্ধে যে সুখ-দুঃখের ভোগবিষয়ে পুরুষকেই হেতু বলা হয়েছে, সেখানেও বাস্তবে সুখী বা দুঃখী হওয়াতে পুরুষই হেতু, ভোক্তা হওয়ায় নয়, কারণ ভোগও ক্রিয়াজনিত হয়। সুতরাং ক্রিয়ার জন্য যে ভোগ, প্রকৃতিই তার হেতু। যে ব্যক্তি নিজেকে প্রকৃতিতে স্থিত মানে, সে-ই সুখী বা দুঃখী হয় (১৩।২১)। কিন্তু যাঁরা তত্ত্বজ্ঞ জীবন্মুক্ত, তাঁরা সুখী বা দুঃখী হন না। এর তাৎপর্য এই যে, সাংখ্যযোগী সমস্ত ক্রিয়াগুলি প্রকৃতির বলেই মনে করেন ; সুতরাং তিনি কর্ম করেনও না, করানও না (৫।১৩) অর্থাৎ তিনি কোনও কর্ম বা কর্মফল ইত্যাদির হেতু হন না।

(৩) **ভক্তিযোগ**—যখন ভক্ত নিজেকে ভগবানের

---

[১] যার দ্বারা কর্ম করা হয়, যেমন মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়াদি, অন্তঃকরণ প্রভৃতিকে 'করণ' বলা হয়।

প্রতি সর্বতোভাবে সমর্পণ করেন, নিজেকে ভগবানে বিলিয়ে দেন, তখন করা এবং করানো সবই ভগবানের দ্বারাই হয়ে থাকে, ভক্ত সেখানে নিমিত্তমাত্র। সুতরাং ভক্তিযোগের প্রকরণে ভগবান নিজ প্রিয় ভক্ত অর্জুনকে বলেছেন—'এই ব্যক্তিগণ পূর্বেই আমা দ্বারা হত হয়ে রয়েছে। এদের হত্যার ব্যাপারে তুমি নিমিত্তমাত্র হও'—'নিমিত্তমাত্রং ভব' (১১।৩৩)।

—এইরূপ তিন যোগে তিন হেতু দেওয়ার তাৎপর্য এই যে, তিনটি যোগেই সাধক কর্ম করায় নিজেকে হেতুরূপে রাখেন না, বরং নিমিত্তমাত্র হয়ে থাকেন। লোকেরা হয়ত এঁদের হেতুরূপেই দেখে, কিন্তু বাস্তবিক তাঁরা হেতু হন না।

(৪৩) সকলেই গীতোক্ত যোগের অধিকারী

সর্বে মানবদেহত্বাৎ প্রভুপ্রাপ্ত্যধিকারিণঃ।
তস্মাৎ কেনাপি মার্গেণ হরিং প্রাপ্নোতি মানবঃ॥

অন্যান্য শাস্ত্রে জ্ঞান, যোগ ইত্যাদি মার্গের পৃথক্ পৃথক্ অধিকারীর কথা বলা হয়েছে ; যেমন—যে ব্যক্তি সাধন-চতুষ্টয়সম্পন্ন, সে জ্ঞানের অধিকারী ; যে ব্যক্তি মূঢ় এবং ক্ষিপ্ত বৃত্তিসম্পন্ন নয়, কিন্তু বিক্ষিপ্ত বৃত্তিসম্পন্ন, সে ব্যক্তি পাতঞ্জলযোগের অধিকারী ইত্যাদি। কিন্তু ভগবানের এই এক বিশেষ উদারতা এবং দয়ালুতা যে, তিনি গীতায় মানুষমাত্রেই ভক্তিযোগ, জ্ঞানযোগ এবং কর্মযোগের অধিকারী বলে জানিয়েছেন। অর্থাৎ ভগবৎতত্ত্বলাভে ইচ্ছুক ব্যক্তিমাত্রেই গীতোক্ত যোগের অধিকারী।

ভক্তিযোগের অধিকারী

সপ্তাধিকারিণো ভক্তের্ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়াঃ স্ত্রিয়ঃ।
বৈশ্যাঃ শূদ্রা দুরাচারা যেঽপি স্যুঃ পাপযোনয়ঃ॥

ভগবান ভক্তির অধিকারীদের বর্ণনা করতে গিয়ে সর্বপ্রথমে দুরাচারীর কথাই বলেছেন, 'যদি অত্যন্ত পাপী (দুরাচারী) ব্যক্তিও অনন্যভাব নিয়ে আমার ভজনা করে, তবে তাকে সাধু বলে জানবে, কারণ সে আমাকে প্রাপ্ত হওয়ার জন্য দৃঢ়নিশ্চয় করেছে। সেই ব্যক্তি অতি সত্বর ধর্মাত্মারূপে পরিগণিত হয় এবং নিত্য শান্তি লাভ করে।' (৯।৩০-৩১)।

দ্বিতীয়, পাপযোনিভূত ব্যক্তিদের নাম করেছেন, যাদের পূর্বকৃত পাপের জন্য চণ্ডাল ইত্যাদি যোনিতে জন্ম হয়েছে (৯।৩২)।

তৃতীয় হচ্ছে চার বর্ণের স্ত্রী, বৈশ্য ও শূদ্রদের কথা, যারা হলেন মধ্যম শ্রেণীভুক্ত (৯।৩২)।

চতুর্থত, পবিত্র ব্রাহ্মণ এবং রাজর্ষি ক্ষত্রিয়, যাদের জন্ম এবং আচরণাদিকে উত্তম বলে মানা হয় (৯।৩৩)।

এইপ্রকার দুরাচারী, পাপযোনি, স্ত্রী, বৈশ্য, শূদ্র, ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়—এভাবে সমগ্র প্রাণিকুলই এই সাত বিভাগের অন্তর্ভুক্ত। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, প্রাণিমাত্রই ভক্তির অধিকারী। কারণ ভগবানের অংশসম্ভূত হওয়াতে প্রাণিমাত্রেরই ভগবানের সঙ্গে অখণ্ড, অটুট ও নিত্য সম্বন্ধ থাকে। কিন্তু তারা এই ভুল করে যে, যা তাদের নিজেদের নয় সেগুলিকে নিজস্ব বলে মনে করে এবং যা তাদের একান্ত নিজস্ব, তাকে তারা নিজের বলে স্বীকার করে না।

ভক্তির অধিকারী সাতপ্রকার হলেও, ভাব অনুযায়ী তাদের চার শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়—অর্থার্থী, আর্ত, জিজ্ঞাসু এবং জ্ঞানী (৭।১৬)। যে ব্যক্তি ধনপ্রাপ্তির আশায় ভগবানের ভজনা করে এবং ভগবানের কাছেই কেবল চায়, অন্যের সাহায্য নেয় না, সে (সাংসারিক পদার্থ কামনা করার জন্য) 'অর্থার্থী ভক্ত' নামে পরিচিত হয়। যার অর্থার্থী ভক্তের ন্যায় সাংসারিক কামনা নেই, কিন্তু কোন দুঃখ হলে তা সহ্য করতে পারে না, ভগবানকে ডাকে অর্থাৎ নিজ দুঃখ দূর করার জন্য ভগবান ছাড়া আর কাউকে ডাকে না, সে (দুঃখ দূর করবার কামনা থাকার কারণে) 'আর্ত ভক্ত' বলে পরিচিত হয়। যার মধ্যে সাংসারিক বস্তুর কামনা নেই বা দুঃখ দূর করারও কামনা

নেই, যে শুধু ভগবৎতত্ত্ব জানার উদ্দেশ্যে ভগবানের ভজনা করে, এবং তা শুধু ভগবানের কাছ থেকেই জানতে চায়, তাকে (তত্ত্ব জানার কামনা হওয়ার জন্য) 'জিজ্ঞাসু ভক্ত' বলে। যে ব্যক্তি ভগবানের কাছে কিছুই চায় না, শুধু ভগবানকেই চায় এবং নিত্য নিরন্তর তাঁতেই মগ্ন থাকে, তাকে (নিজের কোন কামনা না থাকার জন্য) 'জ্ঞানী ভক্ত' অর্থাৎ 'প্রেমিক ভক্ত' বলা হয়। এমন ভক্ত ভগবানের অত্যন্ত প্রিয় হয় এবং এরূপ ভক্তদেরও ভগবান অত্যন্ত প্রিয় হন (৭।১৭)। এরূপ ভক্তদের ভগবান নিজ আত্মস্বরূপ বলে জানিয়েছেন (৭।১৮)। এই ভক্তদেরই ভগবান পঞ্চদশ অধ্যায়ের উনিশ সংখ্যক শ্লোকে 'সর্ববিৎ' বলেছেন। অর্থাৎ যেসব মানুষের উদ্দেশ্য শুধু ভগবৎপ্রাপ্তি তাদের লৌকিক কামনা থাকুক বা পারলৌকিক কামনা থাকুক কিংবা কোনও কামনা না থাকুক—এরা সবাই ভক্তির অধিকারী। শ্রীমদ্ভাগবতে বলা হয়েছে—

অকামঃ সর্বকামো বা মোক্ষকাম উদারধীঃ।
তীব্রেণ ভক্তিযোগেন যজেত পুরুষং পরম্॥
(২।৩।১০)

'যে বুদ্ধিমান ব্যক্তি সকাম বা নিষ্কাম বা মোক্ষলাভে আকাঙ্ক্ষী, তার কেবল তীব্র ভক্তিযুক্ত হয়ে পরমপুরুষ শ্রীভগবানের সাধন-ভজন করা উচিত।'

জ্ঞানযোগের অধিকারী

যে নরা জ্ঞাতুমিচ্ছন্তি স্বরূপং সংশয়াত্মকাঃ।
সর্বে তে জ্ঞানযোগস্য ভবেয়ুরধিকারিণঃ॥

যেমন সকলেই ভক্তির অধিকারী, তেমনি সকলেই জ্ঞানেরও অধিকারী। ভগবান গীতায় বলেছেন যে, শ্রোত্রিয় এবং ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুর সেবা করে, তাঁর অনুগত হয়ে জিজ্ঞাসাপূর্বক প্রশ্ন করে মানুষ যে জ্ঞান প্রাপ্ত হয় এবং যে জ্ঞান প্রাপ্ত হয়ে আর কখনো মোহগ্রস্ত হয় না তথা যে জ্ঞান দ্বারা সাধক প্রথমে সমস্ত প্রাণীকে নিজের মধ্যে এবং পরে পরমাত্মার মধ্যে দেখে, সেই জ্ঞান (তীব্র জিজ্ঞাসা হলে) অতি পাপীরও হতে পারে (৪।৩৪-৩৬)।

ভগবান বলেছেন যে, জগতের সকল পাপীর চেয়েও অধিক পাপী যদি জ্ঞান লাভ করতে চায়, তবে সেও জ্ঞান লাভ করে জ্ঞানরূপী নৌকার দ্বারা সমস্ত পাপ-সমুদ্র পার হয়ে যায়। জ্বলন্ত অগ্নি যেমন কাষ্ঠরাশিকে ভস্ম করে দেয়, সেইরূপ জ্ঞানরূপী অগ্নিও সমস্ত পাপকে সর্বতোভাবে ভস্ম করে দেয় (৪।৩৬-৩৭)।

যদি অত্যন্ত পাপীও জ্ঞানলাভ করতে পারে, তবে যে শ্রদ্ধাবান, সাধনায় তৎপর এবং জিতেন্দ্রিয়, তার যে জ্ঞানলাভ হবে, তাতে আর বলবার কি আছে (৪।৩৯)।

কেউ ধ্যানযোগ দ্বারা, কেউ বা সাংখ্যযোগের দ্বারা, আবার কেউ বা কর্মযোগের দ্বারা নিজের মধ্যেই সেই পরমাত্মতত্ত্ব অনুভব করে (১৩।২৪)। কিন্তু যারা এই সাধনগুলি জানে না, সেই সব ব্যক্তি শুধুমাত্র তত্ত্বজ্ঞ মহাপুরুষদের কাছে শুনে, তাঁদের উপদেশ পালন করে জ্ঞানলাভ করেন (১৩।২৫)।

এর তাৎপর্য এই যে, মানুষ যদি শ্রদ্ধাবান সাধক হয় বা অত্যন্ত পাপী অথবা অত্যন্ত মূঢ় যাই হোক না কেন সে যদি জ্ঞানলাভ করতে আগ্রহী হয়, তাহলেই তার জ্ঞান হতে পারে।

কর্মযোগের অধিকারী

যে নির্মমাস্তু নিষ্কামা ইচ্ছন্তি ভবিতুং নরাঃ।
সর্বে তে কর্মযোগস্য ভবেয়ুরধিকারিণঃ॥

ভক্তিযোগ এবং জ্ঞানযোগের যেমন সকলেই অধিকারী, তেমনি কর্মযোগেরও সকলেই অধিকারী। যে ব্যক্তি সাংসারিক কামনা থেকে মুক্ত হতে চায় অর্থাৎ নিজের উদ্ধার চায়, সে যে কোন বর্ণ, আশ্রম, সম্প্রদায়ের হোক বা যে কোন স্থানেই বাস করুক, সে যদি নিষ্কামভাবে নিজ কর্তব্য তৎপরতার সঙ্গে পালন করে, তবে তার পরমাত্মপ্রাপ্তি ঘটে (১৮।৪৫)। যে ফলাসক্তি ত্যাগ করে মমত্বরহিত হয়ে শরীর-ইন্দ্রিয় মন ও বুদ্ধি দ্বারা অন্তঃকরণের শুদ্ধির জন্য কর্ম করে, সে-ই কর্মযোগী (৫।১১)। এরূপ কর্মযোগীর সমস্ত (ক্রিয়মাণ, সঞ্চিত এবং প্রারব্ধ) কর্ম লীন হয়ে যায় (৪।২৩)।

অর্থাৎ ফলাসক্তি ত্যাগ করে অপরের হিতের জন্য যারা নিজ কর্তব্য-কর্ম করে, তারা সকলেই কর্মযোগের অধিকারী।

(৪৪) গীতায় তিন যোগের সমত্ব

কর্মযোগে জ্ঞানযোগে ভক্তিযোগে তথৈব চ।
অস্তি সাধনসিদ্ধৌ চ গীতায়াং তু সমানতা॥

গীতায় ভগবান কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ এবং ভক্তিযোগ—তিন যোগেই একপ্রকারের কথা বলেছেন যেমন—

কর্মযোগে—**'কর্মণ্যকর্ম যঃ পশ্যেদকর্মণি চ কর্ম যঃ।'** (৪।১৮) 'যে ব্যক্তি কর্মে অকর্ম এবং অকর্মে কর্ম দেখে।'

জ্ঞানযোগে—**'সর্বভূতস্থমাত্মানং সর্বভূতানি চাত্মনি।'** (৬।২৯)। 'যে আত্মাকে সমস্ত প্রাণীতে এবং সমস্ত প্রাণীদের আত্মার মধ্যে দেখে।'

ভক্তিযোগে—**'যো মাং পশ্যতি সর্বত্র সর্বং চ ময়ি পশ্যতি।'** (৬।৩০)। 'যে সর্বত্র আমাকে দেখে এবং আমার মধ্যে সবকিছু দেখে।'

এইরূপ তিনটি যোগেই একই ধরনের কথা বলার অর্থ এই যে, সাধক যে যোগেরই অধিকারী হোক না কেন, সেই যোগের তত্ত্ব সে যেন অসন্দিগ্ধরূপে বুঝতে পারে। কর্মযোগে 'অকর্ম' ; জ্ঞানযোগে 'আত্মা' এবং ভক্তি-যোগে 'ভগবানই' মুখ্য। অর্থাৎ অকর্ম, আত্মা এবং ভগবান—তিনই তত্ত্বতঃ এক।

কর্মযোগে কর্মের অভাব এবং 'অকর্মে'র ভাব আছে। যেমন, প্রত্যেক কর্মের আরম্ভ এবং শেষ থাকে ; কিন্তু কর্মের আরম্ভ হওয়ার পূর্বেও অকর্ম ছিল এবং কর্ম সমাপ্ত হওয়ার পরও অকর্ম থাকবে। সিদ্ধান্ত এই যে, যে বস্তু আদিতেও থাকে আবার অন্তেতেও থাকে, তা মধ্যেও থাকে। সুতরাং কর্ম করার সময়ও অকর্ম একইভাবে থাকে।

জ্ঞানযোগে 'সর্বভূতে'-র অভাব এবং 'আত্মা'-র ভাব আছে। সব শরীরেরই জন্ম ও মৃত্যু আছে ; কিন্তু শরীর জন্মাবার পূর্বেও আত্মা ছিল, শরীর নাশের পরেও আত্মা থাকবে। সুতরাং শরীরের বর্তমান অবস্থাতেও আত্মা যেমনকার তেমনি থাকে।

ভক্তিযোগে 'সর্বে'-র অভাব এবং 'ভগবানে'-র ভাব আছে। সংসার সৃষ্টি হয় ও ধ্বংস হয় ; কিন্তু সংসার সৃষ্টির আগেও ভগবান ছিলেন এবং ধ্বংসের পরেও তিনি থাকবেন। অতএব সংসার থাকাকালীনও তিনি যেমনকার তেমনই আছেন।

অকর্ম (নির্লিপ্ততা), আত্মা, এবং ভগবান এই তিন স্বতঃসিদ্ধ। যে বস্তু স্বতঃসিদ্ধ তা সর্ব সময়ের জন্য, সকল প্রাণীর জন্য এবং সর্বস্থানের জন্য হয়। কিন্তু পূর্বোক্ত কর্ম, সর্বভূত এবং সর্ব (বস্তু, ব্যক্তি, যোগ্যতা, পরিস্থিতি, অবস্থা ইত্যাদি)—এই তিনটি স্বতঃসিদ্ধ নয়, সুতরাং এগুলি সর্বকালের জন্য, সকলের জন্য এবং সর্বস্থানে নয়।

যে বস্তু কখনো থাকে আবার কখনো থাকে না, কেউ পায় আবার কেউ পায় না, কোথাও আছে আবার কোথাও নেই, সেই বস্তুর প্রাপ্তি ক্রিয়া এবং পদার্থ দ্বারা হয়। এইজন্য কর্ম, সর্বভূত এবং সর্বের প্রাপ্তি ক্রিয়া এবং পদার্থের আশ্রিত অর্থাৎ এইসব প্রাপ্তি অভ্যাসসাধ্য। কিন্তু অকর্ম, আত্মা এবং ভগবানের প্রাপ্তি আয়াসসাধ্য নয়, বরং নিষ্কামভাব, বিবেক এবং বিশ্বাসের দ্বারা সাধ্য। যদি এঁর প্রাপ্তি অভ্যাস দ্বারা সাধ্য হোত, তাহলে এঁকে সর্বদা, সকলের জন্য, সর্বস্থানে প্রাপ্ত হওয়া যেত না।

'কর্ম', 'সর্বভূত' এবং 'সর্ব' কখনো থাকে, কখনো থাকে না ; কোথাও থাকে কোথাও বা থাকে না। এজন্য স্বয়ং যিনি, তাঁর এসবে কোনও প্রয়োজন নেই। এসবের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করা অকর্ম, আত্মা এবং ভগবানে বিমুখ হওয়া বোঝায়। অকর্ম, আত্মা এবং ভগবান—এই তিনকে অনুভব করার জন্য উৎপত্তি ও বিনাশশীল শরীর, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, যোগ্যতা, পরিস্থিতি ইত্যাদির কোন প্রয়োজন নেই। কিন্তু মানুষ এটি বুঝতে পারে না ; কারণ সে এই বাস্তবিকতাকে স্বয়ং অনুভব না করে ইন্দ্রিয় এবং অন্তঃকরণ দ্বারা অনুভব করার চেষ্টা করে, কারণ এইরূপ করাই তার স্বভাব হয়ে আছে।

অকর্ম, আত্মা এবং ভগবান—এই তিনটি তত্ত্বতঃ এক এবং আমাদের সঙ্গে এর নিত্য সম্বন্ধ। অপরপক্ষে

কর্ম, সর্বভূত এবং সর্ব এই তিনের সঙ্গে আমাদের নিত্য সম্বন্ধ-বিচ্ছেদ। কর্ম থেকে সম্বন্ধ-বিচ্ছেদ অনুভূত হলে 'অকর্ম' অবশেষ থাকে। অকর্মে আত্মা এবং ভগবান দুই-ই থাকে। 'সর্বভূত' থেকে সম্বন্ধ-বিচ্ছেদ অনুভূত হলে 'আত্মা' শেষে থেকে যায়। আত্মাতে অকর্ম এবং ভগবান দুই-ই থাকে। 'সর্ব' থেকে সম্বন্ধ-বিচ্ছেদের অনুভব হলে 'ভগবান' শেষে থাকেন। ভগবানে অকর্ম এবং আত্মা দুই-ই বিদ্যমান।

কর্মে অকর্ম অনুভবকারী 'কৃতকৃত্য' হয়ে যায়—'**স বুদ্ধিমান্মনুষ্যেষু স যুক্তঃ কৃৎস্নকর্মকৃৎ**' (৪।১৮)। সর্বভূতে যিনি আত্মাকে অনুভব করেন, তিনি 'জ্ঞাত-জ্ঞাতব্য' হয়ে যান—'**ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্বত্র সমদর্শনঃ**' (৬।২৯)। সর্বভূতে ভগবানকে অনুভবকারী 'প্রাপ্ত-প্রাপ্তব্য' হয়ে যায়—'**তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি**' (৬।৩০)।

কৃত-কৃত্যতা, জ্ঞাত-জ্ঞাতব্যতা এবং প্রাপ্ত-প্রাপ্তব্যতা—এই তিনটির মধ্যে যে কোন একটির প্রাপ্তি ঘটলে অন্য দুটি স্বাভাবিকভাবে এসে যায় অর্থাৎ কৃত-কৃত্য হলে কর্মযোগী জ্ঞাত-জ্ঞাতব্য এবং প্রাপ্ত-প্রাপ্তব্যও হয়ে যান, জ্ঞাত-জ্ঞাতব্য হলে জ্ঞানযোগীও কৃত-কৃত্য এবং প্রাপ্ত-প্রাপ্তব্যও হয়ে যান তথা প্রাপ্ত-প্রাপ্তব্য হলে ভক্তিযোগী কৃত-কৃত্য এবং জ্ঞাত-জ্ঞাতব্যও হন।

কৃত-কৃত্যতা (কিছু করার শেষ না থাকা), জ্ঞাত-জ্ঞাতব্যতা (কিছু জানার শেষ না থাকা) এবং প্রাপ্ত-প্রাপ্তব্যতা (কিছু পাওয়ার শেষ না থাকা)—এই তিনটির দ্বারা মানুষ পূর্ণাবস্থা প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ তার মনুষ্যজন্ম সর্বতোভাবে সার্থক হয়।

মানুষ যতক্ষণ নিজের জন্যই কেবলমাত্র কাজ করে, ততক্ষণ সে কৃত-কৃত্য হয় না। অপরপক্ষে সে যখন নিজের জন্য কিছু না করে অপরের জন্যই কেবলমাত্র কর্ম করে, তখন সে কৃত-কৃত্য হয়। সাধক যখন নিজ স্বরূপ যথার্থরূপে জানতে পারে এবং অনুভব করতে পারে, তখন সে জ্ঞাত-জ্ঞাতব্য হয়ে যায়। শুধু ভগবানকেই যে নিজের বলে মনে করে, অপরকে নিজের বলে মানে না; সেই সাধক প্রাপ্ত-প্রাপ্তব্য হয়। অর্থাৎ করবার মতো শুধু অপরের সেবা, জানার মতো কেবল নিজ স্বরূপ এবং পাওয়ার মতো একমাত্র ভগবানই আছেন।

(৪৫) গীতায় তিন যোগের (মহত্ত্ব) গুরুত্ব

ত্রয়ো হি যোগাঃ সুগমা বরিষ্ঠাঃ সিদ্ধিপ্রদাঃ পাপনিবারকাশ্চ।
তুষ্টিপ্রশান্তিপ্রদসাম্যদাশ্চ জ্ঞানাস্থদাতার উদীরিতাশ্চ॥

ভগবান গীতায় তিন যোগের স্বতন্ত্র সাধনপ্রণালী জানিয়েছেন এবং প্রতিটির জন্য নয় প্রকারের গুরুত্ব প্রকট করেছেন—

কর্মযোগ

১) শ্রেষ্ঠ—কর্মযোগ জ্ঞানযোগ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ—'**তয়োস্তু কর্মসন্ন্যাসাৎ কর্মযোগো বিশিষ্যতে**' (৫।২)। কারণ কর্মযোগে সমস্ত কর্ম, কর্তব্য-পরম্পরা সুরক্ষিত রাখার উদ্দেশ্যে অর্থাৎ অপরের জন্য করা হয়ে থাকে। অতএব এর দ্বারা নিজ সুখ-আরাম, গুণ-মহিমা, বিদ্যা-বুদ্ধির অভিমান, ভোগ এবং সংগ্রহ করার আকাঙ্ক্ষা অতি সহজেই পরিত্যক্ত হয়। কিন্তু জ্ঞানযোগে বিবেক ও বিচারপূর্বক সুখ-আরাম পরিত্যাগ করা অপেক্ষাকৃত কঠিন মনে হয়।

কর্মযোগ ধ্যানযোগ হতেও শ্রেষ্ঠ—'**ধ্যানাৎ কর্মফলত্যাগঃ**' (১২।১২)। কারণ কর্মযোগে সমস্ত কর্মের ফল অর্থাৎ কর্মফলেচ্ছা ত্যাগ হয় ; কিন্তু ধ্যানযোগে কর্মফল ত্যাগের কোনো ব্যাপার নেই।

কর্ম ত্যাগ করার থেকে আসক্তিরহিত হয়ে যিনি কর্ম করেন তিনি শ্রেষ্ঠ—'**কর্মেন্দ্রিয়ৈঃ কর্মযোগমসক্তঃ স বিশিষ্যতে**' (৩।৭)। কারণ আসক্তিরহিত হয়ে কর্ম করলে তার দ্বারা যোগারূঢ় (সমতা) হওয়া সম্ভব

(৬।৩) কিন্তু শুধুমাত্র কর্মত্যাগ করলেই সিদ্ধি হয় না (৩।৪)।

২) **সুগম**—কর্মযোগী বন্ধন থেকে অনায়াসে মুক্ত হয়ে যান—**'সুখং বন্ধাৎ প্রমুচ্যতে'** (৫।৩)। কারণ তাঁর রাগ-দ্বেষ থাকে না বরং সমভাব থাকে। মানুষকে সাধারণতঃ কর্ম করতেই হয়, কিন্তু রাগ-দ্বেষ, সিদ্ধি-অসিদ্ধিতে সুখী বা দুঃখী হওয়ার ফলে সে বন্ধন থেকে মুক্ত হয় না।

৩) **শীঘ্র সিদ্ধি**—সমত্বসম্পন্ন কর্মযোগী খুব শীঘ্রই পরমাত্মতত্ত্ব প্রাপ্ত হয়—**'যোগযুক্তো মুনির্ব্রহ্ম নচিরেণাধিগচ্ছতি'** (৫।৬)। কারণ তাঁর কর্ম এবং কর্মফলে আসক্তি হয় না এবং সংসারের আশ্রয়ও থাকে না (৪।২০)।

৪) **পাপের নাশ**—যে কেবল যজ্ঞের জন্য অর্থাৎ কর্তব্য-পরম্পরা সুরক্ষিত রাখার উদ্দেশ্যেই কর্ম করে, তার সমস্ত কর্ম এবং পাপ লীন হয়ে যায়—**'যজ্ঞায়াচরতঃ কর্ম সমগ্রং প্রবিলীয়তে'** (৪।২৩)। কারণ যজ্ঞার্থ কর্ম করলে কর্মের ফলাসক্তি, কামনা ইত্যাদি থাকে না।

কর্ম কি এবং অকর্মই বা কি—তা ঠিক মতো জেনে কর্ম করলে কর্মযোগীর সম্পূর্ণ কর্ম ভস্মসাৎ হয়—**'জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্মাণম্'** (৪।১৯)। কারণ তাঁর সমস্ত কর্ম কামনা ও সংকল্পরহিত হয়, সেইজন্য সেই কর্মে বন্ধনের শক্তি থাকে না।

৫) **সন্তুষ্টি**—কর্মযোগী আপনাতে আপনি তুষ্ট থাকেন—**'আত্মন্যেবাত্মনা তুষ্টঃ'** (২।৫৫), **'আত্মন্যেব চ সন্তুষ্টঃ'** (৩।১৭)। কারণ তাঁর সমস্ত কামনা সর্বতোভাবে ত্যাগ হয়, সুতরাং তাঁর সন্তুষ্টি পরাধীন নয় অর্থাৎ অন্য কোন কিছুর আশ্রিত নয়।

৬) **শান্তি-প্রাপ্তি**—কর্মযোগী শান্তি প্রাপ্ত হন **'স শান্তিমধিগচ্ছতি'** (২।৭১) **'শান্তিমাপ্নোতি নৈষ্ঠিকীম্'** (৫।১২)। কারণ তাঁর কামনা, মমতা ইত্যাদি থাকে না অর্থাৎ সংসারের সঙ্গে তাঁর কোন সম্বন্ধ থাকে না।

৭) **সমত্ব প্রাপ্তি**—কর্মযোগী সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে সমবুদ্ধি সম্পন্ন থাকেন—**'সমঃ সিদ্ধাবসিদ্ধৌ চ'** (৪।২২)। কারণ তাঁর কর্মের সিদ্ধি-অসিদ্ধি, পূর্তি-অপূর্তিতে হর্ষ-শোক বা রাগ-দ্বেষ হয় না।

৮) **জ্ঞান-প্রাপ্তি**—কর্মযোগে সিদ্ধিপ্রাপ্ত ব্যক্তি নিজ স্বরূপের জ্ঞান (বোধ) আপনা হতেই লাভ করেন—**'তৎ স্বয়ং যোগসংসিদ্ধঃ কালেনাত্মনি বিন্দতি'** (৪।৩৮)। কারণ তাঁর সংসারের প্রতি কোন আকর্ষণ নেই। জড়ত্ব (সংসারের আকর্ষণ) না থাকায় স্বরূপ স্বতঃসিদ্ধভাবে প্রকাশিত থাকে।

৯) **প্রসন্নতা (স্বচ্ছতা) প্রাপ্তি**—কর্মযোগী অন্তঃকরণে প্রশান্তি লাভ করেন—**'প্রসাদমধিগচ্ছতি'** (২।৬৪)। কারণ রাগ-দ্বেষ পূর্বক বিষয় ভোগ করলে অন্তঃ-করণে অশান্তি, অস্থিরতা জন্মে, অপরপক্ষে কর্মযোগী সাধক রাগ-দ্বেষ-রহিত হয়ে বিষয় ভোগ করেন, তাই তাঁদের অন্তঃকরণ স্বচ্ছ ও নির্মল হয়।

জ্ঞানযোগ

১) **শ্রেষ্ঠ**—দ্রব্যময় (আহুতি দ্বারা কৃত) যজ্ঞ থেকে জ্ঞানযজ্ঞ শ্রেষ্ঠ **'শ্রেয়ান্ দ্রব্যময়াদ্ যজ্ঞাজ্ জ্ঞানযজ্ঞঃ'** (৪।৩৩)। কেননা দ্রব্যময় যজ্ঞে দ্রব্যসমূহ এবং ক্রিয়াসমূহের প্রাধান্য থাকে, কিন্তু জ্ঞানযজ্ঞে কেবল বিবেক-বিচারই প্রাধান্য পায়। বিবেক-বিচারে মানুষের যত স্বাতন্ত্র্য থাকে, তত স্বাতন্ত্র্য দ্রব্যসমূহে ও ক্রিয়াসমূহের ক্রিয়াতে পাওয়া যায় না।

২) **সুগম**—জ্ঞানযোগী সাধক নির্গুণ-নিরাকারের ধ্যান করতঃ সম্পূর্ণ পাপমুক্ত হয়ে সহজেই পরমাত্মাকে লাভ করেন—**'সুখেন ব্রহ্মসংস্পর্শমত্যন্তং সুখমশ্নুতে'** (৬।২৮), কারণ তাঁর দেহাভিমান থাকে না।

৩) **শীঘ্র সিদ্ধি**—শ্রদ্ধাবান্ সাংখ্যযোগী জ্ঞানলাভ করে শীঘ্রই পরমগতি প্রাপ্ত হন—**'জ্ঞানং লব্ধ্বা পরাং শান্তিমচিরেণাধিগচ্ছতি'** (৪।৩৯)। কারণ তিনি ইন্দ্রিয়কে বশীভূত করেছেন।

৪) **পাপের বিনষ্টি**—অত্যন্ত দুরাচার ব্যক্তিও জ্ঞানরূপী নৌকার সাহায্যে সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হন—**'সর্বং জ্ঞানপ্লবেনৈব বৃজিনং সন্তরিষ্যসি'** (৪।৩৬)। জ্ঞানরূপী অগ্নি পাপরাশিকে ভস্মসাৎ করে **'জ্ঞানাগ্নিঃ সর্বকর্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে'** (৪।৩৭)। কারণ স্বরূপের বোধ হলে শরীর-সংসার থেকে সম্পর্ক-বিচ্ছেদ হয়।

৫) **সন্তুষ্টি**—নিজ স্বরূপ-ধ্যানকারী সাংখ্যযোগী আপনাতে আপনি সন্তুষ্ট হন—**'পশ্যন্নাত্মনি তুষ্যতি'** (৬।২০)। কারণ তাঁর জড়ত্ব অর্থাৎ শরীর, মন, বুদ্ধি ইত্যাদির সঙ্গে সম্বন্ধ থাকে না।

৬) শান্তি-প্রাপ্তি—জ্ঞানযোগী পরমা শান্তি প্রাপ্ত হয় —'**জ্ঞানং লব্ধ্বা পরাং শান্তিমচিরেণাধিগচ্ছতি**' (৪। ৩৯)। কারণ তিনি তত্ত্ব জেনে যান ফলে তাঁর আর কোন কিছু জানার বাকী থাকে না।

৭) সমত্ব-প্রাপ্তি—যিনি সমস্ত প্রাণীতে নিজেকে এবং নিজেকে সমস্ত প্রাণীর মধ্যে দেখেন, তিনি সমদর্শী হয়ে যান অর্থাৎ তাঁর সমত্বপ্রাপ্তি ঘটে—'**সর্বত্র সমদর্শনঃ**' (৬।২৯)। তাঁর সুখ-দুঃখেও সমস্থিতি ঘটে—'**সমদুঃখসুখঃ**' (১৪।২৪)। কেননা তাঁর তত্ত্বের সঙ্গে অভিন্নতা হয়।

৮) জ্ঞান-প্রাপ্তি—ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ পৃথক্ পৃথক্—এইরূপ বিবেক হলে সাংখ্যযোগীর স্বরূপবোধ অর্থাৎ পরমতত্ত্ব প্রাপ্তি হয়—'**যান্তি তে পরম্**' (১৩।৩৪)। কারণ তাঁর প্রকৃতি এবং প্রকৃতির কার্য থেকে সম্বন্ধ-বিচ্ছেদ হয়ে যায়।

৯) প্রসন্নতা (স্বচ্ছতা) প্রাপ্তি—সাংখ্যযোগী অন্তঃকরণের প্রসন্নতা প্রাপ্ত হয়—'**ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা**' (১৮।৫৪), কারণ তিনি অহংকার, কামনা ইত্যাদি থেকে মুক্ত।

ভক্তিযোগ

১) শ্রেষ্ঠ—ভগবানে তদ্গত অন্তঃকরণসম্পন্ন শ্রদ্ধাবান ভক্ত সমস্ত যোগীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ—'**স মে যুক্ততমো মতঃ**' (৬।৪৭)। কারণ ভগবানের ওপরেই তাঁর শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস থাকে এবং তাঁর আশ্রয়ও ভগবানই হয়ে থাকেন। সাংখ্যযোগী এবং ভক্তিযোগীর মধ্যে ভক্তিযোগীই শ্রেষ্ঠ—'**তে মে যুক্ততমা মতাঃ**' (১২।২); কারণ তিনি নিত্য-নিরন্তর ভগবানেই লেগে থাকেন।

২) সুগম—ভক্ত শ্রদ্ধা ও ভক্তি দ্বারা যে পত্র-পুষ্প-ফল-জলাদি ভগবানকে অর্পণ করেন, ভগবান তা গ্রহণ করেন। শুধু তাই নয় যদি ভক্তের কাছে পত্র-পুষ্প ইত্যাদিও দেওয়ার মত না থাকে, তবে তিনি যা কিছু করেন তা সমস্ত যদি ভগবানে অর্পণ করেন, তাহলে তিনি সকল বন্ধন-মুক্ত হয়ে ভগবানকে প্রাপ্ত হন—'**পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং -------মামুপৈষ্যসি**' (৯।২৬-২৮)। কারণ ভক্তের ভগবানে অর্পণ করার ভাব থাকে এবং ভগবানও ভাবগ্রাহী।

৩) শীঘ্র সিদ্ধি লাভ—ভগবানে সমর্পিতচিত্ত ভক্তকে ভগবান অতি শীঘ্রই উদ্ধার করে থাকেন—'**তেষামহং সমুদ্ধর্তা----নচিরাৎপার্থ ময্যাবেশিত-চেতসাম্**' (১২।৭) কারণ তিনি কেবল ভগবৎপরায়ণ হন ; সুতরাং তাঁকে উদ্ধার করার দায়িত্ব ভগবান গ্রহণ করেন।

৪) পাপের বিনষ্টি—ভগবান তাঁর শরণাগত ভক্তকে সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত করেন—'**অহং ত্বা সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি**' (১৮।৬৬)। কারণ শরণাগত ভক্তের সমস্ত দায়িত্ব স্বয়ং ভগবানের।

৫) সন্তুষ্টি—ভগবানে অর্পিতচিত্ত ভক্ত সর্বদা সন্তুষ্ট থাকেন—'**তুষ্যন্তি**' (১০।৯)। কারণ ভগবানে যেমন যেমন মন অর্পিত হয়, তেমন তেমনই তিনি সন্তোষ লাভ করেন—'আমার মন ভগবৎচিন্তনে ব্যাপৃত'। সিদ্ধাবস্থায় ভক্তদের এই সন্তোষ স্বাভাবিকভাবে হয়ে থাকে—'**সন্তুষ্টঃ সততং যোগী**' (১২।১৪)। কারণ তাঁর ভগবৎপ্রাপ্তি হয়েছে।

৬) শান্তি-প্রাপ্তি—ভক্ত পরম শান্তি লাভ করেন—'**শান্তিং নির্বাণপরমাম্**' (৬।১৫), '**শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি**' (৯।৩১)। কারণ তাঁর আশ্রয় হচ্ছে কেবল ভগবান।

৭) সমত্ব-প্রাপ্তি—ভগবান তাঁর ভক্তকে সেই সমত্ব প্রদান করেন, যার দ্বারা ভক্ত ভগবানকে লাভ করেন—'**দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে**' (১০।১০)। কারণ তিনি শুধু ভগবানেই লেগে থাকেন, ভগবান ছাড়া তিনি আর কিছুই চান না।

৮) জ্ঞান-প্রাপ্তি—ভগবান স্বয়ং তাঁর ভক্তের অজ্ঞান দূর করেন—'তেষামেবানুকম্পার্থ-------জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা' (১০।১১)। কারণ যেহেতু ভগবানেই তাঁর চিত্ত সমর্পিত এবং ভগবান ছাড়া তাঁর আর কিছু চাওয়ার নেই। তাই ভগবান নিজেই তার অজ্ঞান দূর করে ভগবৎ-তত্ত্বের জ্ঞান করিয়ে দেন।

৯) প্রসন্নতা (স্বচ্ছতা) প্রাপ্তি—ভক্তের অন্তঃকরণ প্রসন্ন এবং স্বচ্ছ হয়—'**প্রশান্তাত্মা**' (৬।১৪)। কারণ তিনি সর্বদা ভগবানের ধ্যানেই রত থাকেন।

(৪৬) গীতায় যোগ এবং ভোগ

প্রভুণা সহ সম্বন্ধো জীবানাং যোগ উচ্যতে।
প্রকৃত্যা কৃতসম্বন্ধঃ প্রাণিনাং ভোগ উচ্যতে॥

জীবের পরমাত্মার সঙ্গে যে স্বতঃসিদ্ধ সম্বন্ধ, তাকে 'যোগ' বলে এবং বস্তু, ব্যক্তি, ক্রিয়া, পদার্থ, ঘটনা, পরিস্থিতি ইত্যাদি প্রাকৃত বস্তুগুলির সঙ্গে যে সম্বন্ধ মানা হয়, তাকে 'ভোগ' বলে। সংসারের আসক্তি ত্যাগ করা হলো 'যোগ' এবং আসক্তি ধরে রাখা হলো 'ভোগ'। 'যোগ' নিত্য এবং 'ভোগ' অনিত্য।

খাদ্যবস্তু গ্রহণ শুধু জীবননির্বাহের জন্য করা উচিত। ভোজ্য-পদার্থে যদি অনুরাগ না হয়, আকর্ষণ না থাকে, তাহলে ভোজনও 'যোগ' বলে বিবেচিত হয়। অপরপক্ষে শরীর যেন পরিপুষ্ট হয়, বলশালী হয়—এই দৃষ্টিতে এবং স্বাদ পাবার বা রস গ্রহণ করার জন্য যে ভোজন করা হয়, তাকে 'ভোগ' বলা হয়। অর্থাৎ রাগরহিত হয়ে, নির্লিপ্ততাপূর্বক ভোজন করলে পূর্বের অনুরাগ নষ্ট হয় এবং স্বাদবুদ্ধি, সুখবুদ্ধি না হওয়ায় নতুন করে আর অনুরাগ সৃষ্টি হয় না, ফলে তা 'যোগ' হয়। অনুরাগপূর্বক ভোজন করলে পুরাতন অনুরাগ বৃদ্ধি পায় এবং স্বাদ-বুদ্ধি, সুখ-বুদ্ধি হলে নতুন অনুরাগ সৃষ্টি হয়, যাকে 'ভোগ' বলে।

সাংসারিক বস্তু, পদার্থ আদির অনুরাগ ত্যাগ করলে যে সুখ পাওয়া যায়, তার দ্বারা 'যোগ' হয় (১২।১২), এবং ভোগের দ্বারা যে তাৎক্ষণিক বা সাময়িক সুখ হয়, তাতে বন্ধন সৃষ্টি করে (১৮।৩৮)।

প্রবাদ আছে যে, একগুণ দান, সহস্রগুণ পুণ্য। ফলাকাঙ্ক্ষা করে এক টাকা দান করলে তাতে হাজার গুণ পুণ্য হয় অর্থাৎ হাজার টাকার সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। সুতরাং এইরূপ দান সম্বন্ধ-জনিত ভোগ সৃষ্টি করে। অর্থাৎ সকামভাবে করা দানের দ্বারা বর্তমানে বস্তু ইত্যাদির তাৎক্ষণিক সম্বন্ধ-বিচ্ছেদ মনে হলেও পরিণামে বস্তু আদির সম্বন্ধ তৈরী হয় (২।৪২-৪৪)। দান করা কর্তব্য এই ভাব নিয়ে, প্রত্যুপকারের আশা না করে অর্থাৎ নিষ্কামভাবে যদি দান করা যায়, তবেই বস্তু ইত্যাদির সঙ্গে সম্বন্ধ-বিচ্ছেদ ঘটে (১৭।২০)। একেই ত্যাগ বলে। ত্যাগে অনন্ত পুণ্য হয়, ত্যাগে মহান পবিত্রতা আসে এবং ত্যাগের দ্বারা তৎক্ষণাৎ যোগ সিদ্ধ হয় (৬।২৩)। যোগ দ্বারা সাংসারিক বিয়োগ হয় (৬।২৩) এবং ভোগ দ্বারা সাংসারিক যোগ হয় (৫।২২)।

অপরকে নিষ্কামভাবে সুখ দেওয়ার জন্য, হিত কর্ম করার জন্যই তাদের সঙ্গে যে সম্পর্ক করা হয় তাতে 'যোগ' হয়, কারণ এতে নিজের অনুরাগ, সুখ, আরাম, প্রভৃতি ত্যাগ করা হয়। অপরপক্ষে, কোন বস্তু বা ব্যক্তি থেকে সুখ পাওয়ার জন্য সম্পর্ক করলে, তাতে 'ভোগ' হয়। বস্তু, ব্যক্তি ইত্যাদিতে অনুরাগপূর্বক সম্বন্ধ স্থাপন করলে পরমাত্মার নিত্য-সম্বন্ধের অনুভব হয় না।

বস্তু বা ব্যক্তি থেকে সম্পর্করহিত হলে একপ্রকার সুখ অনুভূত হয়। সাধক সেই সুখভোগে যদি লালায়িত না হয় তবে 'যোগ' হয়। কিন্তু যদি সেই সুখ সে ভোগ করে এবং তাতে খুশী হয়, তবে তাতে 'যোগ' না হয়ে 'ভোগ' হয়।

সাধক যদি ভোগবুদ্ধি সর্বতোভাবে ত্যাগ করে, তাহলে তার সব সাধনাতেই 'যোগ' (পরমাত্মার নিত্য অনুভব) হয়ে যায়। যেমন—কর্মযোগে শুধু সৃষ্টিচক্রের সীমা সুরক্ষিত রাখার জন্য, কেবল কর্তব্য-পরম্পরা রক্ষার জন্য নিষ্কামভাবে কর্তব্য-কর্ম করলে কর্মের প্রবাহ কেবল সংসারের দিকে যায় এবং কর্মগত সম্পর্করহিত হওয়ায়, ভোগাসক্তিরহিত হওয়ায় পরমাত্মার সঙ্গে স্বয়ং (স্বরূপে)-এর যোগ হয়ে যায় (৪।২৩)।

জ্ঞানযোগে সৎ-অসৎ-এর বিবেক-বিচার দ্বারা বস্তু, ব্যক্তি, ক্রিয়া ইত্যাদি পরিবর্তনশীল পদার্থ থেকে সাধক সম্বন্ধ-রহিত হয়, এর ফলে সে পরমাত্মার সঙ্গে যুক্ত হয় অর্থাৎ সাধক পরমাত্মার সঙ্গে নিজের স্বতঃসিদ্ধ অভিন্নতা অনুভব করে (১৩।২৩, ৩৪)।

ভক্তিযোগে সমস্ত ক্রিয়া, পদার্থ ইত্যাদিকে ভগবানের বলে মেনে ভগবানকেই অর্পণ করা হয়, যার ফলে সকল ক্রিয়া পদার্থ ইত্যাদিতে সম্বন্ধ-রহিত হয়ে সাধক ভগবানের সঙ্গে যুক্ত হয় অর্থাৎ ভগবানের সঙ্গে একাত্মতা

লাভ করে (৯।২৭-২৮)।

ধ্যানযোগে নিরন্তর পরমাত্মায় মন অভিনিবেশ করলে মন যখন সংসার থেকে বিরত হয়ে যায় তখন পরমাত্মার সঙ্গে যোগ হয় এবং নিজ স্বরূপ অনুভূত হয় (৬।২০, ২৮)।

অষ্টাঙ্গযোগে ক্রমশঃ যম, নিয়মাদি আট অঙ্গ নিষ্কামভাবে পালন করলে, তার দ্বারা সংসারের সম্বন্ধ রহিত হয়ে পরমাত্মার সঙ্গে যোগ হয়ে যায় (৫।২৭-২৮)। কিন্তু তাতে সাধকের বিশেষ সাবধান থাকতে হয় যেন সে কোন সিদ্ধিতে আবদ্ধ না হয়ে যায়। যদি সে সিদ্ধিতে আবদ্ধ হয়ে যায় তাহলে তাতে ভোগ হয়, যোগ হয় না।

তাৎপর্য এই যে, যে কোন পথেই সাধক বিচরণ করুক না কেন সাংসারিক ব্যবহারে অথবা সাধন অবস্থায়, সর্বদাই সাধককে সাবধান থাকতে হয়। কোন অবস্থাতেই বস্তু, ব্যক্তি, ক্রিয়া, পদার্থ, যোগ্যতা, স্থিরতা ইত্যাদির থেকে সুখ গ্রহণ করা উচিত নয়। কারণ তার থেকে সুখ গ্রহণ করলে, সেটি ভোগরূপে পরিণত হয়, যোগ হয় না (১৪।৬)।

সাত্ত্বিক সুখ সান্নিধ্য (আসক্তির) দ্বারা, রাজসিক সুখ কর্মের আসক্তিতে এবং তামসিক সুখ নিদ্রা, আলস্য এবং প্রমাদে আবদ্ধ করে (১৪।৬-৮)। সুতরাং সাধককে সাবধানে থাকতে হয় যেন সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক সুখে সে আবদ্ধ না হয়, সেগুলির সঙ্গে তার সম্বন্ধ না হয়, তাহলেই তার পরমাত্মার সঙ্গে যোগ হওয়া সম্ভব।

(৪৭) গীতায় বন্ধ এবং মোক্ষের স্বরূপ

গুণসঙ্গো হি জীবানাং বন্ধনং কথ্যতে মহৎ।
গুণসঙ্গপরিত্যাগো জীবানাং মোক্ষ উচ্যতে॥

রন্ধনের জন্য পরিষ্কার বাসন উনুনে চাপালে তাতে বাইরে ধোঁয়া এবং ভিতরে খাদ্যপদার্থ আটকে যায়, এইভাবে সেই বাসনে বিজাতীয় দ্রব্যের (ধোঁয়া, অন্নের) সঙ্গে সম্পর্ক হয়। পরিষ্কার কাপড়ে ময়লা লেগে যায়, আয়নাতে ময়লা পড়ে, বাড়ী-ঘর অপরিচ্ছন্ন হয়ে যায়। এইভাবে কাপড়, আয়না ও বাড়ী-ঘরের সঙ্গে বিজাতীয় দ্রব্যের সম্পর্ক হয়। কিন্তু বাসন-পত্র মাটি এবং জল দিয়ে ধুলে তা পরিষ্কার হয়ে যায় অর্থাৎ তাতে আটকে থাকা খাদ্যপদার্থ ও ধোঁয়া ধুয়ে ফেললে তা পুনরায় আগের মতো হয়ে যায়। কাপড়কে সাবান ও জল দিয়ে ধুলে তার ময়লা বেরিয়ে যায় এবং সেটি পরিচ্ছন্ন হয়ে নিজ স্বরূপ ফিরে পায়। আয়নাকে পরিষ্কার কাপড় দিয়ে মুছলে তার ময়লা চলে গিয়ে সেটি পরিষ্কার হয়ে যায়। বাড়ী-ঘর ঝাড়ু দিয়ে সাফ করলে ময়লা চলে যায় এবং সেটিও পরিষ্কার হয়ে যায়। তেমনি জীবাত্মা (স্বয়ং) প্রকৃতি এবং তার কার্য শরীর ইত্যাদির সঙ্গে নিজ সম্বন্ধ পাতিয়ে নেয়, তার বশ হয়ে যায় এবং তাতে তার অশুদ্ধি আসে, একেই বলে বন্ধন। কিন্তু যখন সে প্রকৃতি এবং তার কার্যগুলির সঙ্গে পাতানো সম্বন্ধ পরিত্যাগ করে, তখন সে নির্মল হয় এবং তার নিজ স্বরূপবোধ জেগে যায়, একেই বলা হয় মোক্ষ।

বাসনে ধোঁয়া, ময়লা বা অন্ন না লাগলে যেমন বাসন পরিষ্কার থাকে, ময়লা না ধরলে যেমন কাপড় পরিচ্ছন্ন থাকে, আয়নাতে ময়লা না পড়লে যেমন আয়না স্বচ্ছ থাকে, বাড়ী-ঘরে নোংরা না জমলে যেমন পরিচ্ছন্ন থাকে, তেমনি জীবাত্মা যদি প্রকৃতির স্থূল, সূক্ষ্ম এবং কারণ-শরীরকে না ধরে, তার সঙ্গে আত্মীয়তা না করে, তাকে নিজের না মনে করে, তবে সে মুক্তই থাকে। বাসন, কাপড়, আয়নার সঙ্গে জীবের এক বিশেষ তফাৎ এই যে, বাসন ইত্যাদি নিজে ময়লাকে ধরে না, বরং ময়লা আপনিই আসে এবং এতে লেগে যায়, অপরপক্ষে জীবাত্মা নিজে প্রকৃতির কার্য-শরীর, ইন্দ্রিয় ইত্যাদির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে, তাকে আপন বলে

মানে, যার ফলে সে বদ্ধ হয়ে যায়। সৎ-অসৎ, শুভ-অশুভ যোনিতে জন্মগ্রহণ গুণসমূহের সংসর্গেই হয় (১৩।২১)। সকল প্রাণী ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞের সংযোগ থেকেই উৎপন্ন হয় (১৩।২৬), কিন্তু এই সম্পর্ক ক্ষেত্র দ্বারা হয় না, ক্ষেত্রজ্ঞ (জীবাত্মা) নিজেই করে থাকে। ক্ষেত্রের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করাই বন্ধন এবং সম্পর্ক না করাই হল মোক্ষ।

ভগবান বলেছেন যে, আমার অপরা প্রকৃতি, পৃথিবী, জল, তেজ ইত্যাদি আট ভাগে বিভক্ত এবং এ থেকে ভিন্ন জীবরূপে হল আমার পরা প্রকৃতি। এই পরা-প্রকৃতি (জীবাত্মা)ই অহংকার-মমতা, কামনা, বাসনা ইত্যাদির দ্বারা এই জগতকে ধারণ করে আছে (৭।৪-৫)। জীবলোকে জীবভূত এই আত্মা আমারই সনাতন অংশ, কিন্তু তারা ভ্রমবশতঃ প্রকৃতিতে স্থিত মন-ইন্দ্রিয়ের প্রতি আকর্ষিত হয়ে তাকে নিজের বলে মনে করে (১৫।৭)। এর তাৎপর্য হল, জীবাত্মা স্বরূপতঃ স্বতঃ অসঙ্গ, কিন্তু সে প্রকৃতির গুণ-কার্য ইন্দ্রিয়, শরীর প্রভৃতিকে স্বীকার করে নিয়ে তার সঙ্গে একাত্মতা করে, ফলে সে বন্ধনে আবদ্ধ হয়। স্ত্রী, পুত্র, অর্থ, সম্পদকে যত বেশী আপন মনে করে, ততই সে বদ্ধ হতে থাকে, এদের বশীভূত হয়ে যায়। অপরদিকে যতই সে এদের সম্পর্ক ত্যাগ করতে থাকে, ততই সে মুক্ত হতে থাকে।

জীবাত্মা স্বয়ং প্রকৃতির সম্পর্ক ছাড়া কোন সাংসারিক কার্যাদি করতে অক্ষম। প্রকৃতির সম্পর্ক ছাড়া যখন সে কিছু করতেই পারে না তখন (প্রকৃতির সম্বন্ধ ছাড়া) এ বন্ধনেও আবদ্ধ হতে পারে না। কিছু না করতে পারার কারণে তার ওপর কিছু করার কোন দায়িত্ব ন্যস্ত হয় না এবং কর্তৃত্বও আসে না। সেইজন্যই গীতায় বিভিন্ন জায়গায় একে অকর্তা বলা হয়েছে (১৩।২৯, ৩২-৩৩ প্রভৃতি)।

প্রকৃতির সঙ্গে মেনে নেওয়া যে সম্পর্ক, তা দূর করার তিনটি উপায় আছে—

১) কর্মযোগ—কর্মযোগের দ্বারা বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার উপায় এই যে, মানুষ স্থূল, সূক্ষ্ম এবং কারণ-শরীর দিয়ে যা কিছু করে, তা যেন কেবল লোকসংগ্রহের জন্য, কর্তব্য-পরম্পরা সুরক্ষিত রাখার উদ্দেশ্যে, মানুষকে কু-পথ থেকে সৎপথে ধরে রাখার জন্য এবং প্রাণীমাত্রেরই হিত করার জন্য করে, নিজের জন্য নয়, (৩।৯, ২০)। এরূপ করলে তার অসঙ্গতা এবংনিজ স্বরূপবোধ জাগ্রত হয়।

২) জ্ঞানযোগ—জ্ঞানযোগ দ্বারা মুক্তি পাবার উপায় হলো এই যে, মানুষ সৎ-অসৎ, নিত্য-অনিত্যকে বিবেক দ্বারা অসৎ(শরীর ইত্যাদি) থেকে নিজেকে পৃথক বলে যেন অনুভব করে। এইরূপ করলে সে মোক্ষ লাভ করে এবং বন্ধনমুক্ত হতে সক্ষম হয় (১৩।২৩, ৩৪)।

৩) ভক্তিযোগ—ভক্তিযোগ দ্বারা বন্ধন থেকে মুক্ত হবার উপায় এই যে, মানুষ নিজেকে এবং সংসারকেও যেন ভগবানের মনে করে, তাঁর প্রসন্নতার জন্যই যেন সমস্ত কার্য নিষ্পন্ন করে, সমস্ত কর্ম ভগবানেই অর্পণ করে। এইরূপ করার ফলে সে সংসার-বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে যায় (৯।২৬-২৮)।

বাস্তবে বন্ধন নেই। যদি বন্ধন বলে কিছু থাকত, তবে তার কখনো অনস্তিত্ব হোত না—**'নাভাবো বিদ্যতে সতঃ'** (২।১৬), এবং জীব কখনো বন্ধন থেকে মুক্ত হোত না। প্রকৃতপক্ষে এই বন্ধন নিজেরই সৃষ্টি, বন্ধনকে ধরে রাখা হয়েছে। সুতরাং সে ইচ্ছা করলেই, বন্ধন মুক্ত হতে পারে। বন্ধন ত্যাগে সে স্বাধীন, সবল, সমর্থ, যোগ্য এবং অধিকারী। তাই গীতা বলে যে, অতি পাপী ব্যক্তিও জ্ঞান লাভ করতে পারে (৪।৩৬) এবং অত্যন্ত দুরাচার ব্যক্তিও অনন্যভাবে ভগবানের সাধন ভজন করতে পারে (৯।৩০)। সুতরাং যে কোন দেশ বা বেশভূষা, যে কোনও বর্ণের বা সম্প্রদায়ের কোনও ব্যক্তি স্ত্রী বা পুরুষ যেই হোক না কেন তারাও সংসার-বন্ধনরহিত হয়ে মোক্ষ প্রাপ্ত করতে পারে।

সব সাধকই নিজ নিজ সম্প্রদায় অনুযায়ী দ্বৈত, অদ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত, অচিন্ত্যভেদাভেদ, দ্বৈতাদ্বৈত ইত্যাদি কোন এক সম্প্রদায়ের মত অনুসারে পারমার্থিক পথে অগ্রসর হয় এবং সেই ধারণানুসারেই তাঁর পরমাত্মতত্ত্ব, নিজ স্বরূপের অনুভব হয়। কিন্তু তাদের সকলেরই এই পরিবর্তনশীল জগৎ-সংসার থেকে সম্বন্ধের বিচ্ছেদ হয়। সম্বন্ধ-রহিত হলে তাদের কাছে সংসারের কোন পৃথক সত্তা থাকে না ; কারণ বাস্তবে সংসারের পৃথক সত্তা নেই-ই।

ভগবান পরা (চেতন) ও অপরা (জড়) এই দুই-ই

নিজের প্রকৃতি বলে জানিয়েছেন। অপরা-প্রকৃতি নিত্য পরিবর্তনশীল, তা কখনও একভাবে থাকে না এবং পরা-প্রকৃতি পরমাত্মার থেকে অভিন্ন, কাজেই তা ভিন্ন হয়ে লীলা করুক বা অভিন্ন অবস্থাতে থাকুক, পরমাত্মা ভিন্ন তার কোন আলাদা (স্বতন্ত্র) সত্তা হয় না। লীলার জন্যই তাকে দ্বৈতরূপে দেখা যায়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা অদ্বৈতই থাকে, তার পরমাত্মার সঙ্গে নিত্য যোগ থাকে। অর্থাৎ প্রেমরস আস্বাদনের জন্য পরা-প্রকৃতি পরমাত্মার থেকে পৃথক হয়ে লীলা করে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা কখনই পৃথক নয়। এই বিষয়ে আচার্যদের মধ্যেও মতভেদ আছে। কোন কোন আচার্য অদ্বৈত মানেন, কোন আচার্য মানেন দ্বৈত, কেউ বা দ্বৈতাদ্বৈত, আবার কেউ বিশিষ্টাদ্বৈত ইত্যাদি। সেই আচার্যগণের মতানুসারে, মান্যতানুসারে, সম্প্রদায় অনুসারে সাধকদের সাধনভজন চলতে থাকে। অর্থাৎ কোন সাধক দ্বৈত মানেন এবং সেইভাবে চলেন, কোন সাধক অদ্বৈত পথে চলেন, কিন্তু বাস্তবিক অনুভব হলে প্রথমে যেরূপ মান্যতা ছিল সেরূপ আর থাকে না। সাধকদের প্রাথমিক যে ধারণা থাকে তার চেয়ে বিলক্ষণ তত্ত্ব প্রাপ্ত হন। যেমন—কেউ বদ্রীনারায়ণ যাওয়া স্থির করেছেন, তখন তিনি বদ্রীনারায়ণের বিষয়ে (শোনা কথা অনুযায়ী) অনেক প্রকার কল্পনা করতে থাকেন যে, সেখানে এইরূপ মন্দির হবে, মন্দিরের কাছেই অলকানন্দা নদী বইছে, বরফের পাহাড় কাছাকাছি, ইত্যাদি। কিন্তু তিনি যখন সেখানে যান তখন দেখেন যা কল্পনা করেছিলেন তেমনটি নয়, উপরন্তু তার চেয়েও অনেক বেশী। আমরা কোন মহাত্মার বিষয়ে শুনে তাঁর মহিমা গুণ জেনে এবং তাঁর শরীর এইরূপ, মাথায় সাদা চুল ইত্যাদি নানাবিধ কথা শুনে একরূপ ধারণা করে রাখলেও যখন তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় তখন তাঁর সঙ্গে আমাদের ধারণা মেলে না, উপরন্তু তাঁকে আরও বিশেষ মনে হয়। এইরূপ সাধক প্রথমে নিজ সম্প্রদায় অনুযায়ী, নিজ ধারণা অনুযায়ী সাধনা করেন ; কিন্তু প্রকৃত অনুভব ওই ধারণার থেকে ভিন্নই হয়। যদি আমরা প্রকৃত অনুভবকে নিজের পূর্বধারণা থেকে ভিন্ন বলে না স্বীকার করি, সাধকাবস্থায় যা ভেবেছিলাম ঠিক সেইরূপই মনে করি, তবে সাধক এবং সিদ্ধের মধ্যে কোন পার্থক্য হতে পারে না। সাধক এবং সিদ্ধের ভিন্নতার দ্বারাই প্রমাণিত হয় যে, তত্ত্ব প্রকৃতপক্ষে সাধকের ধারণার মতো নয়। কারণ তত্ত্ব বর্ণনাতীত, তার বর্ণনা করা যায় না ; তার অনুভব হয় মাত্র। অতএব ঐ তত্ত্বের বর্ণনা, বিবেচনা করার সময় যেমন মান্যতা থাকে অনুভব হওয়ার পরে আর সেরূপ মান্যতা থাকে না। যেমন, কোন সাধক বিবেক-(প্রকৃতি-পুরুষের ভিন্নতা) এর প্রাধান্য বজায় রেখে সাধনা করেন ; কিন্তু যখন তাঁর বাস্তবিক তত্ত্ব অনুভূত হয়, তখন তাঁর কাছে প্রকৃতির স্বতন্ত্র সত্তা থাকে না এবং বিবেকও প্রকৃত তত্ত্বে পরিণত হয়, তার নাম আর তখন 'বিবেক' থাকে না, 'বোধ' হয়ে যায়। এই বোধকেই প্রকৃতপক্ষে অনুভব বলা হয়। অর্থাৎ সাধনাবস্থায় সাধকের যে ধারণা থাকে, প্রকৃত তত্ত্বের অনুভব হলে তা আর থাকে না। কারণ সাধকের বিচার করার যে সমস্ত উপকরণ, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, অন্তঃকরণ ইত্যাদি থাকে তা সমস্তই অপরা-প্রকৃতির অংশ। তাই এ সমস্ত একত্র হয়েও প্রকৃতির অতীত যে তত্ত্ব তা চিনতে পারে না।

যে সাধক দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ইত্যাদি কোন ভাবের প্রাধান্য রেখে ভজন করেন, তাঁর যখন (তত্ত্ব) অনুভব হয়ে যায়, তখন তাঁর আর এই সমস্ত ভিন্ন বোধের ভাব (আলাদা আলাদা করে) থাকে না। তাঁর ভগবানের সঙ্গে নিত্য যোগ হয়ে যায়। যেমন শ্রীরাম যখন বনবাসে চলে গেলেন তখন তাঁর মা কৌশল্যা সুমিত্রাকে জিজ্ঞাসা করলেন, ভগ্নি, সত্য করে বল, রাম বনে চলে গেছে, না এখানেই আছে ? যদি বনে চলে গিয়ে থাকে তাহলে সে আমার দৃষ্টিগোচরে আছে কেমন করে, আর বনে যদি গমন না করে থাকে, তবে আমার হৃদয় এত ব্যাকুল কেন ? এতে বোঝা যাচ্ছে মাতা কৌশল্যার শ্রীরামের সঙ্গে নিত্য যোগ রয়েছে। নিত্যযোগ কখনও স্মৃতিরূপে হয় এবং কখনও স্বরূপে হয়। 'বিয়োগ (বিচ্ছেদ) হবে' এইরূপ ভাব থাকলে 'যোগে বিয়োগ' হয় ; এবং বিয়োগেও সর্বদা প্রেমাস্পদকে সামনে দেখতে পাওয়া যায়—এই হলো 'বিয়োগে-যোগ'। এইরূপ যোগে-বিয়োগ এবং বিয়োগে-যোগ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হতে থাকে। যোগ এবং বিয়োগের ধারায় প্রেম প্রতিমুহূর্তে বৃদ্ধি পেতে থাকে। কোন কোন আচার্য যোগকে, আবার কোন কোন আচার্য বিয়োগকে প্রাধান্য দিয়েছেন।

যিনি অদ্বৈতমত মানেন, তাঁর যে আনন্দপ্রাপ্তি হয়, তা অখণ্ড (শান্ত) হয়। আবার যাঁরা দ্বৈতবাদী, প্রেমকে মানেন, তাঁদের যে আনন্দপ্রাপ্তি হয় তা অনন্ত (প্রতিক্ষণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত) হয়। সেই প্রেমের আনন্দতেই যোগে বিয়োগ এবং বিয়োগে যোগ—এই প্রবাহ চলে, যার কখনো অন্ত হয় না।

প্রশ্ন— মুক্তি পাঁচ প্রকারের কি কি ?

উত্তর—সালোক্য, সার্ষ্টি, সামীপ্য, সারূপ্য ও সাযুজ্য (একত্ব)—এই পাঁচ প্রকারের। ভগবদ্ধামে বাস করাকে **'সালোক্য'** বলে। ভগবদ্ধামে এক বিশেষ আনন্দ থাকে, সেখানে সুখ বা দুঃখের মিলিত সুখ নেই বরং সুখ-দুঃখের অতীত যে আনন্দ, তাই আছে। সালোক্যের পরে যে মুক্তি তাকে বলে **'সার্ষ্টি'**। এই মুক্তির দ্বারা ভক্তের ভগবদ্ধামে ভগবানের সমান ঐশ্বর্য প্রাপ্তি হয় অর্থাৎ ভগবানের যেমন ঐশ্বর্য, তেমনি ঐশ্বর্য ভক্ত লাভ করে। জগৎ-সংসার উৎপন্ন করা বা সংহার করা ব্যতীত আর সমস্ত ঐশ্বর্য, ধর্ম, যশ, শ্রী, জ্ঞান এবং বৈরাগ্য— এই সমস্তই ভগবানের সঙ্গে সমভাবে ভক্ত প্রাপ্ত হয়। সার্ষ্টির পরে যে মুক্তি তাকে বলে-**'সামীপ্য'**। এই মুক্তির দ্বারা ভক্ত ভগবদ্ধামে থেকে ভগবানের সমীপে (নিকটে, সন্নিধানে) বাস করে এবং ভগবানের সঙ্গে মা-বাবা, সখা, পুত্র, স্ত্রী ইত্যাদি সম্পর্ক করে থাকে। সামীপ্যর পরেও মুক্তি আছে **'স্বারূপ্য'**। এই মুক্তির সহায়ে ভক্তের অবস্থা ভগবানের সমান হয়ে যায়। ভগবানের বক্ষঃস্থলস্থিত শ্রীবৎস (লক্ষ্মীদেবীর আবাস), ভৃগুলতা (শ্রীভৃগুর চরণ-চিহ্ন) এবং কৌস্তুভমণি—এই তিনটি বাদে শেষগুলি অর্থাৎ শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম ইত্যাদি সমস্ত চিহ্নই ভক্তেরও হয়ে যায়। সারূপ্যেরও পরের মুক্তি হল-**'সাযুজ্য'**। এর অর্থ হচ্ছে একত্ব। এই মুক্তিতে ভক্ত ভগবানের সঙ্গে অভিন্ন হয়ে যায়, অর্থাৎ সে আর তার পৃথক্ অস্তিত্ব আছে বলেই মনে করে না।

উপরিউক্ত পাঁচ প্রকার মুক্তি, সগুণ-সাকার যারা মানে তাদের হয়। এই পাঁচ মুক্তির মধ্যে 'সাযুজ্য' (একত্ব) মুক্তিকে নির্গুণ-নিরাকারবাদিগণ ও অদ্বৈত-সিদ্ধান্তপথে বিচরণকারিগণও মানতে পারেন।

প্রেমী ভক্ত ভগবানের সেবা ছেড়ে এই পাঁচ প্রকার মুক্তি ভগবানের দ্বারা প্রদত্ত হলেও গ্রহণ করতে চায় না—

সালোক্যসার্ষ্টিসামীপ্যসারূপ্যৈকত্বমপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ॥

(শ্রীমদ্ভাগবত ৩।২৯।১৩)

কারণ সে কেবল ভগবানকে সুখ দিতে চায়। সংসারে জন্ম-মরণ হোক, সংসার বন্ধন থেকে মুক্তি না হোক, এসবের সে পরোয়া করে না। বন্ধনে দুঃখ এবং মুক্তিতে সুখ পাওয়া যায়, কিন্তু ভগবানের সেবা যারা করে তারা নিজ সুখ-দুঃখের পরোয়া করে না, বরং ভগবানের প্রসন্নতাপ্রাপ্তিই তাদের উদ্দেশ্য থাকে।

বদ্ধ অবস্থায় আমরা ব্রহ্ম, জীব ইত্যাদিকে বিশেষ রীতিতে দেখি এবং প্রকৃতিকেও কার্যকারণরূপে বিশেষভাবে দেখি। সাধনা করতে করতে সাধকের ব্রহ্ম, জীব ইত্যাদির বিষয়ে বিশেষরকম অনুভব হয়। সিদ্ধাবস্থায় আরও বেশী অনুভব হয়। অদ্বৈত-সিদ্ধান্তে যে মোক্ষ হয়, তাতে জড়ের সঙ্গে সম্পর্ক রহিত হওয়াই প্রাধান্য পায় এবং ভক্তি দ্বারা যে মোক্ষ প্রাপ্তি ঘটে, তাতে চিন্ময় তত্ত্বের সঙ্গে ঐক্যই প্রাধান্য পায়।

(৪৮) গীতার সমত্ব

সিদ্ধসাধকয়োঃ প্রোক্তা গীতায়াং সমতা দ্বিধা।
মানসী সাধকানাং চ সিদ্ধানাং সহজা স্মৃতা॥

গীতায় কোন প্রভাবশালী লক্ষণ যদি থাকে তা হল সমত্ব। সেই সমত্ব বা সাম্যভাব কোন সাধনা দ্বারা লাভ হয়ে গেলেই গণ্ডী পার হওয়া যায়। সাধকে সমত্ব এলে গীতা অন্য লক্ষণ নিয়ে বিচার করে না ; কারণ সমত্ব

সাক্ষাৎ পরমাত্মারস্বরূপ—'**নির্দোষং হি সমং ব্রহ্ম**' (৫।১৯), '**সমোঽহং সর্বভূতেষু**' (৯।২৯) এবং সমত্বই সাধনার পূর্ণতা। সুতরাং সমত্ব এলে অন্যান্য লক্ষণ আপনিই এসে পড়ে। যদি কোন মানুষের মধ্যে সমত্ব না থাকে, অপর লক্ষণ বহুল পরিমাণে থাকে তবে সে অপূর্ণ, তার পূর্ণতা নেই। সমত্ব ব্যতীত অন্য সব লক্ষণ—বিদ্যা, যোগ্যতা, সম্মান, সুস্থতা, ধন-সম্পত্তি ইত্যাদির কোন মূল্য নেই, তা সবই অসমত্বের বিষয়। সমত্ব মানুষমাত্রেই স্বাভাবিকভাবে থাকে। অসমত্ব মানুষের নিজের সৃষ্ট। সুতরাং অসমত্ব কৃত্রিম, প্রাকৃত, তা স্থায়ী নয় ; কারণ তা অসৎ (শরীর ইত্যাদির)-এর সংস্পর্শে জাত।

প্রত্যেক কাজেরই আরম্ভ থাকে এবং শেষ থাকে। কর্মফলেরও সংযোগ এবং বিয়োগ হয়ে থাকে, কিন্তু স্বরূপ (স্বয়ং) যেমন তেমনি থাকে। এটি সকলের অনুভবগম্য। সংযোগ বা বিয়োগ ব্যক্তি, ক্রিয়া বা পদার্থের হয় কিন্তু স্বরূপ-এর কোন সংযোগ বা বিচ্ছেদ হয় না, যেমন তেমনি থাকে। সংযোগমাত্রেরই বিয়োগ হওয়া অবশ্যম্ভাবী অর্থাৎ যার সংযোগ হয় তার বিচ্ছেদ হবেই। কিন্তু যার বিচ্ছেদ হয়েছে তার যে সংযোগ হবেই—এ নিয়ম নেই। সুতরাং সংযোগ অনিত্য আর বিচ্ছেদ নিত্য। সেইজন্য মানুষ যদি বিচ্ছেদের দিকে সদা দৃষ্টি রাখে তবে তার মধ্যে কখনো অসমত্ব আসতে পারে না। কারণ অসমত্ব হল আগন্তুক, কিন্তু সমত্ব তার মধ্যে স্বতঃসিদ্ধ। এই সমতার নাম 'যোগ' (২।৪৮)।

পরমাত্মা হচ্ছেন সম। তিনি অ-সম হতেই পারেন না। অপরপক্ষে প্রকৃতি অ-সম, সুতরাং পরমাত্মার দিকে যার দৃষ্টি থাকে, সে সমদৃষ্টিসম্পন্ন হয়। অর্থাৎ সর্বত্র সমরূপ, পরমাত্মরূপ দেখাই সমদৃষ্টি এবং প্রকৃতি বা তার কার্য (শরীর, সংসার) ইত্যাদি দেখা অসমদৃষ্টি। প্রকৃতি এবং তার কার্যে সমদৃষ্টি কখনও হতেই পারে না। প্রকৃতির দিকে যাদের দৃষ্টি, তারা কখনও সমদর্শী হতে পারে না এবং পরমাত্মার দিকে যারা দৃষ্টি রাখে, তারা কখনও অসমদর্শী হয় না। তাই গীতায় পরমাত্মার দিকে দৃষ্টি যারা রাখে তাদের '**সমদর্শিনঃ**' (৫।১৮) '**সর্বত্র সমবুদ্ধয়ঃ**' (১২।৪) ইত্যাদি পদ দ্বারা বলা হয়েছে।

পরমাত্মার সঙ্গে স্বয়ং-এর নিত্য যোগ আছে এবং মন, বুদ্ধি ইত্যাদির সঙ্গে স্বয়ং-এর নিত্য বিয়োগ (বিচ্ছেদ) (৬।২৩)। পরমাত্মার সঙ্গে নিত্য যোগ থাকলেও, যতক্ষণ স্বয়ং সংসারের সঙ্গে সম্বন্ধ রেখে চলে, ততক্ষণ পর্যন্ত তার সেই নিত্য যোগের অনুভূতি হয় না। কিন্তু যখন নিত্যযোগের অনুভূতি হয়ে যায় অর্থাৎ পরমাত্মার সঙ্গে সংযোগ হয়ে যায়, তখন সেই যোগ অর্থাৎ সমত্বের বোধ তার মন, বুদ্ধি ও অন্তঃকরণেও নেমে আসে (৫।১৯)। তখন সে সুখ-দুঃখ ইত্যাদিতে সম হয়ে যায় (১৪।২৪-২৫) এবং তার সমত্বসম্পন্ন দৃষ্টি পুণ্যাত্মা-পাপাত্মা ইত্যাদি ব্যক্তির প্রতিও এসে যায় (৬।৯)। সেই সমতা তার ব্যবহারেও এসে যায় এবং তার ব্যবহারে কোন আসক্তি বা দ্বেষ থাকে না (৫।১৮)। পরে নানা পদার্থের প্রতিও তার সমভাব আসে অর্থাৎ কোনো পদার্থে তার প্রিয়-অপ্রিয় ভাব থাকে না (৬।৮)। অর্থাৎ পরমাত্মতত্ত্বের অনুভবের ফলে যোগে তার সর্বত্র সমভাব হয়ে যায়। বর্ণ, আশ্রম, পরিস্থিতি, সাধন ইত্যাদিতে তার ব্যবহার যথাযোগ্য হয়, কিন্তু হৃদয়ে অনুরাগ-দ্বেষ, হর্ষ-শোক এসব আর থাকে না।[১]

সমতা দুই প্রকারের—সাধনরূপা এবং সাধ্যরূপা। সাধনরূপা সমতা অন্তঃকরণের হয় এবং সাধ্যরূপা সমতা পরমাত্মতত্ত্বের হয়। একে যথাক্রমে সাধকের সমতা ও সিদ্ধের সমতাও বলা যায়।

১) সাধকের সমতা (সমভাব)—কর্মযোগী সাধক সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে সম থেকে কর্ম করেন (২।৪৮)। জ্ঞানযোগী সাধকের সৎ ও অসৎ-এর বিবেচনাই মুখ্যরূপে থাকে। সৎ-এর বিয়োগ নেই এবং অসৎ কখনো নিত্য বা চিরস্থায়ী হয় না। সুতরাং জ্ঞানযোগী সত্য-স্বরূপে সর্বদা সমভাবে বিরাজ করে (২।১৫)। ভক্তিযোগী সাধক ভগবন্নিষ্ঠ হয়। সে ভগবানের ইচ্ছা-অনিচ্ছাতে সর্বদাই প্রসন্ন থাকে। সেইজন্য সাংসারিক পদার্থ, বস্তু বা পরিস্থিতিজনিত সংযুক্তি বা বিযুক্তিতে তার উপর কোন প্রভাব পড়ে না। তার কেবল ভগবানের সঙ্গেই সম্পর্ক থাকে। এরূপ ভক্তকে ভগবান স্বয়ং

[১]বিস্তারিতভাবে জানতে হলে গীতার 'সাধক-সঞ্জীবনী' নামক টীকার পঞ্চম অধ্যায়ের আঠারো সংখ্যক শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

সমত্ববোধ প্রদান করেন (১০।১০)।

যদি কর্মযোগীর সমত্ববোধ না আসে, তাহলে বুঝতে হবে সিদ্ধি-অসিদ্ধিতে তার গুরুত্বগত ভেদবুদ্ধি রয়েছে। যদি জ্ঞানযোগীর সমত্ববোধ না আসে, তাহলে বুঝতে হবে পদার্থের প্রতি তার গুরুত্বগত ভেদবুদ্ধি আছে। যদি ভক্তিযোগীর সমত্ববুদ্ধি না হয়, তাহলে বুঝতে হবে ভগবানের কৃপার দিকে তার দৃষ্টি নেই। এর অর্থ এই বোঝায় যে, অনিত্য বস্তুর প্রতি আগ্রহ অন্তঃকরণে থাকলে স্বাভাবিকভাবে সমত্ব অনুভূত হয় না। সেই আগ্রহ চলে গেলেই সমত্ব এসে যায়।

এর তাৎপর্য হচ্ছে যে, সম-ভাবের সঙ্গে মানুষের নিত্যযোগ আছে। কেবলমাত্র অসৎকে গুরুত্ব দেওয়াতেই অ-সমতা জন্মায়। সুতরাং মানুষের অসৎকে (অনিত্যকে) গুরুত্ব দেওয়া উচিত নয়।

২) সিদ্ধের সমতা (সাম্য)—সিদ্ধ কর্মযোগী (৬।৮-৯), সিদ্ধ জ্ঞানযোগী (১৪।২৪) এবং সিদ্ধ ভক্তিযোগী (১২।১৮-১৯) এই তিনেই সমত্ববুদ্ধি স্বাভাবিকভাবে থাকে।

এর তাৎপর্যরূপে বলা যায় যে, সাধক যে কোন পথেই চলুক না কেন, যতক্ষণ অনুকূল-প্রতিকূল, সুখ-দুঃখ ইত্যাদির কিছুমাত্র প্রভাব তার ওপর পড়ে এবং সে তাতে বিচলিত হয়, ততক্ষণ সাধকের সাধনরূপ সমতা থাকে ; কিন্তু যখন তার অনুকূল-প্রতিকূল জ্ঞান হওয়া সত্ত্বেও সে তাতে প্রভাবিত হয় না, তখন সাধ্যরূপ সমতা তাতে অটলরূপে বিরাজ করে। সেই সাধ্যরূপ সমতা প্রাপ্ত হলে অন্তঃকরণে স্বতঃই সমত্ববুদ্ধি জাগ্রত হয় এবং অন্তঃকরণের সমতা দ্বারা বোঝা যায় যে, যোগীর সাধ্যরূপ সমতা লাভ হয়েছে (৫।১৯)।

(৪৯) গীতায় ক্রিয়া, কর্ম এবং ভাব

কর্তৃত্বভাবেন সকামভাবাৎ সর্বাঃ ক্রিয়া বন্ধনকারিকাশ্চ।
কর্তৃত্বহীনা অপি কামহীনাঃ সর্বাঃ ক্রিয়া নিষ্ফলতাং প্রয়ান্তি॥

জড়ের মধ্যে (প্রকৃতিতে) কেবল পরিবর্তনরূপ ক্রিয়া আছে, কর্ম নেই এবং চেতন নিষ্ক্রিয় অর্থাৎ তাতে ক্রিয়াও নেই, কর্মও নেই। কিন্তু যখন চেতন ক্রিয়াশীল প্রকৃতির সঙ্গে নিজের সম্পর্ক যুক্ত করে প্রকৃতির ক্রিয়া নিজের মধ্যে আরোপিত করে নেয় অর্থাৎ 'আমি করি'— এইরূপ অহংকার ভাব করে (৩।২৭), তখন প্রকৃতির ক্রিয়া তার কর্মরূপে প্রতিভাত হয়, যা শুভ-অশুভ ফল দান করে। ক্রিয়া কখনো বন্ধনের কারণ হয় না, কেবল অহং-কর্তৃত্ব-পূর্ণ ক্রিয়াই বন্ধনের কারণ হয়। সেইজন্যই গীতায় বলা হয়েছে যে, যে ব্যক্তির মধ্যে অহং-কর্তৃত্ব ভাব ও ফলেচ্ছা নেই, সে যদি সমস্ত প্রাণীকে নিধনও করে তাহলেও কাউকে নিধন করাও হয় না বা তার দ্বারা সে আবদ্ধও হয় না (১৮।১৭)। কারণ তার দ্বারা শুধু ক্রিয়াই অনুষ্ঠিত হয়। যেমন, গঙ্গাজলে অনেকের পালন-পোষণ হয় ; ব্রাহ্মণ, গাভী ইত্যাদি সকলেই সেই জল পান করে, কিন্তু গঙ্গার তাতে কোন পুণ্য হয় না। আবার গঙ্গার প্রবাহে অনেক জীব ভেসে যায়, মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তাতেও গঙ্গার কোন পাপ হয় না। কারণ গঙ্গার কখনও অহং-কর্তৃত্ব ভাব থাকে না ও গঙ্গা মনে করে না যে, আমিই সকলকে পালন-পোষণ করছি। সুতরাং তার দ্বারা ক্রিয়ামাত্রই হয়, কর্ম বন্ধন হয় না। সূর্য উদিত হলে বেদ পাঠ হয়, যজ্ঞাদি অনুষ্ঠিত হয়, কিন্তু তার দ্বারা সূর্যের কোন পুণ্য হয় না। আবার সূর্য উদিত হলে শিকারী পশু শিকার করে, তাতেও সূর্য পাপভাগী হয় না। কারণ 'আমার দ্বারা আলো প্রকাশিত হয়' এই অহং-কর্তৃত্ব ভাব সূর্যে না থাকায় তার দ্বারা কেবল ক্রিয়াই অনুষ্ঠিত হয়, কর্ম হয় না। এইরূপই জগতে কত চুরি হয়, ডাকাতি হয়, হত্যাকাণ্ড ঘটে যায়, কিন্তু তাতে আমাদের অনুমোদন না থাকায়,

সেগুলির সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক না থাকায় সেইসব কার্যগুলি আমাদের নিকট ক্রিয়ামাত্র, তাতে আমাদের কোনপ্রকার বন্ধন হয় না। এইরূপ আমাদের শরীর, মন, ইন্দ্রিয় দ্বারা যে ক্রিয়াসকল ঘটে, তাতে যদি আমাদের কর্তৃত্ব-ভাব এবং ফলাসক্তি না থাকে, তাহলে তা আমাদের কর্মবন্ধনের কারণ হয় না, তার দ্বারা কোন ফলপ্রাপ্তিও হয় না এবং জন্ম-মৃত্যু আবর্তনের কারণ ঘটে না। কিন্তু যদি সেই ক্রিয়ায় আমাদের কর্তৃত্ব-ভাব ও ফলাসক্তি আসে তবে সেই ক্রিয়া কর্মে রূপান্তরিত হয় এবং বন্ধনকারক হয়ে যায় (৫।১২)।

মানুষ বাল্যাবস্থা থেকে যুবকে পরিণত হলে তার কোন পাপ বা পুণ্য হয় না, তাতে ক্রিয়ামাত্র ঘটে। শরীরে প্রাণ, অপান ইত্যাদি বায়ুর দ্বারা যে ক্রিয়াগুলি হয়, তার দ্বারা কোন পাপ বা পুণ্য অর্জিত হয় না। ইন্দ্রিয় দ্বারা যে সমস্ত কাজ স্বাভাবিকভাবে হয় তাতেও পাপ বা পুণ্য হয় না। কিন্তু যখন আমরা সেই ক্রিয়াগুলিতে নিজের কর্তৃত্ব-ভাব আরোপ করি তখন তা কর্ম হয়ে ওঠে। যেমন শ্বাস গ্রহণ একটি ক্রিয়া, কিন্তু কেউ যখন প্রাণায়াম করে সেটি তখন কর্ম হয়ে ওঠে এবং তা ফল প্রদানকারী হয় (৪।৩০)।

বাস্তবে সকল ক্রিয়াই প্রকৃতির দ্বারা হয় বা প্রকৃতিতে অনুষ্ঠিত হয় (১৩।২৯) ; সমস্ত ক্রিয়া প্রকৃতির গুণগুলির দ্বারা হয় (৩।২৭-২৮) ; তথা সমস্ত ক্রিয়া ইন্দ্রিয়ের দ্বারা সংঘটিত হয় (৫।৯)। এর তাৎপর্য এই যে, প্রকৃতি, প্রকৃতির কার্য গুণ এবং গুণের কার্য ইন্দ্রিয়গুলির দ্বারা ক্রিয়ামাত্রই অনুষ্ঠিত হয়, কর্ম নয়।

অষ্টাদশ অধ্যায়ের চতুর্দশ শ্লোকে কর্মের সিদ্ধিতে অধিষ্ঠান, কর্তা ইত্যাদি পাঁচটি কারণ বলা হয়েছে। এক্ষেত্রে কর্তা তাকেই বলা হয়েছে যার অন্তঃকরণ অহংকারে মোহিত। এইরূপ কর্তার দ্বারাই কর্মসংগ্রহ হয় অর্থাৎ তার কর্ম বন্ধন-কারক হয়। কিন্তু মানুষ যেখানে নিজেকে কর্তা বলে মনে করে না অর্থাৎ নিজের মধ্যে অকর্তৃত্ব অনুভব করে, সেখানে ক্রিয়ামাত্র অনুষ্ঠিত হয়, কর্ম হয় না (১৩।২৯)।

কর্তার ভাব অনুযায়ী ক্রিয়া সাত্ত্বিক, রাজসিক এবং তামসিক কর্মরূপে প্রতিভাত হয় অর্থাৎ কর্তা সাত্ত্বিক হলে কর্মও সাত্ত্বিক হয় ; কর্তা রাজসিক হলে কর্মও রাজসিক হয় এবং কর্তা তামসিক হলে কর্মও তামসিক হয় (১৮।২৩-২৫)। কিন্তু মানুষ যখন ত্রিগুণের অতীত হয়ে যায় তখন তার দ্বারা শুধু ক্রিয়া হয়, কর্ম নয়।

আমরা যা কিছু দেখি-শুনি, তা যদি নির্লিপ্ততা সহকারে করি তাহলে সেই দেখা বা শোনা আমাদের কাছে ক্রিয়ারূপে থাকে, বন্ধনকারক হয় না। কিন্তু সেই দেখা শোনাই যদি আসক্তি সহকারে করি তবে তা বন্ধনরূপ কর্ম হয়ে যায়। এই কথা সমস্ত প্রকার ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়ার বিষয়েই বোঝা উচিত।

কর্মযোগী সাধক শুধু লোকসংগ্রহার্থে কর্ম করেন, নিজের জন্য কিছু করেন না ; সুতরাং এই কর্ম ক্রিয়ামাত্র হয়, যা তাঁকে বন্ধন থেকে মুক্ত করে (৩।২০)।

জ্ঞানযোগী সাধক নিজেকে অকর্তা অনুভব করেন, সুতরাং তাঁর দ্বারা ক্রিয়া মাত্রই হয় (১৩।২৯)।

ভক্তিযোগী সাধক কেবলমাত্র ভগবানের প্রসন্নতার নিমিত্ত কর্ম করেন (১১।৫৫ ; ১২।১০)। সুতরাং সেই ক্রিয়াগুলি ভগবানের সঙ্গে সম্বন্ধিত হওয়ায় কর্মরূপে প্রকাশিত হয় না। কেবল তাই নয়, তাঁর ক্রিয়াতে দিব্যতা এসে যায় এবং সেই ক্রিয়া দ্বারা জগতের হিত সাধিত হয়।

ধ্যানযোগী, লয়যোগী, হঠযোগী ইত্যাদি কোনপ্রকার সাধকই যদি প্রকৃতির ক্রিয়াগুলির সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত না হন, তবে তাঁদের দ্বারা কেবল ক্রিয়াই হয়, কর্ম হয় না।

এর তাৎপর্য এই যে, কর্মযোগীর নিষ্কামভাব হলে, জ্ঞানযোগীর প্রকৃতি এবং তার কার্যের ক্রিয়াদিতে পৃথক্‌ভাব হলে এবং ভক্তিযোগীর ভগবানের প্রসন্নতার ভাব হলে তাদের দ্বারা ক্রিয়ামাত্র হয়, কর্মবন্ধন ঘটে না। জ্ঞানী মহাপুরুষ যা কিছু করেন, তা তাঁর নিজ শুদ্ধ রাগ-দ্বেষহীন স্বভাব অনুযায়ীই করে থাকেন, সুতরাং তা তাঁর কর্মবন্ধন ঘটায় না, কেবল ক্রিয়ামাত্র হয় (৩।৩৩)।

(৫০) গীতায় কর্মের ব্যাপকতা

কায়েন মনসা বাচা যৎকিঞ্চিৎ কুরুতে নরঃ।
শুভাশুভং চ তৎসর্বং কর্ম বৈ গীতয়া মতম্॥

পরমাত্মা এবং পরমাত্মার শক্তি প্রকৃতি—এই দুটি বিদ্যমান। এর মধ্যে পরমাত্মা সবসময় এক রূপ, এক রস অবস্থায় থাকেন, তাঁর কখনও পরিবর্তন হয় না, কিন্তু প্রকৃতি নিত্য পরিবর্তনশীল, তা কখনও পরিবর্তন রহিত থাকে না[১]। এই প্রকৃতিতে যা কিছু পরিবর্তন হয় তা সমস্তই 'ক্রিয়া' এবং ক্রিয়ারই পুঞ্জীভূত রূপ হলো পদার্থ। প্রকৃতিতে স্বাভাবিকভাবে ঘটিত ক্রিয়ার সঙ্গে যখন অহং-কর্তৃত্ব বোধ এসে যায় তখন তার সংজ্ঞা হয় 'কর্ম'। এই কর্ম কায়িক হোক বা বাচিক অথবা মানসিক—তা ইষ্ট-অনিষ্ট ও মিশ্রিত ফলদানকারী রূপে প্রতিভাত হয় (১৮।১২)। ওইসকল কর্ম করার যে ভাব তা কর্তার মধ্যেই থাকে। এই 'কর্ম' এবং 'ভাব' শুভ ও অশুভ দুই প্রকারের। 'শুভ' কর্ম এবং 'ভাব' মুক্তিদানকারী এবং 'অশুভ' কর্ম ও 'ভাব' পতনকারী। এই কর্ম এবং ভাবকে ভগবান চতুর্থ অধ্যায়ের ত্রয়োদশ শ্লোকে 'কর্ম' এবং 'গুণ' নামে অভিহিত করেছেন এবং এর দ্বারাই চার বর্ণের রচনার কথা জানিয়েছেন। অর্থাৎ শুভ এবং অশুভ ক্রিয়াকে 'কর্ম' বলা হয়, 'গুণ' বলা হয় শুভ-অশুভ ভাবকে। এই ক্রিয়া এবং ভাবগুলিকে নিয়ে চারটি বর্ণের সৃষ্টি হয়েছে।

ভগবান চার বর্ণের যে লক্ষণ (চিহ্ন) বলেছেন, সে সবগুলিকে 'স্বভাবজ কর্ম' নামে তিনি অভিহিত করেছেন। এতে ব্রাহ্মণের শম, দম, তপ, শুদ্ধি ইত্যাদি নয়টি গুণ ও ক্ষত্রিয়ের শৌর্য, তেজ, ধৃতি ইত্যাদি সাতটি গুণকে কর্ম বলা হয়েছে এবং বৈশ্যের কৃষি, গোরক্ষা, বাণিজ্য এই তিন কর্ম এবং শূদ্রের পরিচর্যাত্মক কর্মগুলিকেও 'কর্ম' নামেই অভিহিত করা হয়েছে। বৈশ্য ও শূদ্রদের কর্মগুলিকে কর্ম বলাই ঠিক, কারণ এগুলি কর্মই, কিন্তু ভগবান ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়ের গুণগুলিকেও কর্ম নামে অভিহিত করেছেন। গুণগুলিকে কর্ম নামে অভিহিত করার তাৎপর্য এই যে, প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্ক করে মানুষ যা কিছু করে, তা সবই কর্ম অর্থাৎ প্রকৃতির সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত করলে ভাব, ক্রিয়া ইত্যাদি সবই কর্ম নামে পরিচিত হয় যা জন্ম-মৃত্যু চক্র এবং নানাপ্রকার অনুকূল-প্রতিকূল পরিস্থিতি প্রদান করে। কিন্তু যে ব্যক্তি প্রকৃতি থেকে সম্বন্ধ ত্যাগ করে পরমাত্মতত্ত্ব প্রাপ্ত হয়, তার শরীর দ্বারা কর্ম হলেও সেইকর্মকে 'অকর্ম' বলা হয়। নিজ স্বরূপে স্থিত থাকা 'অকর্ম' এবং অকর্মে স্থিত থেকে শরীর, মন, বুদ্ধি ইত্যাদির দ্বারা যে কর্ম হয়, সে সমস্ত কর্মই 'অকর্ম'। ভগবান চতুর্থ অধ্যায়ের আঠারো সংখ্যক শ্লোকে এর বর্ণনা করে বলেছেন যে, যে ব্যক্তি কর্মে অকর্ম এবং অকর্মে কর্ম অনুভব করেন, তিনি যোগী, তিনি বুদ্ধিমান এবং তাঁর আর কোন কর্ম বাকী থাকে না।

এই বিশ্লেষণে প্রমাণিত হয় যে, প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্ক রেখে মানুষ যা কিছু করে, তা সবই বন্ধনরূপ কর্ম। সে স্থূল-শরীরের সঙ্গে সম্পর্ক রেখে স্থূল-ক্রিয়া করে এবং সূক্ষ্ম শরীরের সঙ্গে সম্পর্ক রেখে ধ্যান, চিন্তা ইত্যাদি করে আর কারণ-শরীরের সঙ্গে সম্পর্ক রেখে সমাধিগত হয়। গীতা অনুযায়ী এ সমস্তই 'কর্ম', কারণ এইসবের সঙ্গেই প্রকৃতির সম্বন্ধ আছে। ভগবান অষ্টাদশ অধ্যায়ের পঞ্চদশ শ্লোকে বলেছেন যে, মানুষ তার শরীর, মন এবং বাক্য দ্বারা যা কিছু করে তা সবই 'কর্ম'। চতুর্থ অধ্যায়ের চব্বিশ

[১]যদিও প্রকৃতিকে সর্গ এবং মহাসর্গের অবস্থায় সক্রিয় তথা প্রলয় এবং মহাপ্রলয়ের অবস্থাতে নিষ্ক্রিয় বলা হয়, বাস্তবে এই নিষ্ক্রিয় অবস্থা সক্রিয় অবস্থারই সাপেক্ষে সূচিত হয়। বাস্তবে প্রকৃতি কখনোই নিষ্ক্রিয় থাকে না, এতে সূক্ষ্মভাবে পরিবর্তন হতেই থাকে, সেইজন্যই প্রলয় ও মহাপ্রলয়ের পরে সর্গ এবং মহাসর্গ হয়। যখন প্রলয় এবং মহাপ্রলয় হয় তখন প্রলয় ও মহাপ্রলয়ের মাঝ পর্যন্ত প্রকৃতি প্রলয় ও মহাপ্রলয়ের দিকে যেতে থাকে এবং অর্ধেক প্রলয় ও মহাপ্রলয়ের পর প্রকৃতি সর্গ ও মহাসর্গের দিকে অগ্রসর হয়।

থেকে ত্রিশ সংখ্যক শ্লোক পর্যন্ত যে সমস্ত যজ্ঞের বর্ণনা করা হয়েছে, সে সমস্তকে ভগবান কর্মোদ্ভূত বলে জানিয়েছেন—'**কর্মজান্ বিদ্ধি তান্ সর্বান্**' (৪।৩২)।

কর্ম থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্য ফলাসক্তি ত্যাগ করে যদি শুধু যজ্ঞ অর্থাৎ কর্তব্য-পরম্পরা সুরক্ষিত রাখার জন্যই কর্ম করা যায়, তবে তা 'কর্মযোগ' হয় (৩।৯ ; ১৮।৯)। বিবেক দ্বারা কর্ম থেকে সম্পর্ক ছেদ করলে, তা জ্ঞানযোগ হয় (১৩।২৩, ৩৪) এবং কর্ম যদি ভগবানে অর্পণ করা হয় তাহলে তা 'ভক্তিযোগ' নামে অভিহিত হয় (৯।২৭ ; ১২।৬)।

(৫১) গীতায় 'যজ্ঞ' শব্দের ব্যাপকতা

গীতায়া যজ্ঞশব্দস্তু কর্তব্যকর্মবাচকঃ।
পালনীয়স্ততো যজ্ঞো নিষ্কামৈর্মানবৈঃ সদা॥

গীতার শ্লোক ধরে যদি বিচার করা যায় তাহলে দেখা যায় যে, নিষ্কামভাবে করা শাস্ত্রবিহিত সমস্ত শুভকর্মই '**যজ্ঞ**' নামে অভিহিত। যজ্ঞের বিশেষ বর্ণনা চতুর্থ অধ্যায়ে আছে। সেখানে ভগবান বলেছেন যে, শুধু যজ্ঞের জন্য মানুষ যে কর্ম করে, তাতে তার সমস্ত কর্মের বন্ধনকারকত্ব নষ্ট হয়ে যায়—'**যজ্ঞায়াচরতঃ কর্ম সমগ্রং প্রবিলীয়তে**' (৪।২৩)। এই কথাই ভগবান তৃতীয় অধ্যায়ের নবম শ্লোকে অন্যভাবে বলেছেন যে, যজ্ঞের অতিরিক্ত যে সমস্ত কর্ম করা হয়, তা মনুষ্যের বন্ধনের কারণ '**যজ্ঞার্থাৎ কর্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্মবন্ধনঃ**'। চতুর্থ অধ্যায়ের চব্বিশ থেকে ত্রিশ সংখ্যক শ্লোকে ভগবান দ্বাদশ প্রকার যজ্ঞের বর্ণনা করেছেন—১) ব্রহ্মযজ্ঞ, ২) ভগবৎ-অর্পণরূপ যজ্ঞ, ৩) অভিন্নতারূপ যজ্ঞ, ৪) সংযমরূপ যজ্ঞ, ৫) বিষয়হবনরূপ যজ্ঞ, ৬) সমাধিরূপ যজ্ঞ, ৭) দ্রব্যযজ্ঞ, ৮) তপোযজ্ঞ, ৯) যোগযজ্ঞ, ১০) স্বাধ্যায়রূপ জ্ঞানযজ্ঞ, ১১) প্রাণায়ামরূপ যজ্ঞ এবং ১২) স্তম্ভবৃত্তি প্রাণায়ামরূপ যজ্ঞ। আবার একত্রিশ সংখ্যক শ্লোকে ভগবান বলেছেন যে, যজ্ঞ থেকে প্রাপ্ত পরিণামরূপ অমৃত যে ব্যক্তি অনুভব করে, সে সনাতন পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়, '**যজ্ঞশিষ্টামৃতভুজো যান্তি ব্রহ্ম সনাতনম্**' (৪।৩১)। এই কথাই ভগবান তৃতীয় অধ্যায়ের ত্রয়োদশ শ্লোকে '**যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সন্তো মুচ্যন্তে সর্বকিল্বিষৈঃ**' শ্লোকাংশে বলেছেন যে, 'যজ্ঞাবশেষ যারা গ্রহণ করে তারা শ্রেষ্ঠ মানুষ, এবং তারা সর্বপাপ থেকে মুক্ত হয়ে যায়।' এইভাবে তৃতীয় অধ্যায়ের নবম এবং ত্রয়োদশ ও চতুর্থ অধ্যায়ের তেইশ এবং একত্রিশ সংখ্যক—এই চারটি শ্লোকে যজ্ঞের ফল বলা আছে—সমস্ত পাপের নাশ, সংসারের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ এবং পরমাত্মতত্ত্বপ্রাপ্তি। সুতরাং পরমাত্ম তত্ত্বপ্রাপ্তির যত উপায় আছে তা সমস্তই গীতার যজ্ঞ শব্দের অন্তর্গত।

গীতার 'যজ্ঞ' শব্দ এতো ব্যাপক যে যজ্ঞ, দান, তপ, তীর্থ, ব্রত, হোম ইত্যাদি সমস্ত শাস্ত্রবিহিত শুভকর্মই এর অন্তর্গত হয়। চতুর্থ অধ্যায়ের বত্রিশ সংখ্যক শ্লোকে বেদের বাণীতে বহুপ্রকার যজ্ঞের বিস্তারিত বর্ণনা আছে—এই বলে ভগবান দহরাদির উপাসনাকেও 'যজ্ঞ' শব্দে সমাবিষ্ট করেছেন, এর বর্ণনা গীতায় নেই কিন্তু উপনিষদে আছে। ভগবান আরও বলেছেন যে—এই সমস্ত যজ্ঞ-গুলিকে তুমি কর্মোদ্ভূত বলে জান এবং এইপ্রকার জানলে মুক্তিলাভ করবে '**এবং জ্ঞাত্বা বিমোক্ষ্যসে**' (৪।৩২)।

চতুর্থ অধ্যায়ের নবম শ্লোকে ভগবান বলেছেন যে, 'আমার জন্ম ও কর্ম দিব্য' '**জন্ম কর্ম চ মে দিব্যম্**'। নিজ কর্মের দিব্যতার বর্ণনা ভগবান ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শ্লোকে করেছেন। এতে ভগবান বলেছেন যে—আমি সৃষ্টি-রচনাকারী ইত্যাদির কর্তা হলেও, আমাকে তুমি অকর্তা বলে জানবে, কারণ কর্মফলে আমার কোন স্পৃহা নেই, তাই কর্ম আমাকে বাঁধতে পারে না। এইরূপে যারা আমাকে তত্ত্বসহ জানে তারাও কর্ম দ্বারা বন্ধন প্রাপ্ত হয়

ফলাসক্তিরহিত হয়ে কর্ম করে, সেও কর্ম দ্বারা বন্ধন প্রাপ্ত হয় না। এইভাবে ভগবান নিজের কর্মের দিব্যতা সম্বন্ধে জানিয়েছেন যে, কর্মের দ্বারা বন্ধন হয়, সেই কর্মই মুক্তিদায়ী হয়ে ওঠে—এই হচ্ছে কর্মের দিব্যতা। পনেরো সংখ্যক শ্লোকে ভগবান আবার **'এবং জ্ঞাত্বা---'** পদে বলেছেন যে, এইভাবে জ্ঞাত হয়ে মুমুক্ষু ব্যক্তিরাও কর্ম করেছেন, অতএব তোমারও (অর্জুনেরও) সেভাবে কর্ম করা উচিত—**'কুরু কর্মৈব'**। ষোড়শতম শ্লোকে কর্ম থেকে নির্লিপ্ত থাকার তত্ত্বকে বিস্তারিতরূপে জানাবার জন্য ভগবান প্রতিজ্ঞা করেছেন এবং **'যজ্জ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেঽশুভাৎ'** পদ দ্বারা তাকে জানার ফল মুক্ত হওয়া বলে জানিয়েছেন। এই কথাই তিনি এই প্রসঙ্গের উপসংহারে **'এবং জ্ঞাত্বা বিমোক্ষ্যসে'** (৪।৩২) পদে বলেছেন। অতএব কর্তৃত্বাভিমান এবং আসক্তিরহিত হয়ে করা সমস্ত শুভ-কর্মই 'যজ্ঞে' পর্যবসিত হয়।

গীতায় অনেক স্থানে যজ্ঞ, দান এবং তপ—এই তিন শুভকর্মের বর্ণনা আছে (১৭।২৪-২৫, ২৭ ; ১৮।৩, ৫), কোথাও বা যজ্ঞ, দান, তপ এবং বেদাধ্যয়ন—এই চারটি শুভকর্মের বর্ণনা আছে (৮।২৮, ১১।৫৩) এবং কোথাও যজ্ঞ, দান, তপ, বেদাধ্যয়ন এবং ক্রিয়া—এই পাঁচটি শুভকর্মের বর্ণনা করা হয়েছে (১১।৪৮)। বাস্তবে কোনও একটি যজ্ঞের উল্লেখেই সমস্ত শুভকর্মের কথা বলা হয়ে যায়।

তৃতীয় অধ্যায়ের দশম শ্লোকে ভগবান বলেছেন যে, সৃষ্টির আদিতে প্রজাপতি ব্রহ্মা যজ্ঞের সহিত প্রজা সৃষ্টি করেছিলেন, **'সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্ট্বা'**। এখানে 'প্রজা' বলতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ইত্যাদি সকলকেই বোঝানো হয়েছে এবং তার সঙ্গে **'সহযজ্ঞাঃ'** বিশেষণ দেওয়ায় প্রশ্ন জাগে এই যে, যজ্ঞে তো সকলের অধিকার নেই তাহলে ভগবান সমস্ত প্রজার জন্য এই বিশেষণ কেন প্রয়োগ করেছেন ? তার সমাধান হিসাবে বলা যায় এই যে, উনি সেই যজ্ঞের কথা এখানে বলেননি যাতে সকলের অধিকার নেই। 'যজ্ঞ' শব্দটি এখানে 'কর্তব্য-কর্ম বাচক'। নিজ বর্ণ, আশ্রম, ধর্ম, জাতি, স্বভাব, দেশ, কাল ইত্যাদি অনুযায়ী প্রাপ্ত সমস্ত কর্তব্য-কর্মই 'যজ্ঞে'র অন্তর্গত। অপরের হিতের চিন্তা নিয়ে করা সমস্ত কর্মকেই 'যজ্ঞ' বলা হয়। **'স্বকর্মণা তমভ্যর্চ্য'** (১৮।৪৬) পদে নিজ কর্তব্য-কর্ম দ্বারা পরমাত্মাকে পূজা করার যে কথা বলেছেন, তাও যজ্ঞেরই অন্তর্গত।

সেঁকো, ধুতরা ইত্যাদি যত বিষ আছে, বৈদ্যেরা যখন সেগুলিকে শোধন করে ঔষধে পরিণত করেন তখন সেই বিষ অমৃতরূপ ধারণ করে এবং কঠিন কঠিন অসুখ তার দ্বারা নিরাময় হয়। এইরূপ কামনা, মমতা, আসক্তি, পক্ষপাত, ভেদভাব, স্বার্থ, অহংকার ইত্যাদি সবই বিষবৎ। কর্মের এই বিষময় অংশ দূর করলে কর্ম অমৃতময় হয়ে জন্ম-মরণ-রূপ মহান রোগ দূর করতে সক্ষম হয়। এই অমৃতময় কর্মকেই 'যজ্ঞ' বলা হয়।

সবার মূল পরমাত্মা। পরমাত্মা থেকেই বেদ প্রকটিত হন। বেদ কর্তব্য পালনের বিধি নির্দেশ করে। মানুষ সেই বিধি অনুযায়ী কর্তব্য পালন করে। কর্তব্য পালনের দ্বারা যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয় এবং যজ্ঞ করলে বৃষ্টি হয়, বৃষ্টির দ্বারা অন্ন উৎপন্ন হয়, অন্ন থেকে প্রাণীর জন্ম এবং সেই প্রাণীদের মধ্যে মানুষ কর্তব্য পালন করে যজ্ঞ করে (৩।১৪-১৫)। এইভাবেই সৃষ্টিচক্র গতিশীল থাকে। পরমাত্মা সর্বব্যাপী হওয়া সত্ত্বেও কর্তব্য-কর্মরূপ যজ্ঞে সদা বিদ্যমান থাকেন **'তস্মাৎ সর্বগতং ব্রহ্ম নিত্যং যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্'** (৩।১৫)। অর্থাৎ নিষ্কামভাবে যেখানে কর্তব্য পালন করা হয়, সেখানেই পরমাত্মা অবস্থান করেন। অতএব পরমাত্মপ্রাপ্তিতে ইচ্ছুক ব্যক্তি নিজ কর্তব্য-কর্ম পালনের দ্বারা অতি সহজেই তাঁকে প্রাপ্ত হতে পারে। কিন্তু যে ব্যক্তি যজ্ঞ করে না, নিজ কর্তব্য পালন করে না, ভগবান বলেন সে ব্যক্তি চোর—**'স্তেন এব সঃ'** (৩।১২) ; 'সে পাপ ভক্ষণ করে' **'ভুঞ্জতে তে ত্বঘম্'** (৩।১৩) ; 'যে ইন্দ্রিয়রমণাসক্ত পাপজীবন যাপনকারী মানুষ, তার বেঁচে থাকাই বৃথা'—**'অঘায়ুরিন্দ্রিয়ারামো মোঘং পার্থ স জীবতি'** (৩।১৬)।

যজ্ঞ অর্থাৎ কর্তব্য পালন করার দায়িত্ব একমাত্র মানুষের উপরে ন্যস্ত। সুতরাং মানুষের উচিত নিষ্কামভাবে বা ভগবৎপূজার ভাব রেখে নিজ কর্তব্য তৎপরতার সঙ্গে পালন করা। নিজ কর্তব্য-কর্ম তৎপরতার সঙ্গে পালনকারী মানুষ পরমাত্মতত্ত্ব প্রাপ্ত হয়—**'স্বে স্বে কর্মণ্যভিরতঃ সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ'** (১৮।৪৫)।

(৫২) গীতায় লোকসংগ্রহ

সাধকাৎ প্রভুসিদ্ধাভ্যাং জায়তে লোকসংগ্রহঃ।
যেনোন্মার্গং পরিত্যজ্য ভবন্তি ধার্মিকা জনাঃ॥

'লোক' শব্দটি স্বর্গ, মর্ত্য এবং পাতাল—এই তিন লোকের বাচক। এই ত্রিলোকের মর্যাদাকে স্থায়ী রাখবার জন্য যে কর্ম করা, তাকেই বলে 'লোকসংগ্রহ'। লোকসংগ্রহ মানুষেরই অধীন ; কারণ মনুষ্য-শরীরের দ্বারা কৃতকর্মই ফলরূপে স্বর্গ, মর্ত্য এবং পাতাল—তিন লোক সৃষ্ট হয় (১৪।১৮)।

লোকেরা যাকে শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখে, আদর্শ বলে মনে করে এবং যার আচরণ ও বাক্যে লোকে উন্মার্গ থেকে সন্মার্গে চলে তার দ্বারাই লোকসংগ্রহ হয়। লোকসংগ্রহ সাধক, সিদ্ধ এবং ভগবান এই তিনের দ্বারা হয়ে থাকে। যেমন—

১) সাধকের দ্বারা লোকসংগ্রহ—ভগবান অর্জুনকে সাধকদের প্রতিনিধিরূপে উপস্থাপিত করে বলেছেন, 'পূর্বে রাজা জনকের মত মহাপুরুষগণ কর্মের দ্বারাই পরমসিদ্ধি প্রাপ্ত হয়েছেন ; সুতরাং লোক-সংগ্রহের দিকে দৃষ্টি রেখে তুমি তাঁদের মতই অনাসক্তভাবে কর্ম করার যোগ্য' (৩।২০)।

২) সিদ্ধের দ্বারা লোকসংগ্রহ—সিদ্ধ মহাপুরুষগণ যেরূপ আচরণ করেন, অন্যান্য ব্যক্তিগণও সেইরূপ আচরণ করে এবং মহাপুরুষগণ তাঁদের বাণী দ্বারা যে উপদেশ দেন, অন্য ব্যক্তিরা তারই অনুসরণ করে (৩।২১)। কর্মে আসক্ত সাধারণ মানুষেরা যে প্রকার সাবধানতা ও তৎপরতাপূর্বক কর্ম করে, সিদ্ধ মহা-পুরুষেরাও লোকসংগ্রহের দৃষ্টিতে যেন অনাসক্ত-ভাবে সেইরূপ কর্ম করে (৩।২৫)।

৩) ভগবানের দ্বারা লোকসংগ্রহ—ভগবান নিজের বিষয়ে বলেছেন, 'ত্রিলোকে আমার কোন কর্ম করা বাকী নেই এবং কিছু পাওয়ারও বাকী নেই, তবুও আমি কর্তব্য-কর্ম করে থাকি। আমি যদি আলস্যবশতঃ কর্তব্য-কর্ম না করি, তবে সাধারণ লোক আমারই অনুসরণ করবে অর্থাৎ তারাও নিজ কর্তব্য-কর্ম পরিত্যাগ করবে, তাতে তাদের পতন হবে। সুতরাং আমি যদি কর্তব্য-কর্ম না করি, তবে আমি সংকরত্ব উৎপন্নকারী এবং প্রজানাশকারী বলে বিবেচিত হব' (৩।২২-২৪)।

তাৎপর্য এই যে, বাস্তবে লোকসংগ্রহ ভগবান এবং সিদ্ধগণ দ্বারাই হয় ; কারণ তাঁদের নিজস্ব কোন স্বার্থ থাকে না। সাধকগণ যদিও মর্যাদার সঙ্গেই থাকেন এবং তাঁদের দ্বারাও লোকসংগ্রহ হয়, কিন্তু যথাযথ লোকসংগ্রহ হয় না ; কারণ, সাধকদের নিজ কল্যাণের প্রয়োজনও থাকে।

জ্ঞাতব্য

ভগবান এবং সিদ্ধ মহাপুরুষদের ভাব সর্বদা নিষ্কাম হওয়ায় তাঁদের দ্বারা শুদ্ধ, আদর্শ লোকসংগ্রহ হয়। কিন্তু সাধকদের ভাব সর্বথা (সর্বতোভাবে) নিষ্কাম হয় না, প্রত্যুত তাঁদের উদ্দেশ্য থাকে নিষ্কাম হওয়ার দিকে, সুতরাং তাঁদের দ্বারা লোকসংগ্রহ হয় গৌণভাবে। সাধারণ মানুষের মধ্যে সকামভাব থাকে ; সুতরাং তাদের দ্বারা তেমন উল্লেখযোগ্য লোকসংগ্রহ হয় না। তারা যে শাস্ত্রবিহিত ক্রিয়াকর্ম করে, তার দ্বারাই সামান্য ভাবে কিছু লোকসংগ্রহের কাজ হয়।

লোকসংগ্রহ দুইভাবে হয়—

১) আচরণ দ্বারা—মানুষ যে বর্ণ ও আশ্রমে স্থিত থাকে, সেই অনুসারে শাস্ত্র যার জন্য যেরূপ কর্মের বিধান করেছে, সেইরূপ কর্ম নিষ্কামভাবে কেবলমাত্র সংসারের হিতসাধনের জন্য করা।

২) বাক্য দ্বারা—নিজের অতিরিক্ত অপর বর্ণ এবং আশ্রমে স্থিত যত ব্যক্তি আছে, তাদের উন্মার্গ থেকে সন্মার্গ (সৎ-মার্গ)-তে সরিয়ে আনা।

এই দুইভাবে লোকসংগ্রহের মধ্যে নিজ আচরণাদির দ্বারা অন্যান্য ব্যক্তিদের ওপর যে প্রভাব পড়ে, তা শুধুমাত্র বাক্যদ্বারা হয় না। যে ব্যক্তির আচরণাদি তার বর্ণ ও আশ্রমের মর্যাদা অনুযায়ী হয়, তার বাক্যের প্রভাবই অপরের ওপর পড়ে। এই কথা জানাবার জন্য ভগবান

তৃতীয় অধ্যায়ের একুশ সংখ্যক শ্লোকের পূর্বার্ধে 'যৎ'-'যৎ', 'তৎ'-'তৎ' এবং 'এব'-এই পাঁচ শব্দ ব্যবহার করেছেন ; এবং উত্তরার্ধে 'যৎ' তথা 'তৎ'-এই দুই শব্দ ব্যবহার করেছেন[1]। এর তাৎপর্য এই যে, নিজ আচরণের প্রভাবই অপরের ওপরে বিশেষ ভাবে পড়ে এবং শুধুমাত্র বাক্যের প্রভাব অপরের ওপরে কম পড়ে। সুতরাং আচরণই মুখ্য। হ্যাঁ, যদি কেউ অত্যন্ত শ্রদ্ধাবান ব্যক্তি হন, তবে তিনি শুধু বাক্যদ্বারাই প্রভাবিত হতে পারেন।

মানুষের নিজ আচরণ লোকমর্যাদা অনুযায়ীই করা উচিত। এতে কোন লোক দেখানো ব্যাপার যেন না থাকে। তার সেই আচরণ কেউ দেখুক বা না দেখুক, কেউ মানুক বা না মানুক তা গ্রাহ্য না করে লোকসমক্ষে বা একান্তে সুচারুরূপে নিজ কর্তব্য পালন করা উচিত। এইসব কর্তব্য করার সময় যেন কিঞ্চিন্মাত্র ব্যক্তিগত স্বার্থের ভাব না থাকে, পক্ষান্তরে বিশ্বের প্রাণিমাত্রের হিত ভাবনা যেন থাকে। অর্থাৎ সমস্তকর্মই জগৎ-সংসারের হিতের ভাবনা রেখে করা উচিত।

নিজ কল্যাণের কথা ভেবে কর্ম করাও স্বার্থভাব। অতএব লোকসংগ্রহকারী ব্যক্তির এই চিন্তা ত্যাগ করা উচিত এবং দিবারাত্র জগৎ-সংসারের কল্যাণের ভাব মনে রাখা কর্তব্য। যদিও নিজ কল্যাণের চিন্তা করা সকামভাব নয়, তবুও ব্যক্তিগত কল্যাণের ভাব লোকসংগ্রহ যথাযথভাবে হতে দেয় না। যে ব্যক্তি নিজ কল্যাণের চিন্তা না করে শুধু অপরের কল্যাণের ভাব মনে রেখে নিজ কর্তব্য পালন করে, তার দ্বারা স্বতঃই মানুষের কল্যাণ হয়। যেমন বরফের কাছে গেলে ঠাণ্ডা লাগে, আগুনের কাছে গেলে গরম লাগে, তেমনি ঐসব ব্যক্তির কাছে গেলে বা তাদের কথা চিন্তা করলেও কল্যাণ হয়। এইসব ব্যক্তি যদি গৃহস্থাশ্রমে থাকেন, তাহলে তাঁর গৃহ থেকে যারা অন্ন-জল নিয়ে ব্যবহার করে তাদেরও ভালো হয় এবং এরূপ ব্যক্তি যদি সন্ন্যাসী হন, তাহলে তিনি যে গৃহ থেকে অন্ন-জলাদি গ্রহণ করেন, সেই (অন্ন-জল দানকারী) ব্যক্তিরও কল্যাণ হয়ে থাকে। তিনি জীবিত থাকাকালে তাঁর আচরণ, বাক্য, ভাব প্রাণীদের উপর যে প্রভাব ফেলে, তাঁর মৃত্যুর পরও তা তেমনিই প্রভাব ফেলে। যে স্থানে মহাপুরুষ বসবাস করেন, অজানিত ভাবে কোন ব্যক্তি যদি তথায় যায় তবে সে-ও সেইস্থানে শান্তি অনুভব করে। এই মহাপুরুষদের উপদেশ অলক্ষ্যে স্থায়িরূপে বিরাজ করে এবং কোন অধিকারী ব্যক্তির সেই তত্ত্বলাভের জন্য জিজ্ঞাসা বা উৎকণ্ঠা জাগলে মার্গদর্শন পেতে থাকে। সেই ব্যক্তি জানতে পারে না যে, তার এই ভাব কোথা থেকে এল, তবে সে এই ভাবের প্রাপ্তিকে ভগবান বা মহাপুরুষদের কৃপা মনে করে।

মহাপুরুষের দ্বারা যে সমস্ত ক্রিয়াদি হয় তা সমস্তই আদর্শ রূপে হয়। কোথাও কোথাও তাঁর ক্রিয়া অনুকরণীয় রূপেও দৃষ্ট হয়। যেমন আস্তিক ব্যক্তি শাস্ত্রবিহিত কর্মে এবং সেই কর্মফলে দৃঢ় শ্রদ্ধা-বিশ্বাস রেখে সকামভাবে তৎপরতার সঙ্গে কর্ম সম্পন্ন করেন, জ্ঞানী মহাপুরুষও তেমনি তৎপরতার সঙ্গে কর্ম করেন (৩।২৫)।

কর্মযোগী সাধকের কর্ম করার যে স্বভাব থাকে সেই স্বভাব সিদ্ধাবস্থায়ও থাকে। সুতরাং কর্মযোগ দ্বারা সিদ্ধ মহাপুরুষের স্বাভাবিক ভাবে কর্ম করার প্রবৃত্তি দেখা যায়। কিন্তু জ্ঞানযোগে সিদ্ধ মহাপুরুষদের এই প্রবৃত্তি দেখা যায় না ; কারণ, জ্ঞানযোগী প্রথম থেকেই নিজেকে নির্লিপ্ত অনুভব করেন। তাই সিদ্ধাবস্থায় তাঁর কর্মে এবং বস্তুজগৎ সম্বন্ধে স্বাভাবিকভাবে উপরতি থাকে যা জ্ঞান-পথের সাধকের জন্য আদর্শ এবং এই মহাপুরুষের বস্তুজগৎ সম্বন্ধে যে উদাসীনতা থাকে তা জগতের পক্ষে হিতকারী হয়।

প্রশ্ন—সিদ্ধ মহাপুরুষদের অহংভাব থাকে না, তাহলে তাঁদের দ্বারা লোকসংগ্রহ, ক্রিয়াদি কীভাবে হয় ?

উত্তর—সেই মহাপুরুষদের শরীর দ্বারা ক্রিয়া হওয়ার দুটি কারণ আছে—এক, তাঁর অদৃষ্ট এবং দ্বিতীয়, প্রাণীদের ভাব। যে ভাগ্যের ফলে তিনি শরীর প্রাপ্ত হয়েছেন, সেই ভাগ্যের জন্যই তাঁর এইসমস্ত ক্রিয়া সংঘটিত হয় এবং তিনি যেসব প্রাণীর সম্মুখীন হন

---

[1] যদ্যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ। স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ততে॥

(গীতা ৩।২১)

তাদের ভাব অনুযায়ী ক্রিয়াদি অনুষ্ঠিত হয়। যদি তাঁর নিকট প্রেম ভাবাপন্ন, শ্রদ্ধাযুক্ত মানুষ আসে তাহলে তার সঙ্গে সেই মহাপুরুষের ব্যবহারও প্রেমযুক্ত হয়। যদি উদাসীন অথবা শত্রুভাবাপন্ন মানুষ আসে, তাহলে সেই মহাপুরুষের ব্যবহারও উদাসীনের মতো হয় (শত্রুভাব মহাপুরুষদের মধ্যে থাকে না)।

জগতে জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ, কর্মযোগ ইত্যাদি যে যোগ-সাধনের যখন যখন প্রয়োজন হয়, সেই সেই সময় সন্ত-মহাপুরুষ দ্বারা সেই যোগ সাধনের প্রচার হয়ে থাকে। যেমন, যে সময় জগতে জ্ঞানযোগের প্রয়োজনীয়তা ছিল, সেই সময় শ্রীশঙ্করাচার্যের দ্বারা জ্ঞানযোগের বিশেষভাবে প্রচার হয়েছিল। যে সময় জগতে ভক্তিযোগের প্রয়োজনীয়তা ছিল, সেই সময় শ্রীরামানুজাচার্য দ্বারা বিশেষভাবে ভক্তিযোগেরই প্রচার হয়েছে। যেমন ভগবানের দ্বারা হওয়া সমস্ত ক্রিয়াই প্রাণীদের হিতের জন্য হয়, এইরূপ মহাপুরুষদের দ্বারা সম্পাদিত সমস্ত কর্মও স্বতঃই প্রাণীদের হিতের জন্য হয়। তাঁদের আচরণ এবং বাক্য (উপদেশ)-দুই-ই প্রাণীদের হিতের জন্য, কিন্তু তাঁদের মধ্যে হিত করবার কোন অহং-অভিমান থাকে না। যেমন সূর্য দ্বারা জগৎ-সংসারের সকলেই আলো এবং কর্ম করার প্রেরণা পায়, তেমনি ঐসব মহাপুরুষদের আচরণাদি এবং বাক্য দ্বারা জগতের সকলের জ্ঞান এবং কর্তব্য-কর্ম করার প্রেরণা মেলে, তিনি জীবিত থাকুন আর নাই থাকুন। ভগবান যখন শ্রীরাম এবং শ্রীকৃষ্ণের অবতাররূপে জন্ম নিলেন, তখন তাঁকে সাক্ষাৎ ভগবান বলে মানবার মতো মানুষ খুব কম ছিল। কিন্তু এখন তাঁকে ভগবান বলে মানবার মতো মানুষের সংখ্যা অনেক। কলিযুগ হওয়ায় মানুষের আচরণাদিতে শিথিলতা এলেও তাঁকে ভগবান বলে মানবার ভাবটি বৃদ্ধি পেয়েছে। তেমনি মহাপুরুষদের দেহ ত্যাগের পর তাঁদের সিদ্ধান্ত এবং বাণীগুলির বিশেষভাবে প্রচার ও সমাদর হয়।

যতক্ষণ মানুষের অহংভাব থাকে, তার ক্রিয়াদি ততক্ষণ জগতের জন্য হিতকারী হয় না। অহংভাব ঘুচলে তবেই তার ক্রিয়াদি জগতের পক্ষে কল্যাণকারী এবং আদর্শ হয়ে ওঠে। সকামভাবে কর্ম করলেও মানুষের কর্ম অপরের জন্য আদর্শ হয় বটে, কিন্তু তা কল্যাণকারী হয় না। সকাম কর্মকারী মানুষ ততটাই শুদ্ধি পায়, যার দ্বারা সে নানাপ্রকার ভোগ উপভোগ করতে পারে। সে এমন শুদ্ধি পেতে পারে না যার দ্বারা কল্যাণ হয়।

যে গ্রামে বা প্রান্তরে সন্ত-মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করেছেন বা বসবাস করেছেন, তা আজও পবিত্র। এখনও সেখানকার অধিবাসীদের মধ্যে আস্তিকতা, শুদ্ধ-বিচার, শুদ্ধ-আচরণ ইত্যাদি দেখা যায় এবং যে গ্রামে কোন সাধু সন্ত জন্মগ্রহণ করেন নি বা সেখানে কেউ যান নি, সেই স্থানের মানুষেরা ভূত-প্রেতের মতই হয়।

(৫৩) গীতোক্ত 'প্রবৃত্তি' এবং 'আরম্ভ'

বর্ণাশ্রমাভ্যাং নিয়তং হি কর্ম কার্যং প্রবৃত্তিঃ কথিতা বুধৈশ্চ।
কর্মাণি ভোগায় নবানি চৈব কার্যাণি চারম্ভ উদীরিতো বৈ॥

ভগবান রজোগুণের বৃদ্ধির লক্ষণ বলতে গিয়ে 'প্রবৃত্তি' এবং 'আরম্ভ' এই দুটি শব্দ একসঙ্গে প্রয়োগ করেছেন—'লোভঃ প্রবৃত্তিরারম্ভঃ কর্মণামশমঃ স্পৃহা' (১৪।১২)। যদিও স্থূলদৃষ্টিতে প্রবৃত্তি এবং কর্মের আরম্ভ—এই দুটি সমানই দেখায়, কিন্তু এই দুটিতে বেশ বড় তফাৎ আছে। নিজ নিজ বর্ণ, আশ্রম, দেশ, পোশাক-পরিচ্ছদ অনুসারে প্রাপ্ত পরিস্থিতি অনুযায়ী যে কর্তব্য উপস্থিত হয়, তাকে সুচারুভাবে সম্পন্ন করাই 'প্রবৃত্তি'। আর ভোগ তথা সম্পদ বাড়াবার উদ্দেশ্যে নতুন নতুন কর্ম আরম্ভ করাকে বলে 'আরম্ভ'। প্রবৃত্তিকে নিষ্কামভাবে, নির্লিপ্ততাপূর্বক পালন করা উচিত, তাকে ত্যাগ করা উচিত নয় ; কারণ নিষ্কামভাবে প্রবৃত্তি পালনই যোগারূঢ়

হওয়ার কারণ (৬।৩)। কিন্তু সকল আরম্ভকেই পরিত্যাগ করা উচিত। কারণ তা ভোগ এবং সম্পদ সংগ্রহের আসক্তি বৃদ্ধি করিয়ে পতন ঘটায়।

গীতা পরিস্থিতি পরিবর্তনের কথা বলে না ; পরিমার্জন করার কথাই বলে, যাতে মানুষ কোনও পরিস্থিতিতে আবদ্ধ না হয় এবং যে পরিস্থিতিতেই সে থাকুক তার দ্বারা যেন তার কল্যাণ হয়। নিজের কল্যাণ করার জন্য যেন নতুন কর্ম আরম্ভ করতে না হয় এবং বর্ণ, আশ্রম, দেশ, কাল ও পরিস্থিতির পরিবর্তনের প্রয়োজন না পড়ে। কারণ পরমাত্মা সমস্ত বর্ণ, আশ্রম, দেশ, কাল, পরিস্থিতি, ঘটনা ইত্যাদিতে পূর্ণভাবে ব্যাপ্ত আছেন।

প্রবৃত্তি (নিজ কর্তব্য পালন) তো সমস্ত বর্ণ-আশ্রমে হয় এবং হওয়া উচিতই ; কারণ, নিজ নিজ কর্তব্য পালন না করলে সৃষ্টিচক্রের মর্যাদা থাকে না এবং নিজ কর্তব্য ত্যাগ করলে উদ্ধার লাভ হয় না। সুতরাং মানুষ যে কোন বর্ণ, আশ্রম, ইত্যাদিতে থাকুক না কেন, তার নিষ্কামভাবে নিজ কর্তব্য অবশ্যই পালন করা উচিত।

গুণাতীত মানুষের দ্বারাও প্রবৃত্তি বা নিজ কর্তব্য পালন হয়ে থাকে (১৪।২২), কিন্তু তার দ্বারা ভোগ অথবা সঞ্চয়ের উদ্দেশ্যে কর্ম আরম্ভ হয় না। কোনও কোনও স্থানে গুণাতীত মানুষের দ্বারা নতুন নতুন কর্মের আরম্ভ লক্ষ্য করা যায় ; কিন্তু সেই কর্মে তাঁর কিছুমাত্র আসক্তি বা দ্বেষ থাকে না। ভোগ ও সঞ্চয়ের উদ্দেশ্যে নতুন নতুন কর্মের আরম্ভকারী মানুষ 'আমাকে পরমাত্মপ্রাপ্তি করতেই হবে'—এরূপ স্থির নিশ্চয় কখনও করতে পারে না (২।৪৪)।

অর্থাৎ নিজ বর্ণ, আশ্রম অনুযায়ী নিষ্কামভাবে করা প্রবৃত্তি বন্ধনের কারণ হয় না, তা মুক্তিরই হেতু হয়ে থাকে। তেমনি নিজ স্বার্থ, অভিমান, কামনা, আসক্তি ত্যাগ করে শুধু সর্বপ্রাণীর জন্য করা নতুন নতুন কর্মের আরম্ভও বন্ধনের কারণ হয় না। কিন্তু এই আরম্ভের সময় সাধককে বিশেষভাবে সাবধান থাকতে হবে যেন তার হৃদয়ে বস্তুসমূহ এবং ক্রিয়াগুলি কোন গুরুত্বপূর্ণ ছাপ না ফেলে। যদি এই সমস্ত ক্রিয়া ও বস্তু তার হৃদয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছাপ ফেলে, তবে সেইসব কর্মে সাধকের নির্লিপ্ততা থাকতে পারে না অর্থাৎ সেই সাধক যদি নিজের কাছে টাকা-পয়সা নাও রাখে, দ্রব্যাদির সংগ্রহে মনোযোগ নাও দেয়, তবুও তার হৃদয়ে ধন-সম্পত্তি, বস্তু এবং ক্রিয়াসকল গুরুত্বের ছাপ ফেলবে তথা কাজ করা বা না করা অবস্থায় তার সেই কর্মের চিন্তা হতেই থাকবে।

ভগবান কর্মযোগী, জ্ঞানযোগী এবং ভক্তিযোগী—তিনপ্রকার সাধককেই প্রবৃত্তি (কর্ম) থেকে নির্লিপ্ত থাকার কথা বলেছেন। কর্মযোগী সাধকের ফলাসক্তি না থাকায় তিনি কর্ম করলেও তার ফলে লিপ্ত হন না—**'কুর্বন্নপি ন লিপ্যতে'** (৫।৭)। জ্ঞানযোগী সাধক 'সমস্ত কর্ম প্রকৃতির দ্বারাই সম্পন্ন হয়'—এইরূপ দেখেন এবং নিজেকে অকর্তা ভাবেন (১৩।২৯)। এইজন্য তিনি কর্ম করলেও তাতে লিপ্ত হন না। ভক্তিযোগী সাধক তাঁর সমস্ত কর্ম ভগবানে অর্পণ করেন, অতএব তিনি কর্ম করলেও তাতে লিপ্ত হন না।

ভগবান কর্মযোগে কর্মের প্রারম্ভকালে কামনা এবং সংকল্প ত্যাগ করার কথা বললেও কর্মের আরম্ভ ত্যাগ করতে বলেন নি। কারণ কর্মযোগে নিষ্কামভাবে কর্ম করা আবশ্যক। কর্ম পালন না করলে কর্মযোগে সিদ্ধিলাভ হতে পারে না (৬।৩)। কিন্তু জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগে ভগবান কর্মের আরম্ভ সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করার কথা বলেছেন ; যেমন— যে সকল কর্মের আরম্ভ ত্যাগ করে তাকে গুণাতীত বলে (১৪।২৫) এবং যে সকল কর্মারম্ভ ত্যাগ করেছে, সেই ভক্তই আমার প্রিয় (১২।১৬)। কারণ জ্ঞানযোগী ও ভক্তিযোগীর সাংসারিক কর্মে উপরতি বা বিরতি-ভাব থাকে।

(৫৪) গীতায় ত্যাগের স্বরূপ

বাহ্যব্যক্তিপদার্থানাং ন ত্যাগস্ত্যাগ উচ্যতে।
কামাদীনাং পরিত্যাগং প্রাহুস্ত্যাগং বিচক্ষণাঃ॥

ত্যাগের বিষয়ে মানুষের প্রায়শঃ এরূপ ধারণা থাকে যে, যে ব্যক্তি ঘর-সংসার, স্ত্রী-পুত্র, মাতা-পিতা ইত্যাদি ত্যাগ করে সাধু বা সন্ন্যাসী হয়, সেই যথার্থ ত্যাগী। কিন্তু বাস্তবে তাকে ত্যাগ বলে না। কারণ, যতক্ষণ অন্তঃকরণে সাংসারিক বস্তু, ব্যক্তি, পদার্থ আদিতে অনুরাগ বা আসক্তি থাকে, ভালবাসা থাকে, মনে এগুলির প্রতি গুরুত্ব থাকে, ততক্ষণ বাহ্যতঃ ঘর-সংসার ইত্যাদি ত্যাগ করলেও তা সত্যকার ত্যাগ নয়। যদি ওই ভাবে ঘর-সংসার ছাড়লেই ত্যাগ করা হয়, তবে যেসব ব্যক্তি মৃত্যুমুখে পতিত হয় তাদের কল্যাণ হওয়া উচিত। কারণ, তারা নিজ ঘর-সংসার বিশেষ করে নিজের শরীর পর্যন্ত ত্যাগ করে যায়। কিন্তু তাতে তাদের কল্যাণ হয় না ; কারণ, তারা তো সংসারের আসক্তি মমতা ইত্যাদি ত্যাগ করে নি, এগুলি থাকা অবস্থাতেই তাদের মৃত্যুকে বরণ করতে হয়েছে।

যে জিনিস নিজের নয়, তাও ত্যাগ করা যায় না আর যা নিজ স্বরূপ (স্বভাব), তাও ত্যাগ করা যায় না। যেমন—আগুন তার দাহিকা শক্তি এবং প্রকাশিকা শক্তি বর্জন করতে পারে না। কারণ দাহিকা শক্তি এবং প্রকাশিকা শক্তি দুই-ই অগ্নির স্বরূপ। তাহলে ত্যাগ কিসের হবে ? যা নিজের নয় অথচ নিজের বলে মনে করা হয়, তাকে ত্যাগ করা এই মিথ্যা মান্যতার ত্যাগ হয়। যার সঙ্গে কোনরূপ সম্বন্ধ ছিল না, এখন নেই, পরেও হবে না এবং কখনও হতে পারেও না অর্থাৎ পরিত্যাগ না করলেও যার প্রতিক্ষণ আমাদের থেকে সম্পর্ক-বিচ্ছেদ হয়ে যাচ্ছে, তার সঙ্গে সম্বন্ধ ত্যাগ করা বাস্তবিকই ত্যাগ। এর তাৎপর্য এই যে, বস্তু আদির বাহ্যিক পরিত্যাগ উদ্দেশ্য নয় আসলে ওইসব বস্তু ইত্যাদিতে যে মানসিক সম্বন্ধ করা হয়, যে আসক্তি, মমতা ইত্যাদি করা হয় তা ত্যাগ করা। এই ত্যাগই সত্যকারের ত্যাগ, এরূপ ত্যাগের ফলে তৎক্ষণাৎ শান্তি লাভ হয়, **ত্যাগাচ্ছান্তিরনন্তরম্** (১২।১২)।

ত্যাগের বিষয়ে প্রধান কথা হল এই যে, সংসারে থাকতে হবে সংসারের জন্যই, নিজের জন্য নয়। সাত্ত্বিক ত্যাগের স্বরূপ জানাতে গিয়ে ভগবান বলছেন যে, শুধু কর্তব্য-কর্মই করা উচিত কিন্তু তাতে যেন আসক্তি, মমতা বা ফল লাভের ইচ্ছা না থাকে। আসক্তি ইত্যাদি না থাকলে শরীর-সংসার থেকে সম্পর্ক-ছেদ হয় (১৮।৯)। কর্তব্য পালন করলে ক্লেশ হয়, পরিশ্রম হয়, আরাম পাওয়া যায় না—এইরূপ চিন্তা করে অর্থাৎ শারীরিক কষ্টের ভয়ে কর্তব্য পরিত্যাগ করলে তাকে রাজসিক ত্যাগ বলে। রাজসিক ত্যাগে শান্তি পাওয়া যায় না (১৮।৮)। মোহবশতঃ চিন্তা ভাবনা না করেই কর্তব্য, ক্রিয়া, পদার্থ ত্যাগ করাকে তামস ত্যাগ বলে (১৮।৭)। তামস ত্যাগ মানুষকে প্রমাদ ও আলস্যে অভিভূত করে, যাতে তার অধোগতি হয়।

তিনিই সাধক, যিনি ত্যাগী অর্থাৎ যিনি শুধু সংসারকে দিয়ে থাকেন, নেন না কিছু। কোন কিছু গ্রহণ করাও তাঁর দেওয়া-তুল্য এবং কিছু প্রদান করাও দেওয়া-তুল্য, অর্থাৎ অন্ন-বস্ত্র-জল ইত্যাদি যা কিছু তিনি গ্রহণ করেন তা জগতের কল্যাণের জন্যই এবং অন্ন-জলাদি যদি নেন, তাও কল্যাণের জন্যই নেন। তিনি যদি কিছু না করে শান্ত হয়ে বসেও থাকেন, তাহলেও তিনি জগৎকে দিতেই থাকেন ; কারণ, তাঁর শুধু বেঁচে থাকা বা শুধু তাঁকে দর্শনের দ্বারাই জগতের স্বতঃই হিত হয়। তাঁর শরীর ত্যাগের পরও তাঁর ভাব দ্বারা, তাঁর আচরণাদির পঠন-স্মরণ-মনন ইত্যাদির দ্বারা এবং তাঁর বাসস্থানের অণু-পরমাণু দ্বারাও পৃথিবীর মঙ্গল হয়। এর তাৎপর্য এই যে, তিনি **'সর্বভূতহিতে রতাঃ'** (৫।২৫ ; ১২।৪) হন, তাঁর জীবন হয় ত্যাগময়, তাই তিনি নেন না কিছুই, সবকিছু দিয়ে যান।

গীতায় সাংখ্যযোগকে 'সন্ন্যাস' এবং কর্মযোগকে 'ত্যাগ' নামেও অভিহিত করা হয়েছে (১৮।১)। যার গচ্ছিত বস্তু, তাকে সেই বস্তু ফিরিয়ে দেওয়ার নামই

'সন্ন্যাস'। শরীর এবং সংসার প্রকৃতির সম্পদ। প্রকৃতির গচ্ছিত বস্তু বা সম্পদ প্রকৃতিকে ফিরিয়ে দেওয়াই অর্থাৎ নিজ সম্বন্ধ না রাখাই 'সন্ন্যাস'। যা নিজস্ব নয়, তার থেকে সম্পর্ক ছেদ করার নামই 'ত্যাগ'। মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়, শরীর ইত্যাদিতে মমত্ব না রাখা, নিজ সম্বন্ধ না রাখার নামই 'ত্যাগ' ; কারণ এসবই জগতের, নিজের নয়। মন, বুদ্ধি ইত্যাদিতে মমতা-আসক্তি না রেখে শুধু জগৎ-সংসারের জন্য কাজ করা উচিত, নিজের জন্য নয়। নিজের জন্য, নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য যদি মানুষ কাজ করে, তবে সে তার দ্বারা বদ্ধ হয়—**'যজ্ঞার্থাৎ কর্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্মবন্ধনঃ'** (৩।৯)। শুধুমাত্র যজ্ঞ করার জন্য, অপরের হিতের জন্য এবং জগৎ-সংসারের জন্য কর্ম করলে মানুষের সম্পূর্ণ কর্ম বিলীন হয়ে যায়—**'যজ্ঞায়াচরতঃ কর্ম সমগ্রং প্রবিলীয়তে'** (৪।২৩)।

কর্মের আরম্ভ না করলেও সিদ্ধিলাভ হয় না এবং উপর থেকে কর্ম ত্যাগ করলেও সিদ্ধিলাভ হয় না (৩।৪)। কর্মের আরম্ভ না করলে সিদ্ধি হয় না ; কারণ কর্মানুষ্ঠান ছাড়া কর্মযোগীর সিদ্ধি প্রাপ্তি হয় না। যে ব্যক্তি যোগারূঢ় হতে চায়, নিজের মধ্যে সমত্ব আনতে চায়, তার নিষ্কামভাবে কর্ম করাই সিদ্ধি লাভের মূল (৬।৩)। অর্থাৎ কর্ম না করে মানুষ যোগারূঢ় হতে পারে না, কর্ম করলে তবেই কর্মের সিদ্ধি-অসিদ্ধি এবং ফলের প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তিতে সম-ভাবের পরীক্ষা হয়।

কর্মকে কেবল স্বরূপতঃ ত্যাগ করাতেও সিদ্ধিলাভ হয় না ; কারণ যতক্ষণ কর্তৃত্বাভিমান (করবার ভাব) বিদ্যমান থাকে, ততক্ষণ সাংখ্যযোগীর সিদ্ধি প্রাপ্তি হয় না। কর্তৃত্বাভিমান ত্যাগ করলেই সিদ্ধিলাভ হয় ; কারণ বাস্তবে 'করা' প্রকৃতিতে হয়, নিজের নয় (১৩।৩১)। এর তাৎপর্য এই যে, সাংখ্যযোগী যদি কর্তৃত্বাভিমান ত্যাগ করেন তাহলে তারপর কর্মকে স্বরূপতঃ ত্যাগ করলেও তাঁর সাধনায় সিদ্ধিলাভ হয়। কিন্তু কর্মযোগে কর্তব্য-কর্ম করলে তবেই সিদ্ধিলাভ হয়।

যে কর্ম দ্বারা সংসারের সঙ্গে সম্পর্ক যোগ হয়, তাকে 'অকুশল' কর্ম বলে। কর্মযোগী অকুশল কর্ম ত্যাগ করে বটে, কিন্তু দ্বেষ-ভাব থেকে নয়। লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, ত্যাজ্য বস্তু তত বন্ধনকারক নয়, যত বন্ধনকারক হল দ্বেষযুক্ত মনোভাব। একইভাবে কর্মযোগী কুশল কর্ম করে, কিন্তু আসক্তিপূর্বক নয়। এতেও দেখা যায় যে, কুশলকর্ম দ্বারা যে লাভ হয় তার থেকে অনেক বেশী ক্ষতি হয় আসক্তি পূর্বক কর্ম করলে। এইভাবে কর্ম করলেই তা বাস্তবিক ত্যাগ হয় (১৮।১০)।

যে ব্যক্তি কর্মফলের অপেক্ষা না রেখে, কর্মফলের আসক্তি বা কামনা না রেখে, কর্মফলের সঙ্গে নিজের সম্বন্ধ না রেখে কর্তব্য-কর্ম করে যায়, বাস্তবে সেই ত্যাগী। কেবল অগ্নি (যজ্ঞাদি) ও কর্ম ত্যাগকারী হলেই ত্যাগী হওয়া যায় না (৬।১)। নিজ সংকল্প ত্যাগ না করে, মনের বাসনা ত্যাগ না করে মানুষ কোনওভাবেই যোগী হতে পারে না (৬।২)। যে ব্যক্তি কর্ম এবং কর্মফলের আসক্তি ত্যাগ করেছে, সে কর্মে প্রবৃত্ত হলেও বাস্তবে সে কিছুই করে না (৪।২০)। যে কর্ম করেও নির্লিপ্ত থাকে (কামনা, মমতা, আসক্তি রহিত হয়), নির্লিপ্ত থেকেই কর্ম করে, সেই যোগী বুদ্ধিমান এবং সর্বকর্মকারী (কৃতকৃত্য) (৪।১৮)। এর তাৎপর্য এই যে, কর্মযোগী কর্মকে স্বরূপতঃ ত্যাগ করে না, সে কেবল কর্ম এবং কর্মফলের কামনা, মমতা, আসক্তি ত্যাগ করে। ভক্তিযোগীও কর্মকে স্বরূপতঃ ত্যাগ করে না, সে কর্ম এবং কর্মফল ভগবানে অর্পণ করে অর্থাৎ তার (কর্মের) কামনা, মমতা, আসক্তি ত্যাগ করে (৩।৩০ ; ১২।৬, ১৮।৫৭)।

ভক্তের কিছু নেবার ইচ্ছা কখনো হয় না, তার মুক্তির ইচ্ছাও হয় না ; কারণ তার কোন বন্ধনই হয় না। যেখানে জড় অনিত্য বস্তুকে স্বীকার করা হয়, সেখানেই বন্ধন ঘটে। ভক্ত কখনো অনিত্য বস্তুকে স্বীকার করে না। সে ভগবানের নিকট কিছু নেয় না, ভগবানকে সে শুধু দিয়েই যায়। তার মধ্যে 'আমি ভগবানের নিকট কিছু চাই না, মুক্তিও চাই না',—এইরূপ অভিমানও থাকে না। ভগবান যেমন কারো নিকট হতে কিছু নেন না, শুধু দিয়েই থাকেন, তবু তাঁর কোন কিছু কমে না, তেমনি এই ত্যাগী ভক্তদেরও কিছু কমে যায় না। ভক্ত নিজের জন্য ভগবানকেও চায় না, সে স্বয়ং ভগবানে সমর্পিত হতে চায়, নিজের পৃথক অস্তিত্ব পর্যন্ত রাখতে চায় না।

অদ্বৈত সিদ্ধান্ত অনুসারে সাধক ব্রহ্মরূপ হয়ে যায়। কিন্তু ভক্ত ব্রহ্মরূপের থেকেও বিশিষ্ট হয় ; ফলে

ভগবানও ভক্তের ভক্ত হয়ে যান। কিন্তু ভক্ত চায় না যে ভগবান তার ভক্ত হন। এরূপ ভক্ত ছাড়া ভগবানেরও ভালো লাগে না। ভগবানেরও এরূপ ভক্তের প্রয়োজন হয়, চাহিদা থাকে। শ্রীহনুমান যেমন ভগবানের কাছ থেকে কিছুই চান নি ; থাকবার স্থানও চাননি ; খাদ্যও চাননি, বস্ত্রও না, না সহায়তা বা মান মর্যাদা, কিছুই চাননি তিনি, কিন্তু তিনি ভগবানের কার্য করবার জন্য সবসময় ব্যগ্র থাকতেন—**'রাম কাজ করিবে কো আতুর'**। তারই জন্য ভগবান শ্রীরাম, সীতা, লক্ষ্মণ, ভরত, অযোধ্যাবাসী প্রত্যেকেই হনুমানের কাছে ঋণী হয়ে গিয়েছিলেন। হনুমান তাঁর ত্যাগের জন্য এতো উচ্চ স্থানে আসীন যে যেখানে শ্রীরামের মন্দির সেখানেই হনুমানের মন্দির তৈরী করা হয়। কিন্তু যেখানে শ্রীরামের মন্দির হয়নি, সেখানেও পৃথকভাবে হনুমানের মন্দির তৈরী করা হয়। অর্থাৎ হনুমানের মন্দির ব্যতীত শ্রীরামের মন্দির হয় না, কিন্তু শ্রীরাম ব্যতীতও শ্রীহনুমানের মন্দির হয়।

ত্যাগী ভক্তদের ভগবান মা-বাবা, ভাই-বন্ধু, আত্মীয় করে নেন। ভক্তের ভালবাসা পাওয়ার জন্য ভগবানও ব্যাকুল হয়ে থাকেন। বৃন্দাবনের গোপীদের সঙ্গে তাঁর এইরূপ প্রেমই ছিল। তাঁরা নিজেদের জন্য কিছুই চান নি, শুধু ভগবানকে সুখ দিতে চাইতেন। তাঁদের পৃথক্ কোন সত্তা ছিল না ; তাঁরা ভগবানেই নিজ নিজ ব্যক্তিগত সত্তার আহুতি দিয়েছিলেন।

ব্রহ্ম একরস (বা সমরস)। তিনি কাউকে রস দেনও না, কারুর থেকে রস গ্রহণও করেন না। কিন্তু ভক্ত ভগবানকে রস দেয় এবং দিতেই থাকে, তার দেওয়ার শেষ নেই। যেমন সমুদ্রে মিশলেও গঙ্গার প্রবাহ সমুদ্রেতে বহমানই থাকে, যদিও তাতে তাঁকে প্রবাহিত বোঝা যায় না, এইরূপ ভক্তের দেওয়ার প্রবাহ চলতেই থাকে।

(৫৫) গীতায় নির্দ্বন্দ্ব হওয়ার গুরুত্ব

রাগদ্বেষাদয়ো দ্বন্দ্বাঃ শত্রবঃ সন্তি দেহিনাম্।
তন্মুক্তাঃ সাধকাঃ শীঘ্রং ভবেয়ুঃ সমমাশ্রিতাঃ॥

সাংসারিক কর্মে সংসারের সঙ্গে সম্বন্ধ থাকে এবং পারমার্থিক সাধনে সংসার থেকে বিমুখ হয়ে ভগবন্মুখী হতে হয়। সুতরাং সাংসারিক কর্ম করা উচিত, না পারমার্থিক সাধনা করা উচিত—মনে এই দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়। এই দ্বন্দ্ব নিবারণের উপায় এই যে, সাংসারিক কাজ সংসারের জন্য না করে শুধু ভগবানের জন্য করা উচিত। শুধু ভগবৎপ্রীতির জন্য করলে সমস্ত কর্ম, ক্রিয়া সাধনরূপে পর্যবসিত হয়। গীতায় নবম অধ্যায়ের সাতাশ সংখ্যক শ্লোকে ভগবান **'যৎ করোষি'** (তুমি যা কিছু কর) **'যদশ্নাসি'** (যা কিছু ভোজন কর), **'যজ্জুহোষি'** (যা কিছু হোমযজ্ঞাদি কর), **'দদাসি যৎ'** (যা কিছু দান কর) এবং 'যৎ তপস্যসি' (যা কিছু তপস্যা কর)—এই পাঁচটি ক্রিয়ার কথা বলেছেন। এর মধ্যে **'করোষি'** এবং **'অশ্নাসি'** এই দুটি সংসার সম্বন্ধীয় ক্রিয়া, **'জুহোষি'** **'দদাসি'** এবং **'তপস্যসি'**—এই তিনটি ক্রিয়া শাস্ত্রীয় ; কিন্তু এই পাঁচটি ক্রিয়ারই সম্বন্ধ **'মদর্পণম্'**-(ভগবদর্পণ)-এর সঙ্গে যুক্ত। কারণ পাঁচটি ক্রিয়ার সঙ্গেই **'যৎ'** শব্দটি যুক্ত আছে এবং অর্পণ ক্রিয়ার সঙ্গে **'তৎ'** শব্দটি যুক্ত আছে—**'তৎকুরুষ্ব মদর্পণম্'**। অতএব এই পাঁচটি ক্রিয়া শুধু ভগবানের প্রীত্যর্থেই করা উচিত। এতে কিছুমাত্র আপনভাব রাখা উচিত নয়।

অর্পণ দুই প্রকারের—১) কর্ম করে ভগবানে অর্পণ করা, ২) শরীর-ইন্দ্রিয়-মন-বুদ্ধি ইত্যাদি সবই ভগবানের—এইরূপ মনে করা। এই দুটির মধ্যে দ্বিতীয় অর্পণই শ্রেষ্ঠ ; কেননা এর দ্বারা সমস্ত কিছুই ভগবানে সমর্পিত হয়। এইভাবে অর্পণকারী ভক্তের লৌকিক এবং শাস্ত্রীয় সমস্ত কর্মই পারমার্থিক হয়ে যায়, ভগবৎ-প্রীত্যর্থ হয়ে ওঠে। তখন অর্পণকারীর মধ্যে আর কোন দ্বন্দ্ব থাকে না।

অনুকূল পরিস্থিতিতে সন্তুষ্ট থাকা এবং প্রতিকূল

পরিস্থিতিতে অসন্তুষ্ট হওয়াও দ্বন্দ্ব। এরূপ দ্বন্দ্বের ফলে আচার-ব্যবহার বিরূপ হয়ে যায়, দুঃখ অনুভব হয় এবং বন্ধন দৃঢ় হয়। কিন্তু যে ব্যক্তি অনুকূল বা প্রতিকূল পরিস্থিতি এলেও সন্তুষ্ট বা অসন্তুষ্ট হয় না, সমভাবে থাকে, ব্যবহার ঠিক রাখে, সে দুঃখ পায় না এবং তার কর্মবন্ধন কেটে যায় (২।৩৮)। যেমন, যে মা নিজ সন্তানদের মধ্যে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করে, পক্ষপাত বা ভেদবুদ্ধি রাখে, সে মা হয়েও সন্তানদের সুখী রাখতে পারে না, যার জন্য আত্মীয়দের সঙ্গে ঝগড়া-বিবাদ, অশান্তি, মনোমালিন্য হয়ে থাকে। দ্বন্দ্ব বা পক্ষপাত না থাকলে ঝগড়া, অশান্তি দূর হয় এবং সকলের সঙ্গে শান্তিসম্পর্ক বজায় থাকে।

দ্বন্দ্ব, বৈষম্য, পক্ষপাত—এইগুলি জন্ম-মৃত্যু এবং দুঃখের কারণ। এগুলি না থাকলে পরমাত্মতত্ত্ব প্রাপ্তি হয়। সেইজন্য ভগবান দ্বন্দ্বভাবেও সম থাকাকেই 'যোগ' বলে অভিহিত করেছেন (২।৪৮)।

'আমরা যুদ্ধ করব কি করব না, জয় আমাদের হবে, না ওদের হবে' (২।৬)—এও দ্বন্দ্ব। কিন্তু এই দ্বন্দ্ব রাগ-দ্বেষপূর্ণ নয়, এটি ভবিষ্যতের চিন্তাযুক্ত দ্বন্দ্ব। এই দ্বন্দ্বে অভিভূত হয়ে অর্জুন ভগবানের শরণাগত হয়ে তাঁর কাছে নিজের কি কর্তব্য তা জানতে চাইলেন (২।৭)। ভগবান এর উত্তরে জানালেন, 'যদি তুমি এই যুদ্ধে হত হও তাহলে স্বর্গপ্রাপ্ত হবে, জয়লাভ করলে পৃথিবীর রাজত্ব ভোগ করবে' (২।৩৭)। 'অতএব জয়-পরাজয়, লাভ-ক্ষতি এবং সুখ-দুঃখকে তুল্য জ্ঞান করে যুদ্ধ কর, তাহলে তুমি পাপভাগী হবে না' (২।৩৮)। 'কর্মেই তোমার অধিকার, কর্মফলে নয়' (২।৪৭)। 'সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে সমত্ব রেখে তুমি কর্ম কর' (২।৪৮), 'কারণ সমত্ব বুদ্ধিযুক্ত মানুষ এই জীবনেই পাপ-পুণ্য হতে রহিত হয়ে যান (২।৫০)।'

'এই ব্যক্তি আমার শ্রোতা, অন্য ব্যক্তিটি নয় ; এই ব্যক্তি আমার অনুগামী, অপরজন নয় ; এ আমার শিষ্য, অপর জন নয় ; অতএব যে ব্যক্তিগণ আমার অনুগামী শিষ্য ও শ্রোতা তাদেরই আমি আমার সাধন-প্রণালী জানাব, অন্যদের নয়'—এইপ্রকার বক্তার মধ্যে দ্বন্দ্ব, বিষমতা, পক্ষপাত থাকায় রাগ-দ্বেষ হয়। যতক্ষণ রাগ-দ্বেষ থাকে ততক্ষণ কল্যাণ হয় না ; কল্যাণের পথে রাগ ও দ্বেষ—এই দুটি বড় শত্রু (বিঘ্নকারক) (৩।৩৪)।

কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ এবং ভক্তিযোগ—এই তিন যোগ পথেই সাধকের নির্দ্বন্দ্ব হওয়া অত্যন্ত জরুরী। সেইজন্যই ভগবান গীতায় স্থানে স্থানে নির্দ্বন্দ্ব হওয়ার জন্য বিশেষ জোর দিয়েছেন। যেমন—'নির্দ্বন্দ্ব হলে সাধক কর্ম করেও কর্মফলে আবদ্ধ হন না' (৪।২২), 'দ্বন্দ্ব দ্বারা মানুষ সংসারে আবদ্ধ হয়' (৭।২৭) 'কিন্তু নির্দ্বন্দ্ব হলে মানুষ অনায়াসে সংসারবন্ধন থেকে মুক্তিলাভ করে' (৫।৩)। 'দ্বন্দ্বনির্মুক্ত মানুষই দৃঢ়ব্রত হয়ে ভগবানের ভজনা করতে সক্ষম হয়' (৭।২৮)। এর তাৎপর্য এই যে, সাধকের সাধনা নির্দ্বন্দ্ব হলেই দৃঢ়তা লাভ করে। সেইজন্য ভগবান অর্জুনকে নির্দ্বন্দ্ব হওয়ার জন্য উপদেশ দিয়েছেন (২।৪৫)।

(৫৬) গীতায় অহংকার ও মমত্ব ত্যাগ

অহংতামমতাত্যাগঃ কথিতো হরিণা স্বয়ম্।
কর্মযোগে জ্ঞানযোগে ভক্তিযোগে সমানতঃ॥

গীতায় ভগবান কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ এবং ভক্তিযোগ—এই তিন পথেই অহংকার ও মমত্ব ত্যাগ করার কথা বলেছেন ; যেমন- কর্মযোগে **'নির্মমো নিরহংকারঃ'** (২।৭১) পদগুলির দ্বারা, জ্ঞানযোগে **'অহংকারং ------বিমুচ্য নির্মমঃ'** (১৮।৫৩) পদসমূহের দ্বারা এবং ভক্তিযোগে **'নির্মমো নিরহংকারঃ'** (১২।১৩) ইত্যাদি

পদের দ্বারা সাধককে অহংকার ও মমত্ব রহিত হওয়ার কথা বলা হয়েছে। অবশ্য এই তিন যোগপথে অহংকার ও মমত্ব ত্যাগ করার পন্থায় পার্থক্য আছে। যেমন—

কর্মযোগে প্রথমে কামনা ত্যাগ হয় ; কারণ, কর্মযোগী প্রথম থেকেই নিষ্কামভাবে কর্ম করতে শুরু করেন। তাঁর কামনা যখন সর্বতোভাবে ত্যাগ হয়, তখন স্বাভাবিকভাবেই স্পৃহা, মমতা এবং অহংকর্তৃত্ব বোধ দূর হয়। দ্বিতীয় অধ্যায়ের একাত্তর সংখ্যক শ্লোকে ভগবান কর্মযোগীদের প্রথমে কামনা ত্যাগের কথা বলেছেন, পরে আসক্তি, মমতা ও অহংকাররহিত হওয়ার কথা বলেছেন।

জ্ঞানযোগে প্রথমে অহংকার দূর হয়। বন্ধনের মূল এই অহংকার-বোধ ত্যাগ হলে মমতা, আসক্তি এবং কামনা স্বাভাবিকভাবেই বর্জিত হয়। অষ্টাদশ অধ্যায়ের সপ্তদশ শ্লোকে ভগবান বলেছেন যে, জ্ঞানযোগীর প্রথমে অহং ত্যাগ হয়, পরে লিপ্ততা বা ফলেচ্ছা ত্যাগ হয়।

ভক্তিযোগে ভগবানের শরণাগত হওয়ায় 'আমি ভগবানের এবং ভগবান আমার'—এইভাবে অহং বদল হয়ে যায় এবং ভগবানের কৃপায় ভক্তিযোগী অহংকার, মমতা ও আসক্তি-কামনা রহিত হয়ে যায়। অষ্টাদশ অধ্যায়ের ছেষট্টি সংখ্যক শ্লোকে ভগবান বলেছেন যে, তুমি সর্বধর্মের আশ্রয় ত্যাগ করে শুধুমাত্র আমার শরণাগত হও, আমি তোমাকে সমস্ত পাপ (অহংকার, মমত্ব ইত্যাদি দোষগুলি) থেকে মুক্ত করব।

এর তাৎপর্য হচ্ছে যে, প্রত্যেক মানুষই অহংকার ও মমত্বরহিত হতে পারে। কারণ, অহংকার বা মমত্ব তার স্বরূপ নয়। অহংকার ও মমত্ব যদি মানুষের স্বরূপ হতো, তবে তা কখনও ত্যাগ করা সম্ভব হতো না এবং ভগবানও এর থেকে রহিত হবার কথা বলতেন না।

জীবাত্মা স্বয়ং যখন শরীরের সঙ্গে 'আমি এই শরীর' বলে অভিন্নতার সম্বন্ধ পাতায়, তখনই 'অহংকার' জন্ম নেয় এবং যখন শরীরের সঙ্গে 'এই দেহ আমার' এরূপ পৃথক্ সম্পর্ক মেনে নেয়, তখন 'মমতার' উৎপত্তি হয়। অহংকার ও মমতা এই দুই-ই উপাধি, স্বরূপ নয়—এই কথা বিবেকপূর্বক দৃঢ়তার সঙ্গে মনে রাখলে সাধক অনায়াসে এই দুটি থেকে রহিত হতে পারে।

সাধকের শরীরাদির সঙ্গে অহংকার ও মমতারূপে আরোপিত সম্পর্কটুকুই ত্যাগ করতে হবে। কারণ এটি তার স্বরূপ নয়। স্বরূপের বর্ণনা করতে গিয়ে ভগবান বলেছেন যে, এই পুরুষ স্বয়ং অনাদি ও নির্গুণ হওয়ায় পরমাত্ম-স্বরূপই এবং এই শরীরে থেকেও তিনি কিছুই করেন না এবং কর্মফলেও লিপ্ত হন না, (১৩।৩১)। কিন্তু সে নিজে 'আমি করি এবং আমি চাই'— এইরূপ মনে করে নেয়। এই দুই উপাধি আরোপ করতে ভগবান নিষেধ করে বলেছেন—'যার অহংকর্তৃত্ব ভাব নেই এবং যার বুদ্ধি লিপ্ত হয় না, সে যদি সমস্ত প্রাণীকে বধও করে, তাহলে তার দ্বারা হত্যা করা হয় না এবং তার দ্বারা সে লিপ্তও হয় না (১৮।১৭)। কারণ তার স্বরূপে প্রকৃতপক্ষে কর্তৃত্বাভিমান এবং কর্মলিপ্ততা নেই-ই।

শ্রীরামচরিতমানসে (তুলসীকৃত রামায়ণে) যেখানে শ্রীলক্ষ্মণ মায়ার স্বরূপ জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তার উত্তরে ভগবান বলেছেন—

মৈ অরু মোর তোর তৈঁ মায়া।
জেঁহি বস কীন্হে জীব নিকায়া॥ (৩।১৫।১)

এর তাৎপর্য এই যে, অহংকার (আমি-ভাব) এবং মমতা (আমার-ভাব)—এগুলি হচ্ছে মায়ার স্বরূপ, নিজ স্বরূপ নয়। কিন্তু জীব এই মায়ার বশীভূত হয়েছে, বদ্ধ হয়ে রয়েছে। এই বদ্ধদশা থেকে মুক্ত হতে হবে। সাধুদের বাণীও আছে—

মৈঁ মেরেকী জেবরী, গল বঁধ্যো সংসার।
দাস কবীরা ক্যোঁ বঁধে, জাকে রাম আধার॥

শরীরাদিতে অহং-মমতা বোধ করলে স্ব-স্বরূপ পরাধীন হয়ে যায় এবং এতে অপরিচ্ছন্নতা ও মলিনতা এসে পড়ে। অহংকার-মমতা ত্যাগ হলে স্বাভাবিক ভাব স্বরূপের বোধ হয়। অহংকার-মমতা ত্যাগ করার পূর্বেই সাধককে এক প্রত্যয় আনতে হবে যে, এগুলি তার নিজ স্বরূপ নয়। ত্যাগ তারই হতে পারে, যা তার নিজ স্বরূপ নয়। নিজ স্বরূপ কখনো ত্যাগ করা যায় না।

বাস্তবিক ব্যবহারেও দেখা যায় যে, যে ব্যক্তি মনে যত বেশী অহংকার-মমতা রাখে, ততই সে সংসারে অসম্মান পায় ; এবং যে যত অহংবোধ ও মমত্ব ত্যাগ করে, ততই সে সংসারে সম্মাননীয় হয়ে ওঠে, মর্যাদা পেতে থাকে। সাধক নিজেও অনুভব করতে পারে যে, যতই সে সাধনপথে অগ্রসর হতে থাকে ততই তার

অহংকার ও মমত্ববোধ বর্জিত হতে থাকে। অহংবোধ ও মমত্ববোধ সর্বতোভাবে দূরীভূত হলে সাধক জীবন্মুক্ত হয়ে যায়।

অহংকার ও মমতায় আবদ্ধ মানুষ বিশেষভাবে অপবিত্র হয় এবং এগুলি দূর হলে সে অত্যন্ত পবিত্র হয়। যেমন, অহং-মমতাবদ্ধ কোন সাধারণ মানুষের মৃত্যু হলে লোকে তার বস্ত্রাদি স্পর্শ করতে চায় না, কিন্তু যে ব্যক্তির অহং ও মমতাবোধ দূরীভূত হয়েছে সেইরূপ সাধু-মহাপুরুষ দেহত্যাগ করলে লোকে তার বস্ত্রাদি সম্মানের সঙ্গে রেখে দিতে চায় ; কারণ, অহংকার ও মমতা শূন্য থাকায় তাঁর ব্যবহৃত বস্তুগুলি অত্যন্ত পবিত্র হয়। শুধু পবিত্রই নয় অপরকে পবিত্র করার ক্ষমতাও তার থাকে। দ্বিতীয়তঃ যেখানে অহং ও মমতাসম্পন্ন সাধারণ ব্যক্তির দাহ-ক্রিয়া সম্পন্ন হয়, সেই স্থানে ভজন-ধ্যান করলে বিক্ষেপ হয় ; ভয় ভাব জাগে, ভজন তেমনভাবে জমে না। কিন্তু যেস্থানে অহংকার-মমত্ববোধ রহিত সাধু-মহাপুরুষকে দাহ করা হয়, সেইস্থানে বসে ভজন-ধ্যান করলে মন স্থির হয়, ভজন-ধ্যানে সাহায্য পাওয়া যায়, শান্তি মেলে এবং পবিত্র ভাব আসে।

অহংকার-মমতারহিত সাধু-মহাপুরুষদের স্মরণ করলে গৃহ পবিত্র হয়—**'যেষাং সংস্মরণাৎ পুংসাং সদ্যঃ শুধ্যন্তি বৈ গৃহাঃ'** (শ্রীমদ্ভাগবত ১।১৯।৩৩)। কিন্তু অহংকার ও মমত্ববোধ সম্পন্ন ব্যক্তিদের স্মরণ করলে মালিন্য আসে এবং অহংকার ও মমতা ত্যাগ করা কঠিন হয়ে পড়ে।

যাঁর মধ্যে অহংবোধ ও মমত্ববোধ নেই, ভগবান তাঁর মধ্যে বিশেষভাবে প্রকটিত হন। তাঁর স্পর্শযুক্ত বায়ু, তাঁর বাণী এবং তাঁর সংস্পর্শে এলে জীবমাত্রই পবিত্র হয়। কিন্তু এই পবিত্রতা যদি স্বীকার না করা যায় অর্থাৎ তাঁর ওপর অবিশ্বাস করা হয়, তবে সেই পবিত্রতা বাধাপ্রাপ্ত হয়।

নিজস্ব যে সত্তা, তা নিরপেক্ষ, এর কোন পরিবর্তন নেই। পরিবর্তন হয় অহংবোধেই, যেমন—'আমি বিদ্বান', 'আমি মূর্খ', 'আমি ব্রাহ্মণ', 'আমি ক্ষত্রিয়', 'আমি শূদ্র', 'আমি দেবতা', 'আমি রাক্ষস' ইত্যাদি রূপে 'আমি' ভাবেরই পরিবর্তন হয়, অস্তিত্বের (সত্তার) কোন পরিবর্তন হয় না। 'আমি' ভাব বদল হয় মাত্র কিন্তু অস্তিত্ব একভাবেই থাকে। কোন বর্ণ, আশ্রম, যোগ্যতা ইত্যাদির সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন করলে 'আমি' হয়। সুতরাং 'আমি' সাপেক্ষ (অর্থাৎ নিরপেক্ষ নয়) এবং সত্তা স্বতঃই অস্তিত্ববান, সুতরাং সত্তা নিরপেক্ষ।

'আমি সুখী', 'আমি দুঃখী', 'আমি নির্ধন', 'আমি রোগী', 'আমি নীরোগ'—এসবই পুরাতন কর্মের প্রভাবে হয়, অর্থাৎ এই সমস্ত বাহ্যিক পরিস্থিতি পূর্ব-কর্মের (প্রারব্ধের) ফলে হয়, কিন্তু স্ব-অস্তিত্ববোধ কোন কারণের ওপর নির্ভর করে না। স্ব-অস্তিত্ব কোন কর্মের ফল নয়। কোনও বর্ণ, আশ্রম, যোগ্যতা আদির উপরেও নির্ভর করে না। 'আমি' ত্যাগ করলে 'আছি' থাকে না, 'আছে'ই থাকে ; কারণ 'আমি'র জন্য 'আছি' থাকে।

সুখ বা দুঃখ স্ব-স্বরূপে থাকে না, তা 'আমি' ভাবেতেই থাকে। 'আমি'র সঙ্গে যোগ হলে, অহং-এ স্থিত হলে, প্রকৃতিতে স্থিত হলেই সে নিজে 'আমি সুখী', অথবা 'আমি দুঃখী' এরূপ মনে করে। কিন্তু যখন সে 'আমি'কে ত্যাগ করে দেয় এবং 'স্ব'তে স্থিত হয়, তখন সে আর সুখী বা দুঃখী হয় না, সুখ-দুঃখে তার সমবোধ হয়—**'সমদুঃখসুখঃ স্বস্থঃ'** (১৪।২৪)।

যার অন্ত আছে তারই পরিবর্তন হয় কিন্তু যার অন্ত হয় না সেই বস্তুর কোন পরিবর্তন নেই। যেমন সুষুপ্তির সময় 'আমি' ভাব থাকে না, কিন্তু নিজ সত্তার ভাব থাকে যে, 'আমি খুব আরামে ঘুমিয়েছি।' এর তাৎপর্য এই যে, সকল অবস্থাতেই, সকল পরিস্থিতিতেই নিজ সত্তার অখণ্ড অনুভব থাকে, কিন্তু 'আমি' ভাবের অখণ্ড অনুভব হয় না।

যদি কেউ বলে যে জ্ঞান (মুক্তি) হলে শুধু আসুরী সম্পদ্‌যুক্ত অহং (১৬।১৩-১৫) দূরীভূত হয়, অহং সর্বতোভাবে দূর হয় না, সূক্ষ্মরূপে অহং থেকে যায়, তো তাদের কথা ঠিক নয়। কারণ অহং-এর উৎপত্তি হয় অবিদ্যা[1] থেকে এবং জ্ঞান হলে অবিদ্যার নাশ হয়।

---

[1]অবিদ্যাস্মিতরাগদ্বেষাভিনিবেশাঃ ক্লেশাঃ। অবিদ্যা ক্ষেত্রমুত্তরেষাং------ (পাতঞ্জলযোগদর্শন ২।৩-৪)।

অবিদ্যাই যখন থাকে না, তখন অবিদ্যা থেকে উদ্ভূত অহম্ কিভাবে থাকতে পারে ? যে জ্ঞান দ্বারা অবিদ্যা নাশ না হয়, তা কিরূপ জ্ঞান ? সে তো কেবল বাচিক শাস্ত্রজ্ঞান, বাস্তবিক জ্ঞান (বোধ) নয়। দ্বিতীয়তঃ অহং যদি সর্বতোভাবে নাশ না হয়, তবে বীজ থেকে যেমন বিরাট মহীরূপ জন্মায়, তেমনি সূক্ষ্ম অহংও প্রাকৃত পদার্থ, ব্যক্তি ইত্যাদির সঙ্গ পেয়ে বিরাট হয়ে ওঠে, আসুরী সম্পদসম্পন্ন হয়ে ওঠে।

অহং ভোগেচ্ছা এবং মোক্ষপ্রাপ্তির ইচ্ছা এই উভয় ইচ্ছার ওপর টিঁকে থাকে। ভোগেচ্ছা মিটলে মোক্ষপ্রাপ্তির ইচ্ছা পূরণ হয়ে যায় অর্থাৎ চিন্ময়তার প্রাপ্তি ঘটে, যাতে অহং থাকে না, হয় না এবং হবেও না।

(৫৭) গীতায় কর্তৃত্ব-ভোক্তৃত্বের নিষিদ্ধতা

প্রকৃতৌ প্রকৃতেঃ কার্যে ভবন্তি বিবিধাঃ ক্রিয়াঃ।
শরীরবাঙ্মনোভিস্তাঃ প্রকটস্ত্যখিলাঃ সদা ॥
আত্মনি নৈব কর্তৃত্বং ভোক্তৃত্বং নৈব কর্হিচিৎ।
প্রকৃতেরেব সম্বন্ধাত্মন্যতে দ্বে তু পূরুষঃ॥

এক হলেন পরমাত্মা এবং অপরটি হলো তাঁর শক্তি, প্রকৃতি। সেই প্রকৃতিতেই পরিবর্তন হয় এবং সেই প্রকৃতির যিনি আধার, প্রকাশক, আশ্রয়, তাঁর কখনো কিছুমাত্র পরিবর্তন হয় না। প্রকৃতির এই পরিবর্তনকে গীতা কয়েক প্রকারে বর্ণনা করেছে ; যেমন—সমস্ত ক্রিয়াই প্রকৃতির দ্বারা সম্পন্ন হয় (১৩।২৯)। গুণই গুণের দ্বারা প্রবৃত্ত হয় অর্থাৎ সমস্ত ক্রিয়াই প্রকৃতির গুণের দ্বারা হয় (৩।২৭-২৮ ; ১৪।২৩)। ইন্দ্রিয়ই ইন্দ্রিয়গত বিষয়ে প্রবৃত্ত হয় অর্থাৎ সমস্ত ক্রিয়া ইন্দ্রিয়ের দ্বারা সাধিত হয় (৫।৯)। ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা ক্রিয়াদি সুসম্পন্ন হওয়ার কথাও গীতায় কয়েক প্রকারে বলা হয়েছে—কোথাও শরীর, ইন্দ্রিয়াদি, মন এবং বুদ্ধি দ্বারা ক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার কথা বলা আছে (৫।১১), কোনও স্থানে শরীর, কর্তা, করণ, চেষ্টা এবং দৈব (সংস্কারকে)কে ক্রিয়াগুলি সম্পন্ন হওয়ার হেতু বলা হয়েছে (১৮।১৪)। কোন স্থানে শরীর, বাণী এবং মনকে ক্রিয়াগুলি প্রকট করার কারণ বলা হয়েছে এবং কোথাও স্বভাবই তার হেতু বলা হয়েছে (৫।১৪)। প্রকৃতপক্ষে প্রকৃতি, গুণ এবং ইন্দ্রিয়—এই তিনটিই তত্ত্বতঃ এক ; কারণ, প্রকৃতি হচ্ছে মূল, প্রকৃতির কার্য হল গুণ এবং গুণের কার্য ইন্দ্রিয় সকল। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কর্তৃত্ব অর্থাৎ শুধুমাত্র করা প্রকৃতিতে হয়, পরমাত্মার অংশ জীবাত্মা (পুরুষ)তে নয় ; কারণ, কার্য এবং করণ দ্বারা সম্পন্ন ক্রিয়াগুলি উৎপন্ন করায় প্রকৃতিকে হেতু বলে জানানো হয়েছে—**কার্যকরণকর্তৃত্বে হেতুঃ প্রকৃতিরুচ্যতে** (১৩।২০)।

ভোক্তৃত্বতে পুরুষকেই কারণ বলা হয়েছে—**'পুরুষঃ সুখদুঃখানাং ভোক্তৃত্বে হেতুরুচ্যতে'** (১৩।২০)। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে প্রকৃতিস্থ পুরুষই হেতু হয়—**'পুরুষঃ প্রকৃতিস্থো হি ভুঙ্‌ক্তে'** (১৩।২১) অর্থাৎ প্রকৃতিতে স্থিত হওয়ার জন্যই পুরুষ ভোক্তৃত্বের হেতু হয়। যদি পুরুষ (স্বয়ং) প্রকৃতিতে স্থিত না হয়ে নিজ স্বরূপেই স্থিত থাকে তবে সে ভোক্তা হয় না। সেইজন্য ভগবান বলেছেন, 'এই পুরুষ স্বয়ং অনাদি এবং নির্গুণ হওয়ায় অবিনাশী পরমাত্মস্বরূপ, অতএব দেহে বসবাস করেও তিনি কিছুই করেন না বা কর্মফলে লিপ্ত হন না' (১৩।৩১)। এখানে 'করেন না'-এর অর্থ যে এতে তাঁর কর্তৃত্ব ভাব নেই এবং তিনি 'লিপ্ত হন না'-এর অর্থ এতে ভোক্তৃত্ব ভাব নেই।

সেই পুরুষ স্বয়ং যখন কর্মেন্দ্রিয় (শরীরাদি)র সঙ্গে মিশে থাকেন, তখন তিনি কর্তারূপে প্রতিভাত হন আর যখন জ্ঞানেন্দ্রিয় (মন, বাক্যাদি)-এর সঙ্গে মিশে থাকেন, তখন তিনি ভোক্তারূপে পরিচিত হন। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, যখন তিনি কর্মেন্দ্রিয়ের সঙ্গে মেলেন তখন তিনি ভোক্তা নন বা যখন জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সঙ্গে মেশেন তখন তিনি কর্তা নন। আসলে কর্মেন্দ্রিয়ের প্রাধান্যে নিজেকে

কর্তা এবং জ্ঞানেন্দ্রিয়ের প্রাধান্যে তিনি নিজেকে ভোক্তা বলে মনে করেন। বোধ (তত্ত্বজ্ঞান) না হওয়া পর্যন্ত এই কর্তৃত্ব-ভোক্তৃত্বের বোধের প্রভাব থেকে যায়।

ভোক্তা, ভোগ্যবস্তু এবং ভোগরূপী ক্রিয়া—এই তিনটিতে কারণ-রূপ প্রকৃতিগত ঐক্য হয়ে থাকে। ভোক্তার মধ্যে প্রকৃতির যে অংশ বিদ্যমান, তাই ভোগ্য বস্তু এবং ভোগরূপী ক্রিয়ার সঙ্গে এক হয়ে থাকে। সেই প্রকৃতির অংশের সঙ্গে একাত্ম হলে, তার সঙ্গে মিলে-মিশে গেলে এই পুরুষ (চেতন) ভোক্তারূপে প্রতিভাত হন। ভোক্তা হলেও ভোগের যে আকর্ষণ তাঁর মধ্যে সৃষ্টি হয়, তা আসলে প্রকৃতির অংশেই হয় ; কিন্তু শরীরের সঙ্গে তাদাত্ম্য হওয়ার জন্য সেই পুরুষ প্রকৃতি-অংশের আকর্ষণকে নিজের আকর্ষণ বলে মনে করে নেন। তিনি যদি বিবেক-বোধ দ্বারা অনুভব করেন যে, এই আকর্ষণ জড় প্রকৃতির অংশেই হচ্ছে, স্বরূপের নয়, তাহলে তিনি পরমাত্মতত্ত্ব প্রাপ্ত হন। সেইজন্য ভগবান বলেছেন যে, বিচারশীল মানুষ যখন গুণ ভিন্ন অন্য কাউকে কর্তা দেখেন না এবং নিজেকে গুণগুলির অতীত বলে অনুভব করেন, তখন তিনি আমার স্বরূপ প্রাপ্ত হন (১৪।১৯)। কেন প্রাপ্ত হন ? কারণ, তিনি স্বয়ং স্বাভাবিকভাবে গুণগুলিতে নির্লিপ্ত (১৩।৩১)। অর্থাৎ পুরুষ যে জড়-অংশের সঙ্গে একাত্মবোধে নিজেকে ভোক্তা বলে মনে করেন, সেই জড়-অংশে ভোগরূপী ক্রিয়াও থাকে। সুতরাং ভোক্তাও জড়-অংশ রূপেই প্রতিভাত হয়। ভোগরূপী ক্রিয়াও জড়-অংশেতেই হয়, ভোগের সামর্থ্যও জড়-অংশে স্থিত ও ভোগ্য পদার্থও জড় প্রকৃতির কার্য। সেইজন্য ভোক্তা, ভোগরূপী ক্রিয়া, ভোগের সামর্থ্য এবং ভোগ্য পদার্থ সমস্তই প্রকৃতির (১৩।৩০)। ভোগ করার সময় পুরুষের মধ্যে কোন বিকারও হয় না (১৩।৩১) ; কিন্তু তাদাত্ম্যর জন্য পুরুষ নিজের মধ্যে অহংভাব আরোপ করে অর্থাৎ 'আমি সুখী বা আমি দুঃখী'—এইরূপ মনে করে। সেইজন্যই নিজেকে জড়-অংশীভূত মনে করায় ভোক্তার ভোগে আকর্ষণ হয়, নাহলে স্বরূপ-চেতনের ভোগাদিতে আকর্ষণ হতেই পারে না।

ভগবান গুণগুলিকে কর্তা বলেছেন, সেই কর্তার মধ্যে ভোক্তৃত্বও লিপ্ত থাকে, কারণ ভোগ ক্রিয়াগত-ই হয় (৫।৮-৯)। ক্রিয়া ছাড়া ভোগ সম্ভব হয় না, এর দ্বারাও প্রমাণিত হয় যে, স্বরূপে কর্তৃত্ব এবং ভোক্তৃত্ব-দুই এর কোনটাই নেই।

কর্তৃত্ব বোধের সঙ্গেই ভোক্তৃত্ব আসে অর্থাৎ যে কর্তা সেই ভোক্তা রূপে প্রতিভাত হয়। কারণ স্বয়ং কোনো প্রয়োজনে, ফলের ইচ্ছায় কর্ম করতে প্রবৃত্ত হয় অর্থাৎ ভোক্তৃত্ব ভাব রাখার জন্য একে কর্তা বলা হয় । সুতরাং কর্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্ব দুটি আলাদা বস্তু নয়, দুটি আসলে একই[1]। সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখতে গেলে কর্তৃত্বের মধ্যে স্থূলতা ও ভোক্তৃত্বের মধ্যে সূক্ষ্মতা পরিলক্ষিত হয়, কিন্তু তাত্ত্বিক দৃষ্টিতে দুটি একই ; কারণ দুটিই প্রকৃতির সম্বন্ধ থেকে হয়। অতএব কর্তৃত্ব দূর হলে ভোক্তৃত্ব থাকে না এবং ভোক্তৃত্ব না থাকলে কর্তৃত্বও চলে যায়।

জিজ্ঞাসা—গীতায় আছে যে সাধক 'আমি কিছুই করি না'—এরূপ যেন মনে করেন (৫।৮) ; যাতে 'আমি কর্তা' এই ভাব নেই (১৮।১৭) ইত্যাদি। যদি স্বরূপের কর্তৃত্ব না থাকে তাহলে 'আমি কিছু করি না' ; 'যার অহং ভাব নেই'—এরূপ বলার (স্বরূপে কর্তৃত্বের নিষেধ করার) প্রয়োজনই থাকে না। কারণ কোন জিনিস প্রাপ্তির প্রশ্ন থাকলে তবেই তা নিষেধ করা যেতে পারে। '**প্রাপ্তৌ, সত্যাং নিষেধঃ**'। যেখানে প্রাপ্তিই নেই, সেখানে নিষেধ করার ব্যাপারই আসে না। তাই উপরিউক্ত বাক্য দ্বারা কর্তৃত্ব নিষিদ্ধ করায় প্রমাণিত হয় যে, স্বরূপে কর্তৃত্ব থাকে। অতএব কর্তৃত্ব শুধু প্রকৃতিতে আছে স্বরূপে (চেতনে) নেই এরূপ বলার তাৎপর্য কি ?

সমাধান—প্রকৃতপক্ষে ক্রিয়ামাত্রই প্রকৃতিতে হয়, কিন্তু 'আমি কর্ম করি'—এই কর্তৃত্বের ভাব স্বরূপে থাকে অর্থাৎ স্বরূপ নিজের মধ্যে কর্তৃত্বকে মেনে নেয় ; কারণ মানা বা না মানা চেতনে (স্বরূপ)-ই হয়, জড় প্রকৃতির (শরীরে) মধ্যে নয়। স্বয়ং নিজের মধ্যে কর্তৃত্বের ভাব আরোপিত করে, সেজন্যই সে ভোক্তা হওয়ার হেতু হয়।

[1]নিজের মধ্যে কর্তা ভাব না রেখেও ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হয় কিন্তু নিজেকে সুখী বা দুঃখী বলে মনে না করলে ভোক্তৃত্ব প্রমাণিত হয় না।

স্বরূপে যদি কর্তৃত্বের ভাব না থাকে, তাহলে 'পুরুষ ভোক্তৃত্বের হেতু হয়' (১৩।২০)—এ বলা যায় না। যতক্ষণ স্বরূপের প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্ক থাকে, ততক্ষণ কর্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্বের ভাব স্বরূপেই থাকে। সুতরাং কর্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্বের ভাব প্রকৃতির সংস্পর্শে আসাতেই স্বয়ং-এর মধ্যে হয় (৩।২৭)। যদি প্রকৃতি থেকে সর্বতোভাবে সম্পর্ক বিচ্ছেদ হয়, তাহলেই এই কর্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্বের ভাবনা চলে যায় এবং স্বরূপ শরীরে স্থিত হয়েও কিছুই করে না বা কোন কর্মফলে লিপ্ত হয় না (১৩।৩১)।

ভগবান গীতায় এই জীবাত্মাকে পরা (চেতন) প্রকৃতি এবং জগৎ-সংসারকে অপরা (জড়) প্রকৃতি বলেছেন। এই পরা ও অপরা সংযোগেই সমস্ত প্রাণীজগৎ উৎপন্ন হয়। এইসব প্রাণী মনুষ্যলোকের, স্বর্গলোকের, নরকের বা চৌরাশী লক্ষ যোনির বা ভূত-পিশাচ আদি যাই হোক তা সমস্তই পরা-অপরা সম্বন্ধ থেকে উদ্ভূত (৭।৬)। এই কথাই ত্রয়োদশ অধ্যায়ের ছাব্বিশ সংখ্যক শ্লোকে বলা হয়েছে যে, স্থাবর-জঙ্গম যত প্রাণী উৎপন্ন হয় তা সমস্তই ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের সংযোগেই হয়। সংযোগ করার, সম্বন্ধ মানার যোগ্যতা সামর্থ্য চেতনের দ্বারাই হয়, জড় প্রকৃতিতে নয়। সম্বন্ধকে স্বীকার করায় অথবা না করায়, মানায় বা না মানায় স্বরূপ (স্বয়ং) সর্বতোভাবে স্বাধীন। যখন সেই স্বরূপ অবিবেকপূর্বক প্রকৃতি ও তার কার্যরূপ শরীরের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে, তখন তার মধ্যে অভাব অনুভূত হয়। বিবাহের পরে কখনও যখন কারও স্ত্রীর বস্ত্র, অলংকারাদির অভাব হয়, তখন তা সেই ব্যক্তির নিজস্ব অভাব বলে মনে হয় ; তেমনি স্বরূপ (স্বয়ং) শরীরের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করলে শরীরের যে কোন অভাবই তার নিজের বলে মনে করে। সেই অভাব পূরণ করার জন্য সে নিজ দেহ ও ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা কামনা-বাসনাপূর্বক যে চেষ্টা করে, তাতে তার কর্তৃত্ব ভাব হয়, অর্থাৎ তার মধ্যে 'আমি কর্ম করি'—এইভাব এসে যায়। কিন্তু তার মধ্যে কর্তৃত্ব-ভাব এলেও ক্রিয়া, পদার্থ, বস্তু ইত্যাদি রূপে প্রকৃতিই পরিণতি লাভ করে। এর অর্থ হলো ক্রিয়ামাত্রই প্রকৃতির দ্বারা তথা প্রকৃতিতে অনুষ্ঠিত হয় (১৩।৩০)। স্বরূপে কখনো কোন ক্রিয়া হয়ই না, কারণ সে সর্বতোভাবে নির্লিপ্ত এবং আসক্তিবিহীন। তার অনাসক্তি কখনও দূর হয় না, যেমন তেমনই থাকে (১৩।৩১)।

পুরুষ যখন প্রকৃতির সঙ্গে সম্বন্ধ মেনে নেয় তখন সে নিজের মধ্যে অভাব অনুভব করে এবং তা পূর্তির চেষ্টা করে ; সেই চেষ্টা অর্থাৎ কর্মের পূর্তি-অপূর্তি, সিদ্ধি-অসিদ্ধি এবং ফলের প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তি ঘটে। যখন কর্মের পূর্তি, সিদ্ধি এবং ফলের প্রাপ্তি লাভ হয়, তখন তার সুখ অনুভূত হয় এবং দেহধারণকারী নিজেকে সুখী বলে মনে করে। কিন্তু যখন কর্মের অপূর্তি, অসিদ্ধি এবং ফলের অপ্রাপ্তি ঘটে, তখন সে দুঃখ পায় এবং নিজেকে দুঃখী বলে মনে করে। এইভাবে সুখ-দুঃখের অনুভব করাতে, নিজেকে সুখী বা দুঃখী বলে মনে করলে এই পুরুষ সুখ-দুঃখের ভোক্তারূপে প্রতিভাত হয় (১৩।২১)। ভোক্তা হলে অর্থাৎ নিজেকে ভোক্তা বলে মেনে নিলেও ভোগরূপী ক্রিয়া প্রকৃতিতেই হয়, স্বরূপে নয়।

কর্তৃত্ব এবং ভোক্তৃত্বতে ক্রিয়ার যে অংশ তা প্রকৃতির অংশ ; কারণ 'করা' ও 'ভোগ' করা রূপ ক্রিয়া প্রকৃতিতে হয়। কিন্তু প্রকৃতি ও শরীরের সঙ্গে তাদাত্ম্যতার জন্য পুরুষ নিজের মধ্যে কর্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্ব-ভাব স্বীকার করে এবং সেইজন্যই সে নিজের মধ্যে প্রাকৃত পদার্থের আকর্ষণ অনুভব করে। যখন বিবেক-বোধ জাগরিত হয়ে পুরুষ এই প্রকৃতির সঙ্গে তার পৃথকত্ব অনুভব করে, তখন তার আর কর্তৃত্ব-ভোক্তৃত্ব-ভাব থাকে না। তখন সে আর সুখী বা দুঃখী হয় না ; কারণ শুদ্ধস্বরূপে সুখ বা দুঃখ বলে কিছু থাকেই না। স্বরূপের সুখ বলে কিছু থাকলে সে কখনো দুঃখী হোত না এবং দুঃখ থাকলে কখনো সুখী হোত না। সুখ এবং দুঃখ আসে ও যায়, কিন্তু স্বয়ং যেমন তেমনি থাকে। সুখ এবং দুঃখের অবস্থার পরিবর্তন হয়, কিন্তু স্বয়ং (স্বরূপ) অপরিবর্তনীয় থাকে। কর্তৃত্ব-ভোক্তৃত্ব ভাবও বদলায় কিন্তু স্বরূপের কখনো পরিবর্তন হয় না। স্বরূপ সমানভাবে দুই-এর প্রকাশক।

বাস্তবিক সত্য ও সর্বানুভূত ব্যাপার এই যে, যে ব্যক্তি লেখাপড়া করে, তারই পড়ার অভাব অনুভূত হতে পারে কিন্তু যে ব্যক্তি নিরক্ষর তার লেখাপড়াগত অভাববোধ অনুভবেই আসে না। যে ধন, মান, প্রতিষ্ঠা ইত্যাদির সংস্পর্শে এসেছে, সে-ই পারে এসবের অভাব অনুভব করতে। কিন্তু যে ব্যক্তি ধন-মান ইত্যাদি স্বীকার করে না, তার এইসবে কিছু যায় আসে না। এইরূপ এই স্বরূপ যখন দেহ, পরিবার, ধন, মান, প্রতিষ্ঠা ইত্যাদির সঙ্গে

নিজ সম্পর্ক স্থাপন করে তখন তার অভাবের অনুভূতি আসে। সে যেভাবে শরীরের সঙ্গে একাত্ম হয়, তদনুসারে তার অভাবের অনুভূতি বাড়তে থাকে। সেই অভাবপূর্তির জন্য সে তখন কর্ম করে, একেই কর্তৃত্ব বলে এবং ঐ কর্মের পূর্তি বা অপূর্তিতে সুখী বা দুঃখী হওয়াকেই বলা হয় ভোক্তৃত্ব। এর তাৎপর্য হচ্ছে এই যে, কর্তৃত্ব বা ভোক্তৃত্ব স্বরূপেও নেই এবং প্রকৃতিতেও নেই। চেতন প্রকৃতির (শরীরের) সম্বন্ধ মেনে নেয় এবং এই সূত্রেই কর্তৃত্ব-ভোক্তৃত্ব বিরাজ করে (৫।১৪)।

শরীরের সঙ্গে নিজের সম্বন্ধ মানার কারণ কি ? এর মূল কারণ হচ্ছে অজ্ঞান। জ্ঞানের অভাবে অজ্ঞান নয়, অসম্পূর্ণ জ্ঞানকেই অজ্ঞান বলা হয়। তাৎপর্য হচ্ছে এই যে, নিজের জানা বিষয়ে গুরুত্ব না দেওয়াই অজ্ঞান। যেমন, মানুষ এ বিষয়ে অবহিত যে, 'আমি শরীর নই এবং এ শরীরও আমার নয়', তা সত্ত্বেও সে শরীরকে 'আমি' এবং 'আমার' বলে মনে করে, একেই অজ্ঞান বলে। যে বস্তু উৎপন্ন হয়, তার নাশ হবেই—এটাই নিয়ম ; সুতরাং শরীর যখন উৎপন্ন হয়েছে তার নাশ হবেই (মরবেই), এ কথা সকলেই জানে, তবুও 'আমার শরীর ঠিক থাক, যেন নষ্ট না হয়'—এই ইচ্ছা পোষণ করার নামই অজ্ঞান।

এই অজ্ঞান কবে থেকে এলো ? যখন থেকে পুরুষ নিজ বিবেকের অনাদর করতে আরম্ভ করলো, বিবেকের অবহেলা করতে আরম্ভ করল, তখন থেকে তার এই অজ্ঞানতা। এর তাৎপর্য এই যে প্রকৃতিতেই সব ক্রিয়া ঘটে থাকে, তবুও পুরুষ তাকে নিজের বলে মনে করে, এইভাবেই অজ্ঞানতার শুরু।

কর্তৃত্ব-ভোক্তৃত্ব নিজের মধ্যে নেই, এটি মেনে নেওয়া হয়েছে, সেইজন্যই এটি নাশ হয়। কর্তৃত্ব-ভোক্তৃত্ব যদি স্বরূপের হতো, তবে তার কখনো নাশ হোত না—**'নাভাবো বিদ্যতে সতঃ'** (২।১৬), নষ্ট সেই জিনিসই হয়, যার প্রকৃতপক্ষে অস্তিত্ব নেই।

ত্রয়োদশ অধ্যায়ের একুশ সংখ্যক শ্লোকে পুরুষকে 'প্রকৃতিস্থ' এবং একত্রিশ সংখ্যক শ্লোকে পুরুষকে 'শরীরস্থ' বলা হয়েছে। এর তাৎপর্য এই যে, যিনি শরীরের সঙ্গে নিজ সম্পর্ক মেনে নিয়েছেন বা তাদাত্ম্য বোধ করেছেন, তিনি সমস্ত প্রকৃতি এবং প্রকৃতির কার্য সংসার-জগতের সঙ্গেই সম্পর্ক স্থাপন করেছেন। যেমন, মানুষ যখন কোন একটি মহিলাকে বিবাহ করে, তখন মহিলার পরিবারের সকল মানুষের সঙ্গেই সেই ব্যক্তিটির সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। তেমনি স্বরূপ পুরুষ কোন একটি দেহের সঙ্গে সম্পর্ক করলে তার প্রকৃতি এবং সমস্ত জগতের সঙ্গেই সম্পর্ক স্থাপিত হয়। প্রকৃতির সঙ্গে সম্বন্ধ যুক্ত হলে সে সকল গুণ ও সুখ-দুঃখের ভোক্তা হয় (১৩।২০) অর্থাৎ সুখী ও দুঃখী হয়।

প্রকৃতপক্ষে স্বরূপের সুখ বা দুঃখ নেই। সে সুখ-দুঃখের ঊর্ধ্বে, আনন্দস্বরূপ। কিন্তু যখন সে এই প্রকৃতির সঙ্গে নিজেকে এক বলে মনে করে, তখন সে অনুকূল পরিস্থিতিতে 'আমি সুখী' এবং প্রতিকূল পরিস্থিতিতে 'আমি দুঃখী' এরূপ অনুভব করে[১]। যখন এই স্বরূপ প্রকৃতির সঙ্গে সম্বন্ধ-বিচ্ছেদ করে নিজ স্বরূপে স্থিত হয়, তখন সে সুখ-দুঃখে সমত্ব লাভ করে। তখন পরিচ্ছিন্ন অহং, যাকে **'অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্তাহমিতি মন্যতে'** পদের দ্বারা (৩।২৭) বলা হয়েছে, তা দূর হয় এবং তার বুদ্ধি সাম্যাবস্থায় স্থিত হয়ে যায়, মন নির্বিকল্প হয়, ইন্দ্রিয় নির্বিষয় হয় অর্থাৎ তার মধ্যে রাগ-দ্বেষ থাকে না এবং স্থূল-শরীরের প্রতি 'আমি' এবং 'আমার' ভাব দূরীভূত হয়। এইরূপ মহাপুরুষগণ সংসার জয় করেন অর্থাৎ সাংসারিক সংযোগ-বিয়োগের ঊর্ধ্বে চলে যান। কারণ, তিনি নিজ স্বরূপে স্থিতি লাভ করেছেন। প্রকৃতপক্ষে তিনি স্বরূপে স্থিত হলেন তা নয়, আসলে তিনি তো সর্বদাই স্বরূপে স্থিত। যখন তিনি দেহাদির মধ্যে নিজ স্থিতি মেনে রেখেছিলেন তখনও তিনি শরীরে স্থিত ছিলেন না, সেইসময়ও তিনি কর্তৃত্ব-ভোক্তৃত্ব রহিতরূপে বিরাজিত ছিলেন—**'শরীরস্থোঽপি কৌন্তেয় ন করোতি ন লিপ্যতে'** (১৩।৩১) অর্থাৎ স্বরূপের কর্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব বলে কিছু

---

[১]প্রকৃতির স্বরূপ হল—ক্রিয়া এবং পদার্থ অর্থাৎ প্রকৃতিই ক্রিয়া এবং পদার্থরূপে প্রকটিত হয়। ক্রিয়া এবং পদার্থের সংযোগে যে সুখ হয়, তাকে 'ভোগ' বলে, যোগ নয়। কিন্তু পরমাত্মার সম্পর্ক থেকে যে সুখ হয় তাকে 'যোগ' বলে, ভোগ নয়। অতএব এই সুখে ভোক্তা থাকে না।

নেই। যদি প্রকৃতপক্ষে তিনি কর্তা বা ভোক্তা হতেন, তাহলে ভগবান কি করে বলেন, **'ন করোতি ন লিপ্যতে'** ? যদি তাঁর তিনগুণের সঙ্গে একত্ব ঘটত, তাহলে ভগবান **'নিস্ত্রৈগুণ্যো ভব'** (২।৪৫) কথাটির দ্বারা কিভাবে ত্রিগুণরহিত হওয়ার আদেশ দেন ? নিষেধ তারই হতে পারে যা প্রকৃতপক্ষে হয় না।

জ্ঞানযোগী সাধক 'প্রকৃতিজাত গুণই গুণের মধ্যে প্রবর্তিত হচ্ছে'—এইরূপ মনে করে নিজেকে ঐ ক্রিয়াসমূহের কর্তা বলে মনে করেন না (৫।৮-৯ ; ১৩।২৯), সুতরাং তাঁর কর্তৃত্ব-ভোক্তৃত্ব দূর হয়।

কর্মযোগী সাধক শুধু যজ্ঞ-পরম্পরা বা কর্তব্য-কর্ম পরম্পরা সুরক্ষিত রাখবার জন্যই কর্ম করে থাকেন। কেবল অপরের কল্যাণের নিমিত্ত কর্তব্য-কর্ম অনুষ্ঠিত করায় তাঁর কর্তৃত্ব কর্তব্য-কর্মের সঙ্গে সঙ্গে অপরের সেবায় নিয়োজিত হয়, তখন শুধু সেবাই থেকে যায়, সেবক থাকে না। সুতরাং তাঁর কর্তৃত্ব থাকে না। এইভাবেই কর্মযোগী ফলেচ্ছা কামনা ও আসক্তি-রহিত হয়ে তৎপরতাপূর্বক নিজ কর্তব্য পালন করেন (২।৫১)। ফলেচ্ছা না থাকায় তাঁর ভোক্তৃত্বও থাকে না। অর্থাৎ অন্যের কল্যাণের জন্য কর্ম করলে কর্তৃত্ব এবং ফলেচ্ছা না থাকায় তাঁর ভোক্তৃত্ব দূরীভূত হয় (৪।২০)।

ভক্তিযোগী সাধক শরীর-ইন্দ্রিয়-মন-বুদ্ধিসহ নিজেকেও ভগবানে অর্পণ করেন (১৮।৬৬)। তাঁর দ্বারা যা কিছু ক্রিয়া হয়, সবই ভগবানের করানো ; সুতরাং তাঁর কর্তৃত্ব থাকে না। তিনি বস্তু-ব্যক্তি ইত্যাদি সংসারের পদার্থমাত্রকেই ভগবানের বলে মনে করেন (৫।২৯) ; সুতরাং তাঁর ভোক্তৃত্বও থাকে না।

(৫৮) গীতায় গুণসমূহের বর্ণনা

গুণবর্ণনতাৎপর্যং গ্রহণত্যাগয়োর্মতম্।
সত্ত্বং গ্রাহ্যং রজস্ত্যাজ্যং ত্যজনীয়ং তমঃ সদা॥

দ্বিতীয় অধ্যায়ের একাদশ থেকে ত্রিশতম শ্লোক পর্যন্ত ভগবান সৎ-এর মহিমা জানাবার জন্য এবং অসৎ থেকে পৃথক থাকার জন্য সৎ-অসৎ-এর বর্ণনা করেছেন। এইরূপ দ্বিতীয় অধ্যায়ের উনচল্লিশ সংখ্যক থেকে তিপ্পান্ন সংখ্যক শ্লোক পর্যন্ত ভগবান নিষ্কামভাবের মহিমা জানিয়েছেন এবং কামনা পরিত্যাগ করার নিমিত্ত একনিশ্চয়াত্মিকা বা নিষ্কাম ও অনিশ্চয়াত্মিকা বা সকাম মানুষের বর্ণনা করেছেন। বেদে বর্ণিত ভোগ এবং ঐশ্বর্য প্রাপ্ত হওয়ার জন্য যারা উৎসাহী, তারা অব্যবসায়ী বা অনিশ্চয়যুক্ত। বেদের যে খণ্ডে ভোগ ও ঐশ্বর্যের বর্ণনা আছে তাকে **'ত্রৈগুণ্যবিষয়াঃ'** (২।৪৫) বলা হয়েছে। সেই ভোগ এবং ঐশ্বর্য থেকে সরিয়ে অর্জুনকে নিষ্কাম করার উদ্দেশ্যে ভগবান বলেছেন যে, 'হে অর্জুন, তুমি তিনগুণের কার্যরূপ সংসার থেকে অর্থাৎ ভোগ ও ঐশ্বর্য থেকে দূরে থাক'—**'নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জুন'** (২।৪৫)।

প্রকৃতির গুণে বশীভূত প্রাণীদের দ্বারা প্রকৃতি-কেন্দ্রিক গুণ কার্য করিয়ে নেয় ফলে তাদের ক্রিয়া করতেই হয়, অর্থাৎ তারা কর্ম না করে থাকতেই পারে না—**'কার্যতে হ্যবশঃ কর্ম সর্বঃ প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ'** (৩।৫)।

প্রকৃতির গুণগুলির দ্বারাই ক্রিয়াসকল অনুষ্ঠিত হয় —**'প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্মাণি সর্বশঃ'** (৩।২৭) অর্থাৎ স্বরূপের (স্বয়ং-এর) এইসব ক্রিয়ার সঙ্গে কোনপ্রকার সম্পর্ক নেই। কিন্তু অহংকারে মোহিত অন্তঃকরণ-যুক্ত মানুষ নিজেকে কর্তা বলে মনে করে ; সুতরাং সে বদ্ধ হয়ে যায়। গুণ ও কর্মের বিভাগগুলি[১]

[১]গুণের কার্য হওয়ায় শরীর-ইন্দ্রিয়-মন-বুদ্ধি সব 'গুণ-বিভাগ' এবং শরীরাদিতে যে ক্রিয়াসকল হয় তা 'কর্ম-বিভাগ' রূপে অভিহিত হয়।

যাঁরা জানেন, তাঁরা 'গুণই গুণগুলিতে প্রবর্তিত হয়'—**'গুণা গুণেষু বর্তন্তে'** (৩।২৮) অর্থাৎ সমস্ত পরিবর্তনগুলি গুণেই হতে থাকে, ক্রিয়া এবং কর্তৃত্ব কেবল গুণেই হয়, নিজের মধ্যে নয়—এরূপ জেনে তাতে আসক্ত হন না। সুতরাং তাঁরা বন্ধনমুক্ত হয়ে যান। কিন্তু যে সমস্ত মানুষ এই গুণগুলিতে মোহিত হন, তাঁরা আসক্ত হওয়ায় বদ্ধ হন—**'প্রকৃতের্গুণসংমূঢ়াঃ সজ্জন্তে গুণকর্মসু'** (৩।২৯)।

তৃতীয় অধ্যায়ের পঁয়ত্রিশ সংখ্যক শ্লোকের **'বিগুণঃ'** শব্দ সত্ত্ব, রজ এবং তম—এই তিন গুণ রহিত হওয়ার অর্থ বহন করে না, তা আসলে সদ্‌গুণ-সদাচারের অভাবের বাচক।

চতুর্থ অধ্যায়ের ত্রয়োদশ শ্লোকে সৃষ্টি-রচনার সময়ের বর্ণনা করতে গিয়ে ভগবান বলছেন যে, পূর্বে প্রাণীদের গুণ, স্বভাব যেরূপ ছিল এবং তাদের যেমন কর্ম ছিল, সেই অনুযায়ী আমি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এই চার বর্ণের বিভাগ করেছি—**'চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্মবিভাগশঃ'** (৪।১৩)। 'কিন্তু আমি এই রচনারূপ কর্মে সর্বতোভাবে নির্লিপ্ত থাকি। মানুষেরও সেইরূপ সমস্ত কাজ করার সময় নির্লিপ্ত থাকা উচিত।'

সপ্তম অধ্যায়ের দ্বাদশ শ্লোকে ভগবান বলেছেন যে, সংসারে সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক যত ভাব আছে, তা সমস্তই আমা-হতে উদ্ভূত, কিন্তু এগুলি আমাতে বা আমি তাদের মধ্যে নই অর্থাৎ সমস্ত কিছুই আমি। কারণ আমি ছাড়া গুণগুলির স্বতন্ত্র সত্তা হয়ই না। সুতরাং সাধকের দৃষ্টি আমার দিকেই থাকা উচিত, গুণগুলির দিকে নয়। যাদের দৃষ্টি গুণগুলির দিকে থাকে, তারা সাত্ত্বিক, রাজসিক এবং তামসিক ভাবে বিমুগ্ধ হয় এবং তাতেই আবদ্ধ হয়ে থাকে। সুতরাং তারা গুণাতীত আমাকে জানতে পারে না (৭।১৩)। আমার এই গুণময়ী মায়া অতিক্রম করা বড়ই দুস্তর—**'দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া'**(৭।১৪)। কিন্তু যে কেবল আমার শরণাগত, আমার আশ্রিত, সে মায়াকে অতিক্রম করে যায়—**'মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে'** (৭।১৪)। অর্থাৎ যে মানুষ এই গুণগুলি হতে সর্বতোভাবে বিমুখ হয়ে কেবল আমার শরণাগত হয়, সে এই গুণগুলিকে অতিক্রম করে।

ত্রয়োদশ অধ্যায়ের চোদ্দ সংখ্যক শ্লোকে **'সর্বেন্দ্রিয়গুণা- ভাসম্'** পদ দ্বারা 'সর্বেন্দ্রিয়গুণ' শব্দ ইন্দ্রিয়গুলির পাঁচটি বিষয় (শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধ)-এর বাচক। এই ইন্দ্রিয়গুলি এবং তার বিষয়গুলিকে জ্ঞেয়তত্ত্ব পরমাত্মাই প্রকাশিত করেন। এই জ্ঞেয়তত্ত্ব সত্ত্ব, রজ, তম—এই তিনটি গুণরহিতও বটে, আবার তিনটিগুণের ভোক্তাও অর্থাৎ এই তত্ত্ব নির্গুণ এবং সগুণও—**'নির্গুণং গুণভোক্তৃ চ'**।

ত্রয়োদশ অধ্যায়ের উনিশ সংখ্যক শ্লোকে প্রকৃতি (ক্ষেত্র) এবং পুরুষ (ক্ষেত্রজ্ঞ)-এর বর্ণনা করতে গিয়ে ভগবান বলেছেন যে, প্রকৃতি এবং পুরুষ এই দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য আছে অর্থাৎ প্রকৃতির থেকে পুরুষ (চেতন) পৃথক্। সেই প্রকৃতিতেই বিকার, গুণ এবং কার্য ও কারণের দ্বারা অনুষ্ঠিত ক্রিয়াগুলি সম্পন্ন হয়। সুতরাং এই তিনের কোনটির সঙ্গেই (চেতন) পুরুষের সম্বন্ধ নেই। কিন্তু পুরুষ যখন প্রকৃতিতে স্থিত হয়, প্রকৃতির সঙ্গে তাদাত্ম্য করে, তখন সে (প্রকৃতিস্থ পুরুষ) প্রকৃতির গুণগুলির ভোক্তা হয়ে ওঠে। এই গুণগুলির ভোক্তা হওয়ায়, গুণগুলির সঙ্গ করায় তার উচ্চ-নীচ যোনিতে গমনের কারণ হয়ে যায় (১৩।১৯-২১)। কিন্তু যে ব্যক্তি নিজেকে এবং গুণসহ প্রকৃতিকে পৃথক্‌ভাবে জানে অর্থাৎ প্রকৃতির সঙ্গে নিজের কোন সম্পর্ক নেই—এই বাস্তবিকতা অনুভব করে নেয়, সে মুক্ত হয়ে যায় (১৩।২৩)। এর তাৎপর্য এই যে, জীবের প্রকৃতির সঙ্গে সম্বন্ধ নেই এবং প্রকৃতিজাত গুণের সঙ্গেও তার সম্বন্ধ নেই।

গুণ হল প্রকৃতিজাত, জীব (স্বয়ং) গুণরহিত—এই কথা জানাবার জন্য ভগবান ত্রয়োদশ অধ্যায়ের একত্রিশ সংখ্যক শ্লোকে জীবকে 'নির্গুণ' বলেছেন।

ত্রয়োদশ অধ্যায়ে গুণগুলির সংক্ষেপে বর্ণনা করা হয়েছে। সেইজন্য চতুর্দশ অধ্যায়ে এগুলি বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করার উদ্দেশ্যে ভগবান বলেছেন যে সত্ত্ব, রজ ও তম—এই তিনটি গুণ প্রকৃতি থেকে উদ্ভূত (১৪।৫)। এর মধ্যে সত্ত্বগুণের স্বরূপ নির্মল, প্রকাশক এবং নির্দোষ, রজোগুণের স্বরূপ রাগাত্মক এবং তমোগুণের স্বরূপ মোহাত্মক (ভ্রান্তিজনক)। সত্ত্বগুণ সুখ তথা জ্ঞানের দ্বারা, রজোগুণ কর্মের আসক্তিতে এবং তমোগুণ নিদ্রা,

আলস্য তথা প্রমাদ দ্বারা জীবকে আবদ্ধ করে (১৪।৬-৮)। সত্ত্বগুণ সুখে ও রজোগুণ কর্মে লিপ্ত করে জীবকে আবদ্ধ করে এবং তমোগুণ জ্ঞান আবৃত করে প্রমাদ উৎপন্ন করে মানুষের ওপর প্রভাব ফেলে। এই তিন গুণের একটি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হলে অন্য দুটি দুর্বল হয়। রজোগুণ ও তমোগুণকে অভিভূত করে সত্ত্বগুণ প্রবল হয়, সত্ত্বগুণ ও তমোগুণকে অভিভূত করে রজোগুণ প্রবল হয় আবার সত্ত্বগুণ ও রজোগুণকে অভিভূত করে তমোগুণ প্রবল হয় (১৪।৯-১০)।

ইন্দ্রিয়াদিতে প্রকাশ উদ্ভাসিত হলে এবং বুদ্ধিতে বিবেক বোধ জাগ্রত হলে বুঝতে হবে এ সত্ত্বগুণের লক্ষণ। অন্তঃকরণে লোভ, কর্মে প্রবৃত্তি, নতুন কর্ম শুরু, শান্তির অভাব এবং স্পৃহা উৎপন্ন হওয়া—এ সবই রজোগুণ বৃদ্ধির লক্ষণ। অন্তঃকরণে অপ্রকাশ বা অন্ধকার, অনুদ্যম (আলস্য), প্রমাদ (বিস্মৃতি) এবং মোহ উৎপন্ন—এ সবই তমোগুণ বৃদ্ধির লক্ষণ (১৪।১১-১৩)।

মৃত্যুর সময় সত্ত্বগুণের তৎকালীন বৃত্তি বৃদ্ধি পেলে জীব স্বর্গাদি উচ্চলোকে গমন করে, রজোগুণের মৃত্যুকালীন বৃত্তির বৃদ্ধিতে জীব পৃথিবীতে মানুষ রূপে জন্ম নেয় এবং তমোগুণের তৎকালীন বৃত্তির বৃদ্ধিতে জীব পশু, পক্ষী ইত্যাদি মূঢ় যোনিতে জন্মগ্রহণ করে (১৪।১৪-১৫)।

শ্রেষ্ঠ কর্মের ফল সাত্ত্বিক তথা নির্মল হয়, রাজসিক কর্মের ফল দুঃখ এবং তামসিক কর্মের ফল হয় অজ্ঞান (মূঢ়তা) (১৪।১৬)। সত্ত্বগুণ থেকে জ্ঞান, রজোগুণ থেকে লোভ এবং তমোগুণ থেকে প্রমাদ, মোহ ও অজ্ঞান উৎপন্ন হয় (১৪।১৭)। সত্ত্বগুণে স্থিত ব্যক্তি ঊর্ধ্বলোকে, রজোগুণে স্থিত ব্যক্তি মনুষ্যলোকে (মধ্যলোকে) এবং তমোগুণে স্থিত ব্যক্তি অধোগামী (পশুযোনি)তে যায় (১৪।১৮)।

বিচারশীল ব্যক্তি যখন এই তিনটি গুণ ভিন্ন অন্য কাউকে কর্তা বলে মনে করে না অর্থাৎ সমস্ত ক্রিয়া এবং পরিবর্তন গুণগুলি দ্বারাই হয়—এইরূপ বোধ দৃঢ়রূপে হয়, তখন তার অকর্তৃত্ব, অসঙ্গ এবং নির্লিপ্ততার অনুভব হয়ে ভগবৎভাব প্রাপ্তি ঘটে (১৪।১৯)। দেহের উৎপাদক এই তিনগুণকে অতিক্রম করে, জন্মমৃত্যুরহিত মানুষ সেই অমরত্বের অনুভব করে যা স্বয়ং-এর (স্বরূপের) স্বতঃসিদ্ধ (১৪।২০)।

গুণাতীত পুরুষে অর্থাৎ অমরত্ব অনুভবকারী মানুষের সাত্ত্বিক, রাজসিক অথবা তামসিক বৃত্তির হ্রাস-বৃদ্ধিতে কোন অনুরাগ বা দ্বেষ হয় না। শুধু তাই নয়, সে উদাসীনরূপে বিরাজ করে, গুণগুলির দ্বারা সে বিচলিত হয় না তথা 'গুণই গুণের দ্বারা প্রবর্তিত হয়'—এই অনুভব হওয়ায় সে নিজের মধ্যে কখনো কিছুমাত্র পরিবর্তন অনুভব করে না (১৪।২২-২৩)। এটি জ্ঞানযোগের দৃষ্টিতে বলা হয়েছে। ভক্তিযোগের দৃষ্টিতে যখন সাধকের ধ্যেয়, লক্ষ্য কেবল ভগবানই থাকেন, তখন সে স্বতঃই গুণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ব্রহ্মপ্রাপ্তির উপযুক্ত হয়ে যায় (১৪।২৬)।

জল পেলে যেমন বৃক্ষের শাখা-প্রশাখা বেড়ে ওঠে, সেইরূপ সত্ত্ব, রজ, তম—এই তিনগুণের সংস্পর্শে সংসারবৃক্ষের শাখা-প্রশাখা নিম্ন, মধ্য এবং উচ্চলোকে বিস্তৃত হয় (১৫।২)। এর তাৎপর্য এই যে, গুণগুলির সংস্পর্শেই জীবসকল অধোলোক, মধ্যলোক এবং ঊর্ধ্বলোকে জন্মগ্রহণ করে, গুণের সংগ্রবেই সে ভোক্তারূপে প্রতিভাত হয়, কিন্তু স্বয়ং নির্লিপ্তই থাকে—এই তত্ত্ব বিবেকবান ব্যক্তিই জানেন, অবিবেকিগণ নয় (১৫।১০)।

মানুষের স্বভাব থেকে উৎপন্ন শ্রদ্ধা তিন প্রকারের হয়—সাত্ত্বিকী, রাজসী এবং তামসী (১৭।২)। যার যেরূপ শ্রদ্ধা, তার সেইরূপই নিষ্ঠা হয় এবং সেই নিষ্ঠা অনুযায়ী তার প্রবৃত্তি হয়। সাত্ত্বিক ব্যক্তি দেবগণের পূজা করে, রাজসিক ব্যক্তি যক্ষ-রাক্ষস ইত্যাদির পূজা করে, এবং তামসিক ব্যক্তি ভূত-প্রেতাদির পূজা করে (১৭।৩-৪)। যারা পূজাদি করে না, তাদের খাদ্যের রুচির দ্বারা (তাদের) জানা যায়। সাত্ত্বিক ব্যক্তির সরস স্নিগ্ধ আহারদি প্রিয়, রাজস ব্যক্তি অতি কটু অন্নাদি খাদ্যদ্রব্য পছন্দ করে এবং তামস ব্যক্তি অর্ধপক্ব, নীরস, অপবিত্র ভোজ্য পদার্থ পছন্দ করে (১৭।৮-১০)

ফলাকাঙ্ক্ষারহিত ব্যক্তির দ্বারা বিধিপূর্বক সাত্ত্বিক যজ্ঞ, ফললাভের আকাঙ্ক্ষাযুক্ত ব্যক্তির দ্বারা বিধিপূর্বক রাজস যজ্ঞ, এবং বিবেকহীন ব্যক্তির দ্বারা বিধি, মন্ত্র, অন্ন, দক্ষিণা এবং শ্রদ্ধাহীন তামস যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়

(১৭।১১-১৩)। ফলাকাঙ্ক্ষাহীন ব্যক্তি সাত্ত্বিক তপ করে, মান এবং সৎকারকামনাকারী ব্যক্তি দম্ভপূর্বক রাজস তপ করে এবং মূঢ় ব্যক্তি নিজ শরীরকে কষ্ট দিয়ে ও অপরকে দুঃখ দেবার উদ্দেশ্যে তামস তপ করে (১৭।১৭-১৯)। দেশ, কাল ও উপযুক্ত পাত্র পেলে প্রত্যুপকারের আশা না রেখে যে দান করা হয় তাকে সাত্ত্বিক দান বলা হয়, প্রত্যুপকারের আশায় এবং ফল পাওয়ার উদ্দেশ্যে যে দান, তাকে বলা হয় রাজসিক দান এবং দেশ, কাল, পাত্র বিবেচনা না করে অবজ্ঞাসহকারে প্রদত্ত দানকে তামস দান বলা হয় (১৭।২০-২২)।

মোহপূর্বক নির্দিষ্ট কর্ম ত্যাগ করাকে তামস ত্যাগ বলে, শারীরিক কষ্টের ভয়ে নির্দিষ্ট কর্ম ত্যাগকে রাজস ত্যাগ বলে, আসক্তি এবং ফলকামনা ত্যাগ করে নির্দিষ্ট কর্ম করে যাওয়াকে সাত্ত্বিক ত্যাগ বলে (১৮।৭-৯)।

সকল বিভক্ত (পৃথক্ পৃথক্) প্রাণীর মধ্যে অবিভক্ত এক অবিনাশী, চিন্ময় ভাবকে অবলোকন করাই হলো সাত্ত্বিক জ্ঞান। সমস্ত প্রাণীতে পরমাত্মাকে বিভক্ত রূপে পৃথক্ পৃথক্ দেখার নাম রাজস জ্ঞান এবং শুধু পাঞ্চভৌতিক শরীরকেই নিজ স্বরূপ বলে মনে করাই হলো তামস জ্ঞান (১৮।২০-২২)। ফলাকাঙ্ক্ষাশূন্য ব্যক্তি কর্তৃত্বাভিমান ও রাগ-দ্বেষ বর্জিত হয়ে যে কর্ম করেন, তাকে সাত্ত্বিক কর্ম বলে। ফলাকাঙ্ক্ষাযুক্ত ব্যক্তি অহংভাব যুক্ত হয়েও পরিশ্রম সহকারে যে কর্ম করেন, তাকে বলে রাজস কর্ম এবং কার্যের পরিণাম, হানি, হিংসা তথা নিজ সামর্থ্য বিচার না করে মোহবশতঃ যে কর্ম করা হয়, তাকে তামস কর্ম বলা হয় (১৮।২৩-২৫)। রাগ-দ্বেষশূন্য, কর্তৃত্বাভিমান-বর্জিত, ধৈর্য ও উৎসাহযুক্ত এবং সিদ্ধি-অসিদ্ধিতে নির্বিকারচিত্ত ব্যক্তিকে বলা হয় সাত্ত্বিক কর্তা। রাগী (আসক্ত) ফলাকাঙ্ক্ষী, লোভী, হিংসাপরায়ণ, অপবিত্র এবং হর্ষ-শোকান্বিত ব্যক্তিকে বলা হয় রাজস কর্তা। অসাবধান, অভদ্র, একগুঁয়ে, জেদী, অকৃতজ্ঞ, অলস, অবসন্নচিত্ত এবং দীর্ঘসূত্রী ব্যক্তিকে বলা হয় তামস কর্তা (১৮।২৬-২৮)।

প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি, কর্তব্য-অকর্তব্য, ভয়-অভয় এবং বন্ধন-মোক্ষ এই সমস্ত বিষয় যে বুদ্ধি দ্বারা ঠিকমতো জানা যায়, তাকে সাত্ত্বিকী বুদ্ধি বলে। ধর্ম-অধর্ম, কর্তব্য-অকর্তব্য ঠিকমতো ধরতে অসমর্থ যে বুদ্ধি তাকে বলে রাজসী বুদ্ধি। অধর্মকে ধর্ম মনে করে এবং সমস্ত বিষয়কেই বিপরীত বলে ধরে নেয় যে বুদ্ধি, তাকে বলা হয় তামসী বুদ্ধি (১৮।৩০-৩২)। সমত্বপূর্বক মন, প্রাণ এবং ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়াগুলি ধারণ করে যে ধৃতি, তাকে বলা হয় সাত্ত্বিকী ধৃতি ; ফলাকাঙ্ক্ষা এবং আসক্তিপূর্বক ধর্ম, কাম (ভোগ) এবং অর্থকে (সম্পদকে) ধারণ করে যে ধৃতি, তাকে বলে রাজসী ধৃতি। যে ধৃতি দ্বারা নিদ্রা, ভয়, শোক ইত্যাদি ধারণ করা হয়, তাকে বলা হয় তামসী ধৃতি (১৮।৩৩-৩৫)।

পরমাত্ম-সম্পর্কিত বুদ্ধি দ্বারা উৎপন্ন যে সুখ তা সাংসারিক আসক্তির জন্য প্রথমে বিষের ন্যায় এবং পরিণামে অমৃততুল্য মনে হয়—তা হল সাত্ত্বিক সুখ। প্রথমে অমৃতের ন্যায় এবং পরিণামে বিষতুল্য বিষয় ও ইন্দ্রিয় সংযোগে উদ্ভূত সুখকে রাজস সুখ বলা হয়। আরম্ভে এবং পরিণামে দুইয়েতেই মোহিতকারী, কেবলমাত্র নিদ্রা, আলস্য ও প্রমাদ থেকে যা উৎপন্ন, তা হল তামস সুখ (১৮।৩৭-৩৯)।

প্রকৃতিজাত গুণগুলি হতেই সবকিছুর সৃষ্টি হয়েছে, সেইজন্য ত্রিলোকে গুণরহিত কোন বস্তু বা প্রাণী নেই। স্বভাবজাত গুণের দ্বারাই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র —এই চারবর্ণের কর্মবিভাগ করা হয়েছে (১৮।৪০-৪১)।[১]

অষ্টাদশ অধ্যায়ের সাতচল্লিশ সংখ্যক শ্লোকের **'বিগুণঃ'** শব্দটিও তিন গুণরহিতের বাচক নয়, আসলে এই শব্দটি সদ্গুণ-সদাচারের অভাবের বাচক।[২]

এইপ্রকার গীতায় ভাব, বৃত্তি, শ্রদ্ধা, পূজা, আহার, যজ্ঞ, তপ, দান, ত্যাগ, জ্ঞান, কর্ম, কর্তা, বুদ্ধি, ধৃতি

---

[১]কোন একটি বস্তুর উপর ঘা মারলে সেটি দু টুকরো হয়ে যায়, দুটি ঘা মারলে তা তিন টুকরো হয় ও তিন ঘা মারলে সেটি চার টুকরো হয়। এইভাবেই তিনগুণে চারটি বর্ণের বিভাগ হয়।

[২]গীতায় যে অধ্যায়ের যে শ্লোকগুলিতে গুণগুলির বর্ণনা আছে, তারই সঙ্কেত এখানে করা হয়েছে।

এবং সুখ—এই পনেরো প্রকারে গুণগুলির বর্ণনা করা হয়েছে।

উপরিউক্ত তিন প্রকার গুণের মধ্যে সত্ত্বগুণের তাৎপর্য হল এই যে, তা প্রকৃতি এবং প্রকৃতির কার্য থেকে সম্বন্ধ-বিচ্ছেদকারী, রজোগুণের তাৎপর্য প্রাকৃত পদার্থের সঙ্গে সম্বন্ধ দৃঢ় করায় এবং তমোগুণের তাৎপর্য মূঢ়তার বৃদ্ধিপ্রাপ্তিতে।

গীতায় সত্ত্বগুণের স্বরূপ হচ্ছে প্রকাশক ও অনাময় (১৪।৬)। 'প্রকাশ' মানে হচ্ছে অন্তঃকরণের স্বচ্ছতা, নির্মলতা অর্থাৎ অন্তঃকরণে সৎ-অসৎ এবং কর্তব্য-অকর্তব্যের বিবেক জাগ্রত হওয়াই 'প্রকাশ'। 'অনাময়' হল রোগরহিত অর্থাৎ বিকাররহিত হওয়া। জড়ত্ব ত্যাগ হলে মানুষ বিকাররহিত হয়। গীতায় সত্ত্বগুণকে যেমন 'অনাময়' বলা হয়েছে, তেমনি নির্গুণ তত্ত্বকেও 'অনাময়' বলা হয়েছে (২।৫১)। দুটিকেই অনাময় বলার তাৎপর্য এই যে, পরমাত্মপ্রাপ্তির হেতু হওয়ায় সত্ত্বগুণ নির্গুণ তত্ত্বের খুবই সন্নিকট। রজোগুণের স্বরূপ রাগাত্মক (১৪।৭)। বিনাশশীল পদার্থে আকর্ষণ ও আসক্তি হওয়াকে 'রাগ' বলে, এর দ্বারা কামনা উৎপন্ন হয়। এই কামনাই সমস্ত পাপের মূল (৩।৩৭)। তমোগুণের স্বরূপ মোহাত্মক হয়ে থাকে, যাতে মূঢ়তাই মুখ্যরূপে থাকে (১৪।৮)। গীতায় রাজস কর্মকে হিংসাত্মক বলা হয়েছে (১৮।২৭) এবং তামস কর্মাদিতেও হিংসার কথা বলা হয়েছে (১৮।২৫)। দুই ক্ষেত্রেই হিংসা কথাটি বলার অর্থ এই যে, রজোগুণ এবং তমোগুণ—দুটি একে অপরের খুবই কাছাকাছি থাকে[১]।

অন্যান্য গ্রন্থে বলা হয়েছে যে সত্ত্বগুণে পুণ্য হয়—'সাত্ত্বিকৈঃ পুণ্যনিষ্পত্তিঃ', যার সুখরূপ ফল জন্ম-জন্মান্তর ও লোক-লোকান্তরে ভোগ করা যায়। কিন্তু গীতার সত্ত্বগুণ বর্ণনার তাৎপর্য সুখে নয়, বরং এটি অবিনাশী সুখ প্রাপ্তিতে, যা মুক্তিতে সহায়ক হয়। কিন্তু রজোগুণ যদি এই সত্ত্বগুণের মধ্যে এসে যায়, তাহলে এই সত্ত্বগুণ সাধককে সেই স্থিতিতে ধরে রাখে। এর তাৎপর্য এই যে, সত্ত্বগুণের উপভোগ করলে, এর দ্বারা উদ্ভূত সুখ এবং জ্ঞানে আসক্ত হলে এটি মানুষকে এগোতে দেয় না (১৪।৬)।

গীতায় যে যে স্থানে সাত্ত্বিক, রাজসিক এবং তামসিক এই তিন গুণের বর্ণনা করা হয়েছে, সেখানে একদৃষ্টিতে দেখতে গেলে সাত্ত্বিক এবং রাজসিক (সমান) এক। অন্য দৃষ্টিতে রাজসিক ও তামসিক এক তথা অপর দৃষ্টিতে সাত্ত্বিক ও তামসিক এক। যেমন-শাস্ত্রবিধি অনুযায়ী কর্ম করাতে সাত্ত্বিক এবং রাজসিক সমান ; কিন্তু এতে পার্থক্য এই যে সাত্ত্বিকের মধ্যে নিষ্কামভাব থাকে এবং রাজসিকের মধ্যে সকামভাব দেখা যায়। জগৎ-সংসারের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনে রাজসিক ও তামসিক একই প্রকারের ; কিন্তু এর মধ্যে পার্থক্য এই যে, রাজসিকতায় সাবধানী বা সতর্কতা থাকে এবং তামসিকতায় মূঢ়তা দেখা যায়। ক্রিয়া-রহিত হওয়াতে সাত্ত্বিক বা তামসিক এক, কিন্তু তাতে পার্থক্য এই যে, সাত্ত্বিকে বিবেক জাগ্রত থাকে আর তামসিকতায় থাকে মূঢ়তা।

প্রকৃতপক্ষে দেখতে গেলে প্রকৃতি থেকে উদ্ভূত হওয়ায় সাত্ত্বিক, রাজসিক এবং তামসিক তিনটি গুণেই অন্তর্নিহিত সম্পর্ক দেখা যায় (১৪।৫)। এই গুণগুলির সঙ্গে নিজ সম্পর্ক না থাকলে প্রকৃতির অতীত পরমাত্মতত্ত্ব অথবা স্বরূপের অনুভব হয়—যা এই তিন গুণরহিত এবং স্বরূপতঃ সে কিছু করেও না বা লিপ্তও হয় না (১৩।৩১)।

[১]তমোগুণ, রজোগুণ এবং সত্ত্বগুণ—তিনটিতে পরস্পর (১, ১০ এবং ১০০র মত) দশগুণ তফাৎ আছে। তবুও তমোগুণ (১) থেকে রজোগুণ (১০) নিকটে এবং সত্ত্বগুণ (১০০) এই দুইয়ের থেকে দূরে থাকে।

(৫৯) গীতায় পরমাত্মা এবং জীবাত্মার স্বরূপ

জীবাত্মা পরমাত্মা চ তত্ত্বতোঽভিন্ন এব চ।
লক্ষণেষু দ্বয়োঃ সাম্যং কৃষ্ণেন কথিতং স্বয়ম্॥

উপাসনার দৃষ্টিতে পরমাত্মার তিনটি স্বরূপ মানা হয়েছে—সগুণ-নিরাকার, নির্গুণ-নিরাকার এবং সগুণ-সাকার। সৌন্দর্য, মাধুর্য, ঐশ্বর্য ইত্যাদি দিব্য গুণযুক্ত এবং প্রকৃতি তথা তার কার্য সংসারে পরিপূর্ণভাবে ব্যাপক পরমাত্মাকে **'সগুণ-নিরাকার'** বলা হয়। সাধক যখন পরমাত্মাকে দিব্য গুণরহিত বলে মনে করে অর্থাৎ যখন তার দৃষ্টি শুধু নির্গুণ পরমাত্মার দিকে থাকে, তখন পরমাত্মার সেই স্বরূপ **'নির্গুণ-নিরাকার'** বলে পরিচিত হয়। সগুণ-নিরাকার পরমাত্মা যখন নিজ দিব্য প্রকৃতিতে অধিষ্টিত হয়ে নিজ যোগমায়ার দ্বারা জগতে প্রকট হন, তখন তাঁকে **'সগুণ-সাকার'** বলা হয়। এই তিন স্বরূপের বর্ণনা গীতায় এই প্রকারে আছে—

(১) **সগুণ-নিরাকার**—অভ্যাসযোগ দ্বারা যুক্ত একাগ্র মনে সেই পরম পুরুষের ধ্যান করতে করতে শরীর ত্যাগ করলে মানুষ তাঁকেই প্রাপ্ত হয় (৮।৮)। যিনি সর্বজ্ঞ, পুরাণ-পুরুষ, সর্বনিয়ন্তা, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম, সকলের বিধাতা, অচিন্ত্যস্বরূপ, অজ্ঞান থেকে দূর এবং সূর্যের ন্যায় প্রকাশস্বরূপ, তাঁকে স্মরণ করতে করতে একাগ্র মন এবং যোগবলের দ্বারা ভ্রূমধ্যে প্রাণকে স্থাপন করে শরীর-ত্যাগকারী মানুষ সেই দিব্য পরম পুরুষকে প্রাপ্ত হন (৮।৯-১০)। যাঁর অন্তর্গত সমস্ত প্রাণী এবং যিনি সমস্ত ভূতে পরিব্যাপ্ত, সেই পরমপুরুষকে অনন্য ভক্তি দ্বারাই লাভ করা যায় (৮।২২), যাঁর দ্বারা সমস্ত প্রাণীর উৎপত্তি এবং যিনি এই চরাচরে ব্যাপ্ত হয়ে আছেন, সেই পরমাত্মাকে নিজ কর্ম দ্বারা পূজা করে মানুষ সিদ্ধিলাভ করে থাকে (১৮।৪৬); ইত্যাদি, ইত্যাদি।

(২) **নির্গুণ-নিরাকার**—যাঁকে বেদজ্ঞগণ অক্ষর বলেন, বীতরাগ সন্ন্যাসিগণ যাঁতে প্রবেশ করেন এবং যাঁকে প্রাপ্তির আশায় ব্রহ্মচারিগণ ব্রহ্মচর্য পালন করেন, আমি (কৃষ্ণ) তাঁদের সম্বন্ধে বলছি (৮।১১)। যাঁরা অক্ষর, অনির্দেশ্য, অব্যক্ত, সর্বব্যাপী, অচিন্ত্য, কূটস্থ, অচল এবং ধ্রুব তত্ত্বের উপাসনা করেন (১২।৩), ইত্যাদি, ইত্যাদি।

(৩) **সগুণ-সাকার**—'অনন্যচিত্ত যে ভক্ত নিত্য-নিরন্তর আমাকে স্মরণ করেন, তাঁর পক্ষে আমি **'সহজলভ্য'** (৮।১৪)। 'মহাত্মা ব্যক্তিগণ আমাকে লাভ করে পুনরায় এই দুঃখপূর্ণ অশাশ্বত পুনর্জন্ম প্রাপ্ত হন না' (৮।১৫)। 'দৈবী প্রকৃতির আশ্রিত মহাত্মাগণ আমাকে সমস্ত প্রাণীর আদি এবং অবিনাশী জেনে অনন্যচিত্তে আমার ভজনা করেন' (৯।১৩)। 'যে ভক্ত ভক্তি সহকারে পত্র, পুষ্প, ফল, জল ইত্যাদি আমাকে অর্পণ করেন, প্রীতিপূর্বক প্রদত্ত তাঁর সেই উপহার আমি ভক্ষণ করি' (৯।২৬)। 'কেবল অনন্য ভক্তি দ্বারাই আমাকে জানা সম্ভব, দর্শন করা সম্ভব এবং প্রাপ্ত করা সম্ভব' (১১।৫৪); ইত্যাদি।

সগুণ-নিরাকার, নির্গুণ-নিরাকার এবং সগুণ-সাকারের ঐক্য—ত্রয়োদশ অধ্যায়ের চোদ্দ সংখ্যক শ্লোকে ভগবান এই তিন রূপের সমন্বয় করেছেন; যেমন 'সর্বেন্দ্রিয়গুণাভাসম্' অর্থাৎ এই তত্ত্ব সমস্ত ইন্দ্রিয়ের বিষয়গুলির প্রকাশক হওয়ায়, সগুণ-নিরাকার। **'সর্বেন্দ্রিয়বিবর্জিতম্, নির্গুণম্'** অর্থাৎ সকল ইন্দ্রিয় এবং সত্ত্ব, রজ, তম এই তিনগুণ রহিত হওয়ায়, নির্গুণ-নিরাকার। **'সর্বভৃৎ, গুণভোক্তৃ'** অর্থাৎ সমগ্র চরাচরের ভরণ-পোষণকারী তথা গুণের ভোক্তা হওয়ায়, সগুণ-সাকার। এছাড়া অন্যত্রও তিনরূপের সামঞ্জস্য করা হয়েছে। যেমন—তাকেই অব্যক্ত অক্ষর বলা হয় এবং তাকেই পরম গতি বলা হয়, যাকে লাভ করলে জীবের আর পুনর্জন্ম হয় না, তাই আমার পরম ধাম (৮।২১)। 'ব্রহ্ম, অবিনাশী অমৃত, শাশ্বত ধর্ম এবং ঐকান্তিক সুখের আশ্রয়—এসকলই আমি' (১৪।২৭)।

অর্জুনও বিরাটরূপ ভগবানের স্তুতি করতে গিয়ে একাদশ অধ্যায়ের অষ্টাদশ শ্লোকে তিনরূপের ঐক্য সাধন করেছেন; যেমন—**'ত্বমক্ষরং পরমং বেদিতব্যম্'** অর্থাৎ আপনিই জ্ঞাতব্য পরম অক্ষর (অক্ষর ব্রহ্ম)

হওয়ায় নির্গুণ নিরাকার ; 'ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্', আপনিই বিশ্বের পরম আশ্রয় হওয়ায় সগুণ নিরাকার ; 'ত্বং শাশ্বতধর্মগোপ্তা', অর্থাৎ আপনিই সনাতনধর্মের রক্ষাকর্তা হওয়ায় সগুণ-সাকার।

জীবাত্মার স্বরূপ—গীতায় জীবাত্মার স্বরূপের বিষয়ে ভগবান বলেছেন যে 'জীব আমারই সনাতন অংশ, কিন্তু আমার অংশসম্ভূত হয়েও এই জীবলোকে সে জীবরূপে স্থিত রয়েছে এবং প্রকৃতিজাত ইন্দ্রিয়, মন ইত্যাদিকে নিজের বলে মনে করে থাকে (১৫।৭)। প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে অর্থাৎ শরীরকে 'আমি' এবং 'আমার' মনে করে জীব সুখ ও দুঃখের ভোক্তা হয়। প্রকৃতির গুণ এবং বিষয়ের সংস্পর্শেই এই জীবের উচ্চ-নীচ যোনিতে জন্ম হয় (১৩।২১)। এই জীবাত্মা আমার 'পরা প্রকৃতি', কিন্তু সে 'অপরা প্রকৃতি' অর্থাৎ জগৎ চরাচরের সংস্পর্শে এসে অহংকার ও মমত্ববশতঃ এই জগতে বিধৃত হয়ে আছে (৭।৫)। অপরা প্রকৃতির সঙ্গে পরা প্রকৃতির এই সংস্পর্শেই সমস্ত প্রাণীর উৎপত্তি হয় (৭।৬; ১৩।২৬)।

এই জীবাত্মার বর্ণনা দ্বিতীয় অধ্যায়ের এগারো সংখ্যক শ্লোক থেকে ত্রিশ সংখ্যক শ্লোক পর্যন্ত দেহী, শরীরী, নিত্য, অবিনাশী, অপ্রমেয় ইত্যাদি শব্দে করা হয়েছে। ত্রয়োদশ অধ্যায়ের দ্বিতীয় শ্লোকে একে 'ক্ষেত্রজ্ঞ' এবং উনিশ সংখ্যক শ্লোকে 'পুরুষ' নামে বলা হয়েছে। একেই পঞ্চদশ অধ্যায়ের ষোল সংখ্যক শ্লোকে 'অক্ষর' বলা হয়েছে। এর তাৎপর্য এই যে প্রকৃতপক্ষে জীব পরমাত্মার অংশ হওয়ায় পরমাত্মস্বরূপই। আসক্তির জন্য প্রকৃতির কার্য শরীর ও সংসারের সঙ্গে সম্পর্কিত হওয়ায় সে জীবরূপে অভিহিত হয়। প্রকৃতপক্ষে শরীরে স্থিত হয়েও জীবাত্মা কিছুই করেন না এবং কর্মফলেও লিপ্ত হন না। (১৩।৩১)।

সগুণ-নিরাকারের সঙ্গে জীবাত্মার ঐক্য—জীবাত্মার সম্বন্ধে বলা হয়েছে—যিনি এই জগৎ সংসার পরিব্যাপ্ত হয়ে আছেন, তাকে অবিনাশী বলে জানবে (২।১৭) ; এবং সগুণ-নিরাকার পরমাত্মার সম্বন্ধেও বলা হয়েছে যে, সমস্ত প্রাণী যাঁর অন্তর্গত এবং যাঁর দ্বারা এই সমস্ত জগৎ পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে, সেই পরম পুরুষকে অনন্য ভক্তি দ্বারা লাভ করা যায় (৮।২২)। 'আমি অব্যক্তরূপে এই সমস্ত জগৎ পরিব্যাপ্ত করে আছি' (৯।৪)। যে পরমাত্মা এই সমস্ত জগৎ চরাচর পরিব্যাপ্ত করে আছেন, নিজ কর্ম দ্বারা তাঁর পূজা করা উচিত। (১৮।৪৬)।

জীবাত্মাকেও 'ঈশ্বর' বলা হয়েছে (১৫।৮) এবং সগুণ-নিরাকার পরমাত্মাকেও 'ঈশ্বর' বলা হয়েছে (১৮।৬১)।

নির্গুণ-নিরাকারের সঙ্গে জীবাত্মার ঐক্য—জীবাত্মাকেও সমস্ত জগতে পরিব্যাপ্ত বলা হয়েছে (২।১৭) এবং নির্গুণ-নিরাকার পরমাত্মাকেও সমস্ত চরাচর প্রাণীজগতে পরিব্যাপ্ত বলা হয়েছে (১৩।১৫)।

জীবাত্মাকে নিত্য, সর্বব্যাপী, স্থাণু, নিশ্চল, অব্যক্ত এবং অচিন্ত্য (২।২৪-২৫), অপ্রমেয় (২।১৮) তথা কূটস্থ (১৫।১৬) বলা হয়েছে এবং নির্গুণ-নিরাকার পরমাত্মাকে অনির্দেশ্য, অব্যক্ত, সর্বব্যাপী, অচিন্ত্য, কূটস্থ, নিশ্চল এবং ধ্রুব বলা হয়েছে (১২।৩)।

জীবাত্মাকেও 'পরমাত্মা' বলা হয়েছে (১৩।২২) আবার নির্গুণ-নিরাকার পরমাত্মাকেও 'পরমাত্মা' বলা হয়েছে (৬।৭)।

জীবাত্মাকে 'নির্গুণ' বলা হয়েছে (১৩।৩১) এবং নির্গুণ-নিরাকার পরমাত্মাকেও 'নির্গুণ' বলা হয়েছে (১৩।১৪)।

সগুণ-সাকারের সঙ্গে জীবাত্মার ঐক্য—জীবাত্মাকেও 'মহেশ্বর' বলা হয়েছে (১৩।২২) এবং সগুণ-সাকার পরমাত্মাকেও 'মহেশ্বর' বলা হয়েছে (৫।২৯ ; ৯।১১ ; ১০।৩)।

ত্রয়োদশ অধ্যায়ের দ্বিতীয় শ্লোকে, 'তুমি সমস্ত ক্ষেত্রগুলির মধ্যে ক্ষেত্রজ্ঞ বলে আমাকেই জানবে'—এই কথায় জীবাত্মার সঙ্গে নিজের (সগুণ-সাকারের) একত্ব জানিয়েছেন।

সমস্ত স্বরূপের সঙ্গে জীবাত্মার একত্ব জানাবার তাৎপর্য এই যে জীবাত্মার পরমাত্মার সঙ্গে একত্ব স্বতঃ স্বাভাবিক ; কিন্তু শরীরের সঙ্গে একত্ব মানলে তখন আর পরমাত্মার সঙ্গে একত্ব অনুভূত হয় না। সুতরাং সাধকের উচিত শরীরের সঙ্গে নিজের একত্ব স্বীকার না করা, বরং পরমাত্মার সঙ্গে দৃঢ়ভাবে নিজের ঐক্য মেনে একনিষ্ঠভাবে সাধনায় রত হলে তার সেই একত্বের অনুভূতি হয়।

পরমাত্মার সগুণ-নিরাকার, নির্গুণ-নিরাকার এবং সগুণ-সাকার—এই তিনরূপের সঙ্গে জীবাত্মার তত্ত্বগতভাবে ঐক্য থাকলেও ভিন্নতা মেনে নেওয়া হয়েছে। মেনে নেওয়া এই ভিন্নতা দূর হলে তাত্ত্বিক ঐক্য স্বতঃই অনুভূত হয়। সম্প্রদায়গত ভেদে কোনও আচার্য জীবাত্মা এবং পরমাত্মাকে অভেদ বলে মনে করেন এবং আবার কেউ ভিন্ন বলে মনে করেন। ভিন্ন বলে যাঁরা মানেন, তাঁরাও তাত্ত্বিক ভিন্নতা মানেন না। জীব অনেক—এই দৃষ্টিতে জীবাত্মা এবং পরমাত্মায় স্বজাতীয় ঐক্যের কথা বলা হলেও প্রকৃতপক্ষে এই ঐক্য তাত্ত্বিক ঐক্য। কারণ জাতি তাকেই বলা হয়, যা এক হয়েও সব কিছুতে পৃথক্‌ভাবে থাকে। চেতন-তত্ত্ব একই আর তাতে কোন ভেদ (অনৈক্য) নেই, তাহলে তাতে জাতি কিভাবে হয় ? সুতরাং জীবাত্মা এবং পরমাত্মায় তাত্ত্বিক ঐক্য আছে অর্থাৎ দুই-ই তত্ত্বতঃ এক।

জীবাত্মা অল্পজ্ঞ এবং পরমাত্মা সর্বজ্ঞ। জীবাত্মার অল্পজ্ঞতার কারণ হলো অবিদ্যা এবং পরমাত্মার সর্বজ্ঞতার কারণ হলো তাঁর শক্তি প্রকৃতি। যদি জীবাত্মার অবিদ্যা দূর হয়ে যায়, তবে তার অজ্ঞতা থাকে না আর যদি পরমাত্মা নিজ শক্তিকে উপেক্ষা করেন, নিজ শক্তির দিকে দৃষ্টিপাত না করেন ; তাহলে পরমাত্মার সর্বজ্ঞতা থাকে না।

গীতা শব্দময় গ্রন্থ ; অতএব এই লেখাতে গীতার শব্দগুলি নিয়ে জীবাত্মা ও পরমাত্মার ঐক্য দেখানো হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে জীবাত্মা ও পরমাত্মার তাত্ত্বিক ঐক্য কোন গ্রন্থাদির ওপর নির্ভরশীল নয়, তা স্বতঃসিদ্ধ। যদি সাধক কোন গ্রন্থকে গুরুত্ব দেয়, তাহলে তা সেই গ্রন্থে বর্ণিত তত্ত্বের সঙ্গে অভিন্ন হওয়ার জন্যই, তাতে নিজেকে লীন করার জন্যই। সাধকের মধ্যে যখন সাংসারিক বস্তু, ব্যক্তি ইত্যাদির গুরুত্ব থাকে না, তখন তার মেনে নেওয়া তত্ত্বগত ভিন্নতা দূর হয় অর্থাৎ পরমাত্মার সঙ্গে নিজ তত্ত্বগত ঐক্য অনুভূত হয়। এই একত্ব অনুভূত হলে ব্যক্তিত্বের অহং থাকে না ; কারণ, প্রকৃতপক্ষে তত্ত্বে ব্যক্তিত্বের অহং নেই। মানুষের দৃষ্টিতে যে যোগী, জ্ঞানী, অথবা প্রেমী যাই হোক না কেন, প্রকৃতপক্ষে সে আর যোগী, জ্ঞানী বা প্রেমী থাকে না, সে তখন যোগ-স্বরূপ, জ্ঞান-স্বরূপ ও প্রেম-স্বরূপ হয়ে যায়। তত্ত্বতঃ এক হলে অর্থাৎ ব্যক্তিত্বের অহং দূর হলে যোগ এবং যোগী, জ্ঞান এবং জ্ঞানী, প্রেম এবং প্রেমী—এই দুইপ্রকার ভেদ থাকে না। যতক্ষণ এই ভেদ বা ব্যক্তিত্বের অহং থাকে, ততক্ষণ তত্ত্বের সঙ্গে ঐক্য হয় নি বলে মানতে হবে।

(৬০) গীতায় ঈশ্বর এবং জীবাত্মার স্বাতন্ত্র্য (স্বাধীনতা)

কর্তুং তথান্যথাকর্তুং স্বতন্ত্রো হীশ্বরঃ সদা।
প্রকৃতের্বশতাভাগে জীবাত্মা স্ববশঃ সদা॥

'স্ব' হচ্ছে স্বয়ং, 'পর' হচ্ছে অপর ; 'তন্ত্র'-র অর্থ হলো অধীন। সুতরাং যা স্বয়ং এর অধীন তাই স্বাধীন বা স্বতন্ত্র এবং যা অপরের অধীন তাকেই পরাধীন বা পরতন্ত্র বলে। স্বতন্ত্র এবং পরতন্ত্রের ভাবকেই স্বতন্ত্রতা এবং পরতন্ত্রতা বলা হয়।

যদিও ঈশ্বরে কর্তৃত্ব থাকে না এবং ঈশ্বরের অংশ এই জীবাত্মাতেও তত্ত্বগতভাবে কর্তৃত্ব নেই, তবু ঈশ্বরের প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্কের জন্য কর্তৃত্ব আছে এবং জীবাত্মায় শরীর-ইন্দ্রিয়-মন-বুদ্ধির সঙ্গে সম্পর্কের জন্য কর্তৃত্ব আছে। কিন্তু এই দুই কর্তৃত্বের মধ্যে অনেক পার্থক্য। ঈশ্বর প্রকৃতির অধীশ্বর হয়েও প্রকৃতিকে নিজের বশে এনে স্বাধীনভাবে জগতের উৎপত্তি, স্থিতি, প্রলয়াদি কার্য সম্পন্ন করেন (৪।৬ ; ৯।৮) কিন্তু জীবাত্মা সুখের আকাঙ্ক্ষায় শরীরাদির বশীভূত হয়ে পরাধীনভাবে কর্ম করে (১৫।৭-৯)। ভগবান যেমন প্রকৃতিকে অঙ্গীকার করা বা না করায় স্বতন্ত্র এবং অঙ্গীকার করলেও তিনি পরাধীন হয়ে যান না, তেমনি জীবাত্মাও শরীর ইত্যাদিকে 'আমি-আমার' মানা বা না মানায়

স্বতন্ত্র, কিন্তু 'আমি-আমার' মানা বা না মানার এই স্বাধীনতা ভুলে গিয়ে জীবাত্মা তাদের অধীন হয়ে যায় এবং পরিণামে তাকে জন্ম-মরণ চক্রে আবর্তিত হতে হয়।

জীবাত্মার এই পরাধীনতা স্বাভাবিক নয়, তা নিজেরই সৃষ্ট, নিজেরই দ্বারা স্বীকৃত। এর তাৎপর্য এই যে, যখন এই জীবাত্মা নিজ আসক্তির জন্য প্রকৃতির কার্য শরীরাদির অধীনতাকে স্বীকার করে নেয়, তখন সে পরাধীন হয়ে যায় ; কিন্তু যখন সে প্রকৃতির অধীনতাকে অস্বীকার করে, তখন সে স্বাধীন হয় অর্থাৎ নিজ স্বতঃসিদ্ধ স্বাধীনতা, নিজ স্বরূপ সে অনুভব করতে পারে। এই অনুভব করায় সে স্বাধীন।

যখন জীবাত্মা নিজ স্বতঃসিদ্ধ স্বাধীনতা অনুভব করেও সন্তুষ্ট হয় না, তখন তার ভগবৎপ্রেম জন্মায়। ভগবানে প্রীতি জন্মালে ভগবানও তার বশীভূত হন। এর তাৎপর্য এই যে যখন জীবাত্মা প্রকৃতির কার্য পরিত্যাগ করে ভগবানের শরণাগত হয়, তখন চিরস্বাধীন ভগবানও তার অধীন হন। শুধু তাই নয়, ভক্তের অধীনে ভগবান আনন্দ অনুভব করেন। জীবাত্মাকে ভগবান এতোখানি স্বাধীনতা দিয়েছেন !

(৬১) গীতায় সৎ, চিৎ এবং আনন্দ

দ্বাবেব সচ্চিদানন্দৌ প্রোক্তৌ জগজ্জনার্দনৌ।
দ্বয়োরন্তরমেতত্তু সদাস্থিরং সদা স্থিরঃ॥

গীতায় সৎ, চিৎ এবং আনন্দ—এই তিনের বর্ণনা আছে। কিন্তু বেদান্ত গ্রন্থগুলিতে যে ক্রমে এই তিনটি বর্ণিত হয়েছে, সেই ক্রম গীতায় অনুসরণ করা হয় নি ; কারণ গীতা সিদ্ধান্ত-গ্রন্থ, প্রক্রিয়া-গ্রন্থ নয়।

'সৎ' শব্দ সত্তার বাচক, 'চিৎ' হচ্ছে জ্ঞানের বাচক এবং 'আনন্দ' হলো সর্বোপরি সুখের বাচক।

সৎ

সত্তা দুই প্রকারের—স্বতঃসিদ্ধ অবিকারী সত্তা এবং উৎপন্ন হওয়া বিকারী সত্তা। পরমাত্মা এবং জীবের সত্তা অবিকারী আর সংসার এবং শরীরের সত্তা বিকারী। অবিকারী সত্তার কখনও অ-ভাব হয় না—'**নাভাবো বিদ্যতে সতঃ**' (২।১৬) এবং বিকারী সত্তার কখনো ভাব হয় না—'**নাসতো বিদ্যতে ভাবঃ**' (২।১৬)।

উৎপন্ন হওয়া, 'আছে' রূপে দেখা, বেড়ে ওঠা, পরিবর্তিত হওয়া, ক্ষীণকলেবর হওয়া এবং নাশ হওয়া—এই ছটি বিকার অবিকারী সত্তায় হয় না অর্থাৎ এই সত্তা ছয় প্রকার বিকারবর্জিত। এই ছটি বিকার বিকারী সত্তায় হয় ; যেমন—জগৎ-সংসার এবং শরীর উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন হওয়ার পর 'আছে' রূপে দেখা যায়, বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, পরিবর্তিত হয় অর্থাৎ অবস্থা থেকে অবস্থান্তরে যায়, ক্ষীণ হয় এবং নাশ হয়।

গীতায় উপরিউক্ত দুই সত্তার বর্ণনাই একসঙ্গে করা হয়েছে ; যেমন—গতিশীল প্রাণীর মধ্যে যিনি গতি-রহিত, অসম প্রাণীদিগের মধ্যে যিনি সমরূপে বিদ্যমান এবং বিনাশশীল প্রাণীর মধ্যে যিনি বিনাশরহিত (১৩।২৭), বিভিন্ন প্রাণীর মধ্যে যিনি অপরিচ্ছিন্ন ভাবে বিদ্যমান (১৩।১৬), সমস্ত প্রাণী যাঁর অন্তর্গত এবং যিনি সমস্ত প্রাণীতে ওতপ্রোত হয়ে আছেন (৮।২২) ইত্যাদি।

চিৎ

জ্ঞান দুই প্রকারের—করণ-নিরপেক্ষ এবং করণ-সাপেক্ষ। পরমাত্মা এবং নিজ স্বরূপের জ্ঞান বা বোধকে বলা হয় করণ-নিরপেক্ষ। কারণ, এই জ্ঞান স্বরূপ থেকেই হয়, ইন্দ্রিয়, মন ইত্যাদির দ্বারা নয়। সংসার ও শরীরের জ্ঞান করণ-সাপেক্ষ ; কারণ, এই জ্ঞান ইন্দ্রিয়, মন ইত্যাদি দ্বারা হয়। করণ-নিরপেক্ষ জ্ঞান সবকিছুর প্রকাশক। এই জ্ঞানের দ্বারাই সবকিছু প্রকাশিত হয়। এর দ্বারা মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয় সবই প্রকাশিত হয়, কিন্তু করণ-সাপেক্ষ জ্ঞান প্রকাশ্য।

গীতায় উপরিউক্ত দুই জ্ঞানের বর্ণনাও প্রায় একসঙ্গেই করা হয়েছে। যেমন এই পরমাত্মা সকল জ্যোতিরও জ্যোতি অর্থাৎ সমস্ত জ্ঞানের জ্ঞান (১৩।১৭)। তিনি সর্ব ইন্দ্রিয়বিবর্জিত হয়েও সকল বিষয়ের প্রকাশক ; (১৩।১৪)। সেই পরমপদরূপ পরমাত্মাকে সূর্য (চক্ষু), চন্দ্র (মন) এবং অগ্নি (বাক্য) প্রকাশিত করতে পারে না (১৫।৬) ; কিন্তু তাঁর দ্বারাই এই সূর্যাদি সমস্ত (নেত্র) উদ্ভাসিত হয় (১৫।১২), ইত্যাদি।

আনন্দ

সুখও দুই প্রকারের—পারমার্থিক এবং লৌকিক। পারমার্থিক সুখ পরমাত্মস্বরূপ। এই সুখ ত্রিগুণের অতীত এবং সাংসারিক সুখ-দুঃখ-বর্জিত। এই সুখকেই গীতায় অক্ষয় সুখ, আত্যন্তিক সুখ এবং অত্যন্ত সুখ নামে বলা হয়েছে (৫।২১ ; ৬।২১, ২৮)। কিন্তু লৌকিক সুখ ক্ষণভঙ্গুর এবং ত্রিগুণসম্পন্ন। রাজসিক ও তামসিক সুখ তো লৌকিক সুখই, সাত্ত্বিক সুখও যেহেতু উৎপন্ন হয়, তাই এটিও লৌকিক সুখ। গীতায় লৌকিক সুখের বর্ণনার সঙ্গে প্রায় দুঃখের কথাও বলা হয়েছে ; যেমন **'শীতোষ্ণসুখদুঃখদাঃ'**, **'সমদুঃখসুখম্'** (২।১৪-১৫), **'সুখেষু বিগতস্পৃহঃ'** (২।৫৬), **'শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু'** (৬।৭), **'সমদুঃখসুখঃ'**, **'শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু'** (১২।১৩, ১৮) ; **'সমদুঃখসুখঃ'** (১৪।২৪), **'সুখদুঃখসংজ্ঞৈঃ'** (১৫।৫) ; ইত্যাদি।

তাৎপর্য হচ্ছে এই যে, পরমাত্মতত্ত্বও সচ্চিদানন্দ (সৎ, চিৎ, আনন্দ) এবং সংসারও সচ্চিদানন্দ, কিন্তু এই দুই সচ্চিদানন্দ বোধে পার্থক্য আছে। পরমাত্মতত্ত্বের সচ্চিদানন্দময়তা সকলের অনুভব হয় না। মানুষ যখন সাধনা করে, সৎসঙ্গ করে, পরমাত্মার পথে চলে, তখন পরমাত্মার সচ্চিদানন্দময়তা তার অনুভবে আসতে থাকে। পারমার্থিক পথে সে যেমন এগোতে থাকে, তেমনভাবেই তার মধ্যে বিশেষ লক্ষণ আসতে থাকে। কিন্তু জগতে যে সচ্চিদানন্দময়তা আছে তা সকলেরই অনুভবসিদ্ধ। জগতের যে সত্তা ('আছি' ভাব) আছে ; জ্ঞান আছে ; সুখ আছে— সে সবই উৎপন্ন হয় এবং বিনষ্ট হয়। তা আগেও ছিল না, পরেও থাকবে না। অর্থাৎ যে সময় সেটা আছে বলে মনে হয়, সেই সময়ও তা প্রতি মুহূর্তে বিনাশের পথে যাচ্ছে, অ-ভাবে যাচ্ছে। সুতরাং বুদ্ধিমান ব্যক্তির উচিত যেন সে উৎপত্তি ও বিনাশশীল সাংসারিক সৎ-চিৎ-আনন্দতে বদ্ধ না হয়।

পরমাত্মাকে 'সৎ' বলার তাৎপর্য এই যে পরমাত্মা অসৎ থেকে খুবই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ; এখানে অসৎ বলে কিছু নেই-ই। যেমন উৎপন্ন হওয়া বস্তুকে অঙ্গুলি দ্বারা নির্দিষ্ট করে লক্ষ্য করানো যায়, ঠিক সেইভাবে এই পরমাত্মাকে অঙ্গুলি নির্দেশে দেখানো যায় না।

সেই পরমাত্মাকে 'চিৎ' বলা হয়, কিন্তু এই 'চিৎ' জাগতিক প্রকাশ-অপ্রকাশ, জ্ঞান-অজ্ঞান, চেতন-জড় এইসবের মত নয়। কারণ সাংসারিক প্রকাশ বা অপ্রকাশ কোন কিছুর সাপেক্ষে ঘটে, যেমন চক্ষু যেখানে কাজ করে, সেখানে প্রকাশ, কিন্তু চক্ষু যেখানে কাজ করে না সেখানে অন্ধকার। সাংসারিক জ্ঞান-অজ্ঞানও কোন কিছুর সাপেক্ষে ঘটে অর্থাৎ বুদ্ধি যেখানে কার্য করে, সেখানে জ্ঞান উদ্ভাসিত হয় আর বুদ্ধি যেখানে কাজ করে না সেখানে অজ্ঞানতা। সাংসারিক চেতনা জড়ের সাপেক্ষে বিদ্যমান। কিন্তু পরমাত্মা এইরূপ অপ্রকাশ, অজ্ঞান এবং জড়ের সাপেক্ষে 'চিৎ' নন ; সেখানে অপ্রকাশ, অজ্ঞান এবং জড়ত্বের কোন চিহ্ন নেই। এর তাৎপর্য এই যে পরমাত্মায় প্রকাশহীনতা, অজ্ঞানতা বা জড়তা বলে কিছু থাকে না।

জগতে হয় সুখ ঘটে অথবা দুঃখ, কিংবা শান্তি হয় অথবা অশান্তি। এ সমস্তই দ্বন্দ্ব। পারমার্থিক সুখে (আনন্দে) দুঃখ বা অশান্তি বলে কিছু নেই। সেই সুখ সাংসারিক সুখ-শান্তি থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। এর তাৎপর্য হচ্ছে এই যে পারমার্থিক সৎ, চিৎ এবং আনন্দ—এই তিনটিই দ্বন্দ্বাতীত।

(৬২) গীতায় অষ্টাঙ্গযোগের বর্ণনা

সর্বযোগময়ী গীতা সর্বসাধনসিদ্ধিদা।
তস্মাদষ্টাঙ্গযোগস্য বর্ণনং ন যথাক্রমম্॥

পাতঞ্জল যোগদর্শনে যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান এবং সমাধি—এই অষ্ট অঙ্গের বর্ণনা অষ্টাঙ্গযোগের প্রতিপাদ্য বিষয়—'যমনিয়মাসনপ্রাণায়ামপ্রত্যাহারধারণাধ্যানসমাধয়োঽষ্টাবঙ্গানি' (যোগদর্শন ২।২৯)। গীতায় ভগবান অষ্টাঙ্গ যোগের ক্রম-অনুসারে বর্ণনা করেন নি, কিন্তু ভগবানের বাণীর বিশেষত্ব এমনই যে অন্য যোগ-সাধনের বর্ণনার সঙ্গে অষ্টাঙ্গযোগের বর্ণনাও তাঁর বাণীর অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, যেমন—

(১) যম—অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য এবং অপরিগ্রহ—এই পাঁচটি 'যম'-এর অন্তর্ভুক্ত '**অহিংসাসত্যাস্তেয়ব্রহ্মচর্যাপরিগ্রহা যমাঃ**' (যোগদর্শন ২।৩০)। গীতায় '**অহিংসা**' (১০।৫, ১৩।৭; ১৬।২; ১৭।১৪) পদে অহিংসার; '**সত্যম্**' (১৬।২; ১৭। ১৫) পদদ্বারা সত্যের, '**স্তেন এব সঃ**' (৩।১২) পদে বিধিমুখে 'অস্তেয়'র; '**ব্রহ্মচারিব্রতে স্থিতঃ**' (৬।১৪); '**ব্রহ্মচর্যং চরন্তি**' (৮।১১); '**ব্রহ্মচর্যম্**' (১৭।১৪) পদদ্বারা ব্রহ্মচর্যের এবং '**ত্যক্তসর্বপরিগ্রহঃ**' (৪।২১), '**অপরিগ্রহঃ**' (৬।১০) '**অহংকারং.........পরিগ্রহম্**'। **বিমুচ্য......** (১৮।৫৩) পদদ্বারা 'অপরিগ্রহে'র বর্ণনা করা হয়েছে।

(২) নিয়ম—শৌচ, সন্তোষ, তপ, স্বাধ্যায় এবং ঈশ্বর-প্রণিধান—এই পাঁচটিকে 'নিয়ম' বলা হয়—'**শৌচসন্তোষতপঃস্বাধ্যায়েশ্বরপ্রণিধানানি নিয়মাঃ**' (পাতঞ্জল ২।৩২)। গীতায় '**শৌচম্**' (১৩।৭, ১৬।৩; ১৭।১৪, ১৮।৪২) পদদ্বারা 'শৌচ' এবং **যদৃচ্ছালাভসন্তুষ্টঃ** (৪।২২); '**আত্মন্যেব চ সন্তুষ্টঃ**' (৩।১৭), '**তুষ্টি**' (১০।৯), '**সন্তুষ্টঃ**' (১২।১৪), '**সন্তুষ্টো যেন কেনচিৎ**' (১২।১৯) পদদ্বারা 'সন্তোষের', '**যত্তপস্যসি**' (৯।২৭), '**তপঃ**' (১৬।১; ১৭।১৪-১৬) পদদ্বারা 'তপে'র; '**স্বাধ্যায়জ্ঞানযজ্ঞাশ্চ**' (৪।২৮), '**স্বাধ্যায়াভ্যসনম্**' (১৭।১৫), '**অধ্যেষ্যতে চ য ইমং ধর্ম্যং সংবাদমাবয়োঃ**' (১৮।৭০) পদদ্বারা 'স্বাধ্যায়'এর; '**মামাশ্রিত্য যতন্তি**' (৭।২৯), '**তমেব শরণং গচ্ছ**' (১৮।৬২), '**মামেকং শরণং ব্রজ**' (১৮।৬৬), পদগুলির দ্বারা '**ঈশ্বর-প্রণিধানের**' বর্ণনা করা হয়েছে।

(৩) আসন—স্থিরভাবে স্বচ্ছন্দে বসার নাম—'আসন'—'**স্থিরসুখমাসনম্**' (পাতঞ্জল ২।৪৬)। গীতায় '**সমং কায়শিরোগ্রীবং ধারয়ন্নচলং স্থিরঃ**'। '**সম্প্রেক্ষ্য নাসিকাগ্রং স্বং দিশশ্চানবলোকয়ন্**' (৬।১৩)—এই শ্লোকটিতে 'আসন'-এর বর্ণনা করা হয়েছে।

(৪) প্রাণায়াম—শ্বাস-প্রশ্বাসের গতিকে নিরুদ্ধ করার নাম 'প্রাণায়াম'—'**তস্মিন্সতি শ্বাসপ্রশ্বাসয়োর্গতিবিচ্ছেদঃ প্রাণায়ামঃ**' (পাতঞ্জল ২।৪৯)। গীতায় '**প্রাণাপানগতী রুদ্ধ্বা প্রাণায়ামপরায়ণাঃ**' (৪।২৯), '**প্রাণাপানৌ সমৌ কৃত্বা**' (৫।২৭), '**ভ্রুবোর্মধ্যে প্রাণমাবেশ্য সম্যক্**' (৮।১০), '**মূর্ধ্ন্যাধায়াত্মনঃ প্রাণম্**' (৮।১২) পদের দ্বারা 'প্রাণায়ামের' বর্ণনা করা হয়েছে।

(৫) প্রত্যাহার—ইন্দ্রিয়গুলিকে নিজ নিজ বিষয় হতে সরিয়ে আনাকে 'প্রত্যাহার' বলে—'**স্ববিষয়াসম্প্রয়োগে চিত্তস্বরূপানুকার ইবেন্দ্রিয়াণাং প্রত্যাহারঃ**' (পাতঞ্জল ২।৫৪)। গীতায় '**ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যঃ**' (২।৫৮, ৬৮), '**তানি সর্বাণি সংযম্য**' (২।৬১), '**শ্রোত্রাদীনীন্দ্রিয়াণ্যন্যে সংযমাগ্নিষু জুহ্বতি**' (৪।২৬) পদগুলির দ্বারা 'প্রত্যাহার'-এর বর্ণনা করা হয়েছে।

(৬) ধারণা—পরমাত্মায় মনঃ সংযোগ করাকে বলা হয় 'ধারণা'—'**দেশবন্ধশ্চিত্তস্য ধারণা**' (পাতঞ্জল ৩।১)। গীতায় '**মনঃ সংযম্য**' (৬।১৪), '**যতো যতো নিশ্চরতি মনশ্চঞ্চলমস্থিরম্। ততস্ততো নিয়ম্যৈতদাত্মন্যেব বশং নয়েৎ**' (৬।২৬), '**মচ্চিত্তাঃ**' (১০।৯), '**ময্যেব মন আধৎস্ব**' (১২।৮), '**মচ্চিত্তঃ সততং ভব**'

(১৮।৫৭), 'মচ্চিত্তঃ' (১৮।৫৮) পদগুলিতে 'ধারণা'র বর্ণনা করা হয়েছে।

(৭) ধ্যান—যে বিষয়ে চিত্তকে লগ্ন করা হয় সেই বিষয়ে সাধকের একাগ্র হওয়াকেই 'ধ্যান' বলা হয়—**'তত্র প্রত্যৈকতানতাধ্যানম্'** (পাতঞ্জল ৩।২)। গীতায় **'তত্রৈকাগ্রং মনঃ কৃত্বা'** (৬।১২), **'চেতসা নান্যগামিনা'** (৮।৮), **'মাং ধ্যায়ন্তঃ'** (১২।৬), **'ধ্যানেনাত্মনি পশ্যন্তি'** (১৩।২৪), **'ধ্যানযোগপরো নিত্যম্'** (১৮।৫২), ইত্যাদি পদদ্বারা 'ধ্যানে'র বর্ণনা করা হয়েছে।

(৮) সমাধি—ধ্যান করতে করতে চিত্ত যখন ধ্যেয় বস্তুতে তদাকার হয়ে যায়, তখন চিত্তবৃত্তির জ্ঞান থাকে না ; ধ্যানের সেই অবস্থার নাম 'সমাধি'—**'তদেবার্থমাত্রনির্ভাসং স্বরূপশূন্যমিব সমাধিঃ'** (পাতঞ্জল ৩।৩)। গীতায় **'আত্মসংযমযোগাগ্নৌ জুহ্বতি জ্ঞানদীপিতে'** (৪।২৭) পদগুলিতে 'সমাধি' বর্ণিত হয়েছে।

উপরিউক্ত 'অষ্টাঙ্গযোগ'-এর বর্ণনায় গীতার সার কথা এই যে মানুষ সংসার থেকে সরে গিয়ে নিজেকে যেন পরমাত্মায় লগ্ন করে।

(৬৩) গীতায় দ্বিবিধা ভক্তি

ভক্তির্দ্বিধাঽমন্যত কৃষ্ণগীতা ভক্তস্য ভাবেন চ যোগ্যতায়াঃ।
কৃষ্ণে রতিস্তস্য জপাদিকর্ম সংসারকর্ম প্রভুভক্তিভাবঃ॥

ভগবান গীতায় নিজ ভক্তির কয়েকটি প্রকার বর্ণনা করলেও পরিশেষে প্রধানতঃ দুই প্রকারের কথা বলেছেন—

ভক্তির প্রথম প্রকার—যাতে ক্রিয়া এবং ভাব দুই-ই ভগবদ্‌বিষয়ক হয়। যেমন—জপ-ধ্যান, পূজা-পাঠ, স্বাধ্যায়-সৎসঙ্গ, ভগবৎসম্বন্ধীয় গ্রন্থের পঠন-পাঠন, শ্রবণ-মনন ইত্যাদি সকল ক্রিয়াই ভগবৎসম্বন্ধীয় এবং এর দ্বারা ভগবদ্ভাব বৃদ্ধি পায় (১০।৮-৯)।

ভক্তির অপর প্রকার হচ্ছে এই, সাংসারিক ক্রিয়ার মধ্যেও ভগবদ্ভাব থাকে ; যেমন—নিজ নিজ বর্ণাশ্রম অনুযায়ী কর্তব্যের পালন ইত্যাদি 'জীবিকা-সম্বন্ধীয়' ক্রিয়া এবং খাওয়া-দাওয়া, ওঠা-বসা, চলা-ফেরা, শয়ন-জাগরণ ইত্যাদি 'শরীর-সম্বন্ধীয়' ক্রিয়া। কিন্তু এগুলি করার সময় ভগবদ্ভাব এবং ভগবৎপ্রসন্নতার, ভগবৎপূজনের ভাবই থাকে (৯।২৭, ১৮।৪৬, ৩।৩০ ইত্যাদি)।

এর তাৎপর্য এই যে ভক্তির উপর্যুক্ত দুই প্রকারের ক্রিয়াতে পার্থক্য আছে অর্থাৎ প্রথমটি ভগবৎসম্বন্ধীয় এবং দ্বিতীয়টি সংসার-সম্বন্ধীয়। কিন্তু উভয় ক্রিয়াই ভগবদর্থে বা ভগবানের প্রসন্নতার জন্য করার ফলে উভয়ের ভাব একই থাকে। ক্রিয়াসমূহ ভগবৎ-সম্বন্ধীয় হোক বা সংসার-সম্বন্ধীয় হোক এতে সাংসারিক আকর্ষণ না হয়ে শুধু ভগবানেই যদি আকর্ষণ হয়, তাহলে দুই প্রকারের ভক্তিই ভগবানের প্রতি হয়ে যায়। যেমন ক্ষুধা সকলেরই একই প্রকারের হয় এবং ভোজনের পর ক্ষুধার নিবৃত্তি হলে তৃপ্তিও একই রকমের হয় কিন্তু সকলের ভোজনের রুচি পৃথক্ পৃথক্ হয়। এইরূপ দু'প্রকারের ভক্তের প্রথমে ভগবৎপ্রাপ্তিই উদ্দেশ্য থাকলে পরিশেষে দুজনের প্রাপ্তিই অভিন্ন হয়। তবে সাধনায় পার্থক্য থাকে।

(৬৪) গীতায় নবধা ভক্তি

কথিতা নবধা ভক্তিঃ শ্রবণাদিস্বরূপিণী।
যয়া কয়াঽপি সংযুক্তো হরিং প্রাপ্নোতি মানবঃ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে সাধন-ভক্তির নয় প্রকার পথের কথা বলা হয়েছে, যা 'নবধা ভক্তি' নামে প্রসিদ্ধ[১]। গীতায় ভগবান ক্রমঅনুসারে নবধা ভক্তির বর্ণনা না করলেও ভগবানের বাণী এতো সবিশেষ যে তাতে অন্য সাধনের বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে নবধা ভক্তির বর্ণনাও এসেছে ; যেমন—

(১) শ্রবণ—'যেসব ব্যক্তি তত্ত্বজ্ঞ জীবন্মুক্ত মহাপুরুষদের বাণী শ্রবণ ও তদনুসারে উপাসনা করে, এরূপ শ্রবণ-পরায়ণ ব্যক্তি মৃত্যুকে অতিক্রম করে' (১৩।২৫)।

(২) কীর্তন—যেসব ভক্ত প্রীতিপূর্বক আমার নাম, রূপ, লীলা ইত্যাদি কীর্তন করে (৯।১৪) ; হে হৃষীকেশ ! তোমার নাম, রূপ ইত্যাদি কীর্তনে সমস্ত জগৎ হৃষ্ট হয় এবং তোমার প্রতি অনুরক্ত হয়' (১১।৩৬)।

(৩) স্মরণ—যে ব্যক্তি অনন্যচিত্ত হয়ে নিত্য-নিরন্তর আমায় স্মরণ করে (৮।১৪) ; মহাত্মা ব্যক্তিগণ অনন্যচিত্তে আমাকে স্মরণ করে আমার উপাসনা করেন (৯।১৩) ; তুমি সর্বদা আমাতে মদ্‌গতচিত্ত হও (১৮।৫৭) ; মদ্‌গতচিত্ত হলে তুমি আমার কৃপায় সমস্ত বাধা অতিক্রম করবে (১৮।৫৮)।

(৪) পাদবন্দনা—'ভক্ত প্রীতিপূর্বক আমাকে নমস্কার করে আমার উপাসনা করে' (৯।১৪)।

(৫) অর্চনা—যাঁহা হতে সমস্ত প্রাণী উৎপন্ন হয়েছে এবং যিনি সর্বব্যাপী, সেই পরমাত্মাকে নিজ কর্মের দ্বারা অর্চনা (পূজা) করে মানুষ সিদ্ধিলাভ করে (১৮।৪৬) ; 'তুমি আমার পূজনকারী হও, তাহলে তুমি আমাকেই প্রাপ্ত হবে।' (৯।৩৪ ; ১৮।৬৫)।

(৬) বন্দনা—'তুমি আমাকে নমস্কার কর, তাহলে আমাকেই তুমি লাভ করবে (৯।৩৪ ; ১৮।৬৫) ; হে প্রভু ! তোমাকে সহস্রবার নমস্কার করি, নমস্কার করি (১১।৩৯) ; হে সর্বাত্মন্ ! তোমাকে সম্মুখে নমস্কার, পশ্চাতে নমস্কার এবং সকল দিকেই নমস্কার (১১।৪০)। হে প্রভু ! আমি দণ্ডবৎ হয়ে প্রণাম করে তোমাকে প্রসন্ন করতে ইচ্ছা করি' (১১।৪৪)।

(৭) দাস্য—'তুমি আমার ভক্ত হও, তাহলে তুমি আমাকেই পাবে' (৯।৩৪ ; ১৮।৬৫) ; হে কৃষ্ণ ! আমি আপনার শিষ্য (দাস) (২।৭) ; 'হে পার্থ ! তুমি আমার ভক্ত' (৪।৩)।

(৮) সখ্য—'তুমি আমার প্রিয় সখা' (৪।৩) ; হে কৃষ্ণ ! সখা যেমন সখাকৃত অপমান সহ্য করে অর্থাৎ ক্ষমা করে দেয়, তেমনি তুমিও আমাকৃত অপমান সহ্য করতে সক্ষম' (১১।৪৪)।

(৯) আত্মনিবেদন— সেই আদিপুরুষ পরমাত্মার শরণ নেওয়া উচিত (১৫।৪) ; তুমি সর্বতোভাবেই সেই অন্তর্যামী পরমাত্মার শরণ গ্রহণ কর (১৮।৬২), তুমি সকল ধর্মের আশ্রয় পরিত্যাগ করে একমাত্র আমারই শরণ নাও (১৮।৬৬)।

এইপ্রকারে উপরিউক্ত স্থানে ভগবান সাধন-ভক্তির বর্ণনা করেছেন ; এবং **'সংসিদ্ধিং পরমাং গতাঃ'** (৮।১৫), **'মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্'** (১৮।৫৪), **'ভক্তিং ময়ি পরাং কৃত্বা'** (১৮।৬৮)—এই পদ গুলির দ্বারা ভগবান সাধ্য (পরা) ভক্তির বর্ণনা করেছেন[২]।

---

[১]'শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্। অর্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্'॥ (শ্রীমদ্ভাগবত ৭।৫।২৩)

[২]সাধন-ভক্তি দ্বারা সাধ্য-ভক্তি প্রাপ্ত হয়। 'ভক্ত্যা সংজাতয়া ভক্ত্যা' (শ্রীমদ্ভাগবত ১১।৩।৩১)।

(৬৫) গীতায় ভক্তিযোগের প্রাধান্য

সর্বাধ্যায়েষু গীতায়াং স্বভক্তির্গৌরবান্বিতা।
তস্মাদ্ধি ভগবন্নিষ্ঠা সর্বযোগেষু সত্তমা॥

বিচার করলে দেখা যায় যে, গীতায় ভগবান ভক্তির কথাই বিশেষভাবে বলেছেন। যেখানে অর্জুন ভক্তির বিষয়ে কোন প্রশ্ন করেননি অথবা যেখানে কর্মযোগ বা জ্ঞানযোগের প্রসঙ্গ রয়েছে সেখানেও ভগবান নিজে থেকেই ভক্তির কথা বলেছেন, যেমন—

দ্বিতীয় অধ্যায়ে কর্মযোগের বর্ণনায় যেখানে স্থিত-প্রজ্ঞের লক্ষণ বর্ণিত হয়েছে সেখানে ভগবান **'মৎপরঃ'** (২।৬১) পদদ্বারা তৎপরায়ণ হওয়ার কথা বলেছেন। ভগবান ভক্তিকে তাঁরই নিষ্ঠা বলে মনে করেন, সাধকের নিষ্ঠা নয়। এইজন্য তৃতীয় অধ্যায়ে তৃতীয় শ্লোকে দ্বিবিধ নিষ্ঠা—সাংখ্যযোগ এবং কর্মযোগের বর্ণনা করেছেন আর ভক্তির কথা সযত্নে অন্তরালে রেখেছেন। কর্মযোগের বর্ণনা করতে গিয়ে ভগবানই সেই ভক্তির কথা **'ময়ি সর্বাণি কর্মাণি সন্ন্যস্য'** (৩।৩০) পদদ্বারা উল্লেখ করেছেন। চতুর্থ অধ্যায়ে যোগের পরম্পরা জানাতে গিয়ে 'আমিই সৃষ্টির আদিতে যোগের উপদেশ দিয়েছিলাম'—এই কথায় পরম রহস্যের ইঙ্গিত করেছেন। তাই সেখানে **'ভক্তোঽসি মে সখা চেতি রহস্যং হ্যেতদুত্তমম্'** (৪।৩) পদেও ভক্তির প্রকাশ দেখা যায়। চতুর্থ শ্লোকে অর্জুনের প্রশ্নের পর ভগবান পঞ্চম থেকে চতুর্দশ শ্লোক পর্যন্ত অবতারের প্রসঙ্গে বিশেষভাবে ভক্তির কথাই বলেছেন। আবার পঞ্চম অধ্যায়ে দ্বিবিধা নিষ্ঠার কথা বলে প্রথম দশটি শ্লোকে (**ব্রহ্মণ্যাধায় কর্মাণি**) এবং পরে উনত্রিশ সংখ্যক শ্লোকে (**ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং** ......) নিজে থেকে ভগবৎ নিষ্ঠার বর্ণনা করেছেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়ে ধ্যানযোগের বর্ণনা করতে গিয়ে **'মচ্চিত্তো যুক্ত আসীত মৎপরঃ'** (৬।১৪), **'যো মাং পশ্যতি সর্বত্র** ....' (৬।৩০) ; **'সর্বভূতস্থিতং যো মাং ভজত্যেকত্বমাস্থিতঃ'** (৬।৩১) এবং **'শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাম্'** (৬।৪৭)—এই শ্লোকগুলিতে ভক্তির কথা বলেছেন। সপ্তম থেকে দ্বাদশ অধ্যায় পর্যন্ত মুখ্যভাবে ভগবৎনিষ্ঠারই বর্ণনা আছে। ত্রয়োদশ অধ্যায়ে জ্ঞানযোগের বর্ণনা করতে গিয়ে **'ময়ি চানন্যযোগেন ভক্তিরব্যভিচারিণী'** (১৩।১০) এবং **'মদ্ভক্তঃ'** (১৩।১৮) পদগুলির দ্বারা ভক্তির কথাই বলা হয়েছে। আবার চতুর্দশ অধ্যায়ে **'মাং চ যোঽব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে'** (১৪।২৬) এবং **'ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহম্'**.... (১৪ । ২৭)—শ্লোকগুলিতে ভক্তির বর্ণনা করা হয়েছে। পঞ্চদশ অধ্যায় তো ভক্তির কথাতেই পরিপূর্ণ। ষোড়শ অধ্যায়ে দৈবী সম্পদ্‌রূপে ভক্তিযোগী সাধকদের লক্ষণগুলির বর্ণনা রয়েছে। সপ্তদশ অধ্যায়ের তেইশ থেকে সাতাশ সংখ্যক শ্লোক পর্যন্ত 'ওঁ তৎ সৎ'—এই নামগুলির রূপে ভক্তির বর্ণনা করা হয়েছে। অষ্টাদশ অধ্যায়ে **'স্বকর্মণা তমভ্যর্চ্য'** (১৮।৪৬) **'মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্'** (১৮।৫৪) এবং **'ভক্ত্যা মামভিজানাতি'** (১৮।৫৫) পদগুলিতে ভক্তিরই কথা বলেছেন। অষ্টাদশ অধ্যায়ের ছাপ্পান্ন সংখ্যক শ্লোক থেকে ছেষট্টি সংখ্যক শ্লোক পর্যন্ত ভগবৎনিষ্ঠার কথাই মুখ্যভাবে বর্ণিত হয়েছে।

জ্ঞানযোগী এবং কর্মযোগীর মধ্যে নিজ কল্যাণের ইচ্ছা থাকে এবং সেই উদ্দেশ্যেই তাঁরা সাধন-ভজনে ব্রতী হন। ভক্তিযোগীও সাধনার প্রারম্ভে নিজ কল্যাণই কামনা করেন, কিন্তু যখন ভগবানে তাঁর শ্রদ্ধা-ভক্তি বৃদ্ধি পেতে থাকে, তখন আর তাঁর দৃষ্টি নিজ কল্যাণের দিকে থাকে না, তখন তাঁর দৃষ্টি ভগবানের প্রতি নিবদ্ধ হয়। তখন তাঁর কল্যাণ করার দায়িত্ব ভগবানের উপর ন্যস্ত হয় (১০।৮-১১ ; ১২।৬-৭ ; ১৮।৬৬)।

গীতার ভক্তিযোগে জ্ঞানযোগ এবং কর্মযোগের প্রসঙ্গও এসেছে, যেমন—'যে ব্যক্তি অব্যভিচারী ভক্তিযোগ দ্বারা আমার সেবা করে, সে গুণসমূহের অতীত হয়ে ব্রহ্মপ্রাপ্তির যোগ্য হয় (১৪।২৬)'। অর্থাৎ মানুষ যেমন জ্ঞানযোগের দ্বারা গুণাতীত হয়, তেমনি ভক্তিযোগ দ্বারাও গুণাতীত হয়ে যায়। সেইসব ভক্তদের উপরে কৃপা করবার জন্য তাদের স্বরূপস্থিত-আমি তাদের

অজ্ঞান অন্ধকারকে জ্ঞানরূপ প্রদীপ দ্বারা সর্বতোভাবে নাশ করি (১০।১১) অর্থাৎ ভক্তিযোগ দ্বারাও তত্ত্ববোধ (স্বরূপজ্ঞান) হয়। ভগবান ত্রয়োদশ অধ্যায়ে যেখানে সাধনসমূহের বর্ণনা করেছেন, সেখানে তিনি তাঁর অব্যভিচারিণী ভক্তিকেও তত্ত্বজ্ঞান লাভের উপায় বলে জানিয়েছেন (১৩।১০)।

সমস্ত কর্ম যে পরমাত্মাকে অর্পণ করে, সে জলেস্থিত কমলপত্রের ন্যায় পাপ দ্বারা লিপ্ত হয় না (৫।১০) ; কারণ পদ্মপত্র জলে স্থিত হয়েও নির্লিপ্ত থাকে, নির্লিপ্ত অবস্থাতেই জলে থাকে। কর্মযোগের কথায় ভগবান কর্মযোগীদের জন্যও বলেছেন যে, তিনি কর্ম করেও নির্লিপ্ত থাকেন এবং নির্লিপ্ত হয়েই কর্ম করেন (৪।১৮)। এইরূপেই 'সর্বকর্মফলত্যাগম্' (১২।১১), 'সঙ্গবর্জিতঃ' (১১।৫৫) এবং 'স্বকর্মণা' (১৮।৪৬) পদেও কর্মযোগের কথা ভক্তিযোগে বলা হয়েছে।

গীতায় জ্ঞানযোগ দ্বারা পরাভক্তি (প্রেম) প্রাপ্তির (১৮।৫৪) এবং কর্মযোগ দ্বারা জ্ঞানের প্রাপ্তির (৪।৩৮) কথা বলা হয়েছে ; কিন্তু ভক্তি দ্বারা ভগবদ্দর্শন, ভগবৎতত্ত্বের জ্ঞান এবং ভগবৎতত্ত্বে প্রবেশ—এই তিনটিই হয়ে যায় (১১।৫৪)। এই বিশেষত্ব ভক্তিযোগেই আছে, অন্য যোগে নেই।

(৬৬) শরণাগতিতেই গীতার আরম্ভ ও অবসান

আদাবন্তে চ গীতায়াং প্রোক্তা বৈ শরণাগতিঃ।
আদৌ শাধি প্রপন্নং মামন্তে মাং শরণং ব্রজ॥

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জুন একসঙ্গেই থাকতেন। একসঙ্গে থাকলেও অর্জুন যতক্ষণ ভগবানের শরণাগত হয়ে নিজ কল্যাণের কথা জিজ্ঞাসা না করেছেন, ততক্ষণ পর্যন্ত ভগবান তাঁকে উপদেশ দেন নি। মানুষ কখন শরণাগত হয় ? যখন সে প্রকৃতপক্ষে নিজ কল্যাণ চায়, কিন্তু কল্যাণের কোনও পথ খুঁজে পায় না এবং তার নিজের শক্তি, বুদ্ধি, যোগ্যতা ইত্যাদিতে কাজ হয় না, তখন সে গুরু, গ্রন্থাদি অথবা ভগবানের শরণাগত হয়। অর্জুনেরও এই দশা হয়েছিল। ক্ষাত্রধর্মের দৃষ্টিতে তাঁর যুদ্ধ করা উচিত মনে হয়েছিল, কিন্তু কুলনাশের কথা ভেবে যুদ্ধ করা অনুচিত মনে হয়েছিল। এইজন্য যুদ্ধ করা উচিত কিনা—তা স্থির করতে পারছিলেন না। যদি ভগবানের সম্মতিক্রমে যুদ্ধ করাও হয় তাহলে যুদ্ধে জয় হবে, না পরাজয় হবে তাও জানতেন না আবার যুদ্ধে কুটুম্ব বধ করে তিনি বেঁচে থাকতেও চাইছিলেন না (২।৬)। এইরূপ পরিস্থিতিতে অর্জুন ভগবানের শরণাগত হয়েছিলেন (২।৭)।

ভগবানের শরণাগত হওয়ার পরেও অর্জুনের মনে এই চিন্তা জাগল যে, 'যুদ্ধ দ্বারা খুব বেশী হলে পৃথিবীর ধনধান্যপূর্ণ রাজ্যই লাভ হতে পারে। তার চেয়েও বেশী কিছু হলে দেবতাদের আধিপত্য পাওয়া যেতে পারে ; কিন্তু এর দ্বারা আমার ইন্দ্রিয়শিথিলকারী শোক দূরীভূত হবে না' (২।৮)। দ্বিতীয়তঃ 'আমি ভগবানের শরণাগত হওয়াতে তিনি অনতিবিলম্বে এই আদেশ দিতে পারেন যে, তুমি যুদ্ধ কর। কিন্তু যুদ্ধে আমি কোন লাভই দেখতে পাচ্ছি না।' সুতরাং অর্জুন ভগবানের উত্তরের অপেক্ষা না করেই পরিষ্কার জানিয়ে দিলেন যে, 'আমি যুদ্ধ করব না'—'ন যোৎস্যে' (২।৯)।

মানুষ যাঁর শরণাগত হয়, তাঁর কথা যদি বুঝতে অসুবিধা হয়, তাহলেও সেই ব্যক্তির ওপর তার অটল বিশ্বাস থাকা উচিত যে এঁর কথা শুনলে তার ভালোই হবে। অর্জুনেরও ভগবানের ওপর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, 'যদিও আমি যুদ্ধ করাতে কোনরূপ লাভ দেখছি না, তবুও ভগবান যেরূপ আদেশই প্রদান করুন, তা ঠিকই হবে।' এইজন্য গীতায় অর্জুন ভগবানের কথায় নানাপ্রকার প্রশ্ন করলেও ভগবান হতে বিমুখ হন নি।

অর্জুনের প্রশ্নের উত্তরে এবং নিজের দিক থেকেও ভগবান অনেক অন্তরঙ্গ কথা বলেছেন এবং নিজের

শরণাগতির কথাও বলেছেন, কিন্তু এই কথা অর্জুনের পুরোপুরি মনঃপুত হয় নি। শেষে ভগবান বলেছেন যে, 'তুমি সবার হৃদয়ে বিরাজমান সর্বব্যাপী ঈশ্বরের শরণাগত হও ; তাঁর কৃপায় তোমার সংসারের আসক্তি সর্বতোভাবে দূর হবে এবং অবিনাশী পদ লাভ হবে (১৮।৬২)। আমি তোমাকে এই অতি গোপনীয় কথাটি বললাম, এরপর তোমার যা ইচ্ছা হয়, কর'—**'যথেচ্ছসি তথা কুরু'** (১৮।৬৩)।

অর্জুনের এক উল্লেখযোগ্য বিশেষত্ব এই যে তিনি কোনও অবস্থাতেই ভগবান থেকে বিমুখ হননি। তারই জন্য ভগবান যখন বললেন যে 'যেমন তোমার ইচ্ছা, তেমন কর', তখন অর্জুন উদ্বিগ্ন হয়ে গেলেন, ব্যাকুল হয়ে পড়লেন। তখন ভগবান তাঁকে গুহ্যতম উপদেশ দিতে গিয়ে বললেন যে, 'তুমি সমস্ত ধর্মের আশ্রয় পরিত্যাগ করে একমাত্র আমার শরণাগত হও আমি তোমাকে সর্বপাপ হতে পরিত্রাণ করব, তুমি এর জন্য শোক বা চিন্তা কোরো না'[১]। ভগবানের এই কথা শুনে অর্জুন সর্বতোভাবে ভগবানের শরণাগত হলেন, নিজের বুদ্ধির ওপর আর তাঁর নির্ভরতা রাখলেন না। অর্জুন জানালেন যে, হে অচ্যুত ! আপনার কৃপাতেই আমার মোহ সর্বতোভাবে দূরীভূত হয়েছে। এখন থেকে আমি শুধু আপনার নির্দেশই পালন করব—**'করিষ্যে বচনং তব'** (১৮।৭৩)। এরূপ বলে অর্জুন ক্ষান্ত হলেন এবং ভগবানও আর কিছু বললেন না অর্থাৎ অর্জুন সর্বতোভাবে ভগবানের শরণাগত হওয়ায় অর্জুনকে তাঁর কিছু বলার রইল না।

(৬৭) গীতায় আশ্রয়ের বর্ণনা

যাবজ্জীবো ন গৃহ্ণীয়াদ্ধরেশ্চ চরণাশ্রয়ম্।
তাবন্ন চ তরেৎ কশ্চিন্মৃত্যুসংসারসাগরাৎ॥

জীবমাত্রেরই স্বভাব হচ্ছে যে সে কারো না কারো আশ্রয় গ্রহণ করতে চায় এবং আশ্রিত থাকে। মনুষ্য, পশু, পক্ষী, বৃক্ষ, লতা ইত্যাদি সমস্তই কারো না কারো আশ্রয় গ্রহণ করে থাকে, কারণ জীবমাত্রই সাক্ষাৎ পরমাত্মার অংশ। তারই জন্য জীব যতক্ষণ নিজ অংশী পরমাত্মার আশ্রয় গ্রহণ না করে, ততক্ষণ সে অপরের আশ্রয় নিতে থাকে, পরাধীন হতে থাকে এবং দুঃখও পেতে থাকে।

মানুষের বিবেকবোধ আছে অথচ নিজ বিবেককে গুরুত্ব না দিয়ে সে স্বয়ং সাক্ষাৎ অবিনাশী পরমাত্মার চেতন অংশ হওয়া সত্ত্বেও বিনাশশীল জড়বস্তুর আশ্রয় গ্রহণ করে অর্থাৎ শরীর, বল, বুদ্ধি, যোগ্যতা, আত্মীয়-পরিজন, ধন-সম্পত্তি ইত্যাদির আশ্রিত হয়—এটি মনুষ্য-জীবনের একটি মারাত্মক ভ্রান্তি।

গীতায় অর্জুন ভগবানের আশ্রয় গ্রহণ করেই নিজ কল্যাণের কথা জিজ্ঞাসা করেছেন (২।৭)। যতক্ষণ পর্যন্ত অর্জুন ভগবানের আশ্রয় গ্রহণ করেন নি, ততক্ষণ গীতার উপদেশ আরম্ভ হয় নি। উপদেশের শেষেও ভগবান তাঁর আশ্রয় নেওয়ার কথাই বলেছেন (১৮।৬৬)। এইপ্রকারে গীতার উপদেশের আরম্ভ এবং অবসানে ভগবৎ আশ্রয়েরই কথা বলা হয়েছে।

ঈশ্বরপ্রদত্ত স্বাধীনতায় মানুষ তার ইচ্ছামতো যে কারোরই আশ্রয় গ্রহণ করতে পারে। সুতরাং কেউ কেউ নিজ কামনাপূর্তির উদ্দেশ্যে দেবতাদের আশ্রয় গ্রহণ করে (৭।২০), কিন্তু পরিণামে তারা বিনাশশীল ফলই লাভ করে থাকে (৭।২৩)। কিছু মানুষ ভোগাদি কামনায় বেদোক্ত সকাম অনুষ্ঠানের আশ্রয় নেয় এবং পরিণামে

[১]সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥
—এটি শরণাগতির মুখ্য শ্লোক। (গীতা ১৮।৬৬)

তারা পুনঃ পুনঃ মর্ত্যলোকে আগমন করে (৯।২১)।

কিছু মানুষ আবার ভগবানেরও আশ্রয় নেয় না এবং ভগবানকে ভগবান বলে মানে না, সুতরাং এইসব মানুষদের মধ্যে কেউ আসুরীভাবের আশ্রয় নেয় (৭।১৫) ; কিছু ব্যক্তি আসুরী, রাক্ষসী এবং মোহিনী প্রকৃতির আশ্রয় নেয় (৯।১২) ; কেউ কেউ অপূরণীয় কামনায় বশীভূত থাকে (১৬।১০) ; কেউ আমৃত্যু অপার চিন্তার আশ্রয় নেয় (১৬।১১) ; কেউ অহংকার, দুরাগ্রহ, গর্ব, কামনা এবং ক্রোধের আশ্রয় নেয় (১৬।১৮)। এই আশ্রয় নেওয়ার ফলস্বরূপ তাদের বারংবার চুরাশী লক্ষ যোনি এবং নরকে পরিভ্রমণ করতে হয় (১৬।১৯-২১)। এও তার এক ভ্রান্তি।

ভগবদ্‌মুখীন মানুষ ভগবানের এবং তাঁর দয়া, ক্ষমা, সমতা ইত্যাদি গুণগুলির (দৈবী সম্পদের) আশ্রয় গ্রহণ করে এবং পরিণামে ভগবানকে লাভ করে। সুতরাং গীতায় **'মামুপাশ্রিতাঃ'** (৪।১০) ; **'মদাশ্রয়ঃ'** (৭।১) ; **'মামেব যে প্রপদ্যন্তে'** (৭।১৪) ; **'মামাশ্রিত্য যতন্তি যে'** (৭।২৯) ; **'মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য'** (৯।৩২) ; **'মদ্ব্যপাশ্রয়ঃ'** (১৮।৫৬) **'তমেব শরণং গচ্ছ'** (১৮।৬২) ; **'মামেকং শরণং ব্রজ'** (১৮।৬৬) ইত্যাদি পদগুলিতে ভগবানের আশ্রয়ের কথা বলা হয়েছে ; এবং **'দৈবীং প্রকৃতিমাশ্রিতাঃ'** (৯।১৩) এবং **'বুদ্ধিযোগমুপাশ্রিত্য'** (১৮।৫৭) পদগুলিতে দৈবী সম্পদের আশ্রয়ের কথা বলা হয়েছে।[১]

এর তাৎপর্য এই যে গীতায় যেসকল সাধন প্রণালীর কথা বলা হয়েছে, তার মধ্যে সব থেকে শ্রেষ্ঠ এবং সহজ সাধন হলো ভগবানের শরণাগত হওয়া। যে ভগবানের শরণাগত হয়ে সাধনা করে তার সাধনার সিদ্ধি খুবই শীঘ্র এবং সহজে হয়। এই কথা ভগবান গীতায় স্পষ্টভাবেই বলেছেন, যে আমার শরণাগত হয়ে সমস্ত কর্ম আমাতে অর্পণ করে, আমি সেই ভক্তকে মৃত্যুরূপ সংসার-সাগর থেকে অচিরাৎ উদ্ধার করে থাকি (১২।৬-৭)। যারা আমার আশ্রয় নিয়ে মুক্তিলাভের জন্য যত্ন করে তারা ব্রহ্ম, অধ্যাত্ম এবং সম্পূর্ণ কর্ম তথা অধিভূত, অধিদৈব এবং অধিযজ্ঞ সহ আমাকে জানতে পারে অর্থাৎ আমার সমগ্ররূপ অবগত হয় (৭।২৯-৩০)। ভগবান তাঁর আশ্রয় গ্রহণকারী ভক্তদের সমস্ত যোগীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলে জানিয়েছেন (৬।৪৭)। সুতরাং সাধকদের উচিত তাঁরা যে সাধনাই করুন ভগবানের আশ্রয় নিয়েই তা করা।

জীব স্বয়ং পরমাত্মার অংশ এবং স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ-শরীর প্রকৃতির অংশ। ক্রিয়া এবং পদার্থের যে আশ্রয় তা স্থূল শরীরের আশ্রয় (স্থূল শরীর ছাড়াও অর্থ, গৃহ, পুত্র, পৌত্র, আত্মীয়, জমি-জায়গা ইত্যাদির যে আশ্রয় তা তো বিশেষভাবেই জড়ত্বের আশ্রয়)। বিদ্যা, বুদ্ধি, সদ্‌গুণ, যোগ্যতা প্রভৃতির যে আশ্রয় তথা চিন্তা, ধ্যান, মননের যে আশ্রয় তা সবই সূক্ষ্ম-শরীরের আশ্রয়। যাতে ব্যুত্থান (উত্তরণ) হয়, সেই সমাধির আশ্রয় নেওয়া হলো কারণ-শরীরের আশ্রয়। আর সমাধি দ্বারা যে সকল সিদ্ধি প্রাপ্তি হয়, নিজের মধ্যে যা মহত্ত্বরূপে প্রকাশিত হয় সে সবই সমাধিকেন্দ্রিক কার্যের আশ্রয়—এ সবই হলো বিনাশশীল বস্তুর আশ্রয়।

জপ-ধ্যান, কথা-কীর্তন ইত্যাদির আশ্রয় হলো সাধনের আশ্রয়। 'আমি ভগবানেরই'—এইপ্রকার ভগবানের সঙ্গে একমাত্র সম্পর্কিত হওয়া হলো সাধ্যের (ভগবানের) আশ্রয়। সাধনের আশ্রয় নিলে সাধন-ভজন করতে হয়, কিন্তু সাধ্যের আশ্রয় নিলে সাধন স্বতঃস্ফূর্ত হয়, করতে হয় না। বিনাশশীলের আশ্রয় দূরীভূত হলেই ভগবৎপ্রাপ্তির অনুভূতি স্বতঃই হয়ে যায়। কারণ ভগবান নিত্যপ্রাপ্ত, কেবল ক্ষণভঙ্গুর আশ্রয় গ্রহণই হলো ঈশ্বর-প্রাপ্তির একমাত্র অন্তরায়।

[১] দৈবী সম্পদের (ভগবানের গুণগুলির) আশ্রয় নেওয়া ভগবানেরই আশ্রয় নেওয়া বলে বিবেচিত হয়।

(৬৮) গীতায় ভগবানের আশ্বাস

সর্বেভ্যঃ সাধকেভ্যশ্চাশ্বাসনং দত্তবান্ হরিঃ।
জনঃ কল্যাণকৃৎ কশ্চিদ্ দুর্গতিং নৈব গচ্ছতি॥

ভগবৎপ্রাপ্তির পথে কোন বাধা বিঘ্নই নেই। এটি সম্পূর্ণরূপে বাধা-বিঘ্নশূন্য—'**এষ নিষ্কণ্টকঃ পন্থাঃ**'। এই পথে মানুষ যদি চোখ মুদেও ছোটে তাহলেও সে হোঁচট খায় না বা পড়েও যায় না।

সাধক যদি তার একমাত্র লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য পরমাত্মার প্রাপ্তি বলে স্থির করতে পারে তাহলে কাজ অনেক এগিয়ে থাকে। ভগবান স্বয়ং সাধকদের আশ্বাস দিয়ে বলেছেন যে, যারা নিজ কল্যাণের জন্য কর্ম করে তাদের দুর্গতি হয় না—'**ন হি কল্যাণকৃৎ কশ্চিদ্দুর্গতিং তাত গচ্ছতি**' (৬।৪০)। যে কেবল পরমাত্মার উদ্দেশ্যেই সকল কর্ম করে তার সমস্ত কর্মই 'সৎ' বলে অভিহিত হয় (১৭।২৭) এবং সৎ কর্মের কখনো বিনাশ হয় না। স্বল্প-পরিমাণেও সমত্ব-ভাব যদি জীবনে আসে, তাহলে তা জন্ম-মরণ রূপ মহাভয় থেকে ত্রাণ করে—'**স্বল্পমপ্যস্য ধর্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ**' (২।৪০)। বেদাদি গ্রন্থে, যজ্ঞে, তপে এবং দান কর্মে যে পুণ্যফল কথিত আছে যোগীপুরুষ তা সমস্ত অতিক্রম করেন (৮।২৮)। কেবল যোগী নয়, যোগের (সমত্বের) জিজ্ঞাসু ব্যক্তিও বেদোক্ত সকাম অনুষ্ঠান অতিক্রম করতে সক্ষম হন—'**জিজ্ঞাসুরপি যোগস্য শব্দব্রহ্মাতিবর্ততে**' (৬।৪৪)।

তথাকথিত নিজের বস্তুসহ নিজেকেও যাঁরা ভগবানে সমর্পণ করেন, এইরূপ ভক্তগণকে ভগবান অচিরাৎ উদ্ধার করেন (১২।৭)। এরূপ ভক্তদের যোগক্ষেম (অপ্রাপ্ত বস্তুর প্রাপ্তি এবং প্রাপ্ত বস্তুর রক্ষা করার দায়িত্ব) ভগবান নিজে বহন করেন—'**তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্**' (৯।২২)।

অর্জুনের মাধ্যমে ভগবান তাঁর অনন্য ভক্তদের আশ্বাস দিয়ে বলেছেন যে, 'তোমরা সাধনা এবং সিদ্ধি—এই দুই বিষয়ে চিন্তা কোরো না।' সাধক যদি তার দৈবী-সম্পদের গুণের স্বল্পতার জন্য সাধনের কথা ভেবে হতাশ হয়, তবে ভগবান তাদের এই বলে আশ্বাস দেন যে, 'তোমার মধ্যে দৈবী সম্পদের গুণ রয়েছে, সুতরাং তুমি চিন্তা কোরো না'—'**মা শুচঃ সম্পদং দৈবীমভিজাতোঽসি পাণ্ডব**' (১৬।৫)। সাধক যদি নিজ পাপের কথা ভেবে তত্ত্ব-প্রাপ্তিতে হতাশ হয়, সেক্ষেত্রে ভগবানের আশ্বাসবাক্য হলো, 'আমি তোমাকে সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত করে দেব, তুমি চিন্তা কোরো না'—'**অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ**' (১৮।৬৬)[১]।

সাধকদের সাধন এবং সিদ্ধি কোন বিষয়ে হতাশ হওয়া উচিত নয়, তবে ভগবৎপ্রাপ্তির জন্য ব্যাকুলতার খুবই প্রয়োজন। কারণ চিন্তা ভগবান থেকে দূরে নিয়ে যায় এবং ব্যাকুলতা ভগবানের সন্নিকট করে। চিন্তায় নৈরাশ্য আসে, ব্যাকুলতাতে ভগবানকে পাওয়ার আশা দৃঢ় হয়। অতএব সাধকের কখনো চিন্তা করা উচিত নয় বরং নিজ সাধনে তৎপরতার সঙ্গে লেগে থাকা উচিত।

[১]ভগবানের আশ্বাসবাক্য অন্যান্য শ্লোকেও আছে যেমন—দ্বিতীয় অধ্যায়ের বাহাত্তর সংখ্যক শ্লোক, চতুর্থ অধ্যায়ের ছত্রিশ সংখ্যক শ্লোক, পঞ্চম অধ্যায়ের উনত্রিশ সংখ্যক শ্লোক, ষষ্ঠ অধ্যায়ের একত্রিশ সংখ্যক শ্লোক, সপ্তম অধ্যায়ের চতুর্দশ শ্লোক, অষ্টম অধ্যায়ের পঞ্চম এবং চতুর্দশ শ্লোক, নবম অধ্যায়ের ত্রিশ-একত্রিশ সংখ্যক শ্লোক, দশম অধ্যায়ের নবম, দশম ও একাদশ সংখ্যক শ্লোক, একাদশ অধ্যায়ের পঞ্চান্ন সংখ্যক শ্লোক, দ্বাদশ অধ্যায়ের সপ্তম শ্লোক, ত্রয়োদশ অধ্যায়ের পঁচিশ ও চৌত্রিশ সংখ্যক শ্লোক, চতুর্দশ অধ্যায়ের ছাব্বিশ সংখ্যক শ্লোক, পঞ্চদশ অধ্যায়ের উনিশ সংখ্যক শ্লোক এবং অষ্টাদশ অধ্যায়ের আটান্ন সংখ্যক শ্লোক।

(৬৯) গীতায় নয় প্রকারের সগুণ উপাসনা

স্বকীয়োপাসনা প্রোক্তা নবধা ফাল্গুনং প্রতি।
তাসাং যয়া কয়া যুক্তো হরিং প্রাপ্নোতি মানবঃ॥

গীতায় নয় প্রকারের সগুণ-উপাসনার কথা বলা হয়েছে, যথা—

(১) সবকিছুর আদিতে ভগবান বিদ্যমান—'যে ব্যক্তি আমাকে অজাত, অনাদি এবং সর্বকালের মহেশ্বর রূপে মান্য করেন, তিনি সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হয়ে যান' (১০।৩)। 'আমি সমস্ত জগতের প্রভব (নিমিত্ত কারণ) এবং প্রলয় (উপাদান কারণ) অর্থাৎ সকলের আদি কারণ' (৭।৬) ; 'দৈবী প্রকৃতি আশ্রিত মহাত্মা ব্যক্তিগণ আমাকে সমস্ত প্রাণিজগতের আদি ও অবিনাশী জেনে অনন্যভাবে ভজনা করেন' (৯।১৩) ইত্যাদি।

(২) ভগবান সবার মধ্যে বিরাজমান—'যাঁরা সবার মধ্যে আমাকে দেখেন, তাঁদের কাছে আমি কখনো অদৃশ্য হই না' (৬।৩০) ; 'যাঁরা সকল প্রাণীর মধ্যে আমাকে দেখেন' (৬।৩১) ; 'আমি অব্যক্তরূপে এই সমস্ত জগতে পরিব্যাপ্ত আছি' (৯।৪) ; 'প্রাণীদের অন্তঃকরণে আত্মারূপে আমিই আছি' (১০।২০) ; 'সেই পরমাত্মাই সর্বভূতের হৃদয়ে স্থিত' (১৩।১৭) ; 'আমিই অন্তর্যামীরূপে সকল প্রাণীর হৃদয়ে অধিষ্ঠিত' (১৫।১৫) 'ঈশ্বর সমস্ত প্রাণীর হৃদয়ে অবস্থিত' (১৮।৬১) ইত্যাদি।

(৩) সবকিছু ভগবানেই অধিষ্ঠিত—'যিনি সবকিছু আমাতে অধিষ্ঠিত দেখেন, তিনি আমার কাছে কখনও অদৃশ্য হন না' (৬।৩০)। 'সমস্ত জগৎসংসার সূত্রে সূত্র দ্বারা তৈরি গুটির (মণির) ন্যায় আমাতেই ওতপ্রোত হয়ে আছে' (৭।৭) ; 'সমস্ত প্রাণী যাঁর অন্তর্গত' (৮।২২) ; 'সকল প্রাণী আমাতেই অবস্থিত (৯।৬) ; 'হে অর্জুন ! তুমি আমার এই শরীরের এক অংশে চরাচর সমগ্র জগৎ এখনই দর্শন কর' (১১।৭) ; অর্জুন দেবাদিদেব ভগবানের দেহে একই স্থানে স্থিত বহু-বিভাগে বিভক্ত সমস্ত জগৎকে দর্শন করলেন (১১।১৩) ; 'হে দেব ! আমি আপনার শরীরে সমস্ত দেবতাগণ, প্রাণীগণ, কমলাসনে উপবিষ্ট ব্রহ্মা, শঙ্কর, ঋষিগণ এবং দিব্য সর্পগণকে দেখতে পাচ্ছি' (১১।১৫) ইত্যাদি।

(৪) ভগবানই সবকিছুর অধীশ্বর—'আমি জন্মরহিত, অবিনাশী এবং সর্বভূতের ঈশ্বর হয়েও নিজ প্রকৃতিকে অধীন করে যোগমায়ার দ্বারা প্রকটিত হই' (৪।৬) ; 'যে ব্যক্তি আমাকে সকল যজ্ঞ এবং তপের ভোক্তা এবং সর্বলোকের ঈশ্বরেরও ঈশ্বর (প্রভু) ও সমস্ত প্রাণীর সুহৃদ বলে মানেন, তিনি (পরম) শান্তি লাভ করেন' (৫।২৯) ; 'আমার অধ্যক্ষতায় প্রকৃতি সমগ্র চরাচর জগতকে সৃষ্টি করেন' (৯।১০) ; 'মূঢ় ব্যক্তিগণ সমস্ত প্রাণীর মহেশ্বররূপ আমাকে মনুষ্য-দেহধারী সাধারণ ব্যক্তি বলে অবজ্ঞা করে' (৯।১১) ; মহাযোগেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে নিজ পরম ঐশ্বরিক বিরাট রূপ দেখালেন (১১।৯) ইত্যাদি।

(৫) সমস্ত কিছু ভগবান হতেই উৎপন্ন—'সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ভাব আমা-হতেই উৎপন্ন হয়' (৭।১২) ; 'বুদ্ধি, জ্ঞান, অসম্মোহ ইত্যাদি কুড়ি প্রকার ভাব আমা হতেই উৎপন্ন হয়' (১০।৪-৫) ; 'আমা হতেই জগৎ-সংসার প্রবৃত্ত হয়' (১০।৮) ; 'স্মৃতি, জ্ঞান এবং সংশয়াদি দূরীকরণ আমা-দ্বারাই হয়' (১৫।১৫) ; পরমাত্মা থেকেই সকল প্রাণীর উৎপত্তি হয় (১৮।৪৬) ইত্যাদি।

(৬) ভগবান সবকিছুর বিধানকর্তা—'যে ব্যক্তি শ্রদ্ধা সহকারে অন্যান্য দেবতাদের উপাসনা করেন, সেই উপাসনার ফলের বিধান আমিই করে থাকি' (৭।২২) ; 'ভক্তদের যোগক্ষেম আমিই বহন করে থাকি' (৯।

২২) ; 'আমার আশ্রয়গ্রহণকারী ভক্ত আমার কৃপায় অবিনাশী পদ প্রাপ্ত হয়' (১৮।৫৬) ; 'ঈশ্বর সকল প্রাণীর হৃদয়ে অধিষ্ঠিত থেকে শরীররূপী যন্ত্রে আরূঢ় হয়ে সমস্ত প্রাণীকে সঞ্চালিত করেন' (১৮।৬১) ইত্যাদি।

(৭) ভগবানই সকলের আরাধ্য—তিন বেদে বর্ণিত সকাম কর্ম অনুষ্ঠানকারী ব্যক্তিগণ যজ্ঞাদি দ্বারা ইন্দ্রদেবতার রূপে আমারই পূজা করে (৯।২০)। 'যেসব ব্যক্তি অন্য দেবতার পূজা করে তারা প্রকৃতপক্ষে আমারই উপাসনা করে, কিন্তু তা হয় বিধিবর্জিত অর্থাৎ তারা সেই দেবতারূপে আমাকে মানে না' (৯।২৩) ; 'যাঁরা নির্গুণ-নিরাকারের উপাসনা করেন, তাঁরা আমাকেই প্রাপ্ত হন' (১২।৩-৪) ইত্যাদি।

(৮) ভগবানই সবকিছুর প্রকাশক—'সূর্য, চন্দ্র এবং অগ্নিতে যে তেজ তা আমারই অর্থাৎ এইসকল আমার দ্বারাই প্রকাশিত হয়' (১৫।১২)।

(৯) ভগবানই সব হয়ে আছেন—সর্বই বাসুদেব (৭।১৯) ; 'আমিই এই সমস্ত জগতের গতি, ভর্তা, প্রভু, সাক্ষী, নিবাস, শরণ, সুহৃদ্, প্রভব, প্রলয়, স্থান, আধার এবং অবিনাশী বীজও আমিই' (৯।১৮) সৎ, অসৎ আমারই প্রকাশ (৯।১৯) ; হে জগন্নিবাস ! আপনিই সৎ ও অসৎ এবং যা সদসতের অতীত তাও আপনিই (১১।৩৭) ইত্যাদি[১]।

উপরিউক্ত সমস্ত উপাসনার তাৎপর্য এই যে সব-কিছুর বীজ, আধার, প্রকাশক, প্রভু, শাসক—সব এক ভগবানই ; কিন্তু সাধকগণের প্রকৃতি (স্বভাব), যোগ্যতা এবং শ্রদ্ধা-বিশ্বাসের বিভিন্নতার কারণে তাদের উপাসনাও বিভিন্ন প্রকারের হয়। তত্ত্বতঃ কোন ভেদ নেই ; কারণ পরিণামে সমস্ত উপাসনার ফল একই হয়।

ক্ষুধা যেমন সকলেরই একপ্রকার এবং ভোজনে তৃপ্তিও একইপ্রকারের হয়, কিন্তু রুচির ভিন্নতার জন্য খাদ্যপদার্থ বিভিন্ন প্রকারের হয় ; যেমন মানুষের বেশ-ভূষা, থাকা-খাওয়া, ভাষা ইত্যাদি পৃথক হলেও হাসি এবং কান্না সকলের একপ্রকারেরই হয় ; কারণ, সুখ ও দুঃখের অনুভব সকলের একই রকমের হয় ; সেইরূপ ভগবৎপ্রাপ্তির ক্ষুধা (ইচ্ছা) এবং ভগবানকে না পাওয়ার দুঃখ সকল সাধকের একই প্রকারের হয় এবং সাধনায় পূর্ণতা হলে ভগবৎপ্রাপ্তির আনন্দও সকলের একই প্রকারের হয়। কিন্তু সাধকের প্রকৃতি, যোগ্যতা ও বিশ্বাসের বিভিন্নতার জন্য উপাসনা বিভিন্ন প্রকারের হয়ে থাকে।

উপাসনার প্রারম্ভে সাধকের ভাব এবং যোগ্যতা প্রবল থাকে আর সিদ্ধিলাভ হলে (শেষে) তত্ত্বের প্রাধান্য হয়। ভাব এবং যোগ্যতা ব্যক্তিগত, কিন্তু তত্ত্ব ব্যক্তিগত নয়, তা হল সর্বগত।

---

[১]এখানে উপাসনার যে নয়টি বর্ণনা পৃথক্ ভাবে করা হয়েছে, এগুলির কোনওটির বর্ণনা গীতায় কোথাও কোথাও একটি শ্লোকেও করা হয়েছে।

(৭০) গীতার গোপনীয় বিষয়

পুরোঽর্জুনস্য কৃষ্ণেন স্বাত্মা হি প্রকটীকৃতঃ।
বিষয়ো গোপনীয়োঽয়ং গীতায়া মন্যতে বুধৈঃ॥

ভগবান তাঁর আত্মীয় এবং ভক্ত অর্জুনের কাছে নিজেই নিজেকে প্রকাশ করেছেন। এই হলো গীতার গোপনীয় বিষয়। ভগবান যখন অবতার হয়ে আসেন তখন তিনি নিজেকে গোপন করে রাখেন, সবার সামনে নিজ ভগবৎস্বরূপ প্রকাশ করেন না (৭।২৫)। কিন্তু নিজ অন্তরঙ্গ প্রিয় ভক্তদের কাছে তিনি গোপন থাকতে পারেন না, নিজেকে অনাবৃত করে দেন।

গীতায় ভগবান নিজ প্রিয় ভক্ত অর্জুনের কাছে তাঁর ভগবত্তা, মহত্ত্ব এবং প্রভুত্বের বিষয়ে অনেক প্রকারে বলেছেন ; যেমন—

'এই যোগ (কর্মযোগ) আমি প্রথমে সূর্যকে বলেছিলাম, সূর্য মনুকে এবং মনু ইক্ষ্বাকুকে বলেছিলেন। এইরূপে পুরুষানুক্রমে এই যোগ সমস্ত রাজর্ষিগণ অনুসরণ করেছিলেন। কিন্তু এই কর্মযোগের মর্ম জানা লোকের অভাব হওয়ায় কালক্রমে এই যোগ লুপ্তপ্রায় হয়ে গেছে। সেই পুরাতন যোগের কথা আমি তোমাকে বললাম। এ অত্যন্ত গুহ্য তত্ত্ব। অর্থাৎ যা আমি সূর্যকে বলেছিলাম, তা আজ তোমায় বলছি—এটি অত্যন্ত গোপনীয় বিষয়' (৪।১-৩)।

'আমার এবং তোমার বহু জন্ম অতিক্রান্ত হয়েছে ; সেসব আমি অবগত আছি, তুমি জানো না (৪।৫)', 'আমি জন্মরহিত, অব্যয়, আত্মা এবং সর্বভূতের ঈশ্বর হয়েও প্রকৃতিকে বশীভূত করে প্রকট হই' (৪।৬)। 'আমি ধর্মের সংস্থাপন, ভক্তদের রক্ষা ও দুষ্টের বিনাশের জন্য যুগে যুগে অবতাররূপ গ্রহণ করি' (৪।৭-৮)। 'মহাসর্গের শুরুতে আমি চতুর্বর্ণ সৃষ্টি করেছি, এই সৃষ্টি রচনা করেও আমি অকর্তা রূপে বিরাজমান' (৪।১৩)। 'আমাকে সমস্ত যজ্ঞ এবং তপস্যার ভোক্তা, সর্বলোকের মহেশ্বর এবং সর্বভূতের সুহৃদ জেনে মানুষ পরম শান্তি লাভ করে' (৫।২৯)। 'যেসব ব্যক্তি আমাকে সর্বভূতে এবং সর্বভূতে আমাকে অবস্থিত দেখেন, আমি তাঁদের কাছে অদৃশ্য হই না এবং তাঁরাও আমার কাছে অদৃশ্য হন না' (৬।৩০)।

'এই জগতে আমি ভিন্ন অপর কোন মূল কারণ নেই। সমস্ত জগৎ-সংসার আমাতে ওতপ্রোত', 'আমিই জলে রস, চন্দ্র ও সূর্যে প্রভা ইত্যাদি কারণ-রূপে বিদ্যমান' ; 'সাত্ত্বিক, রাজসিক এবং তামসিক ভাব আমা হতেই উৎপন্ন হয় ; কিন্তু আমি সে সকলে অবস্থিত নই, সেগুলিও আমাতে অবস্থিত নয় অর্থাৎ সবকিছু আমি-ই' (৭।৭-১২)। 'আমি এই সমস্ত জগৎ পরিব্যাপ্ত হয়ে আছি এবং সকল প্রাণী আমাতে অবস্থিত ; কিন্তু আমি তাদের মধ্যে অবস্থিত নই এবং তারাও আমাতে নেই—তুমি আমার এই ঐশ্বরিক যোগ (সামর্থ্য) অবলোকন কর' (৯।৪-৫)। 'মহাপ্রলয়ে সমস্ত প্রাণী আমার প্রকৃতিতে লীন হয় এবং মহাসর্গের প্রারম্ভে পুনরায় আমি তাদের সৃষ্টি করি' (৯।৭)।

'আমিই এই জগতের মাতা, পিতা, ধাতা, পিতামহ ইত্যাদি' (৯।১৭)। 'সৎ- অসৎ, জড়-চেতন ইত্যাদি যা কিছু আছে, তা সব আমিই' (৯।১৯) 'একনিষ্ঠ ভক্তগণের যোগক্ষেম আমিই বহন করে থাকি' (৯।২২)। 'আমিই সকল যজ্ঞের ভোক্তা এবং সমস্ত জগতের প্রভু, কিন্তু যারা আমাকে তত্ত্বগত জানে না সংসারে তাদের পতন হয়' (৯।২৪)। 'সর্বভূতেই আমি সমানভাবে আছি কোন প্রাণীই আমার প্রিয় বা অপ্রিয় নয়, কিন্তু যাঁরা ভক্তিপূর্বক আমার ভজনা করেন, আমি তাঁদের মধ্যে এবং তাঁরা আমার মধ্যে বিশেষভাবে রয়েছেন' (৯।২৯)।

'দেবতা বা মহর্ষি কেহই আমার উৎপত্তির কারণ জানেন না, কেননা আমি সর্বপ্রকারেই দেবতা ও মহর্ষিগণের আদি' (১০।২)। 'প্রাণীগণের বুদ্ধি, জ্ঞান আদি সমস্ত ভাব আমা হতেই উৎপন্ন হয়' (১০।৪-৫) 'আমিই জগতের মূল কারণ এবং আমা হতেই সকল প্রাণী সত্তা ও স্ফূর্তি পায়' (১০।৮)। 'আমিই ভক্তদের প্রতি অনুগ্রহ করে তাদের অজ্ঞানজনিত অন্ধকার বিনষ্ট করি' (১০।১১)।

'সর্বভূতের বীজ আমিই, আমা ব্যতীত কোন প্রাণীর সৃষ্টি হতে পারে না' (১০।৩৯)। 'আমি নিজের একাংশে

সমস্ত জগৎকে ব্যাপ্ত করে অবস্থিত আছি' (১০।৪২)। 'তুমি আমার এই বিরাট রূপ তোমার এই চর্মচক্ষু দ্বারা দর্শনে সক্ষম হবে না ; সুতরাং আমি তোমাকে দিব্যচক্ষু দান করছি ; এর দ্বারা তুমি আমার ঐশ্বরিক যোগ (প্রভাব) অবলোকন কর' (১১।৮)। 'আমি লোকক্ষয়কারী মহাকাল এবং এখানে এইসকল যোদ্ধার প্রাণসংহার করতে এসেছি। তুমি যুদ্ধ না করলেও এরা কেউই জীবিত থাকবে না ; কারণ, এদের আমি পূর্বেই বধ করে রেখেছি। অতএব নিমিত্তমাত্র হয়ে তুমি যুদ্ধ কর, তোমার জয় হবে' (১১।৩২-৩৪)।

'মৎপরায়ণ যে ভক্তগণ সমস্ত কর্ম আমাকে অর্পণ করে অনন্যভাবে আমার সাধন-ভজন করে, তাদের আমি (অচিরাৎ) সংসার-সাগর থেকে উদ্ধার করি' (১২।৬-৭)। 'একনিষ্ঠ ভক্তি সহযোগে যিনি আমায় ভজনা করেন, তিনি গুণসমূহকে অতিক্রম করেন' (১৪।২৬)। 'আমিই ব্রহ্ম, অবিনাশী, অমৃত, শাশ্বতধর্ম এবং ঐকান্তিক সুখের আশ্রয়' (১৪।২৭)। 'চন্দ্র, সূর্য এবং অগ্নিতে আমারই তেজ রয়েছে। আমি নিজ শক্তির দ্বারা পৃথিবীকে ধারণ করি। আমি বৈশ্বানররূপে প্রাণিগণের খাদ্য পরিপাক করি। আমি সকলের হৃদয়ে অবস্থান করি। বেদসমূহের জ্ঞাতব্য আমিই' (১৫।১২-১৫)। 'আমি ক্ষরের অতীত এবং অক্ষর থেকে উত্তম ; সেই হেতু বেদ এবং শাস্ত্রে আমিই পুরুষোত্তম নামে প্রসিদ্ধ' (১৫।১৮)। 'যিনি অনন্যভাবে আমার ভজনা করেন, তিনি সর্বজ্ঞ হন' (১৫।১৯)। 'আমি এ অতি গুহ্য শাস্ত্র জানালাম, যা জেনে মানুষ জ্ঞানী ও কৃতকৃত্য হয়' (১৫।২০)।

'মানুষ সর্বদা সর্বকর্মে লগ্ন থেকেও আমার কৃপায় অবিনাশী পদ প্রাপ্ত হয়' (১৮।৫৬)। 'তুমি মৎপরায়ণ হয়ে সমস্ত কর্ম আমাকে সমর্পণ কর, তাহলে আমার অনুগ্রহে সমস্ত সঙ্কট অতিক্রম করবে' (১৮।৫৭-৫৮)। 'তুমি সকল ধর্মের আশ্রয় ত্যাগ করে কেবলমাত্র আমারই শরণাগত হও। আমি তোমাকে সকল পাপ থেকে মুক্ত করব, তুমি চিন্তা কোরো না' (১৮।৬৬)।

এইভাবে ভগবান তাঁর গোপন কথা এবং নিজেকে ভক্তদের কাছে উন্মোচিত করার যত কথা প্রকাশ করেছেন সে সবই গোপনীয় বিষয়।

(৭১) গীতায় সাধকদের দ্বিবিধ দৃষ্টি

গীতায়াং দ্বিবিধা দৃষ্টির্দৃশ্যতে জ্ঞানিভক্তয়োঃ।
জ্ঞানী গুণময়ং সর্বং ভক্তঃ প্রভুময়ং জগৎ॥

(১)

পরমাত্মা এবং সংসারের বর্ণনা গীতায় বিবিধ প্রকারে করা হয়েছে। সেই বিবিধ প্রকার সাধকদের দৃষ্টিতেই করা হয়েছে। যেসকল সাধকের দৃষ্টিতে ভগবানই সব, তিনি ছাড়া আর কিছুই নেই, তাদের 'ভক্তিযোগী' বলা হয়। যাদের দৃষ্টিতে সমস্ত পৃথিবী গুণময়, প্রকৃতির গুণগুলি ছাড়া আর কিছুই নেই, তাদের বলা হয় 'জ্ঞানযোগী'। এইপ্রকার সাধকদের দ্বিবিধ দৃষ্টি হয়—ভক্তিদৃষ্টি এবং জ্ঞানদৃষ্টি। ভক্তিযোগে শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের প্রাধান্য এবং জ্ঞানযোগে বিচার ও বিবেকের প্রাধান্য থাকে।

ভক্তিযোগে ভক্ত মনে করেন যে, ভগবানই সবকিছু—**'বাসুদেবঃ সর্বম্'** (৭।১৯)। ভগবানও বলেছেন যে, চরাচরে কোন প্রাণীই আমা-ছাড়া নেই (১০।৩৯) অর্থাৎ চর-অচর সবকিছু আমিই। সূত্রে গ্রথিত মালার ন্যায় এই সম্পূর্ণ জগৎ-সংসার আমাতে ওতপ্রোত হয়ে আছে' (৭।৭)। 'সাত্ত্বিক, রাজসিক, তামসিক ভাবও আমা-হতে উৎপন্ন, কিন্তু আমি সে সবে এবং সেসব আমাতে স্থিত নয়, অর্থাৎ সবকিছুই আমি' (৭।১২)। 'সৎ-অসৎ অর্থাৎ জড় বা চেতন যা কিছু আছে, তা সমস্তই আমি' (৯।১৯)। 'বুদ্ধি, জ্ঞান, অসম্মোহ ইত্যাদি ভাব আমা হতেই উৎপন্ন হয়, (১০।৪-৫)। আমি সকলের উৎপত্তির হেতু অর্থাৎ মূল

কারণ এবং আমা হতেই সব সক্রিয় হয়' (১০।৮)। দশম অধ্যায়ে ভগবান অর্জুনকে বললেন যে, 'তুমি যে যে স্থানে, যে যে বস্তুতে বা পদার্থে মহত্ত্ব, বিশেষত্ব এবং অলৌকিকতা ইত্যাদি যা কিছু দেখবে, তা সবই আমার বলে জানবে (১০।৪১)। এর অর্থ এই যে, সেই মহত্ত্ব, গুরুত্ব, বিশেষত্ব প্রভৃতি রূপে আমিই আছি—এই মনে করে তোমার দৃষ্টি যেন শুধু আমার দিকেই থাকে'।

জ্ঞানযোগে সাধক এরূপ মনে করেন যে, প্রকৃতির গুণগুলির দ্বারাই সমস্ত কর্ম সংঘটিত হয় (৩।২৭)। গুণই গুণের মধ্যে প্রবৃত্ত আছে (৩।২৮, ১৪।২৩)। এই দৃষ্টিতেই ভগবান অষ্টাদশ অধ্যায়ে সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ—এই তিন গুণ অনুযায়ী জ্ঞান, কর্ম, কর্তা, বুদ্ধি, ধৃতি এবং সুখের তিনটি বিভাগ করে বর্ণনা করেছেন এবং তিনপ্রকার গুণের উপসংহারে বলেছেন যে, ত্রিলোকে এই তিনগুণ ভিন্ন কিছুই নেই ; আমরা যা কিছু দেখি সমস্তই ত্রিগুণাত্মক (১৮।৪০)।

(২)

ভগবান গীতায় একস্থানে বলেছেন যে, 'সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ভাব আমা-হতেই উৎপন্ন,' (৭।১২) এবং অন্য আর এক স্থানে বলেছেন যে, 'সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই তিনগুণ প্রকৃতি থেকে উৎপন্ন' (১৩।১৯ ; ১৪।৫)। প্রথম কথাটি ভক্তিমার্গের এবং দ্বিতীয়টি জ্ঞানমার্গের। ভক্তিমার্গে ভগবান ভিন্ন গুণ এবং ভাবের অন্য কোন স্বতন্ত্র সত্তা নেই। অর্থাৎ গুণ, পদার্থ, ক্রিয়া ইত্যাদি সবই ভগবানের স্বরূপ। সেইজন্যই ভগবান বলেছেন যে গুণগুলি তাঁর থেকেই উদ্ভূত। জ্ঞানমার্গে নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসনা করা হয়। নির্গুণব্রহ্ম গুণসমূহের অতীত, নির্লিপ্ত, নিষ্ক্রিয় এবং নিরাকার। সুতরাং এতে বিন্দুমাত্র প্রকৃতি বা প্রকৃতিগত গুণ নেই। ভগবানও সেইজন্য বলেছেন যে গুণগুলি প্রকৃতিজাত। অর্থাৎ গুণগুলিকে ভগবান হতে উদ্ভূত বলা হোক অথবা প্রকৃতি হতে উদ্ভূত বলা হোক, আমার সঙ্গে গুণের কোন সম্বন্ধ নেই।

(৭২) গীতায় সাধ্য এবং সাধনের সুলভতা

সাধ্যসাধনয়োঃ প্রোক্তং সৌলভ্যং হরিণা স্বয়ম্।
মোহিতং হি বিনা তস্মাদনুৎসাহী ভবেত্তু কঃ॥

গীতায় সাধকের দৃষ্টিতে সাধ্যের দুটি বিভাগ মনে করা যেতে পারে—

(১) সগুণ—সগুণ উপাসনায় অনন্যভাবই প্রধান হয়। অনন্যভাবসম্পন্ন ভক্তদের কাছে ভগবান সহজেই ধরা দেন। এই অনন্যভাব কি ? অন্যের না হওয়া। অন্য কি ? ভগবান ব্যতীত ধন, সম্পত্তি, বৈভব, ঘটনা, পরিস্থিতি, স্ত্রী, পুত্র, পরিবার, মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়, শরীর ইত্যাদি যা কিছু, তা সমস্তই 'অন্য'। সেই সব থেকে বিমুখ হয়ে অর্থাৎ এদের আশ্রয়, গুরুত্ব, আসক্তি, প্রিয়তা ত্যাগ করে কেবল ভগবানের শরণাগত এবং তাঁর প্রতিই গুরুত্ব ও প্রিয়তা বোধের নাম 'অনন্যভাব'। 'আমি ভগবানের এবং ভগবান আমার, আমি জগৎ-সংসারের নই এবং জগৎ-সংসার আমার নয়'—এইরূপ নিজের বলে যা কিছু বস্তু, শরীরাদি সহ নিজেকেও ভগবানে অর্পণ করার নাম হলো 'অনন্যভাব'। অনন্যভাবের দ্বারা ভগবান সুলভ হন (৮।১৪), তিনি ভক্তের যোগক্ষেম বহন করেন (৯।২২), ভক্তকে অচিরাৎ মৃত্যু-সংসারসাগর থেকে উদ্ধার করেন (১২।৭)। এইরূপ অনন্যভাব দ্বারাই ভক্ত ভগবানের দর্শন লাভ করে, স্বরূপতঃ জানতে পারে এবং একাত্ম হতে পারে (১১।৫৪)। এইজন্যই ভগবান বলেছেন যে, 'তুমি মন ও বুদ্ধি আমাতে নিবিষ্ট কর, তাহলে তুমি আমাতেই স্থিতি লাভ করবে' (১২।৮)। তুমি আমাতে মন ও বুদ্ধি অর্পণ কর, তবে তুমি নিশ্চিতরূপে নিঃসন্দেহে আমায় লাভ করবে (৮।৭)।

(২) **নির্গুণ**—নির্গুণের উপাসনায় বিবেক-বিচার মুখ্য হয়। এই সাধন পথে বিবেকসহায়ে জড়ত্ব ত্যাগ করা হয়। নির্গুণ উপাসকেরও সহজেই পরমাত্মপ্রাপ্তি ঘটে। (৪।৩৯, ৬।২৮ ইত্যাদি)।

সাধনেরও তিনটি বিভাগ করা হয়—

(১) **কর্মযোগ**—কর্তব্যরূপে যে পরিস্থিতি সামনে আসবে, তৎপরতার সঙ্গে সেই কর্তব্য পালন করা এবং সেই কর্মের ফলের ইচ্ছা ত্যাগ করা এমন কি কঠিন কাজ ? তারই নাম কর্তব্য যা করা উচিত এবং যা সহজভাবে করতে পারা যায়। এইরূপে প্রাপ্ত কর্তব্য-পালনের কথা ভগবান দ্বিতীয় অধ্যায়ের সাতচল্লিশ সংখ্যক শ্লোকে বলেছেন।

(২) **জ্ঞানযোগ**—এই দেহে প্রতিক্ষণ পরিবর্তন হচ্ছে, এটি মৃত্যুর পথে অগ্রসর হচ্ছে, কেননা এ হচ্ছে অসৎ। কিন্তু অসৎকে যিনি জানেন অর্থাৎ শরীর-জগৎ-সংসার ইত্যাদির পরিবর্তন, উৎপন্ন এবং বিনাশকে যিনি জানেন, তিনিই সৎ—এটা জানা কি এমন শক্ত ? এই কথা প্রায় সমস্ত আস্তিক ব্যক্তিই জানেন যে, শরীর তো বিনাশশীল, কিন্তু যিনি এই শরীরের মধ্যে আছেন, তিনি চিরস্থায়ী। এই কথা ভগবান দ্বিতীয় অধ্যায়ের এগারো থেকে ত্রিশ সংখ্যক শ্লোক পর্যন্ত বিস্তারিতভাবে বলেছেন।

(৩) **ভক্তিযোগ**—যার কাছে ভগবানকে অর্পণ করার মতো ভালো ভালো জিনিস নেই, সে কেবল পত্র, পুষ্প, জল ইত্যাদিই যদি প্রেমপূর্বক ভগবানকে সমর্পণ করে, তাহলে ভগবান 'এটি পাতা বা ফুল, এগুলি আমি কিভাবে খাব ?' এরূপ কোনপ্রকার বিচার না করে সেগুলিকে গ্রহণ করেন (৯।২৬)। আবার কারো কাছে যদি পত্র-পুষ্প-ফল ইত্যাদিও না থাকে, তবে সে যা কিছু ক্রিয়া করে অর্থাৎ খাওয়া-দাওয়া, চলা-ফেরা, ওঠা-বসা, যজ্ঞ-তপ ইত্যাদি করে, তা সব যেন ভগবানে সমর্পণ করে (৯।২৭)। এরূপ করলে সে সমস্ত শুভ-অশুভ কর্ম-বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে ভগবানকে প্রাপ্ত হয় (৯।২৮)। এর চেয়ে সহজ সাধন আর কি হতে পারে ?

(৭৩) গীতায় সর্বশ্রেষ্ঠ সাধন

বরং কর্মত্যাগাজ্জগতি সততং কর্মকরণং
স্বধর্মো হি শ্রেয়ান্ সগুণপরধর্মাচ্চ বিগুণঃ।
বরং ক্ষেত্রজ্ঞানং দ্রবিণময়যজ্ঞাদ্ধি শতশ-
স্তপস্বিজ্ঞানিভ্যঃ সমনিরতযোগী বরতমঃ॥
জ্ঞানধ্যানাদিতঃ কর্মফলত্যাগো বিশিষ্যতে। সর্বেভ্যঃ সাধনেভ্যশ্চ প্রভুভক্তির্গরীয়সী॥

গীতায় পরমাত্মপ্রাপ্তির অনেক প্রকার সাধন প্রণালীর কথা বলা হয়েছে এবং সেগুলি যে শ্রেষ্ঠ তাও বলা হয়েছে। যে সাধন প্রণালীতে সাধকের প্রিয়-ভাব, বিশ্বাস ও যোগ্যতা থাকে, সেই সাধন প্রণালীই সেই সাধকের পক্ষে শ্রেষ্ঠ। কারণ, সেই সাধনার দ্বারাই তার ঈশ্বর প্রাপ্তি ঘটে। গীতায় যে যে স্থানে সাধনপ্রণালীকে শ্রেষ্ঠ বলা হয়েছে, সেই শ্রেষ্ঠত্ব সেখানকার প্রসঙ্গ বা অধিকারকে নিয়েই বলা হয়েছে। বহুপ্রকার শ্রেষ্ঠ সাধনা থাকা সত্ত্বেও ভগবান সর্বশ্রেষ্ঠ সাধনারূপে ভক্তিকেই স্বীকৃতি দিয়েছেন।

গীতা অনুসারে কর্ম না করার চেয়ে নিজের কর্তব্য পালন করা শ্রেষ্ঠ (৩।৮)। কারণ মানুষের যতক্ষণ প্রকৃতির (শরীরের) সঙ্গে সম্পর্ক থাকে, ততক্ষণ সে কর্ম না করে থাকতে পারে না। সে কায়-মন-বাক্যে কিছু না কিছু করতেই থাকে। সে যদি কর্তব্য-কর্মের পালন না করে তবে অকর্তব্য করবে, বিপরীত কর্ম করবে, যার ফলে বন্ধন প্রাপ্ত হবে। অতএব কর্ম না করা অপেক্ষা নিজ কর্তব্য কর্মের পালন করাই শ্রেষ্ঠ।

শাস্ত্র বর্ণাশ্রম অনুসারে যে মানুষের জন্য যে কর্মের বিধান দিয়েছেন সেই ব্যক্তির পক্ষে সেটিই স্বধর্ম এবং যে মানুষের জন্য যে কর্মে নিষেধ আছে, তার পক্ষে সেটি

পরধর্ম। অধিক গুণসম্পন্ন পরধর্ম অপেক্ষা অল্প গুণসম্পন্ন নিজ ধর্ম (স্বধর্ম) শ্রেয়। নিজ ধর্ম-পালনে মানুষের পাপ হয় না এবং ধর্ম পালনকালে যদি মৃত্যু হয়, তবুও তাতে তার কল্যাণ হয় (১৮।৪৭ ; ৩।৩৫)।

দ্রব্যময় অর্থাৎ বস্তুর বাহুল্যযুক্ত যজ্ঞ হতে জ্ঞানযজ্ঞ শ্রেষ্ঠ (৪।৩৩) ; কারণ, দ্রব্যযজ্ঞে পদার্থ, ব্যক্তি, স্থান, কাল, পরিস্থিতি, অবস্থা ইত্যাদির প্রয়োজনীয়তা থাকে এবং সে সবের দ্বারাই দ্রব্যযজ্ঞ সম্পূর্ণ হয়। অতএব দ্রব্যযজ্ঞে অন্যের উপর নির্ভরশীল হতে হয়। কিন্তু জ্ঞানযজ্ঞে পদার্থ, ব্যক্তি ইত্যাদির কোন আবশ্যকতা হয় না, সেইজন্য জ্ঞানযজ্ঞে পরের উপর নির্ভরতা নেই। তাই জ্ঞানযজ্ঞ শ্রেষ্ঠ।

তপস্বী, জ্ঞানী এবং কর্মীর চেয়ে সমভাবসম্পন্ন মানুষ শ্রেষ্ঠ (৬।৪৬)। কারণ তপস্বী, জ্ঞানী এবং কর্মীর মধ্যে সকামভাব থাকে। তপস্বী তপস্যা করে অণিমাদি সিদ্ধি আকাঙ্ক্ষা করে, জ্ঞানী শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন হয়ে মান-মর্যাদা, আরাম-আয়েস আকাঙ্ক্ষা করে এবং কর্মী কর্ম দ্বারা ধন, সঞ্চয়, ভোগ, স্বর্গ ইত্যাদি কামনা করে। কিন্তু সমভাবসম্পন্ন ব্যক্তি কোন কিছু কামনা করেন না, সুতরাং তিনি এই তিনের চেয়ে শ্রেষ্ঠ।

অভ্যাসের থেকে জ্ঞান, জ্ঞানের চেয়ে ধ্যান এবং ধ্যানের থেকে সর্ব কর্মফলত্যাগ শ্রেষ্ঠ (১২।১২)। কেননা অভ্যাস, জ্ঞান এবং ধ্যানে সমতা নেই। সমতা ছাড়া এই তিনটি অসম্পূর্ণ হয়। সর্বকর্মফল ত্যাগ করলে সমতা লাভ হয়, সুতরাং এটি শ্রেষ্ঠ।

সাংখ্যযোগের থেকে কর্মযোগ শ্রেষ্ঠ (৩।৭)। (৫।২) ; কারণ, সাংখ্যযোগে নতুন করে বিচার করতে হয় এবং প্রবল বৈরাগ্য হলে, কোথাও আসক্তি না থাকলে তবেই কল্যাণ হয়। বৈরাগ্য বিনা যে জ্ঞান (বিবেক-বিচার) হয়, তা কেবল তোতাপাখীর মত শেখানো বুলির ন্যায়ই হয়ে থাকে। কিন্তু কর্মযোগের সাধনায় মানুষ যে কর্ম করে আসছে তা কেবল সংশোধন করে নিতে হয় অর্থাৎ মানুষের কর্ম করার স্বভাব তো থাকেই, তাকে শুধু কামনা ও আসক্তি ত্যাগ করতে হবে। যেমন—পত্নী পতির, পুত্র পিতা-মাতার, শিষ্য গুরুর, পরিচারক মালিকের এবং নীচ বর্ণের ব্যক্তি উচ্চবর্ণ মানুষদের সেবা করে থাকে। এই সেবাকার্য করার সময় নিজ সুখ-আরাম, স্বার্থভাব, কামনা-আসক্তি ত্যাগ করতে হয়। এই ত্যাগ খুবই সহজ। সুতরাং কর্মযোগ শ্রেষ্ঠ।

উপরিউক্ত সাধনাগুলি তথা গীতায় উল্লিখিত ধ্যানযোগ, লয়যোগ, হঠযোগ ইত্যাদি সমস্ত সাধনের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হলো ভক্তিযোগ (৬।৪৭)। কারণ অন্যান্য সাধনায় সাধকের নিজের সাধন-শক্তির আশ্রয় থাকে, তাই তাতে পতন হবার সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু ভক্তিযোগী সাধকদের শুধু ভগবানের আশ্রয়ই থাকে, তারা ভগবদ্‌নিষ্ঠ হয় ; সেইজন্য তাদের পতন হওয়ার সম্ভাবনা থাকেই না। ভক্তদের স্বয়ং ভগবান উদ্ধার করেন (১২।৭)। তাদের অজ্ঞান অন্ধকার স্বয়ং ভগবান বিনাশ করেন (১০।১১)। তাদের যোগক্ষেমও স্বয়ং ভগবানই বহন করেন (৯।২২)। এইরূপ ভক্তদের কাছে ভগবান সহজলভ্য (৮।১৪)। ভক্ত তার অনন্য ভক্তি দ্বারা ভগবানকে প্রত্যক্ষ দর্শন করতে পারে, তত্ত্ব দ্বারা তাঁকে জানতে পারে এবং ভগবানে প্রবেশ করতে পারে (১১।৫৪)। অর্থাৎ অন্য সাধকদের কিছু অপূর্ণতা থাকতে পারে এবং মৃত্যুকালে অন্য চিন্তা, মূর্চ্ছা ইত্যাদি কোন কারণে তারা সাধনায় বিচলিত হয়ে যোগভ্রষ্টও হতে পারে এবং তাতে তাদের পুনর্জন্ম হতে পারে। কিন্তু ভক্তের কিছু অপূর্ণতা থাকলে তা দূর করবার দায়িত্ব ভগবানের, ভগবান সেই অপূর্ণতা দূর করে দেন। মৃত্যুকালে ভক্তের কোন কারণবশতঃ ভগবৎ স্মৃতি হারিয়ে গেলে স্বয়ং ভগবানই তাকে স্মরণ করেন। সুতরাং ভক্ত যোগভ্রষ্ট হয় না এবং তার পুনর্জন্ম হয় না। সেইজন্যই ভগবান ভক্তিযোগকে সমস্ত সাধন প্রণালীর মধ্যে এবং ভক্তিযোগীকে সমস্ত সাধকগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলে অভিহিত করেছেন (৬।৪৭ ; ১২।২)।

(৭৪) গীতায় প্রবৃত্তি এবং নিবৃত্তিগত সাধনা

ন প্রবৃত্তির্নিবৃত্তিশ্চ বাধিকা সাধিকা মতা।
দ্বয়োর্মধ্যে তু জীবানাং রাগো বৈ বাধকো মতঃ॥

লৌকিক দৃষ্টিতে কোন ক্রিয়ায় প্রবৃত্ত হওয়াকে 'প্রবৃত্তি' এবং ক্রিয়া থেকে নিবৃত্ত হওয়াকে 'নিবৃত্তি' বলা হয়। এইভাবেই লৌকিক দৃষ্টিতে গৃহস্থাশ্রমকে প্রবৃত্তিগত এবং সন্ন্যাসাশ্রমকে নিবৃত্তিগত স্থান বলা হয়। কিন্তু গীতার দৃষ্টিতে যদি অন্তরে বিষয়ের প্রতি আসক্তি, অনুরাগ ও কামনা থাকে, তাহলে বাইরের নিবৃত্তিও প্রবৃত্তিরূপে চিহ্নিত হয় এবং অন্তরে রাগ, কামনা, আসক্তি যদি না থাকে, তবে বাইরের প্রবৃত্তিও নিবৃত্তিরূপে চিহ্নিত হয়। যে ব্যক্তি বাইরের ক্রিয়াকর্মে নিবৃত্ত হয়েছে, কিন্তু অন্তরে অনুরাগপূর্বক বিষয় চিন্তা করে, তার সেই নিবৃত্তিকে গীতায় মিথ্যাচার বলা হয়েছে (৩।৬)।

গীতায় কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ এবং ভক্তিযোগ—এই তিনটি সাধনপথের অনুসরণ প্রবৃত্তি সহকারে গৃহস্থাশ্রমে থেকে সমস্ত কর্ম করেও করা যায় এবং নিবৃত্তি সহকারে সাংসারিক কাজকর্ম থেকে নিবৃত্ত হয়েও করা যায়। যেমন—

কর্মযোগ

(১) **প্রবৃত্তিগত কর্মযোগ**—যাতে কর্মফলের ইচ্ছা, কামনা, আসক্তি থাকে না এবং যাকে নিজ কর্তব্য তৎপরতার সঙ্গে পালন করা হয়, তাকেই প্রবৃত্তিগত কর্মযোগ বলা হয়। এর তাৎপর্য এই যে শাস্ত্রবিহিত কর্ম পালন করে, সাংসারিক কর্মে প্রবৃত্ত হয়েও নির্লিপ্ত থাকা হলো প্রবৃত্তিগত কর্মযোগ। যেমন, 'কর্ম করায় তোমার অধিকার, ফলে নয়' (২।৪৭) ; 'যোগে অর্থাৎ সমতায় স্থিত হয়ে তুমি কর্ম কর' (২।৪৮) ; 'কর্ম আরম্ভ না করলে নিষ্কর্মতা লাভ হয় না এবং কর্ম ত্যাগ করলেও হয় না' (৩।৪) ; 'তোমার শাস্ত্র-বিহিত কর্ম ত্যাগ করা উচিত নয় ; কর্ম না করা থেকে কর্ম করাই শ্রেষ্ঠ' (৩।৮) ; ব্রহ্মাও সৃষ্টি-রচনা কালে প্রজাদের কর্তব্য পালন করার আদেশ দিয়েছেন (৩।১০-১২) ; ভগবানও লোক-সংগ্রহের জন্য কর্ম করেন (৩।২২-২৪) ইত্যাদি।

(২) **নিবৃত্তিগত কর্মযোগ**—যাতে কর্মে বিরতি থাকে এবং পদার্থের ত্যাগ হয়, তাকে নিবৃত্তিগত কর্মযোগ বলে। কর্ম থেকে বিরত হওয়া এবং পদার্থ ত্যাগ—এতেও জগতের কল্যাণের মনোভাবই থাকে অর্থাৎ নিবৃত্তিরূপ কর্মও সংসারের হিতের জন্যই করা হয়, এতে নিজের কোনো স্বার্থ থাকে না। যেমন, শরীর এবং অন্তঃকরণ বশকারী, সকল প্রকার সংগ্রহ পরিত্যাগকারী এবং সাংসারিক আশারহিত কর্মযোগী শুধু শরীর-সম্পর্কীয় কর্ম করলেও তার দ্বারা আবদ্ধ হয় না (৪।২১)।

জ্ঞানযোগ

(১) **প্রবৃত্তিগত জ্ঞানযোগ**—গুণই গুণের মধ্যে প্রবর্তিত হচ্ছে ; গুণ ব্যতীত আর কেউ কর্তা নেই ; সমস্ত ক্রিয়াই গুণগুলিতে, ইন্দ্রিয় দ্বারা সংঘটিত হচ্ছে—এরূপ বুঝে কর্তৃত্বাভিমান না রেখে ক্রিয়া করলে তা প্রবৃত্তিগত জ্ঞানযোগ হয়। যেমন গুণ বিভাগ ও কর্মবিভাগ সম্পর্কে অবহিত জ্ঞানযোগী 'সমস্ত ক্রিয়াগুলি গুণ দ্বারাই সংঘটিত হচ্ছে'—এরূপ মেনে নিয়ে কর্ম করলেও তাতে আসক্ত হয় না (৩।২৮)। যে (প্রকৃতিস্থ) পুরুষ এবং গুণসহ প্রকৃতিকে সম্যক্‌ভাবে জানে, সে সর্বপ্রকারের আচার-ব্যবহার করেও বন্ধনে আবদ্ধ হয় না (১৩।২৩)। যার মধ্যে অহংকর্তৃত্ব ভাব ও ফলের কামনা নেই, সে সকল প্রাণী হত করলেও অর্থাৎ ঘোরতম কর্ম করলেও তার দ্বারা আবদ্ধ হয় না (১৮।১৭) ইত্যাদি।

(২) **নিবৃত্তিগত জ্ঞানযোগ**—সাংসারিক প্রবৃত্তি থেকে, কর্ম থেকে নিবৃত্ত হয়ে নির্জনে শুধু নিজ স্বরূপের, পরমাত্মার ধ্যানে রত থাকাকে নিবৃত্তিগত জ্ঞানযোগ বলা হয়। যেমন সাত্ত্বিকী বুদ্ধিসম্পন্ন, বৈরাগ্য আশ্রিত, নির্জনে থাকার স্বভাববিশিষ্ট এবং পরিমিত ভোজনকারী

জ্ঞানযোগী (সাধক) ধৈর্যসহ আত্মসংযমপূর্বক শরীর, মন ও বাক্য সংযত করে শব্দাদি বিষয়সমূহ ত্যাগ করে, রাগ-দ্বেষ বর্জিত হয়ে সর্বদা পরমাত্মার ধ্যানে নিরত থাকে। এরূপ সাধক অহঙ্কার, জেদ, দর্প, কাম, ক্রোধ এবং ভোগ্য-সংগ্রহ পরিত্যাগ করে মমত্বশূন্য এবং শান্তচিত্ত হয়ে ব্রহ্মভাব লাভে সমর্থ হয় (১৮।৫১-৫৩)।

ভক্তিযোগ

(১) প্রবৃত্তিগত ভক্তিযোগ—সাংসারিক কাজকর্মও যখন ভগবানের প্রসন্নতা লাভের জন্য করা হয়, ভগবানের শরণাগত হয়ে, ভগবৎপূজার দৃষ্টিতে করা হয় তখন তাকে প্রবৃত্তিগত ভক্তিযোগ বলা হয়। যেমন, 'তুমি যা কিছু কর্ম কর, তৎ সমুদায় আমাকেই অর্পণ কর' (৯।২৭) ; 'আমার নিমিত্ত কর্ম করলে তুমি সিদ্ধি প্রাপ্ত হবে' (১২।১০) ; 'মানুষ নিজ নিজ কর্ম দ্বারা সেই পরমাত্মার পূজা করে সিদ্ধিলাভ করে' (১৮।৪৬) ; 'আমার ভক্ত আমার আশ্রিত হয়ে সর্বকর্ম করতে থাকলেও আমার কৃপায় অবিনাশী পদ প্রাপ্ত হয়' (১৮।৫৬) ইত্যাদি।

(২) নিবৃত্তিগত ভক্তিযোগ—সাংসারিক কর্ম হতে বিরত হয়ে কেবল ভগবৎসম্বন্ধীয় জপ-ধ্যান, কথা-কীর্তন ইত্যাদি কর্মে লগ্ন হয়ে থাকাকে বলা হয় নিবৃত্তিগত ভক্তিযোগ। যেমন, 'যারা নিরন্তর আমাতে চিত্ত নিবিষ্ট রাখে, সেইরূপ দৃঢ়ব্রতী ভক্তগণ ভক্তিপূর্বক সর্বদা আমার নাম কীর্তন করে, আমাকে পাওয়ার জন্য ব্যাকুল হয়ে সাধনা করে, আমায় প্রণামপূর্বক আমার উপাসনা করে' (৯।১৪) ; 'তুমি আমার ভক্ত হও, আমাতে মন নিবিষ্ট কর, আমার পূজা কর এবং আমাকেই নমস্কার কর'(৯।৩৪) ; 'আমাতে অর্পিত চিত্ত, আমাতে অর্পিত প্রাণ ভক্ত নিজেদের মধ্যে আমার গুণ ও প্রভাবের কীর্তনকারী হয় ও আমার কথায় নিত্য সন্তুষ্ট থাকে' (১০।৯) ইত্যাদি।

এর তাৎপর্য এই যে, সাধন-ভজনের দুটি পথ আছে, একটি দ্বারা আচার-ব্যবহার ঠিকমতো রেখে পরমাত্মার লক্ষ্যে অগ্রসর হওয়া আর অপরটি সাংসারিক আচার-ব্যবহার ত্যাগ করে পরমাত্মার লক্ষ্যে চলা। আচার-ব্যবহার পালন করে সাধনভজন করাকে প্রবৃত্তিগত সাধনা বলা হয় এবং ব্যবহারাদি ত্যাগ করে সাধনা করাকে নিবৃত্তিগত সাধনা বলা হয়। যেমন মনু, জনক ইত্যাদি রাজা প্রবৃত্তিমার্গের অনুগামী ছিলেন এবং সনকাদি, শুকদেব প্রভৃতিগণ ছিলেন নিবৃত্তিমার্গের অনুগামী। প্রকৃতপক্ষে কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগ —এই তিনটি সাধন-পথেই নিবৃত্তি অর্থাৎ প্রবৃত্তিতে নিবৃত্তি এবং নিবৃত্তিতেও নিবৃত্তি পরিলক্ষিত হয়। কারণ এই তিন সাধনাতেই সংসারের সম্বন্ধ (আসক্তি) ত্যাগ হয় এবং পরমাত্মার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপিত হয়।

(৭৫) গীতায় সিদ্ধপুরুষের লক্ষণ

সমতাদিষু চিহ্নেষু সিদ্ধানাং তু সমানতা।
তদীয়ব্যবহারে তু ক্রিয়াভাববিভিন্নতা॥

কামনা (ফলেচ্ছা)-র ত্যাগের দ্বারা 'কর্মযোগে'র সাধনা আরম্ভ হয় (২।৪৮) এবং সর্বতোভাবে কামনাশূন্য হলে কর্মযোগে সিদ্ধিলাভ হয় (২।৫৫)। সুতরাং কর্মযোগে কামনার ত্যাগই মুখ্য কথা।

সৎ-অসৎ, প্রকৃতি-পুরুষ, ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ ইত্যাদির ভেদ-বিচারের দ্বারা 'জ্ঞানযোগে'র সাধনা আরম্ভ হয় (১৩।১৯) এবং সর্বতোভাবে অসতের সঙ্গে সম্পর্ক-বিচ্ছেদ হলে এতে সিদ্ধিলাভ হয়। অতএব জ্ঞানযোগে সৎ

ও অসতের (বিচারবোধ) বিবেকই মুখ্যরূপে কাজ করে।

'ভক্তিযোগ' ভগবৎপরায়ণতায় আরম্ভ হয় (১২।৬) এবং ভগবৎপরায়ণতাতেই সম্পূর্ণ হয় (১২।১৪)। সুতরাং ভক্তিযোগে ভগবৎপরায়ণতাই মুখ্য সাধনা।

উপরিউক্ত তিনটি যোগের সাধনার প্রারম্ভকালের যে স্থিতি, সেই স্থিতির পূর্ণতা প্রাপ্ত হলে সেই মার্গের সাধনায় সিদ্ধিলাভ হয়। সেইজন্য গীতায় যেখানে কর্মযোগে সিদ্ধ মহাপুরুষদের বর্ণনা আছে (২।৫৫-৭২), সেখানে কর্মযোগী সাধকদের বর্ণনাও করা হয়েছে (২।৫৯, ৬৪-৬৫ ইত্যাদি)। যেখানে জ্ঞানযোগে সিদ্ধ মহাপুরুষদের বর্ণনা আছে (১৪।২২-২৫), সেখানে তার পূর্বে জ্ঞানযোগী সাধকদের বর্ণনা রয়েছে (১৪।১৯-২০)। এইরূপেই যেখানে ভক্তিযোগে সিদ্ধ মহাপুরুষদের বর্ণনা আছে (১২।১৩-১৯), সেখানে প্রথমে ভক্তিযোগী সাধকদের বর্ণনা করা হয়েছে (১২।৬-১০)।

সাধনকালে কর্মযোগীর কর্মে অধিক প্রবৃত্তি থাকে ; সেইজন্য সিদ্ধাবস্থায়ও তার কর্মে স্বাভাবিক প্রবৃত্তি থাকে। অতএব কর্মযোগে সিদ্ধ মহাপুরুষদের লক্ষণে কর্মে উপরতির বর্ণনা নেই (৬।৭-৯)। জ্ঞানযোগী অসৎ পরিত্যাগ করে নিজ স্বরূপে স্থিতিলাভ করে, কাজেই সংসারের প্রতি তার স্বতঃই বিরাগ থাকে (১৪।২৩)। ভক্তিযোগীর ভগবানে মতি থাকায় সেও সংসারের প্রতি আসক্ত থাকে না (১২।১৬)।

তিন যোগেই সিদ্ধ মহাপুরুষগণ অহংভাব ও মমত্ব বর্জিত হয় (কর্মযোগী ২।৭১), (জ্ঞানযোগী ১৮।৫৩), (ভক্তিযোগী ১২।১৩)। তিন সিদ্ধযোগীই রাগ-দ্বেষ বর্জিত হয় (কর্মযোগী ২।৫৭ ; জ্ঞানযোগী ১৪।২২ ; ভক্তিযোগী ১২।১৭)। তিন যোগীর মধ্যেই সমত্ব-ভাব বিরাজ করে (কর্মযোগী ৬।৭-৯ ; জ্ঞানযোগী ১৪।২৪-২৫ ; ভক্তিযোগী ১২।১৮)।

ভক্তিযোগে 'সবকিছুই বাসুদেব' (৭।১৯)—এই অনুভূতি জাগ্রত হওয়ায় প্রাণিমাত্রের প্রতি মিত্রতা ও করুণার ভাব বিশেষভাবে প্রকটিত হয় (১২।১৩), কিন্তু কর্মযোগে ও জ্ঞানযোগে এরূপ হয় না।

সাধক যে কোন পথেই সাধনা করুন না কেন পূর্ণতা লাভ করলে তারা একই তত্ত্ব লাভ করে। তবুও কর্মযোগীর পক্ষে জ্ঞানযোগের কথা বিশেষভাবে অনুধাবন করা সম্ভব হয় এবং ভক্তিযোগের কথা সাধারণভাবে বোধগম্য হয়। জ্ঞানযোগীর কর্মযোগ এবং ভক্তিযোগ সম্বন্ধে তেমন জ্ঞান থাকে না কিন্তু ভক্তিযোগী কর্মযোগ এবং জ্ঞানযোগ সম্বন্ধে যথেষ্ট অবহিত থাকে।

কর্মযোগে কামনা ত্যাগের কিছু ন্যূনতা থাকলে এবং জ্ঞানযোগে নিজের মধ্যে কোন বিশেষত্ব অনুভব করলে তাদের মধ্যে অহং-অভিমান থাকতে পারে। কারণ, কর্মযোগী এবং জ্ঞানযোগীর যে নিষ্ঠা, তা হল তাদের নিজেদের। সুতরাং অহং-অভিমান দূর করার দায়িত্ব তাদের উপরেই থাকে। কিন্তু ভক্তিযোগীর অহং-অভিমান থাকতে পারে না। কারণ, সে প্রথম থেকেই ভগবন্নিষ্ঠ হয়। তবে ভগবৎপরায়ণতায় ন্যূনতা থাকলে ভক্তিযোগীর মধ্যেও অহং-অভিমান থাকতে পারে, কিন্তু তা দূর করার দায়িত্ব স্বয়ং ভগবানের, ভক্তের নয়, কেননা ভক্তিযোগী ভগবন্নিষ্ঠ হয়।

এর তাৎপর্য এই যে, তিনটি যোগমার্গেই নিজস্ব কিছু বিশেষত্ব থাকায় তিনটি সাধন-পথই হলো পৃথক্। তবুও তত্ত্বলাভ, সমত্ব, নির্বিকার-ভাব—প্রভৃতিতে তাদের মধ্যে কোনও পার্থক্য থাকে না ; তবে তাদের লৌকিক ব্যবহারে ভিন্নতা থাকে।

(৭৬) গীতায় ভগবান এবং মহাপুরুষের সাধর্ম্য

অন্বভূয়ত যৈস্তত্ত্বং তে মুক্তা এব বন্ধনাৎ।
তস্মাৎ প্রোক্তং তু সাধর্ম্যং নিজস্য চ মহাত্মনাম্॥

গীতায় ভগবান এবং সিদ্ধ মহাপুরুষদের লক্ষণগুলির মধ্যে যে সাধর্ম্য আছে তার বর্ণনা করা হয়েছে ; যেমন—

(১) ভগবান বলেছেন যে, 'ত্রিলোকে আমার করণীয় কিছুই নেই'—'**ন মে পার্থাস্তি কর্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন**' (৩।২২)। সেইরূপ মহাপুরুষদের জন্যও কোন কর্তব্য থাকে না—'**তস্য কার্যং ন বিদ্যতে**' (৩।১৭)।

(২) ভগবান বলেছেন, 'পাওয়ার মত কোন বস্তুই আমার অপ্রাপ্ত নেই'—'**নানবাপ্তমবাপ্তব্যম্**' (৩।২২)। সেইরূপ মহাপুরুষদেরও কোন প্রাণীর সঙ্গে কিছুমাত্র স্বার্থের সম্পর্ক থাকে না অর্থাৎ কারো কাছে কিছু পাওয়ার কামনা থাকে না।—'**ন চাস্য সর্বভূতেষু কশ্চিদর্থব্যপাশ্রয়ঃ**' (৩।১৮)।

(৩) কোনরূপ কর্তব্য এবং প্রাপ্তব্য না থাকলেও ভগবান লোকসংগ্রহের জন্য কর্ম করেন। ভগবান বলেছেন যে, 'আমি যদি সাবধান হয়ে কর্ম না করি, তাহলে এই লোক সব উচ্ছন্নে যাবে এবং আমি বর্ণসংকরাদি উৎপন্নকারী তথা প্রজাবিনাশের কারণ হব' (৩।২৩-২৪)। এইভাবে মহাপুরুষদেরও নিজ কর্তব্য বা কিছু পাওয়ার ইচ্ছা না থাকলেও ভগবান তাঁদের তৎপরতাপূর্বক লোকসংগ্রহার্থ কর্ম করার আদেশ দিয়েছেন—'**কুর্যাদ্বিদ্বাংস্তথাসক্তশ্চিকীর্ষুর্লোকসংগ্রহম্**' (৩।২৫)। সুতরাং তাঁরাও আসক্তিবর্জিত হয়ে লোকহিতার্থে কর্ম করেন।

(৪) ভগবান বলেছেন যে, সমস্ত কিছু করতে থাকলেও আমাকে অকর্তা বলে জানবে অর্থাৎ আমি কর্তৃত্বাভিমানরহিত—'**তস্য কর্তারমপি মাং বিদ্ধ্যকর্তারমব্যয়ম্**' (৪।১৩) এইপ্রকার মহাপুরুষদের সম্বন্ধেও বলা হয়েছে যে তাঁরা নানাভাবে কর্ম করলেও প্রকৃতপক্ষে কিছুই করেন না অর্থাৎ তাঁরা কর্তৃত্বাভিমানরহিত হন—'**কর্মণ্যভিপ্রবৃত্তোঽপি নৈব কিঞ্চিৎ করোতি সঃ**' (৪।২০)।

(৫) ভগবান বলেছেন যে, 'আমি সমস্ত কর্ম করলেও কর্ম আমায় লিপ্ত করে না'—'**ন মাং কর্মাণি লিম্পন্তি**' (৪।১৪) এবং কর্মের ফলের প্রতিও আমার স্পৃহা নেই—'**ন মে কর্মফলে স্পৃহা**' (৪।১৪)। এইরূপ মহাপুরুষকেও কর্ম লিপ্ত করে না—'**ন নিবধ্যতে**' (১৮।১৭) এবং কর্মফলেও তাঁদের স্পৃহা থাকে না—'**বিগতস্পৃহঃ**' (২।৫৬) ; '**পুমাংশ্চরতি নিঃস্পৃহঃ**' (২।৭১)।

(৬) ভগবান স্বভাবতই সর্বলোকের সুহৃদ—'**সুহৃদং সর্বভূতানাম্**' (৫।২৯)। এইরূপে মহাপুরুষগণও স্বভাবতই প্রাণিমাত্রেরই হিতে প্রীতি রাখেন—'**সর্বভূতহিতে রতাঃ**' (৫।২৫ ; ১২।৪)।

(৭) ভগবান নিজেকে ত্রিগুণের অতীত বলে বর্ণনা করেছেন—'**মামেভ্যঃ পরমব্যয়ম্**' (৭।১৩)। মহাপুরুষগণকেও এইপ্রকার ত্রিগুণের অতীত বলা হয়েছে—'**গুণাতীতঃ স উচ্যতে**' (১৪।২৫)।

(৮) ভগবান কর্মে অনাসক্ত এবং উদাসীনবৎ অবস্থিত থাকেন, সেইজন্য কর্ম তাঁকে আবদ্ধ করতে পারে না—'**উদাসীনবদাসীনমসক্তং তেষু কর্মসু**' (৯।৯)। এইরূপ মহাপুরুষগণও কর্মে আসক্ত হন না, ফলে তাঁরাও কর্ম দ্বারা আবদ্ধ হন না—'**উদাসীনবদাসীনো গুণৈর্যো ন বিচাল্যতে**' (১৪।২৩)।

(৯) ভগবান বলেছেন 'সৎ এবং অসৎ সবই আমি'—'**সদসচ্চাহম্**' (৯।১৯), এবং মহাপুরুষদের দৃষ্টিতে সবকিছুই বাসুদেব—'**বাসুদেবঃ সর্বম্**' (৭।১৯)।

(১০) ভগবান বলেছেন, 'আমিই বেদের একমাত্র জ্ঞাতা' '**বেদবিদেব চাহম্**' (১৫।১৫)। মহাপুরুষদেরও এইপ্রকার বেদবিদ্ বলা হয়—'**স বেদবিৎ**' (১৫।১)।

—ভগবান এবং মহাপুরুষগণের এরূপ সাধর্ম্য থাকলেও মহাপুরুষগণ ভগবানের ন্যায় ঐশ্বর্যসম্পন্ন হতে পারেন না। পূর্ণ ঐশ্বর্য একমাত্র ভগবানেই সম্ভব—'**ঐশ্বর্যস্য সমগ্রস্য**' (বিষ্ণুপুরাণ ৬।৫।৭৪)। জগৎ চরাচরের উৎপত্তি, পালন ও সংহার একমাত্র ভগবানের দ্বারাই সম্ভব, মহাপুরুষের দ্বারা নয়—'**জগদ্ব্যাপারবর্জম্**' (ব্রহ্মসূত্র ৪।৪।১৭)।

ভগবান এবং মহাপুরুষদের লক্ষণের সাধর্ম্য বলার উদ্দেশ্য এই যে, অনাদিকাল হতে স্বর্গ-নরক এবং চুরাশী লক্ষ যোনি পরিভ্রমণকারী সাধারণ প্রাণী যদি মানব-জন্মের সদুপযোগ করে, তাহলে পরমাত্মার যে লক্ষণসমূহ আছে সেই লক্ষণগুলি জীবন্মুক্ত হলে তার মধ্যেও বর্তায়। যে উৎকর্ষতা ব্রহ্মলোকে গেলেও হয় না, তা জীব মনুষ্যশরীরে থেকেই লাভ করতে পারে।

(৭৭) গীতার তাৎপর্য

শ্রীকৃষ্ণগীতগীতায়াস্তাৎপর্যং দৃশ্যতে বুধৈঃ।
বিবেকভাবয়োর্মধ্যে তাবপি দ্বিবিধৌ স্মৃতৌ॥

গীতার তাৎপর্য সমগ্র জীবের কল্যাণ করা, এইজন্য গীতায় বিবেক এবং ভাবমুখী সাধন-পথের বর্ণনা করা হয়েছে।

গীতায় উল্লিখিত বিবেকবোধ দু প্রকারের—

(১) সৎ এবং অসৎ-এর বিবেক—যা স্থিতিশীল, অপরিবর্তনীয়, যার বিনাশ নেই, সেই শরীরী এবং পরমাত্মাকে 'সৎ' বলা হয়। যা সর্বদা থাকে না, পরিবর্তনশীল এবং বিনাশশীল সেই শরীর এবং জগৎ চরাচরকে 'অসৎ' বলা হয়। (২।১১-৩০, ১৩।১৯-২৩, ২৯-৩৪ ; ১৪।৫-২০) ইত্যাদি।

(২) কর্তব্য এবং অকর্তব্যের বিবেক—কর্তব্য কী এবং অকর্তব্য কী, প্রবৃত্তি কাকে বলে এবং নিবৃত্তি কাকে বলে, ধর্ম কী এবং অধর্মই বা কী ? স্বধর্ম কাকে বলে এবং পরধর্মই বা কাকে বলে—একে কর্তব্য-অকর্তব্যের জ্ঞান (বিবেক) বলা হয় (২।৩১-৫৩ ; ৩।৮-১৬ ; ৩৫; ৪।১৫ ; ১৮।৪১-৪৮ ইত্যাদি)।

ভাবও দু' প্রকারের বলা হয়েছে—

(১) নিষ্কামভাব (ত্যাগভাব)—এইভাবে কর্ম এবং কর্মফলের আসক্তি, কামনাবর্জিত হয়। গীতায় **'সঙ্গং ত্যক্ত্বা'** (২।৪৮) ; **'প্রজহাতি যদা কামান্'** (২।৫৫) ; **'বিহায় কামান্ যঃ সর্বান্'** (২।৭১) ; **'ত্যক্ত্বা কর্মফলাসঙ্গম্'** (৪।২০) **'সঙ্গং ত্যক্ত্বা'** (৫।১১) ; **'সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলানি'** (১৮।৬) ; **'সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলং চৈব'** (১৮।৯) ; **'যস্তু কর্মফলত্যাগী'** (১৮।১১) ইত্যাদি পদগুলিতে নিষ্কামভাবের বর্ণনা করা হয়েছে।

(২) অনন্যভাব (প্রেমভাব)—সংসার হলো পর। সেই সংসারের আশ্রয়, গুরুত্ব ত্যাগ করে এ থেকে বিমুখ হওয়াকেই অনন্যভাব বলা হয়। গীতায় **'অনন্যচেতাঃ সততম্'** (৮।১৪) ; **'ভক্ত্যা লভ্যস্ত্বনন্যয়া'** (৮।২২), **'অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাম্'** (৯।২২) ; **'অনন্যেনৈব যোগেন'** (১২।৬) ইত্যাদি পদসমূহে অনন্যভাবের বর্ণনা করা আছে।

বিবেক এবং ভাব—সমস্ত সাধনাতেই এই দুটির প্রাধান্য থাকা অত্যন্ত আবশ্যক। কারণ এই দুটি না হলে মানুষ সংসারে আবদ্ধ হয় এবং জন্ম-মৃত্যু চক্রে পতিত হয়। তাৎপর্য এই যে, বিবেককে যদি গুরুত্ব না দেওয়া হয়, তবে মানুষের মধ্যে জড়ত্ব (মূঢ়তা) আসে এবং সে অকর্তব্য-কর্মে ব্যাপৃত হয় এবং 'ভাব' (নিষ্কামভাব বা অনন্যভাব) না হলে মানুষের সংসারের প্রতি আসক্তি ও কামনা জন্মে এবং সে ভগবান থেকে বিমুখ হয়ে যায়।

বিবেক-বোধেও নিষ্কামভাব থাকা অত্যন্ত প্রয়োজন (৫।২৩, ২৬)। কারণ, নিষ্কামভাব না থাকলে মানুষ কামনায় বশীভূত হয়, ফলে সংসারের আসক্তি দূর হয় না। তেমনি বিবেক-বোধে অনন্যভাব অর্থাৎ প্রেমভাব থাকা অত্যন্ত আবশ্যক, সেই প্রেম-ভাব স্বরূপের প্রতি হোক (৫।২৪) বা কর্তব্য-কর্মের প্রতি (১৮।৪৫) হোক।

নিষ্কামভাবেও (বিবেকবোধ) জ্ঞান থাকা অত্যন্ত আবশ্যক (৪।১৯ ; ৪১ ; ৬।৮ ইত্যাদি) ; কারণ মানুষের বিবেক-বোধ যদি না থাকে, তবে সে নিষ্কাম হবে কিভাবে ? অনন্যভাবেও বিবেক-বোধ (জ্ঞান) অত্যন্ত প্রয়োজন (৫।২৯ ; ৯।১৩; ১০।৭ ইত্যাদি) ; কারণ বিবেক-বোধের (জ্ঞানের) অভাবে অন্য পদার্থের ত্যাগ কিরূপে সম্ভব ?

এইরূপে গীতায় মানুষের কল্যাণের উদ্দেশ্যে বিবেক ও ভাবগত সাধনগুলির বর্ণনা করা হয়েছে। যেখানে ক্রিয়াগত সাধনার বর্ণনা করা হয়েছে, সেস্থানে ঐগুলিকে তত গুরুত্ব দেওয়া হয়নি যতটা গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে বিবেক (জ্ঞান) এবং ভাবগত সাধনার উপর। যেখানে ক্রিয়াগত সাধনাগুলির উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, সেখানেও প্রকৃতপক্ষে নিষ্কামভাবেরই প্রাধান্য রয়েছে (২।৪৭ ; ৩।৮, ১৭-১৮ ; ৪।১৫) ইত্যাদি।

(৭৮) গীতায় কথোপকথন

সংজয়স্যাম্বিকেয়স্য শ্রীকৃষ্ণস্যার্জুনস্য চ।
দ্বিধৈব মুখ্যসংবাদো গীতয়া মন্যতে স্বয়ম্॥

গীতায় কথোপকথন দুই প্রকারের—ধৃতরাষ্ট্র এবং সঞ্জয়ের ও শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জুনের।

গীতার প্রথম অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকেই ধৃতরাষ্ট্র বলেছেন, তারপরে অষ্টাদশ অধ্যায় পর্যন্ত ধৃতরাষ্ট্রের কোন কথা নেই। সঞ্জয় মাঝে মাঝে কয়েকবার কথা বলেছেন।

প্রথম অধ্যায়ে **'হৃষীকেশং তদা বাক্যমিদমাহ'** (১।২১), **'উবাচ পার্থ পশ্যৈতান্ সমবেতান্ কুরূনিতি'** (১।২৫) ইত্যাদি বাক্যে শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের কথোপকথনের উল্লেখ আছে, কিন্তু এগুলি সঞ্জয়ের বাক্যের অন্তর্গত। দ্বিতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় শ্লোক থেকে শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জুনের পরস্পর কথাবার্তা আরম্ভ হয়েছে।

উপরিউক্ত দুইপ্রকার কথোপকথন ছাড়াও দুর্যোধন এবং প্রজাপতি ব্রহ্মার কথাও গীতাতে আছে ; যেমন—প্রথম অধ্যায়ের তৃতীয় শ্লোক থেকে একাদশ শ্লোক পর্যন্ত (মোট ন'টি শ্লোকে) দুর্যোধনের কথা আছে ; এবং তৃতীয় অধ্যায়ের দশম শ্লোকের উত্তরার্ধ থেকে দ্বাদশ শ্লোকের পূর্বার্ধ পর্যন্ত ব্রহ্মার বাণী আছে। তার মধ্যে দুর্যোধনের বাক্য সঞ্জয়ের বাক্যের অন্তর্গত এবং ব্রহ্মার বাণী ভগবানের বাণীর অন্তর্গত । সেইজন্য ঐস্থানে 'দুর্যোধন উবাচ' এবং 'প্রজাপতিরুবাচ' বলা হয় নি।

দ্বিতীয়তঃ সমগ্র মহাভারতই বৈশম্পায়ন এবং জনমেজয় দ্বারা উক্ত। তাদের কথোপকথনে ধৃতরাষ্ট্র এবং সঞ্জয়ের বার্তালাপ আছে[1] যার মধ্যে সঞ্জয় শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জুনের কথোপকথন সম্বন্ধে বলেছিলেন দুর্যোধন প্রভৃতির নয়। প্রত্যেক অধ্যায়ের শেষে যে উপসংহার দেওয়া হয়েছে, তাতেও **'শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে'** পদ দেওয়া হয়েছে। সুতরাং গীতায় দুটিই কথোপকথন আছে।

---

[1]মহাভারতের বক্তা বৈশম্পায়ন ঋষি এবং শ্রোতা রাজা জনমেজয়। মহাভারতে মোট আঠারোটি পর্ব আছে, তার মধ্যে ভীষ্মপর্বের শুরুতে রাজা জনমেজয় বৈশম্পায়নকে জিজ্ঞাসা করছেন যে কৌরব এবং পাণ্ডবেরা কীভাবে যুদ্ধ করলেন ? উত্তরে বৈশম্পায়ন দুই পক্ষের সেনাদের হর্ষোল্লাসাদির কথা জানালেন। তারপর বেদব্যাস ধৃতরাষ্ট্রের কাছে এলেন এবং ধৃতরাষ্ট্রকে অবশ্যম্ভাবী যুদ্ধের বিষয়ে অনেক কিছু জানালেন ও সঞ্জয়কে দিব্যদৃষ্টি দিলেন যাতে সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রকে যুদ্ধাদির বর্ণনা করতে পারেন। বেদব্যাসের প্রস্থানের পর ধৃতরাষ্ট্র জিজ্ঞাসা করলেন যে, 'যে ভূসম্পত্তির জন্য আমার ও পাণ্ডুপুত্রগণ যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হয়েছে, এখন তার বিস্তারিত বর্ণনা কর।' সঞ্জয় তখন ভারতবর্ষের ভূমি, দ্বীপ, নদী ও পর্বতাদির বর্ণনা করলেন। পরে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা পর্বের শুরুতে (যেটি ভীষ্মপর্বের ত্রয়োদশ অধ্যায়ে আছে) বৈশম্পায়ন রাজা জনমেজয়কে বললেন যে, একদিনের ঘটনা, সঞ্জয় যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ফিরে পিতামহ ভীষ্মের যুদ্ধভূমিতে শরশয্যায় পতনের সংবাদ ধৃতরাষ্ট্রকে শোনালেন। তখন ধৃতরাষ্ট্র ও সঞ্জয়ের মধ্যে দুই পক্ষের সেনাদের সম্বন্ধে অনেক কথা হলো। শেষে ভীষ্মপর্বের পঁচিশ সংখ্যক অধ্যায়ের প্রারম্ভে (গীতার যেটি প্রথম অধ্যায়) ধৃতরাষ্ট্র যুদ্ধের ক্রমানুসারে বিস্তারিত বর্ণনা শোনার জন্য সঞ্জয়কে প্রশ্ন করলেন।